দীপরক্ষী

ষষ্ঠ খন্ড

ডিজিটাল প্রকাশক

তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষনা বিভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

Mobile: +8801787898470
+8801915137084
+8801674140670

Facebook Page :

Satsang Narayangonj, Bangladesh

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনলাইন গ্রন্থশালা

কিছু কথা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্তৃক প্রকাশিত ১ম সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

জয়গুরু।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBObEgyaEU

অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

পুণ্য-পুঁথি

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

সত্যানুসরণ

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

দীপরক্ষী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

দীপরক্ষী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

দীপরক্ষী ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEAb-yyVNBG_qFhOV

দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

কথা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

নানা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

The Message Vol 1

https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

The Message Vol 2

https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

The Message Vol 3

https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

The Message Vol 5

https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

The Message Vol 6

https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

The Message Vol 7

https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

The Message Vol 9

https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

দীপরক্ষী

ষষ্ঠ খণ্ড

সঙ্কলয়িতা

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক
শ্রীঅনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড

প্রকাশকাল
প্রথম সংস্করণ ঃ এপ্রিল, ২০০২

মুদ্রক
কৌশিক পাল
প্রিন্টিং সেন্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

DIPRAKSHI, Vol. VI
Conversation with *Sri Sri Thakur Anukulchandra*
Compiled by Sri Debiprasad Mukhopadhyaya
1st edition, April 2002

ভূমিকা

অখিলমঙ্গলবিধায়ক পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কৃপায়, তাঁর সহিত কথোপকথন-গ্রন্থ দীপরক্ষী ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিবরণ তথা তাঁর সহিত আলাপ-আলোচনার এই সংকলন তাঁরই আদেশে তাঁর সম্মুখে ব'সে লিখিত। প্রায় শতসংখ্যক বাণীগ্রন্থে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর যা' বক্তব্য সবই বলে গেছেন। তবুও আবার এই কথোপকথন-গ্রন্থের প্রয়োজন কেন? এর বিশেষত্ব কোথায়?

বাণীগ্রন্থে আছে তাঁর ভাবাদর্শের কথা। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা কেমন ছিল, তাঁর নিত্যদিনের আহার, নিদ্রা, দরদ, লোকনিয়ন্ত্রণী কৌশল, কষ্ট, আনন্দ, প্রভৃতির যথাসম্ভব খুঁটিনাটি পারম্পরিক বিবরণ এই আলাপচারিতার গ্রন্থ। 'যথাসম্ভব' বলার কারণ—।

প্রথমতঃ, ঈশ্বরীয় নরলীলা কখনও অভ্রান্ত ও পূর্ণাঙ্গভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় না। বাইরে যতটুকু ব্যক্ত হয় তাইই বলা যায় মাত্র। সমুদ্রের উপরিভাগের তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখে কি সেই বারিধির অতলান্ত প্রদেশের জীবকুল, গুল্মলতা, পর্ব্বতাদির অনুমান করা যায়? দ্বিতীয়তঃ, তাঁর শ্রীমুখোচ্চারিত কথাগুলি অবিকৃতভাবে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছি ঠিকই, কিন্তু কথোপকথনকালে তাঁর আঁখিতারকার মধুর সঞ্চালন, সমগ্র আননে উদ্ভাসিত বিমল হাসির ছটা, কোন বিষয় বোঝাবার সময় করাঙ্গুলির বিশেষ প্রক্ষেপণ, ভ্রমণকালে মনোরম গতিবিভঙ্গ, বরাভয়প্রদায়ী চিরপ্রশান্ত ধ্যানগম্য দিব্য তনুঠাম—এগুলির যথাযথ চিত্র কিভাবে ভাষায় ফুটিয়ে তোলা যাবে? তাই, সে খাঁকতি রয়েই গেছে। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন কারণে এবং শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ অনেক সময় তাঁর সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকতে পারি নি। ফলে, অনেক বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হ'য়ে ওঠে নি। চতুর্থতঃ এবং অন্যতম বিশেষ কারণ এই যে শ্রীশ্রীঠাকুর কখন ঘুমাতেন এবং কখন জেগে থাকতেন তা' মানবীয় হিসাবের বাইরে। গভীর নিথীথে যখন সমগ্র সংসার সুষুপ্তির কোলে ঢ'লে পড়েছে, তখন হয়তো তাঁর নিকটে পৃথিবীর কোন প্রান্তের কোন আর্ত্ত বা কোন জ্ঞানপিপাসুর আকুলতা এসে পৌঁছেছে। রাত্রির সেই নিস্তব্ধ যামে তিনি শয্যায় উঠে বসেছেন, ডেকে পাঠিয়েছেন এই দীন সংকলককে,

তারপর দিয়েছেন সেই যাচ্ঞাকারীর প্রার্থনার উত্তরে তাঁর স্বস্তিভরা সমাধানী বাণী। বহু রাতে এমন ঘটনা ঘটেছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, পুরুষোত্তম চির-অতন্দ্র। তাঁর ঐ অমিয় কথা ও ভাব আমি যেমন দেখেছি ও শুনেছি, অবিকল সেইভাবেই ধ'রে রাখার চেষ্টা করেছি। হয়তো আমার বোধের অপূর্ণতার জন্য সেই মহাভাবের প্রকৃত স্বরূপ যথাযথ প্রস্ফুটিত হয়নি।

পূর্ব্বে এই গ্রন্থের পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। সেই সব খণ্ডে জাগতিক ও পারমার্থিক প্রভৃত বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটেছে। দীপরক্ষীর বর্ত্তমান খণ্ড যখন লিখিত হয় তখন শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে ছড়া দিচ্ছেন। কোন কোনদিন সারা দিনেরাতে দেড়শত বা ততোধিক ছড়া আবির্ভূত হয়েছে। কয়েকটি বিশেষ ছড়ার মর্ম্মার্থ ও তাৎপর্য্য তিনি নিজেই ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন। আবার, কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে ছড়াগুলি অবতীর্ণ হয়েছে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণও উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছেন। এই ইতিহাস বর্ত্তমান খণ্ডের উল্লেখযোগ্য অংশ।

এ ছাড়া কয়েকটি শাস্ত্রবচনের গূঢ়ার্থ, রামায়ণ-মহাভারতের কিছু জটিল প্রশ্নের সমাধান এই খণ্ডে আছে। এই সময়ে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানশাখার অধ্যাপক পারিজাত রায় তাঁর কয়েকজন ছাত্র-সহ আশ্রমে কিছুদিন অবস্থান করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে তাঁদের শিক্ষা, সাহিত্য, গুরুভক্তি, সাধন-তপস্যা, জীবনগঠন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। তদ্ব্যতিরেকে আদর্শ, ধর্ম্ম, নিষ্ঠা, কৃষ্টি, বিবাহ, বর্ণাশ্রম, ভাষাতত্ত্ব, নামধ্যান, আত্মবিশ্লেষণ, লোকব্যবহার, শাসনব্যবস্থা, শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখে আত্মজীবনকথা-বর্ণন প্রভৃতি অজস্র বিষয় প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়ে এই খণ্ডে বিধৃত হয়েছে।

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রার্থনা করেছিলেন, "আমাকে রসেবসে রাখিস্ মা!" এই রসেবসে থাকা পরমপুরুষের স্বতঃ স্ব-ভাব। লৌকিক আত্মীয়-পরিজন, অনুরাগী তথা ভক্তগণের মঙ্গলসাধনে শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন চির-অতন্দ্র। এরই মাঝে-মাঝে ঝলক দিয়ে উঠত তাঁর স্নিগ্ধ রসঘন বিমল কৌতুকের ছটা। সেই দিব্য ছটার প্রভাবে পরিবেশের হীনতা, মলিনতা, অবসাদ, কুটিলতা কোথায় উড়ে চ'লে যেত তার ঠিক নেই। তাঁর সেই আনন্দময় মুহূর্ত্তের কয়েকটি ছবিও এই খণ্ডে ধরে রাখা আছে।

ইং ২০।১২।১৯৫৯ (বাং ৪ঠা পৌষ, ১৩৬৬) থেকে ২৮।৫।১৯৬০ (বাং ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭) তারিখ পর্য্যন্ত কথোপকথন এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পার্লারগৃহের নির্ম্মাণকার্য্য ও গৃহপ্রবেশও এই সময়ের মধ্যে ঘটে।

আমি আমার জ্ঞানবুদ্ধিমতো নির্ভুলভাবে সব লিখেছি। কিন্তু সীমায়িত জ্ঞান দিয়ে অসীম অনন্তকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই লেখার মধ্যে যা-কিছু পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর সবই পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের করুণায়, আর যা-কিছু অপূর্ণতা ও দোষত্রুটি সেগুলির কারণ আমারই সীমিত বোধ ও অজ্ঞানতা।

পরমপিতা জয়যুক্ত হউন।

—বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
৮ই আষাঢ়, রথযাত্রা, ১৪০৮
ইং ২৩।৬।২০০১

নিবেদক
শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশকের বক্তব্য

দীপরক্ষী ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেরও বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র প্রণয়ন করেছেন সংকলক শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আমরা আশা করি, দীপরক্ষীর অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় বর্ত্তমান খণ্ডটিও পাঠকবৃন্দের নিকট সমাদৃত হবে।

সৎসঙ্গ, দেওঘর

৮ই আষাঢ়, রথযাত্রা, ১৪০৮ — প্রকাশক

ইং ২৩।৬।২০০১

দীপরক্ষী

৪ঠা পৌষ, ১৩৬৬, রবিবার (ইং ২০। ১২। ১৯৫৯)

আজ বিকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে বসে খুব ছড়া দিচ্ছেন। ছড়ার যেন স্রোত বয়ে চলেছে। মাঝে-মাঝে টুকিটাকি কথাও চলছে। কেউ হয়তো এসে কোন কথা বলছেন। ঐ বিষয়ের উপর ভিত্তি ক'রে আরো কয়েকটি ছড়া নেমে এল, এমনও হচ্ছে।

একজন শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রদত্ত লাঠি দিয়ে কুকুর মেরেছেন। অপর একজন এসে সেকথা নালিশ করলেন। তা' শুনে দয়াল ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন—লাঠির সদ্ব্যবহার করতে হয়। নতুবা বাড়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

এই সময় নিখিলদা (ঘোষ) জিজ্ঞাসা করলেন—লাঠির সদ্ব্যবহার মানে তার area (সীমা) কতটুকু?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্য minimum (কমপক্ষে) যে resistance (প্রতিরোধ)-টুকু দরকার, তার জন্য লাঠি ব্যবহার করা যায়। তারপরেই ছড়া দিলেন—

বাঁচাবাড়ার সংস্কারের
বিরুদ্ধেতে যা-ই দাঁড়াক্,
তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে,
জীবনচর্য্যা বাঁচিয়ে রাখ্।
নিষ্ঠাচারে শিষ্ট হয়ে
অভ্যস্ত হবি যেমনতর,
স্বতঃশিষ্ট প্রতিফলন
হবেও তোমার তেমনতর।

এইভাবে পর পর নেমে আসতে থাকল ছড়ার পর ছড়া। অর্গলমুক্ত নির্ঝরিণী-ধারার ন্যায় ছড়ার স্রোতের বিরাম নেই।

এই অবিশ্রান্ত গতি সমানে চলল রাত দশটা পর্য্যন্ত। মাঝে-মাঝে দয়াল তাম্রকূট সেবন করছেন। দশটার পর বললেন—আমি এই যে বলি, এক-একটা বিষয় নিয়ে

একসময় বলতে থাকি। তার মধ্যে কোন কথা বাদ গেল কিনা, সেইজন্য মাঝে-মাঝে আমার কাছে ওগুলো পড়লে আমার সুবিধা হয়।

৫ই পৌষ, ১৩৬৬, সোমবার (ইং ২১। ১২। ১৯৫৯)

আজ ভোরে আকাশ মেঘলা ছিল। বেলা হতেই পরিষ্কার হয়ে এল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর অশথতলায় পূর্ব্বদিকের ছাউনির তলে এসে বসলেন। মিষ্টি রোদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), জ্ঞানদা (গোস্বামী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), সূর্য্যদা (বসু), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ-অনুযায়ী আগের দিনে দেওয়া ছড়াগুলি তাঁর সামনে পড়া হচ্ছিল। শুনতে শুনতে তার উপর দাঁড়িয়ে আবার নতুন ছড়া বলছেন পরম দয়াল। অর্থাৎ ছড়াই ছড়া টেনে আনছে।

তাঁর সান্নিধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক দিব্য মাদকতা। এ মাদকতার আছে তীব্র আকর্ষণী সম্বেগ। কাছাকাছি যে আসছে, সে-ই আঠার সাথে লেগে থাকার মত এই আসরে আটকে যাচ্ছে। ছড়া দেওয়া চলেছে। প্রজ্ঞা, প্রেম ও কৃতিসম্বেগের এক ছন্দোময় দোলায় সমগ্র পরিবেশ যেন সন্দোলিত।

বেলা ৯টার কাছাকাছি শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে এসে বসলেন। ভক্তবৃন্দ সঙ্গে সঙ্গে আছেন। কথায়-কথায় কেষ্টদা বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বর্ত্তমান education-এ (শিক্ষাব্যবস্থায়) আছে self-selling attitude (আত্মবিক্রয়ী মনোবৃত্তি)। এখনকার পড়াশুনায় progressive trail (প্রগতিমুখর ধারা) অর্থাৎ man-making (মানুষ-তৈরীর) রকমটা একেবারেই নেই। তারপর ছড়ায় বললেন—

শ্রদ্ধার আসনে নিষ্ঠা-আলিম্পনে
ইষ্ট স্থাপিত ক'রে
কৃতিতপা তুই নিখুঁত নিবেশে
হ'য়ে চল্ তাঁরে ধ'রে।
কর্ষে নিয়ে মেধাটি তোর
প্রীতি-বিভব কৃষ্টিতে
ফুলিয়ে তোল্ প্রজ্ঞা-বিভব
অমর জীবন সৃষ্টিতে।

আজও বিকাল থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বিভিন্ন বিষয়ের উপর ছড়া ব'লে চলেছেন। পাতার পর পাতা লেখা হয়ে যাচ্ছে। কত বিচিত্র ছন্দবন্ধ, কত রকমারি ভাব, কত বিস্ময়কর উপস্থাপনা!

পূর্ব্বদিনের মত আজও রাত দশটার পর পর্য্যন্ত ছড়া দিলেন। তারপর ভোগে উঠলেন।

৬ই পৌষ, ১৩৬৬, মঙ্গলবার (ইং ২২। ১২। ১৯৫৯)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর পূবের ছাউনিতে এসে বসেছেন। তাঁর সামনে ও দুই পাশে ভক্তগণ বসে বা দাঁড়িয়ে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) সংস্কার সম্বন্ধে কথা তুললেন।

সংস্কারের কথা শুনেই শ্রীশ্রীঠাকুর এমনভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে বসলেন, মনে হল, আজ ছড়ার ধারা বোধ হয় এই পথ ধরে এগোবে। প্রথমে তিনি বললেন—সংস্কার মানেই যা' সম্যকভাবে কৃত হয়েছে, যা' সত্তায় অনুস্যূত হয়ে আছে। তারপরেই ছড়ার আকারে বলতে শুরু করলেন—

বাঁচার আবেগ সংস্কারসিদ্ধ
সৎচলনে বাঁচতে চাও,
বাঁচার খোরাক তেমনি দিও
সৎ-অসৎকে বেছে নাও।
সুসংস্কার ও সত্তাকুশল
যাতেই তোমায় ধরে রাখে,
সেই শিক্ষায় দক্ষ হয়ে
অমর কর জীবনটাকে।

এইভাবে সংস্কার সম্বন্ধে পর পর বেশ কয়েকটি ছড়া বলার পর পরম দয়াল বললেন—ধর, seed (বীজ) আছে। বোনার পরে তাকে যদি ঠিকমত সার দিতে পার তাহলে ভাল হয়। কিন্তু তুমি হয়তো এমন সারই দিলে যা' সেটা গ্রহণ করতে পারল না। চারাটা মরে গেল। এভাবে করলে তো হবে না। সেইজন্য, মানুষের শুভ সংস্কার যেগুলি আছে তা' যাতে উপযুক্ত রক্ষণার ভিতর দিয়ে পরিপোষিত ও পরিবর্দ্ধিত হতে পারে, দেশে তেমনতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা লাগে। আমি কেষ্টদাকে বলেছিলাম, আমাদের Law (আইন)-গুলো সব প'ড়ে দেখেশুনে ভাল ক'রে একখানা Law-book (আইনগ্রন্থ) লিখতে।

জ্ঞানদাও (গোস্বামী) উকিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই ইচ্ছাটি শুনে তাঁর চোখেমুখে ঔৎসুক্য ফুটে উঠল। তা' লক্ষ্য করে শ্রীশ্রীঠাকুর জ্ঞানদাকে বললেন—ও-কাজ তোমাদের দ্বারা হবে নানে। কারণ, তোমরা কতকগুলি জিনিস পড়াশুনা ক'রে একরকম হয়ে গেছ। তোমাকে আমি যে যাজনের কথা বলেছি, মনে আছে তো? যেমনভাবে বলেছি, সেইভাবে করবা। যাজনের মধ্যে যেন valourous admiration (পরাক্রম-অধ্যুষিত শ্রদ্ধা) থাকেই।

এই কথা হতে হতেই শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে খড়ের ঘরে চ'লে এলেন। সকলে বসার পরে কেষ্টদা বললেন—Experience (অভিজ্ঞতা) নেই অথচ knowledge (জ্ঞান) আছে, এমন হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেটা হয় তার নাম fictional knowledge (অপ্রকৃত জ্ঞান)।

A-priori knowledge নিয়ে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর a-priori শব্দের মানে জিজ্ঞাসা করলেন। ডিক্‌শনারি দেখে দেখা গেল—কারণ দৃষ্টে কার্য্য-নির্ণয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ দৃষ্ট করতে গেলেই experience-কে (অভিজ্ঞতাকে) দৃষ্ট করতে হয়। তারপর ঐ সম্পর্কে ছড়া দিলেন—

কার্য্যকারণ-পরিণতি
বোধবিকাশের সূত্র যেই—
কার্য্যকারণ অবস্থিতি
যেজন জানে জ্ঞানী সেই।
বিশ্লেষণ আর সংশ্লেষণের
জানাগুলির বিচারণায়
বোধ্ বিশেষের স্ফূরণ কেমন
রূপ আর গুণের সুসঞ্জনায়।

বেলা দশটার পরে দেওঘরের পাণ্ডা ডাকুবাবু আরো দুজন ভদ্রলোককে সাথে ক'রে এলেন। ওঁদের চেয়ার দেওয়া হল, বসলেন। তারপর ঐ ভদ্রলোকদ্বয় জানালেন যে স্থানীয় আর-মিত্র স্কুলে ওঁরা একটা কবি-সম্মেলন করতে চান। ওঁদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা ওঁরা ব্যক্ত করলেন।

সব শুনে দয়াল ঠাকুর বললেন—ঐরকম আদানপ্রদানের ভিতর দিয়েই তো আমরা জানি, বুঝি, করি। আমাদের পারস্পরিকতা বাড়ে।

আরো কিছু কথাবার্ত্তার পর ডাকুবাবু ভদ্রলোকদের নিয়ে বিদায় নিলেন।

আজও বিকাল চারটা থেকে যথারীতি ছড়ার স্রোত প্রবাহমান। শ্রীশ্রীঠাকুর ছাউনিতে এসে বসেছিলেন। সন্ধ্যার কাছাকাছি খড়ের ঘরে এসে বসলেন। শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), জ্ঞানদা (গোস্বামী), হাউজারম্যানদা প্রমুখ উপস্থিত।

এক সময় দৈববাণী কী ক'রে হয় প্রশ্ন উঠল। উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাণীর মত শোনা যায়। অন্তরে feel (অনুভব) করা যায়। আসলে সেটা কিন্তু আমারই voice (কণ্ঠস্বর), যদিও আমি তা' আমার বলে জানি না। যাকে আমরা একান্ত ক'রে ভাবি, invoke (আহ্বান) করি, সে-ই হয়তো মূর্ত্তি ধ'রে দাঁড়াল আমার সামনে। বলল, Awake, do, follow me. I am ever for you (জাগো, কর, আমাকে অনুসরণ কর, আমি সর্ব্বদা তোমার জন্য আছি)।

লেখ্—ব'লে বললেন—

জীবন-ধ্বনন জাগ্‌লো প্রাণে
তবে তো তুই বেঁচে আছিস্,
বেঁচে থাকার জোগাড় ক'রে
আর যা' কর্ যত পারিস।

তারপর আবার বলে চললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—মোক্‌থা কথা হল, আমরা যেমন কর্ম্ম করি, তেমনি বিন্যস্ত হই। আর, আমাদের ভেতরকার tuningও (একতানতাও) সেইরকমের হয়। আমাদের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্মের ছাপ brain-এ accumulated (মস্তিষ্কে সঞ্চিত) হয়ে মজুত থাকে। Day of judgement-এ (বিচারের দিনে) সেটা ফুটে বেরোয়। Day of judgement (বিচারের দিন) হচ্ছে আমি যা করি তারই resultant factor (পরিণতি-উপাদান), যা' আমার brain-এ (মস্তিষ্কে) geographical area-র (ভৌগোলিক সীমার) সৃষ্টি করে। স্বর্গ বা নরক এইভাবেই হয়। স্বর্গ হল যেখানে সুখ ও শুভ অর্জ্জিত হয়। আর, clumsy (কুৎসিত) যা-কিছু সব hell (নরক)। এছাড়া স্বর্গ-নরক বলে অন্যত্র কোথাও কিছু থাকে না।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ)—আচ্ছা, এই যে সপ্ত স্বর্গের কথা শোনা যায় তা' কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সপ্ত লোক বা সপ্ত আশমান হল মাথার cortex-এ (বাইরের আবরণে) যে সাতটা layer (স্তর) থাকে তাই। প্রথম হল ভূঃ, মানে হওয়া, তারপর ভুবঃ—যে উৎপন্ন হইতেছে। স্বঃ হল existence (অস্তিত্ব), দ্যুলোকায়িত স্বঃ। মহ হল বিরাট বা বিস্তৃতি। জন—যেখানে জন্ম হয়। তপঃ তপশ্চরণ করা আর সত্য হল বিদ্যমানতার প্রতীক।

এই আলোচনার সূত্র ধরে ছড়া দিলেন—

সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল
জানিস্ না তা মাতাল তবু,
মত্ত নেশায় রিক্ত দিশায়
খাচ্ছ শুধু হাবুডুবু।
দীন-দয়াময় ডাকছে রে ঐ
এখনও তুই ওঠ্ রে জেগে,
জীবনব্রতে ব্রতী হয়ে
ইষ্টপথে চল্ রে বেগে।

অন্যান্য দিনের মত আজও রাত দশটা পর্য্যন্ত চলল সমানে ছড়া দেওয়া। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে বাথরুমে গেলেন।

৭ই পৌষ, ১৩৬৬, বুধবার (ইং ২৩। ১২। ১৯৫৯)

কন্‌কনে ঠাণ্ডা পড়েছে আজ দুদিন। হাত-পা যেন অসাড় হয়ে আসে। প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনের পর শ্রীশ্রীঠাকুর অশত্থতলায় পূবের ছাউনিতে এসে বসেছেন। তাঁর শুভ্র শয্যার উপরে ও আশপাশে সোনাঝরা মিষ্টি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। বিরাট অশত্থগাছটিতে নানারকম পাখীর কাকলী। পরম দয়ালের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে দুটি কুকুর ধুলোর মধ্যে আরাম ক'রে রোদে শুয়ে আছে। ঘাসের উপরে শিশিরের কণাগুলিতে সূর্য্যকিরণ পড়ায় সেগুলি জ্বলজ্বল করছে। অপরূপকে কেন্দ্র ক'রে রচিত হয়েছে এক মনোহর প্রাণকাড়া পরিবেশ।

গতকাল সন্ধ্যায় দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ডাঃ সুবোধ সেন পরলোকগমন করেছেন। তিনি ছিলেন সৎসঙ্গের একজন প্রবীণ কর্ম্মী। এই সংবাদ শোনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বিষণ্ণ ছিলেন। এখন তাঁকে প্রফুল্ল দেখাচ্ছে।

কলকাতা থেকে এলেন কেষ্ট কর্ম্মকারদা। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে কেষ্টদা বললেন—একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছি। সেদিন রাতে শোবার সময় মনে হল, সাইকেলটা বাইরে পড়ে আছে, ঘরে তুলে রাখাই ভাল। আবার ভাবলাম, থাক্‌গে। পরদিন উঠে দেখি সাইকেলটা চুরি হয়ে গেছে। এই চুরি হওয়ার জন্য আমার কষ্ট নেই। কিন্তু ঐ যে go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) করলাম, সেই কথা মনে হ'য়ে কষ্ট হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো ভাল লক্ষণ—ধরতে যখন পেরেছিস, আর go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) করিস নে। তোরে বারণ ক'রে দিল, তবুও শুনলি নে।

কেষ্টদা—আর একটা কথা। আমি আধমণ ওজনের একটা গদা বানিয়েছি। গদাটা নিয়ে exercise (ব্যায়াম) করতে খুব পরিশ্রম হয়। এখন, গদার exercise (ব্যায়াম) করব না সাধারণ ছোটখাট ব্যায়াম করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশী পরিশ্রম ভাল না। যা' সহ্য হয় তাই করিস। Exercise (ব্যায়াম) ভাল, কিন্তু exhaustion (অত্যধিক ক্লান্তি) ভাল না।

বেলা ন'টার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ছাউনি থেকে উঠে খড়ের ঘরে চ'লে এলেন। ঘরের ভেতরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), জ্ঞানদা (গোস্বামী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), রাজেনদা (মজুমদার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), হরিদা (গোস্বামী), বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ আছেন। বারান্দায় দাদারা ও মায়েরা কেউ কেউ উপবিষ্ট। বারান্দার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বেশ রোদ এসে পড়েছে। সেখানে একখানা চেয়ারে শ্রীশ্রীবড়মা স্নান সেরে এসে বসেছেন।

দেশে দুর্নীতি, কুৎসিত মনোবৃত্তি, হীন আত্মস্বার্থপরায়ণতা কিভাবে বেড়ে চলেছে, কেষ্টদা সেই সব কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বলছিলেন। কিছুক্ষণ শোনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর সখেদে বললেন—এসব ভাবলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। এই যে sodomy (পুংমৈথুন) করে, আমার মনে হয় সেখানে male prestige (পৌরুষ-গর্ব্ব) অনেকখানি dormant (সুপ্ত) হয়ে গেছে। এসব এমন vulgarous (হীন) যে তা' আর কওয়ার না। এর আর কোন উপায় নেই। উপায় একটাই আছে। তা' হল একমাত্র mass (জনগণ) যদি আপনাদের হাতে আসে। আপনাদের gift, acumen (ধীশক্তি, সূক্ষ্মদর্শিতা) কিন্তু কম নেই। এখনও তা' দিয়ে আপনারা আগুন ধরায়ে দিতে পারেন। যারা চতুর লোক তারা একটা thread-কেও (সূতাকেও) neglect (অবহেলা) করে না। আর, আমাদের বড় বড় ড্রেন যদি ভেঙ্গেচুরে জল জমে পচা নালাও হয়ে যায় তাও আমরা তাকিয়ে দেখি না।

কেষ্টদা—অবস্থা এমন হয়েছে যে এখন পরের কবলিত হওয়া ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমস্তিপুর থেকে কয়েকজন উকিল আসে। তাদের কাছেও আমি শুনেছি, বড় বড় family-তেও (পরিবারেও) নানারকম কদাচার ঢুকে গেছে।

কেষ্টদা—সমস্তিপুরে দুইজন উকিল আছে গুরুভাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, বেশী আছে। (চুনীদাকে) যা, হরিনন্দনের কাছ থেকে শুনে আয় তো।

চুনীদা শুনে এসে বললেন—জনা সাতেক দীক্ষিত। তার মধ্যে active (সক্রিয়) আছে জনা চারেক।

কেষ্টদা—এখনকার অবস্থা যেন একটা dominating sex-lustre (যৌনতার ঝিকিমিকির আধিপত্য)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের sexual urge-কে (যৌনসম্বেগকে) নিভিয়ে দেওয়া ভাল না, বরং তাকে নিয়ন্ত্রণ করা ভাল। ওরকম করলে মানুষ ম্যাদামারা মত হয়ে যায়। এখন দেখবেন, একটা খেঁকী কুকুরেরও যেটুকু prestige (আত্মসম্মান) বোধ আছে, আমাদের তাও নেই। Self-regarding sentiment (আত্মগৌরবী ভাবানুকম্পিতা) যার আছে, তারই prestige (আত্মসম্মান) বোধ থাকে।

বিকালবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—সকাল বেলায় নানারকম filthy (নোংরা) কথা শোনার পর থেকে মনটা খারাপ হয়ে আছে।

সন্ধ্যার পর ইছাপুর থেকে কিরণদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) এলেন। তাঁর সাথে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক রাত পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কইলেন।

৮ই পৌষ, ১৩৬৬, বৃহস্পতিবার (ইং ২৪। ১২। ১৯৫৯)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর অশত্থতলায়, পূবের ছাউনিতে এসে বসেছেন। মিষ্টি রোদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিরণদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), জ্ঞানদা (গোস্বামী), প্রফুল্লদা (দাস), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ এসে বসেছেন। নানাবিষয়ে কথা চলছে।

হাতে-কলমে কাজ শেখার কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'অটোমেশন' তোমরা কর ক্ষতি নেই। কিন্তু হাতে কাজ করার অভ্যাস থাকুক। তা' থাকলে মানুষগুলি আর empty (বেকার) হয়ে থাকবে না। ধর একখানা কাপড় তৈরী করা হবে, তার সুতো-কাটা থেকে আরম্ভ করে সবটাই হাতে বোনা হল। বুনে মানুষ তার efficiency (দক্ষতা) দেখাতে পারে। এইভাবে কাজগুলি করা যেতে পারে।

কিরণদা—আজকাল একটা কাজ করতে complete (আগাগোড়া) একটা মানুষের প্রয়োজন হয় না। একটা কাজের যে part (অংশ)-টুকু যে জানে, সে তাই-ই করবে জীবনভর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কেন? সে যাতে সবটা পারে তা' করা লাগবে।

কিরণদা—তাহলে ওরকম ক'রে যারা অনেক output (উৎপাদন) দেখাচ্ছে তাদের সাথে আমরা কোনদিনও পারব না। সুইডেনে skilful (দক্ষকর্ম্মী) হলে তার মাইনে কম। কিন্তু এইসব সাধারণ শ্রমিক মাইনে বেশী পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে মানুষ invalid (অসমর্থ) হয়ে পড়বে বেশী। এখন progress of materials (জিনিসপত্রের উৎকর্ষ) হচ্ছে, progress of man (মানুষের উৎকর্ষ) হচ্ছে না।

পরমপূজ্যপাদ বড়দা কয়েকদিন যাবৎ সর্দ্দিজ্বরে ভুগেছেন। সুস্থ হয়ে আজ বিকালে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে।

১০ই পৌষ, ১৩৬৬, শনিবার (ইং ২৬। ১২। ১৯৫৯)

আজ বিকালে অশথতলার ছাউনিতে বসে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকগুলি ছড়া দিয়েছেন। সন্ধ্যা হতেই খড়ের ঘরে এসে বসলেন। ৬-১৫ মিঃ। দুমকা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল (সুরেন্দ্রনাথ ঝা) শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে এলেন। ওঁর সাথে এসে বসলেন হরিনন্দনদা (প্রসাদ), জ্ঞানদা (গোস্বামী), সুধীরদা (চৌধুরী), শৈলেশ-দা (বন্দ্যোপাধ্যায়), শচীনদা (গাঙ্গুলী), নিখিলদা (ঘোষ) প্রমুখ। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব শ্রীশ্রীঠাকুরকে অভিবাদন ক'রে বসলেন সামনের শতরঞ্জিতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্মিতভাষে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি এখন এলেন?

প্রিন্সিপ্যাল—Just now (এইমাত্র)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুমকা কলেজে বি-এ আছে?

প্রিন্সিপ্যাল—বি-এ, বি-এস-সি, দুটোই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানেও কলেজ আছে, ওখানেও কলেজ হয়েছে। ভাল হয়েছে। ছেলেদের খুব সুবিধা হবে।

প্রিন্সিপ্যাল—দুমকা কলেজেও আপনার অবদান আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে কি co-education (সহশিক্ষা)?

প্রিন্সিপ্যাল—হ্যাঁ, প্রায় ষাটজন ছাত্রী আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকাল ছেলেদের ধারণা হয়ে গেছে—পাশ করব, তারপর চাকরি করব। এই attitude (মনোবৃত্তি) যতদিন দূর না হচ্ছে ততদিন আমাদের কোন সুবিধা নেই। আজ আমাদের মধ্যে slave mentality (দাস-মনোভাব) ঢুকে পড়েছে। Defect (ত্রুটি) হল সেইখানে। আজ মানুষ ভাবে, যে আমাকে টাকা দিতে পারবে তার কাছে যাব। এখন আর hearth and home (ঘর-গেরস্থালী)-এর উপর কারো নেশা নেই। কলকাতার কথা তো শোন। সেখানে কত এরকম হয়ে গেছে। সব খারাপ। এতে ভাল হয়নি আমাদের। এ বড় বিপদের কথা হল। Education (শিক্ষা) বল, আর যাই কিছু বল, সে সব যদি আমাদের বাঁচাবার জন্য না হয় তাহ'লে তার দাম কী?

প্রিন্সিপ্যাল—আমার মনে হয়, decrease করতে করতে (নামতে নামতে) যখন চরমে যাবে তখন আবার rise করবে (উত্থান হবে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো ভাবছি। কিন্তু ভাবতে হয়, আমরা আর নীচে যাব না। আমরা বাঁচব, বাড়ব সবাইকে নিয়ে। Suffer (দুঃখভোগ) যদি করি, নীচে আর যাব না, upwards (উপরের দিকে) উঠব।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব হিন্দীতেই কথা বলছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বাংলায় উত্তর দিচ্ছেন। হরিনন্দনদা দোভাষীর কাজ করছেন, একজনের কথা অনুবাদ করে অন্যজনকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

প্রিন্সিপ্যাল—Virtue (ধর্ম্ম) যখন বেশী থাকে তখন vice (পাপ) থাকতে পারে না। আর মানুষ তো goodness-ই (মঙ্গলই) চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবাই চায় virtue (ধর্ম্ম)। আর virtue (ধর্ম্ম) মানেই যাতে আমরা বাঁচি, বাড়ি, যাতে becoming-এর (বর্দ্ধনার) দিকে আমাদের experience

(অভিজ্ঞতা) হয়। আমরা vice চাই না। Vice (পাপ) যে করে তারও ইচ্ছে, আমি বেঁচে থাকি, বেড়ে উঠি। কিন্তু তা' সে করতে চায় অন্যকে মেরে। আর virtue-র (ধর্ম্মের) asset (সম্পদ) হল environment (পরিবেশ)। Environment-কে (পরিবেশকে) যত তাজা রাখতে পারব, আমিও তত তাজা থাকব।

প্রিন্সিপ্যাল—Vicious people (পাপাচারী) যারা তারা জীবনের law (বিধি)-গুলিকে follow (অনুসরণ) করে না বলেই বোধ হয় কষ্ট পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসল কথা হ'ল আমাদের ঐ চাহিদাটা—আমরা মরতে চাই না, বাঁচতে চাই, আর তা' সবাই চায় বুড়ো হয়েও। একেই কয় ধর্ম্ম। আমরা যে অন্যায় করি, তা' ভুলে করি। আমরা জন্মেছি একটা process-এর (বিধানের) ভিতর দিয়ে। সেটাকে অস্বীকার ক'রে আমরা বাঁচতে পারি না। একটা active service to the people (মানুষের প্রতি সক্রিয় সেবা) দরকার আছেই। আর, মানুষকে তা' শেখাবার দায়িত্ব ওঁদের (প্রিন্সিপ্যালকে নির্দেশ করলেন)।

এই সময় পূজনীয় ছোড়দার জ্যেষ্ঠ জামাতা শৈলেশ সান্যাল এসে প্রণাম করলেন। তাঁকে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কখন এসেছ?

শৈলেশদা—দুপুরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাবা-মা সব ভাল তো?

শৈলেশদা—হ্যাঁ।

আবার পূর্ব্ব আলোচনার সূত্র ধ'রে প্রিন্সিপ্যাল বললেন—Environment (পরিবেশ) change (পরিবর্ত্তন) করা বেশ শক্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Environment (পরিবেশ) নতুনভাবে created (গঠিত) হয় ঠিকমত impart (সঞ্চারণা) করার মধ্য দিয়ে। আর, সেই impart (সঞ্চারণা) করার কাজ যদি শিক্ষকরা করতে না পারেন তাহলে হবে না। ঐ যে কী কয়—Example is better than precept (উপদেশের চাইতে উদাহরণ হওয়া ভাল)।

প্রিন্সিপ্যাল—আমাদের education-এর (শিক্ষার) ধারা কেমন হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে আমাদের কথা আছে 'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ'। যাতে আমরা বাঁচতে পারি, বাড়তে পারি, মানুষের 'পরে স্নেহপরবশ হয়ে চলতে পারি, তার তুকগুলি হাতেকলমে করার মধ্য দিয়ে জানাই হ'ল আসল শিক্ষা। তা ছাড়া আমি শেক্সপীয়ার পড়লাম, বায়রণ পড়লাম বা বি এস সি, এম এস সি হলাম, এটা education (শিক্ষা) নয়। ওসব তো একটা গ্রামোফোনের রেকর্ডেরও থাকতে পারে। Inner man-টাকে (ভেতরের মানুষটাকে) change (পরিবর্ত্তন) করা লাগবে।

প্রিন্সিপ্যাল—কিভাবে সেটা সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি কথা শিখলেই শুধু হবে না। (প্রিন্সিপ্যালকে দেখিয়ে) যেমন ওঁর student-রা (ছাত্ররা) আছে। তারা যদি শিক্ষকের আচার-আচরণ imbibe (আত্মীকৃত) করতে থাকে তবেই এটা সম্ভব। ওঁরা যদি conscious (সচেতন) হয়ে ওঠেন তাহলেই সব হয়। আমার মনে হয়, ওঁদের যত দায়িত্ব অত দায়িত্ব আর কারোই না—সে এস-পি-ই হোক, minister-ই (মন্ত্রীই) হোক, আর যে-কেউই হোক না কেন।

প্রিন্সিপ্যাল—এখন তো ভাল teacher (শিক্ষক) পাওয়াও যায় না। দু'একজন আছেন তাঁরা বহু ছাত্রগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কয়জনের উপর নজর রাখবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে রামদাসের কথা আছে—

"বেছে বেছে আত্মীয়-সন্তান
সহৃদয় বুদ্ধিমান
সযতনে কাছে ডেকে এনে
তুষিবে মিষ্ট ভাষে—।"

ঐরকম করতে হয়। তাদের সাথে মেশা লাগবে। দেখা লাগবে ওদের মধ্যে কে shining (জ্বলজ্বলে)। তার সাথে কথা বলতে হয়। কারো হয়তো দুচার কথাতেই কাজ হয়ে যায়। তাকে সেইভাবে nurture (পোষণ) দেওয়া লাগবে।

প্রিন্সিপ্যাল—বর্ত্তমান অবস্থায় তো এটা সম্ভব হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করা লাগবে এটাই। নতুবা বাঁচব কেমন ক'রে? উদ্দেশ্যে পৌঁছাব কি ক'রে?

প্রিন্সিপ্যাল—Ideal teacher (আদর্শ শিক্ষক) পাব কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে নিজে ideal (আদর্শ) হব। তবে তো সেটা impart (সঞ্চারিত) করতে পারব। এইরকম হওয়ার অভ্যাস যদি দু'শ জন করে, তার থেকে চারশ জনের মধ্যে ছড়াবে। সেখান থেকে যাবে আরো চারশ জনের মধ্যে। এইভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়বে।

এর পরে ইউনিভার্সিটি নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জগতের প্রতিটি মানুষই আলাদা। প্রত্যেকেই একটা স্বতন্ত্র unit (একক)। এই unit (একক)-গুলির common factor (সামান্য উপাদান) বের ক'রে, তা' দিয়ে যখন ঐ variety-গুলিকে (বৈচিত্র্যগুলিকে) united (একায়িত) করা হয়, তখন তাকে বলা যায় University (বিশ্ববিদ্যালয়)। আর তার জন্য চাই একটা সুনিষ্ঠ জীয়ন্ত ব্যক্তিত্ব। তাঁতে সংহত ও সংগ্রথিত হয়ে ওঠার ভিতর দিয়েই variety-গুলি (বৈচিত্র্যগুলি) united and adjusted (একায়িত ও বিনায়িত) হয়ে উঠতে পারে। তাই আমি

কই, ইউনিভার্সিটি মানে কয়েকটা building (দালান) না। ঐ যে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, উনি হলেন ইউনিভার্সিটি। এই যে রাদারফোর্ডের ছাত্র যারা, তারা কখনও কয় না 'আমি অমুক পাশ'। তারা বলতে গৌরব বোধ করে যে 'আমি রাদারফোর্ডের ছাত্র'।

প্রিন্সিপ্যাল—Yes, that I admit (হ্যাঁ, তা' স্বীকার করি)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা আছে, spare the rod and spoil the child (বেত না মারলে ছেলেপেলে নষ্ট হয়)। তা' তো নয়। হওয়া উচিত, spare affectionate service and spoil the child. So, you should save the child from being spoiled (সস্নেহ সেবা-পরিচর্য্যা না থাকলে ছেলেপেলে নষ্ট হয়। সেইজন্য ছেলেপেলেকে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচাও)।

কথায়-কথায় রাত হয়ে গেল। এবার প্রিন্সিপ্যাল উঠে হাত জোড় ক'রে বিদায় নিতে চাইলেন। সম্মতিসূচকভাবে মাথা নেড়ে পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আবার সুবিধা হলে আসবেন।

এর পরে সবাই একে একে প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন।

১১ই পৌষ, ১৩৬৬, রবিবার (ইং ২৭।১২।১৯৫৯)

আজ সারাদিন ধরেই ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। শীতও খুব পড়েছে। তাই, আজ বিকালে আর বাইরে যেয়ে বসেন নি শ্রীশ্রীঠাকুর। খড়ের ঘরেই আছেন।

গত পরশু দুপুরে শ্রীশ্রীবড়মা ঘরের মধ্যে পা হড়কে প'ড়ে গেছেন। হাতে ও মাজায় আঘাত লাগে। সঙ্গে-সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। আজ তিনি অনেকটা ভাল আছেন। ব্যথা কম। শ্রীশ্রীঠাকুর থেকে-থেকেই তাঁর খোঁজ নিচ্ছেন।

একটু পরে বললেন—আমার আজ প্রায় বেলা দুটার সময় ঘুম ভেঙ্গেছে। তারপর শুয়ে আছি, আর কেবল মনে পড়ছে দুঃখের কথা। সেই সত্য ঘোষ, সেই কেষ্ট দাস, এদের কথা মনে হচ্ছে। সুখের গা ঘেঁসে থাকলেও বোধ হয় দুঃখের কথা মানুষের মনে হয়। তাই কয়, 'আনন্দো ব্রহ্ম'।

তরুমা—তার মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানে, ব্রহ্মের একটা স্বরূপ ঐ আনন্দ।

তরুমা—তাই যদি হবে তবে দুঃখ আমাদের আসে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুঃখগুলো আঘাত দেয়। আঘাত দিয়ে দিয়ে সুখের চেতনা আনে।

আজকাল দুপুরের পর থেকেই সারা আশ্রম ভ্রমণকারীদের ভিড়ে জমজমাট থাকে। নানা জায়গা থেকে অজস্র নারী-পুরুষ আশ্রম-দর্শনে আসে। সবাই ঘুরতে ঘুরতে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনের চত্বরে এসে ভক্তিভরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাঁকে দর্শন করে। কেউ বা বারান্দায় উঠে এসে অর্ঘ্য-সহ তাঁকে প্রণাম করে। তারপর আবার আশ্রম দেখতে বেরিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যার আগে ভক্তরা অনেকে এসে বসলেন। প্রফুল্লদা (দাস) বললেন—অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গবর্নমেন্টের সাহায্য নিয়ে অনেক কাজ করছে। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে তেমন কিছু করা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি নিই না। আমার ইচ্ছা না। কারণ, ওতে তোমাদের যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। এখন তোমরা যেটুকু আছ, নগণ্যও যদি হও, তাহলেও unadultered (অবিমিশ্র) আছ এখনও। পাবনাতেও আমি নেই নি। সেই একবার গভর্নর বুঝি জোর করে পাঁচশত টাকা দিয়েছিল।

এরপর কথাবার্ত্তা আর অগ্রসর হয় না, শ্রীশ্রীঠাকুর ভাল বোধ করছেন না। বালিশটা টেনে নিয়ে কাত হয়ে শুলেন। সবাই প্রণাম ক'রে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

১৩ই পৌষ, ১৩৬৬, মঙ্গলবার (ইং ২৯। ১২। ১৯৫৯)

আজ ভোর থেকেই আকাশ আবছা মেঘে ঢাকা। কুয়াশার আস্তরণ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। বেলা বাড়তে শীত যেন আরো চেপে এলো। সকাল আটটাতেও রোদের দেখা নেই।

এরকম আবহাওয়ার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর আজ আর বাইরে গেলেন না। খড়ের ঘরের ভিতরে শয্যায় একখানা রেজাই গায়ে দিয়ে বসে আছেন। ঘরের সামনের দিককার পরদা একটু ফাঁকা করা। ভক্তবৃন্দ এই ফাঁকের কাছে এসে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। আর সব দিক এঁটে বন্ধ করা আছে।

বেলা নয়টার পর সমস্তিপুরের কয়েকজন উকিল দাদা এসে বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হরিনন্দনদা (প্রসাদ) প্রমুখ আছেন। আইন ও বিচারপদ্ধতি নিয়ে কথা উঠল। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Justice (বিচার) তখনই হয় যখন কোন সিদ্ধান্ত আমিও স্বীকার করব, আপনিও স্বীকার করবেন, উভয়পক্ষই স্বীকার করবে।

কেষ্টদা—কিন্তু সাধারণ একজন মানুষকে ঐভাবে স্বীকার করানো—

কথা শেষ হবার আগেই শ্রীশ্রীঠাকুর বলে উঠলেন—তা' যদি করতে না পারি তাহলে আমার Judge (বিচারক) হওয়াটাই উচিত হয়নি। Judge (বিচারক) হবে out and out inter-propitious (সম্পূর্ণভাবে সবার মঙ্গলের জন্য)।

কেষ্টদা—কিরাতার্জুনীয়ে (ভারবি-রচিত সংস্কৃত কাব্য) আছে, মানুষ দণ্ডটাকে মালার মত গ্রহণ করত।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

উল্লাসের সাথে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐ হ'ল justice (বিচার)। দণ্ডটা যখন লোকে মালার মত গ্রহণ করে তখনই সেটা justice (বিচার) হল।

কেষ্টদা—সে তো practically (বাস্তবে) অসম্ভব ব্যাপার। জজ্ তো আজকাল গণ্ডায় গণ্ডায় হচ্ছে। কিন্তু অমন রকম কারো তো পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জজ্ ঠিক ঠিক না হলে তো আর সে justice (ন্যায়বিচার) করতে পারে না।

তারপর এই প্রসঙ্গ নিয়ে উপস্থিত দাদাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলতে লাগল। ওদের কথা কিছুক্ষণ শোনার পরে দয়াল ঠাকুর বললেন—যারা conscientious man (বিবেকবান মানুষ) তারা কিরকম করে জানেন? আপনার ছেলে হয়তো কোন দোষ করে নি। লোকে কচ্ছে, সে করেছে। তখন আপনি ছেলেকে মারলেন। এখন, যে ঐরকম দোষ দিচ্ছে, সে তার নিজের ছেলেকে মারা পছন্দ করে কিনা। যদি না করে তাহলে তার উচিত ছিল আপনার ছেলেকে মারতে না দেওয়া। কারণ নিজের ব্যাপারে সে যা' পছন্দ করে না, তা' আপনাকেও করতে না দেওয়া উচিত। মার খেতে যেমন আমি চাই না, আর একজনও তেমনি চায় না। আমার বেলাতে যেটা হল তার বেলাতে সেটা সে চায় কিনা। আমি একটা মানুষ, তুমিও একটা মানুষ। তোমাকে যদি বাঁদর কই আমি! আমি তো বাঁদর হতে চাইনে। চাই নে যে কেউ আমাকে বাঁদর বলুক। তাই, আমারও ওকথা বলা উচিত না।

কেষ্টদা—এরকম বলাবলি যদি হয়, তার বিচার করবে কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিচারের কথা আলাদা। বিচারের কথা আমি বলছি না। আমি বলছি just (ন্যায়) কোন্‌টা। আগে নিয়ম ছিল, যারা বিপ্র তাদের বিচার কোর্ট করতে পারত না। বামুনরা এত conscientious (বিবেচক) ছিল যে heat of the moment-এ (উত্তেজনার মুহূর্ত্তে) যদি কিছু করে ফেলে, they knew how to take penance (তারা জানত কিভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়)। এখন এই conscientiousness (বিবেকপরায়ণতা) কি ক্ষত্রিয়ের মধ্যে নেই? ঢের আছে। কিন্তু সকলের মধ্যে সমানভাবে জাগ্রত নয় তা'। তাহলে আমার কী করা উচিত? যদি কেউ conscientious (বিবেচনাপরায়ণ) না হয়, আমার উচিত তাকে conscientious (বিবেচনাপরায়ণ) ক'রে তোলা। এই যে আমাদের শরীরে কতগুলি cell (কোষ) আছে। প্রত্যেকটি cell-এর (কোষের) different function (আলাদা কাজ)। আবার, প্রত্যেকটিই আলাদা, এবং এই আলাদা বলেই body-র (শরীরের) গঠন সম্ভব হয়ে উঠেছে।

মহেশ্বর প্রসাদ—সবাই যদি ওরকম হয় তবে আর judge-এর (বিচারকের) দরকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যদি তোমার court (বিচারালয়) হও, আর কারো দরকার নেই। তুমি যদি তোমার justice (বিচার) হও, তবে তো আর কারো দরকার নেই।

মহেশ্বরদা—ওরকম হতে পারলে তবে তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হতে হবে। আমার ideal (আদর্শ) কী?—হওয়া—being (অস্তি) থেকে becoming-এ (বৃদ্ধিতে) যাওয়া।

এক দাদা কম্যুনিজ্‌ম্ সম্বন্ধে কথা তুললেন। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কম্যুনিজ্‌মের কথা যদি কেউ কয়, আমি দেখি একটা জায়গায় কম্যুনিজ্‌ম্ আছে। সে ঐ existence (অস্তিত্ব)। বাঁচতে সবাই চায়। তুমি God (ঈশ্বর) বলে কিছু মান বা না মান, তুমি আছ তো? আর একজন আছে তো? এই থাকাটা যেমন তোমার কাছে ঠিক, আর একজনের কাছেও তেমনি একইভাবে ঠিক। তাই, তুমি অপরের কাছে যেমন আশা কর, তেমনি ব্যবহার যদি সবার সাথে ক'রে চল, তার চাইতে বড় কম্যুনিজ্‌ম্ আর কিছু নেই। রে (হাউজারম্যানদা) একটা শালিক পাখী পুষেছিল। সে সব সময় ওর সাথে থাকত। রে যখন হেঁটে যেত, ও উড়ে যেত। ও পাখী, ও মানুষ। কিন্তু deeper cell-এ (অন্তঃস্থ কোষের মধ্যে) এমনতর union (সমতা) হয়েছিল যে তা আর কওয়ার না। রে যখন কোথাও যেয়ে বসে থাকত, পাখীটা ওকে খুঁজে নিয়ে ওর মাথার উপরে যেয়ে বসত। ও যখন খেত, ওর সাথে খেত। ও যখন চান করতে যেত, তার সাথে যেত। সে এক অসম্ভব কাণ্ড! তারপর এখানে একবার ডি ডি টি দিচ্ছিল। সেই জল খেয়ে পাখীটা মরে গেল। আমি রে-কে বললাম, ও যখন তোমাকে অত ভালবাসে তখন ও যাতে ডি ডি টি-র জল না খায় তা' খেয়াল করা উচিত ছিল। ও বলল, আমি ঠিকই পাই নি।

সবাই তন্ময় হয়ে শুনছেন এই অমিয় কথানির্ঝর। ঘরের মধ্যে শান্ত পরিবেশ। বাইরেও অনেকে দাঁড়িয়ে ও বসে আছেন। কিছুক্ষণ পরে হরিনন্দনদা একটি ছেলেকে দেখিয়ে বললেন—এ হল মহেশ্বরবাবুর বড় ভাইয়ের ছেলে। এখন ক্লাস এইটে পড়ে। এরপর কোন্ বিষয় selection (নির্বাচন) করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ওর leaning (ঝোঁক) দেখে ঠিক করা যায়।

মহেশ্বরদা সামনে বসেছিলেন। হাত জোড় করে বললেন—ঠাকুর যা' বলেন তাই পড়বে।

ছেলেটির দিকে একটু তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ও খেলাধূলা করে তো? কী ধরনের খেলা করে?

মহেশ্বরদা—মার্বল খেলা করে, মালা বানায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গাড়ী-গাড়ী খেলে না?

কেষ্টদা—কিছু তৈরী করার দিকে ঝোঁক আছে কিনা?

মহেশ্বরদা—ওসব কিছু খেলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফুটবল, মার্বল, এইসব যারা খেলে, তাদের থাকে artistic taste (সাহিত্য ও কলার প্রতি অনুরক্তি)। আর যারা গাড়ী-গাড়ী খেলে, পিঁ-ই-ই ঘছ ঘছ ঘছ ঘছ (নিজে শিশুদের মত শব্দ ক'রে দেখাচ্ছেন) ক'রে গাড়ী টেনে নিয়ে বেড়ায়, এদের হয় scientific tendency (বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক)।

হরিনন্দনদা—মহেশ্বরবাবু একটা বাড়ী করেছেন। কিন্তু ওঁর বাবা সে-বাড়ীতে যেতে বারণ করেছেন। উনি কী করবেন জানতে চান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাবা যা' বলেন তাই করাই ভাল। বাবা যদি বলেন বাড়ীর 'পরে একটা workshop (কারখানা) করতে তাই করবে। বাবা যদি বাড়ীটা ভাড়া দিতে বলেন তাই দেবে। আমাদের সম্বল তো ঐ concentric urge (সুকেন্দ্রিক আকূতি)।

এরপর সবাই বিদায় নিলেন। ......সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন। পূজনীয় বড় জামাইবাবু সুধাংশুদা (মৈত্র) আজ সন্ধ্যায় এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সাথে কথাবার্ত্তা বলছেন। প্রধানতঃ দেশের দুরবস্থা নিয়েই কথা চলছে।

কথায়-কথায় Neutrality বা নিরপেক্ষতা নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Neutrality (নিরপেক্ষতা) তাদের সাজে যাদের power of resistance (প্রতিরোধের ক্ষমতা) খুব strong (শক্তিশালী)। এই power of resistance (প্রতিরোধ ক্ষমতা) life-urge (জীবনসম্বেগ) থেকেও strong (শক্তিশালী) হওয়া দরকার।

এইসব নানারকম কথায় রাত গভীর হয়ে আসে। জ্ঞানদা (গোস্বামী), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), সুধীরদা (চৌধুরী) প্রমুখ আছেন। তাঁরাও আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন। আলোচনার শেষের দিকে কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর নীরবতা ভঙ্গ ক'রে পরম দয়াল বললেন—আমার মনে হয়, আমি যদি চারশ, সাড়ে-চারশ মানুষ পেতাম, তাহলে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলতে পারতাম। এখনকার এইসব রকম আর থাকত না।

১৪ই পৌষ, ১৩৬৬, বুধবার (ইং ৩০। ১২। ১৯৫৯)

আজ ঠাণ্ডা কিছু কম। প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই অবস্থান করছেন। আজ সকালের সমবেত প্রণাম হল সাড়ে ছ'টারও পরে।

প্রণামের পরে সামনের প্রাঙ্গণে অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ কেউ বারান্দায় উঠে বসেছেন। বারান্দায় যাঁরা উঠে এসেছেন তাঁদের জুতাগুলি সিঁড়ির নীচে খুলে রেখেছেন। তারমধ্যে একজনের একপাটি জুতার উপরে আর একপাটি জুতা উঠানো অবস্থায় আছে। সেদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নজর পড়ল—বললেন—জুতোটা ঠিক ক'রে রাখ মণি।

জুড়ানদা (সিং) এসে পা দিয়ে জুতাজোড়া ঠিক ক'রে দিল। সকাল ৭-৮ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে চটিজোড়া পায়ে দিয়ে খড়ের ঘর থেকে নেমে এলেন। নিভৃত কেতনের সামনে দিয়ে ঘুরে এসে বসলেন অশ্বত্থতলায় তাসুর পূবের ছাউনিতে। আজ আকাশে মেঘ নেই, তবে রোদেরও খুব তেজ নেই।

সাড়ে আটটার পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। তাঁর সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সুনিষ্ঠ চলনের ভিতর দিয়ে মানুষের self-regarding sentiment (আত্মমর্য্যাদাবোধ) জন্মায়। ব'লে ছড়া দিলেন—

খুঁজেপেতে সেধেশুধে
যে-জ্ঞান হয় নিরেট তাই,
না ক'রে যা' কর তুমি
তোমাতে তা' বিশদ নাই।

তারপর বললেন—আমরা কই ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হ'ল বারবার সম্যকভাবে করার মধ্য দিয়ে জীবনীয় যে গুণসম্পদ আহরণ করা হয়েছে তাই। যেমন গাছের শিকড়। শিকড়গুলি মাটির ভিতর থেকে জীবনীয় মশলা নেয়। তারা হল sucker of the sauce of life (জীবনরস-পরিগ্রহণকারী)। সংস্কৃতি মানে যা সংস্কৃত হয়েছে, না কি?

কেষ্টদা—হুঁ, ইংরাজীতে বলে culture, কিন্তু culture তো জগতে অনেক রকম, যেমন Greecian Culture, Mongolian Culture (গ্রীসদেশের সংস্কৃতি, মঙ্গোলদের সংস্কৃতি)।

জ্ঞানদা (গোস্বামী)—তা ছাড়াও যেমন Brahmanic Culture, Hindu Culture, Mohammedan Culture (ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি, মুসলিম সংস্কৃতি)। আবার Santal Culture (সাঁওতাল সংস্কৃতি) নামেও সংস্কৃতি আছে।

কেষ্টদা—Santal Culture (সাঁওতাল সংস্কৃতি) কেউ স্বীকার করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু সেটা আছে তো একটা form-এ (রকমে)।

জ্ঞানদা—আবার বংশের ধারারও Culture (সংস্কৃতি) ছিল, যেমন গৌতম, বশিষ্ঠ এঁদের—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এঁদের ছিল এক একটা School (শিক্ষালয়)। সবাই মহাদিগ্‌গজ। প্রত্যেকেরই ছিল practical knowledge (বাস্তব জ্ঞান)। ওঁদের আবার meeting (সম্মেলন) হ'ত। সেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের experience-এর (অভিজ্ঞতার) কথা কইতেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে যেয়ে খড়ের ঘরে বসলেন। সুধাংশুদা (মৈত্র) এসে বসেছেন। তিনি তাঁর কর্ম্মস্থলে কিছু বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন। সেইসব কথা বলছেন।

সব কথা শোনার পরে দয়াল ঠাকুর বললেন—দুটো জিনিস বাদ দিও না, survival ও resistance (অস্তিত্বরক্ষা ও প্রতিরোধশক্তি)। তোমাকে টিকে থাকতেও হবে, আবার ঐ টিকে থাকার অন্তরায় যা' তাকে প্রতিহতও করতে হবে। যার সঙ্গে অমন গণ্ডগোল তাকে বলতে হয়, আমার যত দোষই থাকুক তা' সত্ত্বেও আমি যে আপনাকে ভালবাসি একথা ঠিকই। হয়তো দেখা হল। বললে—আজ সকাল থেকে শুধু আপনাকেই খুঁজতিছিলাম। আপনার কথাই ভাবছি।

সুধাংশুদা—অনেক সময় মাথা গরম হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাথা গরম হয়ে গেলে adjustment (নিয়ন্ত্রণ) করা যায় না।

সুধাংশুদা—মাথা গরম হলে মাঝে মাঝে দু-একটা ব্যাপার miss ক'রেও যেতে হয় (হারিয়েও ফেলতে হয়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Miss ক'রে গেলে (হারিয়ে ফেললে) তখন root (কারণ) খুঁজো কেন এমন হল।

সুধাংশুদা—ব্লাড প্রেসারের জন্য বোধ হয় এমন হয়। তবে ও-যন্ত্র আমি কোনদিন গায়ে ছোঁয়াই নি। ও ছোঁয়ালেই নাকি বাড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ প্যারীদাকে (নন্দী) ডেকে সুধাংশুদার প্রেসার দেখতে বললেন। প্যারীদা যন্ত্র নিয়ে দেখলেন প্রেসার ১২০/৮০।

সুধাংশুদা—আমার এই প্রিন্সিপ্যালের চাকরীতে শুধু chaos-এর (গোলমালের) মধ্য দিয়ে চলতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ chaos-এর (গোলমালের) মধ্যে তুমি হলে cosmos (নিয়ম-শৃঙ্খলা)। সবার সঙ্গে এমন কথা ক'বে—কী ক'রে আমরা বাঁচতে পারি, কী ক'রে আমরা ভাল থাকতে পারি, এইসব। ধর্ম্মের কথা উচ্চারণ করবে না। তুমি এখান থেকে যেটুকু যা' শিখেছ সেইটুকুই যদি habit-এ (অভ্যাসে) নিয়ে আসতে পার তবে তার মত জ্ঞান আর হয় না।

বিকালে কিরণদা (মুখোপাধ্যায়) কলকাতা থেকে এলেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশমত উইলিয়ম জেম্‌স-এর 'সাইকোলজি' ৪টি কপি নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আপাতত ওগুলি কিরণদার নিজের কাছেই রাখতে বললেন।

ভক্তগণ অনেকেই উপস্থিত। শরৎদা (হালদার) প্রশ্ন করলেন—কেউ যদি জানতে চায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তো এই সেদিন এসে গেলেন। এর পরে immediately (সঙ্গে-সঙ্গে) আর একজন মহাপুরুষের আসার দরকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকৃষ্ণ ঠাকুর ক'য়ে গেলেন, এবার চাবিকাঠি দিলাম না। দেবার জন্য আর একবার আসতে হবে। অবশ্য তাঁর কথা যাই ই থাকুক, রামকৃষ্ণ ঠাকুর যে introduction (উপক্রমণিকা) একথাও তো আমি বলেছি। তাঁর কথাগুলি পরে আরো explained and expanded (ব্যাখ্যাত এবং প্রসারিত) হয়েছে। পূর্ব্ববর্ত্তীর যা-কিছু summation (যোগফল) হ'ল Present (বর্ত্তমানে আগত যিনি)। আবার, Present (বর্ত্তমান প্রেরিত) সবসময় হ'ল according to age (যুগ-অনুপাতিক)। (ক্ষণেক নীরবতার পর বললেন) আপনাদের কথা শুনে মনে হয়, সবই পঞ্চবর্হির সাথে ঠিক ঠিক মিলে যায়।

১৯শে পৌষ, ১৩৬৬, সোমবার (ইং ৪। ১। ১৯৬০)

গত তিনদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর বেশ খারাপ ছিল। সর্দি, কাশি ও অল্প জ্বরে কষ্ট পেয়েছেন। তিনদিন পর আজ বিকালে সমবেত প্রণাম হল। আজ তাঁর শরীর কিছুটা ভাল। তবে মাঝে-মাঝে কাশি হচ্ছে। খড়ের ঘরেই আছেন। থেকে থেকে কাতরাচ্ছেন। সন্ধ্যার সময় একবার পায়খানায় গেলেন।

পায়খানা থেকে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর শয্যার উপরে বসেছেন। যূঁই-মা এসে প্রণাম করলেন। যূঁই-মার বিধবা বেশ। কিছুদিন আগে (২২-১২-৫৯) তাঁর স্বামী ডাঃ সুবোধ সেন পরলোকগমন করেছেন। যূঁই-মাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর দরদভরা কণ্ঠে বললেন—যূঁই-মা নিঃসহায় হয়ে গেল।

ডাঃ বনবিহারীদা (ঘোষ)—আপনি তো আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, স্বামী নেই, বাবা আছেন। (একটু পরে আনমনাভাবে বললেন) এতদিন বেঁচে থাকাই একটা আশ্চর্য্যের ব্যাপার!

যূঁই-মা একটু কাছে এগিয়ে এসে বসলেন। পূজনীয়া ছোটমা নিকটে দাঁড়িয়ে আছেন। যূঁই-মাকে দেখিয়ে বললেন—ওঁর একটু কথা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর যূঁই-মার দিকে একটু ঝুঁকে প'ড়ে বললেন—বল্।

যূঁই-মা—কী অপরাধে ওঁকে ধ'রে রাখতে পারলাম না বাবা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। তুই যেমন ক'রে ধ'রে রেখেছিলি, ওরকম ক'রে আর কেউ ধরে রাখে নি। শেষের দিকে কী যে হয়ে গেল জানতেই পারলাম না। বোধ হয় আমি অসুস্থ বলেই ওরা আমাকে কিছু বলে নি।

যূঁই-মা—আমি কত চেষ্টা করেছি খবর পাঠাবার। কেউ আপনাকে খবর দেয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসুখ হওয়ার সময়টার তো ভালই ছিল।

যূঁই-মা—না, তা' ছিল না। প্রথম থেকেই আমার ভয় ছিল। (যূঁই-মার চোখে জল) বললেন—এতদিন আপনার কাছে ছিলাম। আপনি আমাকে ছেড়ে দেবেন না। আপনাকে যেন কখনও চোখের আড়াল না করি। আপনাকে যেন না ভুলি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভয় নেই। ভয় করিস্ নে। (তারপর সান্ত্বনা দিয়ে বললেন) কাঁদিস্ নে মা! তোকে কাঁদতে দেখলে ওরা ভেঙ্গে পড়বে। বাচ্চাকাচ্চার দিকে নজর রাখিস্, তারা যাতে সুস্থ-সবল হয়ে ওঠে। আমার ইচ্ছা, তুই সুদীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাক্। যখন ইচ্ছে করে, প্রাণ ভ'রে কাঁদিস্—ফাঁকে। ওরা যেন টের না পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের গলা ধরে এল কান্নার চাপে। আর কথা বলতে পারলেন না। একটু পরে যূঁই-মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন—আপনাকে সব সময় দেখতে পাব তো? আপনাকে কাছে পাব তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো আছিই। পরমপিতার কাছে প্রার্থনা—

এই পর্য্যন্ত বলতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের গলা আবার কান্নায় আটকে গেল। তাঁর আয়ত নয়নযুগলে জল টল্‌টল্ করছে। গলা দিয়ে আর স্বর বেরোল না।

কিছুক্ষণ পরে সামলে নিয়ে যূঁই-মাকে আস্তে আস্তে বললেন—ওকে ভাবিস্, আর খুব ক'রে কাঁদিস্। ছেলেমেয়েদের সামনে কাঁদিস নে।

এরপর যূঁই-মা প্রণাম ক'রে ধীরে ধীরে উঠে গেলেন। ......সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হল। ভক্তগণ অনেকে এসে বসেছেন। সাতটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ছড়া দিলেন—

আগ্রহমদির ভাবদীপনায়
যারাই ইষ্টভৃতি করে,
অপ্রত্যাশী এমন ভৃতি
সৎ-চলনায় তাকেই ধরে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অমূল্যদা (ঘোষ) ও জ্ঞানদাকে (গোস্বামী) ডেকে জানতে চাইলেন, দীক্ষাপত্রের মধ্যে ইষ্টভৃতি প্রসঙ্গে 'অপ্রত্যাশী' কথাটা আছে কিনা।

জ্ঞানদা—ঠিক মনে নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টভৃতির ওখানে 'আমার এই অপ্রত্যাশী অবদান' এইরকম কথা থাকা ভাল। (তারপর বললেন) দীক্ষাপত্রের শেষের দিকে একটা sentence-ই (বাক্যই) যোগ ক'রে দিতে হয়—'আমার এই অপ্রত্যাশী অর্ঘ্যাঞ্জলি তোমাকে তৃপ্ত করিয়া তুলুক'।

কথা কয়টি জ্ঞানদা তাঁর নোটবুকে টুকে নিয়ে বললেন—দীক্ষাপত্র তো ছাপানো আছে। এখন কিভাবে ওটা দেওয়া যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রবার স্ট্যাম্প ক'রে নিয়ে 'সীল' দিয়ে দিলে হয়।

আনন্দদা—অমূল্যদা কাল কলকাতায় যাচ্ছে। তাহলে ওকেই রবার স্ট্যাম্প ক'রে আনতে দিই।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমতি দিয়ে বললেন—স্ট্যাম্পের অক্ষরগুলো যেন দীক্ষাপত্রের অক্ষরের সমান হয়।

রাত্রি সাড়ে আটটা। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। তাঁর সাথে এলেন বীরেনদা (মিত্র) ও যামিনীদা (রায়চৌধুরী)। পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য) আগের থেকেই বসেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। বাণীগুলি কেমনভাবে আসে, শব্দ কিভাবে চয়িত হয়, এইসব বিষয় নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে পণ্ডিতদা কথা বলছিলেন।

কেষ্টদা এলে দয়াল ঠাকুর বললেন—পণ্ডিতের সাথে গল্প করছিলাম। ওকে কচ্ছিলাম, তোর বাবার কাছে ঐ তুক্‌গুলি শিখে নে—কিভাবে আমাকে দিয়ে কী করালো! ওইটা যদি শিখে নিস্, জগতের মহা-উপকার হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে সবাই হাসছেন। পণ্ডিতদা বললেন—কিন্তু যিনি করেছেন বলে আপনি বলছেন, তিনিও তো স্বীকার করেন না যে আপনি জানেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দ্যাখ্ আগের থেকেই philosophise (দার্শনিকতা) করিস্।

পরমকরুণাময়ের এই বিনয়ভরা দীন ভাবটি ভক্তবৃন্দ সানন্দ পুলকে উপভোগ করছেন। থেকে থেকে হাসির রোল উঠছে। কারণ, প্রত্যেকেই জানেন যে বাণীগুলি দিয়েছেন স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর। কেষ্টদা মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন, কখনও বা একটা বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনাও করেছেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বাণী দিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। বাণীগুলির বিষয়বস্তু উস্‌কে দেওয়ার ব্যাপারে কেষ্টদার এই কৃতিত্বকে কী অপূর্ব সৌন্দর্য্যমাখা মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করছেন প্রেমময় ঠাকুর আমার!

পরে কেষ্টদাকে বলছেন—আপনি যখন উপস্থিত থাকতেন তখনকার লেখার কেতা একরকম। আবার ইদানীং উপস্থিত থাকেন না, এখনকার কেতা আর একরকম। (এরপর আত্মগতভাবে বললেন) কিভাবে কী হয়ে গেল টেরও পেলেম না।

কেষ্টদা—উপনিষদে আছে 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ'। লেখাগুলি সেই স্বয়ম্ভূর মত।

ঐকথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন পরম দয়াল—স্বয়ম্ভূ কি কৃষ্ণভূ ভগবান জানে। আমি পণ্ডিতকে কই, আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই ওগুলি শিখে নে।

কেষ্টদা—আপনার এই সব শোনার পরে পাতঞ্জলের 'তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্' সূত্রটির মানে বুঝলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা হচ্ছে, আমার কিছু জানা আছে। সেগুলি আপনাদের কাছে গল্প করি। তা' হল নিজের acumen (জ্ঞান) না কী কয়! কিন্তু এগুলি (বাণীগুলি) তা' নয়। এর ধাঁচ আলাদা। এগুলির পিছনে আছে আপনার হাত।

চুনীদা (রায়চৌধুরী)—কিন্তু কেষ্টদার লেখার ধাঁচ তো আপনার থেকে আলাদা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হতে পারে।

কেষ্টদা চুনীদার দিকে ফিরে বললেন—ঠাকুরের ওরকম একটা মনে হয়। ওর উপরে দাঁড়ান। কিন্তু এ বিশ্বাস আমার নেই যে, ঠাকুর ওগুলি জানেন না। (তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন) আপনি তো হিন্দিও বলেছেন কয়েকদিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ধারাটা যদি চলত তাহলে হয়ত হিন্দিতেও বলতে পারতাম। যাহোক, একটা কিছু আপনি করেছিলেন। তাই আমি কই, আপনি যাওয়ার আগে—অবশ্য যাওয়াটা যদি সত্যই হয়—তাহলে ওদের শিখিয়ে দিয়ে যাওয়া ভাল। (আবার পণ্ডিতদাকে বলছেন) এ ব্যাপার কিন্তু গুরুতর। ভাবাই কঠিন।

কেষ্টদা—আপনি সেদিন বললেন, experience (অভিজ্ঞতা) ছাড়া knowledge (জ্ঞান) হয় তা' আমি জানি নে। কিন্তু আপনার এই কথাগুলি তার contradiction (বিপরীত)।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসলেন, বড় মিষ্টি হাসি। তারপর বাণীগুলির আগম সম্বন্ধে বলেছেন—কিরকম হয়? শব্দগুলি আমার চোখের সামনে যেন এক ঝাঁক মাছের মত ভেসে যেতে থাকে। অথবা আকাশে একদল বকের মত যেন উড়ে চ'লে যাচ্ছে। আমি সেই বকগুলি ধরে ফেলে মারছি কেষ্টদার উপর। এই সবই সেইভাবে হয়েছে। আমার বিদ্যে কিছু নেই এতে।

একটু পরে হাসতে হাসতে বললেন—আর যদি ক'ন এর মধ্যে knowledge (প্রজ্ঞা) আছে, তখন আমার বলতে ইচ্ছা করে—Come to me, I shall make you fishers of knowledge (আমার কাছে এস, আমি তোমাদের জ্ঞান-আহরণ করা জেলে তৈরী করব)। Psychology-ও (মনস্তত্ত্বও) কিন্তু কম নেই ওর মধ্যে, facts and psychology (বাস্তব তথ্য ও মনস্তত্ত্ব) দুইই আছে।

কেষ্টদা—হ্যাঁ, গভীরতম। আর, এমন দিক নেই, যে-সম্বন্ধে আপনার বলা নেই।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক চাইলেন। বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) দৌড়ে তামাক সেজে এনে দিলেন। গড়গড়ার নলে কয়েকটি টান দিয়ে দয়াল প্রভু আবার পূর্ব্বসূত্র ধরে ইংরেজী বাণীর কথা তুললেন। বললেন—এই যে যে-সমস্ত ইংরাজী কয় শুনি, আমার কথাগুলি তার সাথে লাগেই না। প্রথমেই বোধ হয় আপনি লিখেছিলেন, Booming commotion of existence ('মেসেজ্' বইয়ের প্রথম বাণী)।

কেষ্টদা—প্রথমে ওরকম শুনে লিখতে যেয়ে আমার হাত থেকে তো কলমই প'ড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐরকম তো বললাম, তারপর ভাবলাম, কেষ্টদা বোধ হয় আমাকে ইয়ে করার জন্য ঐরকম ক'রে বলতে বলছে। যাক্, কই তো! তারপর পর পর বলে গেলাম। আবার কিরকম হত? Start (আরম্ভ) তো হয়ে গেছে। এর মধ্যে কত ভেজাল এসে উপস্থিত হত—আমার মেয়ের অসুখ, ছেলে কথা শোনে না, বাঁশটা কী করব, ইত্যাদি। অটল, ঘরামী, সৎসঙ্গীরা, সবাই এসে কথা বলত। কিন্তু ওর মধ্যে আমার ঠিক চলত। অস্তিকায়নে যখন Realisation-এর (অনুভূতির) কথা না কী লিখি—

কেষ্টদা—সেটা অস্তিকায়নের কাছের একটা তাঁবুতে। বলতে বলতে শেষের দিকে 'আগুন, আগুন' বলে চীৎকার ক'রে উঠলেন। হঠাৎ আঁতকে যেয়ে সবাই ভাবল—এ কী হল!

প্যারীদা (নন্দী)—হ্যাঁ, আমি যেয়ে জড়িয়ে ধরলাম, জলটল খাওয়ালাম।

কেষ্টদা—প্যারীর তখন কয়েকদিন ধরে চোখের সামনে শুধু আগুনের বল ফাটত।

শ্রীশ্রীঠাকুর আনমনা চেয়ে আছেন। মন যেন তাঁর সেই দূর অতীতে চলে গেছে। মানসনয়নে বুঝি দর্শন করছেন মুনিজনসাধ্য ধ্যানগম্য সেই পরম তটস্থ অবস্থা। ঘরের ভিতরে বহু লোক। তথাপি সর্ব্বত্র বিরাজ করছে এক শান্ত নীরবতা। সকলেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে অবলোকন করছেন নিত্যকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই আশ্চর্য্য পুরুষকে।

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে যায়। তারপর নীরবতা ভঙ্গ ক'রে দয়াল ঠাকুর আত্মগতভাবে বললেন—লোকে জীবনী-টীবনী লেখে, কিন্তু কারো হাত দিয়ে এসব জিনিস বেরোনো মুশকিল আছে।

কেষ্টদা—আপনি যখন লেখা দেন, আপনার কথা শুনে মনে হয়, কেউ একটু ক'রে বলে দিচ্ছে, সেইটুকু আপনি বলছেন।

প্রাণমাতানো হাসির ছটা ছড়িয়ে দিয়ে পরম দয়াল বললেন—কিরকম সব গাঁজাখুরি মত। আজ ঐ পণ্ডিতকে একা পাইছিলাম। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কথা উঠে গেল।

কিছুদিন আগে হজরত রসুলের মেরাজের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিয়েছেন। ঐ বাণীর কথা উল্লেখ ক'রে এখন কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ঐ মেরাজটা ঠিক আছে তো?

কেষ্টদা—হুঁ।

বেশ কিছু সময় চুপচাপ কাটে। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে বললেন—সব ভাবতে গেলে মাথা কিরকম গরম হয়ে যায়।

কেষ্টদা অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা ক'রে বললেন—ওষুধ সম্পর্কেও তো আপনি অনেক কিছু বলেছেন। একজন হয়ত একটা অসুখের কথা ক'ল। বই-টই নিয়ে বসা হ'ল। তারপর ভাবতে ভাবতে ঠিক ওষুধটি বেরিয়ে গেল।

ও-কথায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্ব প্রসঙ্গেই ফিরে যেতে চাইলেন। বললেন—তা' না হয় হ'ল। কিন্তু এ হয় কেমন করে? যে জানে না, সে জান্‌ল কি ক'রে?

পণ্ডিতদা—ছোটবেলায় আপনি কঞ্চি দিয়ে ফাউন্টেন পেন বানিয়ে ছিলেন। তার অনেকদিন পর পাবনা বাজারে ফাউন্টেন পেন পাওয়া গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কতদিন পরে। তখন দোয়াতে ক'রে কালি বেঁধে নিয়ে যাওয়া লাগত স্কুলে। তা' যাতে করতে না হয়, সেইজন্য ঐভাবে ফন্দী করলাম।

বার বার প্রসঙ্গান্তরের এরকম উপস্থাপনা যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের মনঃপূত হচ্ছে না। বাণীপ্রদানের প্রসঙ্গ নিয়েই তিনি যেন আজ মেতে গেছেন। তাই, পণ্ডিতদার কথার ঐটুকু উত্তর দিয়েই একটা ঝাঁকি দিয়ে বললেন—তা' না হয় হ'ল। কিন্তু এ হয় কি ক'রে? ছড়া কই কি ক'রে? আর, ছড়াও না হয় হ'ল, ইংরাজী কই কি ক'রে? ইংরাজী তো আমি মোটেই জানি নে। নানাপ্রসঙ্গে বলা শেষ হলে আপনি বললেন, এতেই একটু একটু জোড়াতালি দিয়ে দিলে সুন্দর ইংরাজীতে বলা হয়ে যায়। ভাবি যে তা' হবে কেমন করে! একটু একটু কী!—কিরকম গাঁজাখুরি মতন। এখন যে ইংরাজী কই, কেষ্টদা সবসময় থাকে না তো। আপনি থাকলে যা' হয় তা' আর হয় না। আপনি যা' করলেন তা' কাউকে বোঝাবার জো নেই।

আবার বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর কেষ্টদা বললেন—পাবনায় একবার একটা মেয়ে মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আপনি যেয়ে সেটা অন্যরকম ক'রে দিয়ে এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যেয়ে তার গায়ে-টায়ে হাত দিয়ে ফিরায়ে দিলাম। সে আর ওপথে গেল না।

এই পর্য্যন্ত বলেই চুনীদার দিকে ফিরে বললেন—আমি যে অমন করেছি, তোমরা খবরদার কোন সময় অমন করতে যেও না। বুঝলে তো?

চুনীদা সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

কেষ্টদা—আপনি আগে শেখাতেন, হাসবে sexually (কামজভাবে), কিন্তু চোখের দৃষ্টি হবে মায়ের মতন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ঐরকম কত যে বলেছি—মুখটা এমন থাকবে, কানটা এমন রাখবে, চোখটা এমন হবে, এইরকম কত কথা যে বলেছি, তার যদি record (লিপিবদ্ধ) থাকত। যা' আছে সেইটুকুই যদি মানুষ করে—

কেষ্টদা—দুনিয়া তাহলে সম্রাট হয়ে যায়। এই দেখেশুনে বিশ্বাস হয়, আপনি সব জানেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' মোটে জানি না, তা' যে ক'লাম, সেটা আমার কাছে একটা miracle (অলৌকিক ঘটনা) হয়ে আছে। আমি জানি না, অথচ আমি কচ্ছি। এটা কোন হিপ্‌নোটিজম্ না, মেস্‌মেরিজম্ না, থট্-রিডিংও না। অথচ হয়েছে। সব বুঝি, এ ব্যাপারটা আর বুঝতে পারি না।

কেষ্টদা—আরো দেখতাম, আমাদের বুদ্ধিতে যা' হয় না, আপনি সেটা করছেন 'Let there be light and there was light' (তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—আলো হউক। তখন আলোর সৃষ্টি হল)-এর মত ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এগুলি তো বোঝা যায়। চাল যেখানে যেমন apt (উপযুক্ত), তেমনি করা লাগে। শুধু শাসনেও মানুষকে সন্তুষ্ট করা যায় না, শুধু তোষণেও মানুষকে সন্তুষ্ট করা যায় না। মানুষকে যদি ভালভাবে study (পর্য্যবেক্ষণ) কর তাহলে দেখতে পাবে, সে ক'য়েই দেয় 'তুমি আমার প্রতি এমনি কর'। সে ক'য়ে দেয়, মানে, ক'য়ে দেয় তার চেহারা, তার রূপ, তার appearance (হাবভাব)। কিন্তু dealings (ব্যবহার) সব জায়গায় একই রকম হয় না। কারো একদিক দিয়ে হয়, কারো বা অন্যদিক দিয়ে যেতে হয়। তাহলে, ওগুলি tactics-এর (কৌশলের) উপর নির্ভর করে। আপনি যেখানে successful (কৃতকার্য্য) হতে পারেন না, সেখানে আপনি coloured (অনুরঞ্জিত) হয়ে গেছেন বুঝতে হবে। চুনী হয়তো কোন অন্যায় করেছে। তখন তার উপর আপনার বিতৃষ্ণা এসে গেছে। ঐ বিতৃষ্ণা যেই এসে গেল, আর তাকে আপনি টেনে তুলতে পারলেন না। এসব কায়দা জানত ঐ গিরিশ ঘোষ। ঐ যে কেমনভাবে বলেছে—

বলে অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলে উঠলেন—

"এস ভাই, এস বৃকোদর!
দণ্ডীরে এনেছ সঙ্গে লয়ে?
না জানি কি গুরু অপরাধে
বহু লজ্জা দিয়েছ শ্রীহরি!
ত্রিভুবন অযশ গাহিবে—
দুর্য্যোধন সহায় হইলে।
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হয় সাধ।
হে মুরারি, তব পদ স্মরি করিয়াছি পণ,
রণে দুর্য্যোধনে করিব নিধন—
গদাঘাতে ভাঙ্গি উরু।

মরমে দহিয়ে, তোমার স্মরিয়ে
পাঞ্চালী খুলেছে বেণী!
যা'ক্ মম প্রতিজ্ঞা অতলে!
রহুক দ্রৌপদী এলোকেশী চিরদিন!

....

কিন্তু আশ্রিতে ত্যজিব;—
এ কলঙ্ক অর্পিতে মাথায়
ইচ্ছা কি হে তব ইচ্ছাময়?"

আবৃত্তি শেষ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসলেন। তারপর বললেন—মানুষকে relief (শান্তি) দিতে পারেন। কিন্তু মনে রাখবেন, মানুষের প্রকৃতি বদলায় না। আমার এই মনে হয়। হজরত রসুলের কথাও তাই।

কেষ্টদা—দার্শনিক বেকন লিখেছেন, আচারের দ্বারা প্রকৃতির অনেকখানি পরিবর্ত্তন ঘটানো যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য বোধ হয় বলে 'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ'।

কেষ্টদা—কিন্তু বেকন নিজে ভাল লোক ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যে বোধ হয় শয়তানী জানত ভাল।

ফোটাদা (পণ্ডা) ফোন করতে গিয়েছিল। এখন এসে দাঁড়াতে শ্রীশ্রীঠাকুর ফোনের খবর জানতে চাইলেন। ফোটাদা বলল—কলকাতার বাসায় অনেকেরই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা। কেষ্টদা যাচ্ছেন বলে দিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর (কেষ্টদাকে)—আপনি তো আবার ওর মধ্যে যাচ্ছেন। সাথে যাবে কে? কিরণ? কিরণকে ক'য়ে দিলে হয়, আলাদা একটা জায়গা যেন ঠিক করে। ঐ হাওয়া আপনার না লাগে।

কেষ্টদা—বীরেন যাচ্ছে সঙ্গে। ও ঠিক হবে নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আপনি পারবেন নানে। আপনার ওসব কাণ্ডজ্ঞান কম আছে। যদি যান, ওর মধ্যে যাবেন না। আপনার ঢের কাম আছে।

রাত প্রায় দশটা বাজে। এখন সবাই ধীরে ধীরে উঠছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকাল আমার খাওয়ার আর ঝাঁকানোর ভারি অসুবিধা হয়েছে। বঙ্কিমের অশৌচ।

কেষ্টদা—আমাদের যেন দিন-দিন আচারবাহুল্য হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা থাকতে আগে অত আচার দেখতাম না।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ইঙ্গিত করতে সরোজিনী-মা পিকদানী নিয়ে এসে ধরলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মুখের সুপারি ফেলছেন। ফেলতে ফেলতে সরোজিনী মার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—সরোজিনীর মুখখানা কালো হয়ে যাচ্ছে। ক্রীম মাখলে হয়।

কেষ্টদা—প্রিভেন্টিনাও ভাল।

সরোজিনীমা—আমি প্রিভেন্টিনাও মাখিনে, সাবানও মাখি নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' মাখবা কেন? মুখটা কালো হয়ে যাক আর কি!

পরম দয়ালের কণ্ঠস্বরে দরদ যেন ঝরে পড়ছে। এরপর সবাই উঠে দাঁড়ালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে পায়খানায় গেলেন। এদিকে রাতের ভোগের আয়োজন হতে থাকল।

২০শে পৌষ, ১৩৬৬, মঙ্গলবার (ইং ৫। ১। ১৯৬০)

প্রাতে—খড়ের ঘরে। কাল রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাল ঘুম হয় নি। শেষরাতের দিকে একটু ঘুমাতে পেরেছেন। বেলায় উঠলেন। আজ সকালের সমবেত প্রণাম হ'ল ৮-৫০ মিনিটে। তাঁর গলার স্বর আজও ভারী।

আজ ভোরের দিকে খানিকটা বর্ষা হয়ে গেছে। এখন সারা আকাশ জুড়ে মেঘ। মাঝে মাঝে ঝিরঝির ক'রে জল পড়ছে। রোদের লেশমাত্রও দেখা যায় না।

সকালে ন'টার পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। আজ তিনি কলকাতায় যাচ্ছেন মোটরযোগে। সে-সম্পর্কে কিছু কথাবার্ত্তা বলে প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন।

বেলা সাড়ে দশটার পর কেষ্টদা কলকাতা রওনা হলেন। দুপুর থেকে আকাশের মেঘলা ভাবটা কাটল। বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাশি হচ্ছে থেকে থেকে। পণ্ডিতদার মা এসে বসলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—কেষ্টদা-রা এতক্ষণ কতদূর গেছে?

মা—বর্ধমান ছাড়ায়ে গেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো বার বার ক'য়ে দিলাম ইনফুয়েঞ্জার মধ্যে যেন না যায়।

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)—হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে আলাদা বাসা ভাড়া ক'রে থাকার কথা আপনি বলে দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে একজন এলো। শ্রীশ্রীঠাকুর তার সাথে কিছুক্ষণ প্রাইভেট কথা বললেন। পরে সে প্রণাম ক'রে উঠে গেল। তখন দয়াল ঠাকুর মায়া-মাসীমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলছেন—আমার এইরকম করা লাগে, একবার সাপের গালে চুমো খাওয়া, একবার বাঘের গালে চুমো খাওয়া।

বিকাল ৪-৪৫ মিঃ। পূজনীয়া ছোটমা কাছে এসে দাঁড়ালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—এই দ্যাখ্, কাজলা যেন একটু কুঁজো হয়ে যাচ্ছে মনে হ'ল। আমার পিঠ কুঁজো নাকি?

ছোটমা—না, আপনি কুঁজো না, কাজলও কুঁজো হবে না।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর চাদরটি বুক পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে শয়ন করলেন। ইনফ্লুয়েঞ্জার পর শরীর তাঁর এখনও দুর্বল আছে।

রাতে আকাশ অনেক পরিষ্কার হয়ে গেল। বেশ তারা দেখা যাচ্ছে। শীতও বেশী বোধ হচ্ছে।

২১শে পৌষ, ১৩৬৬, বুধবার (ইং ৬। ১। ১৯৬০)

আজ সকালে আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। বেশ ঠাণ্ডা বাইরে। ভক্তগণ অনেকেই খড়ের ঘরের ভিতরে এসে বসেছেন। পূজনীয় কাজলদা এসে প্রণাম করতে তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ভাল বই মাঝেমাঝে পড়তে হয়, ইংরাজী বাংলা সবরকম।

কাজলদা—পড়ার বই ছাড়া আমি কোন ইংরেজী বই পড়ি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনই তো পড়তে হয়। সময় পেয়েছিস। কিন্তু ওতে মজে গেলে আর ডাক্তারী পড়া হবে না। যখন মজলে, তখনকার জন্যই মজলে, এমন হওয়া চাই।

এই সময় জ্ঞানদা (গোস্বামী) এসে প্রণাম করলেন। তাঁকে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, তুই কাজলকে কয়েকখানা ইংরাজী ও বাংলা ছোট ছোট বই জোগাড় ক'রে দিবি? বড় হলে ওর পক্ষে মুশকিল।

জ্ঞানদা—আজ্ঞে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(কাজলদাকে) বড় বড় orator (বাগ্মী)-দের বই পড়া লাগে। আর, সেগুলি recapitulate (পুনরাবৃত্তি) করা লাগে। কথা বলার সময় তাদের নানারকম attitude (ভাবভঙ্গী) হয়। সেগুলি আবার রিহার্সাল দেওয়া লাগে। হয়তো what কথাটা বললে, একেবারে ফেটে পড়ল। (শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে, মুখে ও কণ্ঠস্বরে ঐ বলা-অনুপাতিক ভাব ফুটে উঠল)। নয়তো শুধু পড়ার জন্য পড়ে গেলে, তাতে কিছু হয় না।

যামিনীদা (রায়চৌধুরী) সামনে এসে বসেছেন। তিনি বোধ হয় কিছু বলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এখন জিজ্ঞাসা করলেন—আমি ক্ষত্রিয়। আমার ঝোঁক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Administration, Military (শাসনকার্য্য, সামরিক কাজকর্ম) এইসব।

যামিনীদা—তা' তো আমার হচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Practice (অনুশীলন) করা লাগে।

যামিনীদা—কিন্তু আমাকে training (শিক্ষা) দেবে কে? আমি তো শুধু আসি আর চলে যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Guide (চালক) তোমার আছেই। তার কথা শোন, note (লক্ষ্য) কর। সেই নির্দেশ-মাফিক চললেই হয়। Guide-এর (চালকের) আদেশ যে ঠিকমত work out (কার্য্যে পরিণত) করে, তার আর ভাবনা নেই।

যামিনীদা—কিন্তু একজনের সাথে থাকতে পারলে সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে বললাম। Attempt (প্রয়াস) থাকা চাই তোমার নিজের। ঝোঁক যদি থাকে তাহলে জল খেতে খেতে ঠিক সাঁতার শিখে ফেলবে। সবার আগে কথা হ'ল, মানুষের হৃদয় জয় করা লাগবে।

যামিনীদা—কিভাবে যে তা' করতে হয়, অনেক সময় তাল পেয়ে উঠি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—থিয়েটারে part (অংশ) নিছিস্। এখন ভালমত অভ্যাস করবি, তবে তো হবে!

যামিনীদা—এখন ভাল করি আর মন্দ করি—

এই পর্য্যন্ত বলতেই সগর্জ্জনে বাধা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মন্দ করি কী? মন্দ করবেই না, ভাববেও না।

যামিনীদা—সত্তা যে আমার অমনতর হয়েই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তা কখনও অমনতর হয় না। তুমি যেমন চাও তাই হতে পারে। মনে রেখো, destiny-কে (ভাগ্যকে) তোমার create (সৃষ্টি) করা লাগবে। কথায় আছে—'শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়।' শুধু idea (মতবাদ) নিয়ে চললে হবে না, fact (বাস্তব তথ্য) নিয়ে চলতে হবে। অসৎকে সবসময় নিরোধ করবে। তা' করতে যেয়ে হয়তো পাঁচ জায়গায় পারলে না, দশ জায়গায় পারলে না, পনের জায়গায় পারলে না, তারপর যেয়ে হ'ল। হাল ছাড়বে না। লেগে থাকতে হয়। লেগে থাকতে থাকতেই সিদ্ধি আসে। এসব কথা আমার কওয়া আছে। মনে নেই যে কী কওয়া নেই। বেশী কওয়া ভাল না। তাতে শোনার luxury (বিলাস) বেড়ে যায়।

বিকালে শরৎদা (হালদার) একটা চিঠি হাতে ক'রে নিয়ে এসে জানালেন—মুর্শিদাবাদের রবীন সিংহ তাঁর দুই মেয়ের জন্য এক বাড়িতে দুটি পাত্র দেখেছেন। পাত্ররা দুই সহোদর ভাই। এখন ঐ পাত্রপক্ষ আধুনিকভাবাপন্ন। তাঁরা ঠিকুজী-কোষ্ঠী রাখেন না বা মানতেও চান না। এক্ষেত্রে কী করা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-সব জায়গায় মেয়ের কোষ্ঠী দেখেই স্থির করতে হয়, সে কোষ্ঠী কেমন, বৈধব্য-যোগ বা অন্য কোন খারাপ কিছু আছে কিনা, ইত্যাদি।

২২শে পৌষ, ১৩৬৬, বৃহস্পতিবার (ইং ৭। ১। ১৯৬০)

আজ ভোর থেকেই কনকনে ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া বইছে। শীতে সবাই জড়সড়। সোয়েটার, আলোয়ান, ওভারকোট ইত্যাদি-পরা ভক্তগণ একে একে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। একটা বড় আলোয়ানে প্রায় আপাদমস্তক ঢেকে এসে দাঁড়ালেন হরিদাস ভদ্রদা।

তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, তুই আমাকে কতকগুলি বই select (নির্বাচন) ক'রে দিছিলি, খুব ভাল। আর কতকগুলি cottage industry, engineering (কুটিরশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং), এই সবের বই জোগাড় ক'রে দিতে পারিস, যাতে ক্রীম ইত্যাদি তৈরি করা যায়, আরো কী কী করা যায়, সব লেখা আছে। এসব আমার কিছু কিছু পাবনায় ছিল। কিন্তু কে যে নিয়ে গেল।

পূজনীয় কাজলদা এসে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ তুমি কেমন আছ বাবা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গলায় একটু সর্দির ভাব এখনও আছে। তবে অন্যদিনের থেকে কাল রাতে ঘুমও ভাল হয়েছে।

সকাল ৮টা। সুশীলদার (বসু) সাথে শ্রীশ্রীঠাকুর বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলছেন। কথাপ্রসঙ্গে দয়াল ঠাকুর বললেন—ইউরোপীয়ান, নিগ্রো, ভুইটস, এইসব নানারকম race-এর (জাতির) সংমিশ্রণের result (পরিণাম) কী, এ সম্বন্ধে যদি কোন বই পান তো দেখবেন। (তারপর বললেন) আমার মনে হয়, এই যে সব masturbation (হস্তমৈথুন) করে, তাতে sexual urge (যৌন সম্বেগ) বাড়ে এবং তার ফলে nervous debility (স্নায়বিক দুর্ব্বলতা) আসে। আচ্ছা, মেয়েলোকের উপর পুরুষ মানুষের এই যে টান, এটা কি কামুক কিছু, না এর beyond-এ (ওপারে) কিছু আছে।

সুশীলদা—মনে হয় আরো কিছু আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যেমন বড় বৌকে ভালবাসি। এই বয়সে ও-সব sex (যৌনতা) কিছু আর টের পাই নে। কিন্তু তবুও টান আছে।

এ যেমন স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে, তেমনি মা-ছেলে। আর, তার থেকে পবিত্র জগতে কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। মেয়েদের ভিতরে এই ভাবটা সঞ্চারিত হয় বাবার থেকে। আর, ছেলেদের ভিতরে আসে মায়ের থেকে। Sex (যৌন সম্বেগ) যদি ঠিক channelised (খাতে প্রবাহিত) হয়, তবে তার থেকে ব্যাপ্তি আসে। ওটা হল spring of life (জীবনের উৎস)। ক্রাইস্টও বলেছেন, তুমি আর তোমার wife (স্ত্রী) আলাদা না। সেইজন্য এই দিক দিয়ে যারা যত pure (বিশুদ্ধ), তাদের expansion of life (জীবনের ব্যাপ্তি) তত বেশী।

সুশীলদা—তাহলে যারা বিয়ে-থাওয়া করে নি, তাদের কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রায়ই দেখা যায়, তাদের একটা neurosis-এর (স্নায়ুরোগের) মত অবস্থা হয়।

বেলা সাড়ে ৮টা। আসাম থেকে এলেন কয়েকজন দাদা ও মা। ওঁরা অন্যান্য জিনিসের সাথে দুই ঝুড়ি পঞ্চমুখী কচু নিয়ে এসেছেন। ঝুড়ির দিকে নির্দেশ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ও কী রে?

ধীরেনদা (বিশ্বাস)—পঞ্চমুখী কচু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় বৌকে দেখা।

পাশে একখানা বড় চেয়ারে বসে আছেন শ্রীশ্রীবড়মা। সিতেন্দুদা (দাস) একখানা কচু হাতে ক'রে তাঁর কাছে যেয়ে দেখালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে বলে উঠলেন—ঐ দেখ, পঞ্চমুখী কচুর একেবারে পাহাড় বানিয়ে ফেলেছে।

এরপর দাদারা জিনিসপত্রগুলি নিয়ে ভোগের ঘরে দিতে গেলেন। কিছুক্ষণ পর খাওয়াদাওয়া নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে দয়াল ঠাকুর বললেন—কলার পাতায় গরম ভাত খাওয়া খুব ভাল। সোজা দিকে sunrays (সূর্য্যকিরণ) পড়ে, তার থেকে ক্লোরোফিল নেয়। গরম ভাতে ওটা উঠে আসে। স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল। আমরা তো আগে কলার পাতাতেই খেতাম। পাড়াগাঁয়ে প্রত্যেক বাড়ীতেই আগে কলার এক ঝাড় থাকত। পদ্মপাতাতেও খাওয়া খুব ভাল। বরনের চালের ভাত কলাপাতায় ঢেলে একটু ঘি দিয়ে আর তার সাথে যদি একটু সিদ্ধ কিছু থাকে, তবে তা' যেমন tasteful, তেমনি উপকারী।

২৪শে পৌষ, ১৩৬৬, শনিবার (ইং ৯।১।১৯৬০)

কাল থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীরে একটা jerking (ঝাঁকুনি) হচ্ছে। থেকে থেকে শরীরের হাত, পিঠের অংশবিশেষ কেঁপে-কেঁপে উঠছে। এতে নিদ্রারও ব্যাঘাত ঘটে।

আজ বিকালে পূজনীয় কাজলদা তাঁর স্বাস্থ্যের খবর জিজ্ঞাসা করতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঘুম হয় নি। থেকে থেকে ঐ ঝাঁকুনি হচ্ছে। শরীর দুর্ব্বল।

বেলা সাড়ে চারটার পরে অনেকে এসে বসলেন। শরৎদা (হালদার) প্রশ্ন করলেন—Brain radiation (মস্তিষ্কের বিকিরণ) কি অনুভব করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তাই মনে হয়। আমি তো এ সম্বন্ধে আপনাদের বলেছি।

শরৎদা—আচ্ছা, 'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন' এ কথাটার তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অ মানে ন। প্রাকৃত মানে materialised (মূর্ত্ত)। অপ্রাকৃত মানে হল not materialised (মূর্ত্ত নয়, বাস্তবে নয়)। আর মদন হল ঐ urge (সম্বেগ)। তা'

অপ্রাকৃত বলেই চিরনবীন। তাঁর ভিতর এটা আছে বলেই তিনি দুনিয়াকে উপভোগ ক'রে চলতে পারেন। তিনি শাশ্বত, পুরাণ পুরুষ, ever old (চিরপুরাতন), অথচ ever new (চিরনবীন)। যেমন আপনি old (প্রবীণ), কিন্তু আপনার ছেলে new (নবীন)। এইরকমভাবে চলে আসছে আর কি! আর, শঙ্করপন্থীরা এটা অস্বীকার ক'রে চলে। তারা 'নেতি নেতি' ক'রে, 'কেউ নেই, কিছু নেই' ক'রে এগিয়েছে।

আমার বাবাকে (শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) শ্রীশ্রীঠাকুর কারো জন্য দুইশত টাকা জোগাড় ক'রে আনতে আদেশ করেছিলেন। বাবা এখন সেই টাকা নিয়ে এলেন। বাবাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তোর হয়ে গেছে?

বাবা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দাঁড়া, এ বিশুর কাছে দে। (তারপর কী ভেবে বললেন) না, তুই রাখ, তোর কাছে থাক। তোর হাত দিয়েই দেওয়াব।

বাবা প্রণাম করে একপাশে বসলেন। গুরুদাস সিংহদা এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, তুই আর কতকগুলি পুরানো বই জোগাড় কর্। আমার তোফিল যে শূন্য হয়ে গেল।

শরৎদা—অনেক পুরানো বই তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের বই ছিঁড়তে দেখি নি। কেষ্টদার বইও সে কী সাবধানে রাখে। আর আমার বইগুলো ছিঁড়েই ফেলল। মানুষ ছেলেপেলের গায়েও ওরকম ক'রে হাত দেয় কিনা জানি নে।

২৫শে পৌষ, ১৩৬৬, রবিবার (ইং ১০।১।১৯৬০)

গত রাতে ভূপেশদা (দত্ত) এসেছেন কলকাতা থেকে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে একখানা অক্সফোর্ড ডিকশনারি কিনে আনতে বলেছিলেন। সেটি এবং আরো কয়েকটি টিউব ও অন্যান্য জিনিস কিনে আনছিলেন ভূপেশদা। কিন্তু গাড়ীতে সে সব চুরি হয়ে যায়। আজ সকালে ভূপেশদা এসে প্রণাম ক'রে সেকথা জানালেন।

তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ ব্যথিত হয়ে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে ভূপেশদাকে বললেন—এরকম যে কত গল্প শোন, মনে থাকে না? তুমি কায়েত মানুষ। এ কাজ করলে কি ক'রে? খবরদার, ওরকম যেন আর হয় না। আমি এসব এত শুনেছি যে বিরাট একখানা বই হতে পারে। তুমি যদি ওগুলি কাউকে দিয়েও আসতে, তাতে আমার এত কষ্ট হ'ত না। চুরি গেল কেন?

ভূপেশদা—কিভাবে যে গেল—

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার বেকুবী, তাই গেল। সেই বেকুবী সংশোধন কর। ঐ যে সুশীলদার চশমার খাপ কেটে নিয়ে গেছে, কিন্তু টাকা নিতে পারে নি।

গতকাল জলপাইগুড়ির বলরামদা (সরকার) খোল, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এসেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে। তিনি আজ ভোরে চ'লে গেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলরামদাকে আরো চারখানি খোল আনতে বলেছেন। সেই কথা জিজ্ঞাসা ক'রে অনিলদাকে (গাঙ্গুলি) বললেন—ও তাড়াতাড়ি আনবে তো?

অনিলদা—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাড়াতাড়িই নিয়ে আসবে।

আজ বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অনেক ভাল। গত কাল মায়া-মাসীমার একটু জ্বর হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এখন বিশুদাকে ডেকে মায়া-মাসীমার টেম্পারেচার দেখতে বললেন।

রমণের মা সামনে এসে বসেছেন।

এই সময় প্রিয়নাথ সরকারদা এলেন। তাঁকে বললেন দয়াল—এই প্রিয়নাথ! রমণের মাকে গোটা চারেক বীচে কলা খাওয়াতে পারিস?

প্রিয়নাথদা—দেখি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাঁচা হলে আরো ভাল হয়। বীচে কলার ঝোল রেঁধে খেতে পারে।

রমণের মা খুশী খুশী মনে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে তাকিয়ে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মায়া-মাসীমার দিকে ফিরে রমণের মাকে দেখিয়ে নীচু স্বরে বললেন—ওকে ওরকমভাবে না বললে হয় না।

এই সময় তরুমা শ্রীশ্রীঠাকুরের বৈকালিক জলযোগ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। সামনের আলোটা জ্বেলে দেওয়া হল। কাছে যাঁরা ছিলেন, সকলে উঠে বাইরে গেলেন। ঘরের পর্দা টেনে দেওয়া হল। শ্রীশ্রীঠাকুর তরুমাকে বললেন—খাবারটা বড় বৌকে দেখায়ে নিয়ে আয়।

তরুমা দেখিয়ে আনার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর তা' গ্রহণ করলেন।

বিনয় মুখার্জীদা কলকাতা থেকে এসেছেন সপরিবারে। সন্ধ্যার পরে সবাই এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। কুশলপ্রশ্নাদির পর শ্রীশ্রীঠাকুর বিনয়দাকে বললেন—ঝানু ব্যবসায়ীদের কী কী গুণ থাকা দরকার? তুই আমাকে কয়েকটা point (বিষয়) দে ভেবে-চিন্তে। আর, বামুনরা কিভাবে ব্যবসা করবে তাও ক'বি। এমন আছে যে, ব্যবসার ভিতর দিয়ে service (সেবা) দিতে চায়, মানুষের জন্য করতে না পারলে খুশী হয় না। সেটা বামনাই রকম। না, আমি ক'ব না। ক'লে তোর থেকে আর বার হবিনানে।

বিনয়দা—আমার কাছে যদি কেউ আসে, আমি চেষ্টা করি তাকে কতখানি সাহায্য করতে পারি। কূটনীতির মধ্যে প'ড়ে যাতে সে ধ্বংস না হয় তা' দেখি। আবার তার দৃষ্টিটাও আমি নিই। এইরকম আমারটা আমি বলতে পারি। কিন্তু অন্যেরটা বলব কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমারটাই তুমি কও।

বিনয়দা নিজে ব্যবসায়ী।

ব্যবসায়ে কিভাবে সাফল্য অর্জন করা যায়, সেই প্রসঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বললেন। কিছু সময় শোনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Good (ভাল) ব্যবসায়ী যারা, after all (মোটের উপর) তারাই কিন্তু বাঁচে। তাদের হয়তো পয়সা নেই, কিন্তু তারা মানুষকে খুশী করার চেষ্টা করে। এর ভিতর দিয়ে তাদের credit (সুনাম) বাড়ে, ability (যোগ্যতা) বাড়ে। লোকে তাদের জিনিস খুশী হয়ে কেনে। আর ওরকম যারা করে না, তাদের লোকে আস্তে-আস্তে বুঝতে পারে। শেষে তাদের কাছ থেকে আর কেনে না। আর, ওদের বড় ধাক্কাও যদি আসে, ওরা টুকরোও যদি হয়ে যায়, আবার গজায়ে উঠবে—গাছের গুঁড়ি থেকে যেমন গাছ গজায়। আর, এরা শুকিয়ে যেতে থাকে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিলেন—

স্বভাবটাই তো তোমার হওয়া
যেমন স্বভাব তেমনি তুমি,
তেমনতরই চলন-বলন
তেমনি তোমার চিত্তভূমি।
চেষ্টা যত্ন যেমন তোমার
মানসগতি যেমনতর,
কৃতিমুখর যাতে তুমি—
হওয়া-পাওয়াও তেমনতর।

রাত এগারোটা পর্য্যন্ত এইভাবে পরপর বহু ছড়া বলে গেলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তারপর উঠে বাথরুমে গেলেন।

২৭শে পৌষ, ১৩৬৬, মঙ্গলবার (ইং ১২। ১। ১৯৬০)

আজ বিকালেও বিনয় মুখার্জীদা এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে। কাছে আছেন শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), অনিলদা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ। বিনয়দার ব্যবসার কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওকে স্প্রিং বানানো শেখালো কে? কেউ তো শেখায় নি। নিজের থেকেই সব করেছে।

সুশীলদা—কলকাতায় স্প্রিং-এর যত ব্যবসা, সব ওঁদের থেকে গজিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আদরের সুরে বললেন—ওকে India-র (ভারতের) স্প্রিং-এর sole maker (একমাত্র নির্ম্মাণকর্তা) বললেও হয়। যেমন inventive brain (উদ্ভাবনী মস্তিষ্ক), তেমনি বামনাই রকমও আছে।

ব্যবসাতে লাগে সুব্যবহার
হিসেবী অনুচলন,
ব্যবস্থিতি যতই ভাল
তেমনি তার বলন।

একটু পরে বিনয়দা বললেন—আমি যেখানটায় আছি, সেদিকটা বড় নির্জন। চিৎকার করলেও মানুষের সাড়া পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' এখানে চলে আসলে হয়, এই বিশ্বাসবাড়ীতে। এই বুড়ি!

একজন দৌড়ে বুড়িমাকে ডাকতে গেল। বুড়িমা বিশ্বাসবাটীতেই থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে বললেন—আপনারা এখানে land (জমি) নিয়ে ঘর তো করবেন। সেখানে 'সুরেশ কুটির' নামে সুরেশদার নাম দিয়ে ওদের একখানা ঘর ক'রে রাখবেন, যাতে ওরা আসলে উঠতে পারে।

ইতিমধ্যে বুড়িমা এসে পৌঁছালেন। বিনয়দাকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—যা, বুড়ির সঙ্গে যেয়ে বাড়ী দেখে আয়।

বিনয়দা তাঁর স্ত্রী ও কন্যা-সহ বুড়িমার সাথে গেলেন। এই সময় হরিদাসদাকে (সিংহ) সামনে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই, বিনয় ওরা আছে বিলাসী টাউনে। ওদিকটা নাকি নির্জন। তুই আজ রাতে যেয়ে ওদের বাড়ীতে শুবি।

একটু পরে বিনয়দা এসে জানালেন যে, এই বাড়ি তাঁর পছন্দ হয়েছে। আগামীকাল দুপুরের পরই সব নিয়ে এখানে চ'লে আসবেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর অনিলদাকে ডেকে বিশ্বাসবাটীর ঐ ঘরখানা ভালভাবে পরিষ্কার করিয়ে রাখতে বললেন, আর অজয়দাকে ডেকে বললেন ওখানকার ইলেকট্রিকের সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে দেবার জন্য।

১লা মাঘ, ১৩৬৬, শুক্রবার (ইং ১৫। ১। ১৯৬০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন। ভক্তবৃন্দ মেঝেতে পাতা সতরঞ্চিতে উপবিষ্ট। নানা বিষয়ে কথা চলছে। কথায়-কথায় যন্তা সুরেনদা (বিশ্বাস) বললেন—আপনার কথাগুলি আমাদের কাছে শুধু বই হ'য়ে থাকল, আচরণে ফুটল না। আবার, আচরণের জন্য যে চেষ্টা করব, তাও কারো কাছে কোনো সহানুভূতি নেই, কিছু নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও কথা কও কেন? তোমরা না করলে হবে কী ক'রে? তোমরা অন্ততঃ পঁচিশ জন মানুষও যদি ঐভাবে তৈরি হয়ে নিতে তাহলে দেখতে কী হয়! ঐ যে কী কয়, 'আপনি আচরি ধর্ম্ম—'?

জ্ঞানদা (গোস্বামী)—জীবেরে শেখায়।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—হজরত মহম্মদ বলেছেন, কারো প্রকৃতি বদ্‌লেছে এ বিশ্বাস ক'রো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গীতায় প্রকৃতি নিয়ে কী যেন আছে, 'প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য'—না কী?

কেষ্টদা—হ্যাঁ, 'বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে?

কেষ্টদা—আমি প্রকৃতিকে অবরুদ্ধ ক'রে সৃষ্টি করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে গীতায় বলেছেন 'অবষ্টভ্য', সেটা আশার কথা। তার মানে তুমি পার করতে—তোমার প্রবৃত্তিকে benumbed (নিষ্ক্রিয়) ক'রে। চাই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টের নির্দ্দেশ-আনুপাতিক চলন-বলন। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে আত্মনিয়মনী আগ্রহ নিয়ে কর, চল। তা' না হলে পারবে কিভাবে?

এই সময় পণ্ডিত মশাই (গিরিশচন্দ্র কাব্যতীর্থ) এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, বড় খোকার লগ্নাধিপতি কে?

পণ্ডিত মশাই—শুক্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর বিশেষ ভাল বোধ করছেন না। তাই কথাবার্ত্তা আর অগ্রসর হয় না।

বিকালেও তাঁর শরীরের অবস্থা একই রকম। চুপচাপ বসে আছেন। পূজ্যপাদ বড়দাকে ডেকে পাল্‌স্ দেখতে বললেন। বড়দা পাল্‌স্ দেখলেন ১০২। দেখেই টেম্পারেচার নিতে বললেন। টেম্পারেচার উঠল ৯৮.৫।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার পায়খানায় গেলেন। তারপর আবার টেম্পারেচার নেওয়া হল। তাপমাত্রা পূর্ব্ববৎই আছে। রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর শুধু সাবু আহার করলেন এবং অন্যদিনের চাইতে তাড়াতাড়ি শয়ন করলেন।

২রা মাঘ, ১৩৬৬, শনিবার (ইং ১৬।১।১৯৬০)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের টেম্পারেচার ৯৭°। শরীর বেশ ক্লান্ত। কয়েকজন দাদাকে সঙ্গে ক'রে চন্দ্রনাথ বৈদ্য আজ সকালে এসে পৌঁছেছেন। ওঁরা এসে প্রণাম ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বসলেন।

কিছু কথাবার্ত্তার পরে দয়াল ঠাকুর আমাকে বললেন—আমার এখনকার ছড়াগুলি ঐ চন্দ্রনাথকে শোনালে হয়। দেখি ও বোঝে কিনা। ওই ফাঁকে নিয়ে যেয়ে শোনাতে হয়।

এই কথা হতেই চন্দ্রনাথদা হাত জোড় ক'রে বলে উঠলেন—ঠাকুর! আমার তো চাকরীর মেয়াদ শেষ হয়েছে। এখন পেন্‌সন পাচ্ছি। এখন কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই আগে ছড়াগুলো শুনে আয়। তারপর তোর কথা শুন্‌ব নে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে এরকম তাড়া পেয়ে চন্দ্রনাথদা উঠে পড়লেন। আমি ওঁকে নিয়ে এলাম অশত্থতলার চৌকিতে। সেখানে বসে ইদানীং কয়েকদিনের দেওয়া সব ছড়াগুলি পড়ে পড়ে শোনাতে লাগলাম। সবটা পড়তে বেলা প্রায় দশটা বেজে গেল।

বিকালে চন্দ্রনাথদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বললেন—ছড়াগুলি সকালে শুনেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছড়াগুলি সব শোনা লাগবে। তার কারণ, ওর মধ্যে তুকগুলি সব দেওয়া আছে। ঐ রকমে সব-কিছুকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে হবে। আসল কথা হ'ল মানুষ। মানুষগুলি যাতে normally (স্বাভাবিকভাবে) এগিয়ে যায়, তাদের পারিবারিক উন্নতি যাতে হয়, সেদিকে সব সময় লক্ষ্য রাখবে। এই কাজের মধ্যে কী যে নেই তা' বলা যায় না।

চন্দ্রনাথদা—কিন্তু নিজে না হলে তো অপরকে করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, example is better than precept. (উপদেশদানের চাইতে উদাহরণ হওয়া ভাল)।

চন্দ্রনাথদা—কিভাবে কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Elite (সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি)-দের দিকে নজর দেওয়া লাগে। তাদের সাথে মিশতে হয়, কথা বলতে হয়। ধর্ম্ম হ'ল বাঁচা ও বাড়া। সেই বাঁচা-বাড়া ব্যাহত হতে পারে এমন ism (বাদ) কেউ চায় না, তা' সে যত বড় লোকই হোক। আবার, এমন লোকও আছে যারা এসব কথায় contest (বিতর্ক) করে। সেখানে তোমার কায়দা ক'রে কথা কওয়া লাগবে। এ করতে গিয়ে তোমার নিজের জীবনের practical experience (বাস্তব অভিজ্ঞতা)-গুলি কাজে খাটানোর প্রয়োজন হবে। এক কথায়, shepherd-এর (মেষ-পরিচালকের) কাজ যা' এও তাই।

এর আগে শ্রীশ্রীঠাকুরের খুস্‌খুসে কাশি একটু ছিলই। এখন হঠাৎ দম্‌কা কাশি এল। কাশির ধমকটা একটু সামলে নিয়ে পাশে অবস্থিত ডাক্তারদের নির্দ্দেশ ক'রে তিনি বললেন—আমার ধাত বুঝে ওরা ওষুধ দিতেও পারে না, আর এ সারেও

না। এরকম আমার হয়েছে তো কন্‌ফারেন্সের প্রথম দিন থেকে। (আজ সতের দিন)। ভুগছি এতদিন থেকে। একটা কবিরাজী পাঁচনমত দিলেও সেরে যেত। আচ্ছা, বামনহাটির কী action (ক্রিয়া) আছে রে? পিপুল, বচ্, এই সব গুঁড়ো করে বামনহাটি দিয়ে মিশিয়ে একটা কিছু ক'রে দিলেও বোধ হয় সারত।

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)—আচ্ছা দেখছি।

ব'লে বইতে বামনহাটির গুণ দেখতে গেলেন। দুপুরের পরে আকাশ আবার মেঘে ঢেকে গেছে। বিকাল সাড়ে চারটায় চারদিক যেন আঁধার হয়ে এল। মায়া-মাসীমা ও পূজনীয় কাজলদা এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ডাঃ সূর্য্যদাকে (বসু) ডেকে বললেন মায়া-মাসীমার টেম্পারেচার দেখতে। দেখা হল ৯৭.৮। আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের টেম্পারেচার আছে সাড়ে সাতানব্বই।

এরপর কাজলদা বললেন—একজন যুবকের তো ছয় ঘণ্টা ঘুম sufficient (যথেষ্ট)। কিন্তু কেউ যদি সাড়ে চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠে পড়ে, তাহলে প্রথম প্রথম তার গা ম্যাজ্ ম্যাজ্ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' করে। কিন্তু উঠতে উঠতে অভ্যাস হয়ে গেলে তখন ঠিক হয়ে যায়। আর, এ অভ্যাস করা লাগে গরম কাল থেকেই।

কাজলদা—আমি এখন থেকেই অভ্যাস করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো আগে সাড়ে চারটার সময় ঘুম ভেঙ্গেই যেত। এখনও ভাঙ্গে। এই যে বড়-বৌ ঘুমায় দশ মিনিট কি পনের মিনিট।

কাজলদা—রাত দুটার সময়েই তো উঠে পড়েন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। আগে পা যখন ভাল ছিল, তখন উঠে ঘুরে ঘুরে পাহারাও দেখত।

কথা চলছে। প্যারীদা (নন্দী), সূর্য্যদা (বসু), হরিপদদা (সাহা) প্রমুখ ডাক্তাররা একপাশে বসে ভৈষজ্যরত্নাবলী, ভারতভেষজ-তত্ত্ব, দ্রব্যগুণ প্রভৃতি বই দেখছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের গলার অস্বস্তির জন্য ওষুধ বের করতে নিজেরা আলোচনা করছেন।

সন্ধ্যার পর বিশুদা শ্রীশ্রীঠাকুরের টেম্পারেচার নিলেন—সাড়ে আটানব্বই। একটু পরে প্যারীদা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানালেন—ওষুধ ঠিক হয়ে গেছে। বিশুদা ওষুধ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সব কথা শুনেছিলেন। বললেন—এতে নির্ঘাত সারবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় খোকারে দেখাইছিস?

প্যারীদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় খোকারে দেখা।

প্যারীদা ওষুধের কথা বলতে গেলেন পরমপূজ্যপাদ বড়দাকে। এসে জানালেন—বড়দা বললেন, দেওয়া যেতে পারে।

এই সময় ননীদা (চক্রবর্ত্তী) দুটি ভদ্রলোককে সাথে নিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন। বললেন—এঁরা বাইরের থেকে বেড়াতে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন কথা না বলে সম্মতিসূচকভাবে মাথা কাত করলেন। একটু দাঁড়িয়ে থেকে ননীদা ওঁদের নিয়ে নেমে গেলেন।

ঘন-ঘন কাশি ও গলা খাঁকারির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর আজকাল মুখে একরকম আমলকীর লজেন্স রাখছেন। তাতে কিছুটা উপশম হয়। এখন তার একটা মুখে ফেলে চাদরটি বুক পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে বালিশের উপর আধ-শোওয়া হলেন। ননীমা এসে সেই ঐশী-তনু ধীরে ধীরে ঝাঁকিয়ে দিতে লাগলেন। ......আজ রাতে লুচি-ভোগ হল।

৩রা মাঘ, ১৩৬৬, রবিবার (ইং ১৭। ১। ১৯৬০)

গত রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাল ঘুম হয় নি। মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙ্গে গেছে। সকালে উঠে তিনি দুর্ব্বল বোধ করছেন। প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে জল-টল খেয়ে তামাক খেলেন একবার। তারপর বেলা সাড়ে আটটায় শুয়ে পড়লেন। ঘুম আসছে। সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত খুব শান্তভাবে ঘুমালেন। ঘুম থেকে ওঠার পর প্যারীদা (নন্দী) শ্রীশ্রীঠাকুরের টেম্পারেচার নিলেন—৯৬.২। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে পায়খানায় গেলেন।

আজ সকালে আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ। মাঝে মাঝে রোদ বেরোচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। শীতও আছে।

পায়খানা থেকে আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর থেকে থেকে গলা টানছেন। মনে হচ্ছে, গলায় বুঝি কাশি আটকে আছে। কাশিটা যেন উঠে-উঠেও উঠছে না। কিছুক্ষণ এইরকম চলার পর প্রভু প্যারীদাকে ডেকে বললেন—এই শোন্। চই, পিপুল, পিপুলমূল আর শুঁঠ গুঁড়ো ক'রে খাবারের সাথে খেলে গলার এই অবস্থার উপকার হয়।

প্যারীদা—আজ্ঞে আমি দেখছি, ব্যবস্থা করছি।

আজ কাশির সাথে শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্দির ভাবও দেখা যাচ্ছে। বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন। একটু পরে তিনি বললেন—কাল বামনহাটি দিয়ে ওষুধ করিছিস্ তো। আর এক কাম কর্। বামনহাটি, পিপুল, বাসক, তুলসীর পাতা এগুলি সমানভাগে নিয়ে যদি ক্বাথ করে খাওয়া যায়, তাতে সর্দির প্রথম অবস্থায় খুব উপকার হয়। অবশ্য সর্দির সব অবস্থাতেই এটা ভাল, তবে প্রথম অবস্থায় দেওয়াই ভাল।

উপকরণ জোগাড় ক'রে প্যারীদা ওষুধ প্রস্তুতের কাজে গেলেন।

দ্বিপ্রহরে নবনির্ম্মিত ওষুধটি দেবার পরে বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অনেকটা ভাল। সকালের মেঘটা কেটে গেছে। কিন্তু জোর বাতাস চলেছে পূর্ব্বদিক থেকে। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে উত্তরাস্য হয়ে উপবিষ্ট। ঘরের পূবদিকটা বন্ধ রেখে শুধু উত্তর ও দক্ষিণের দিকের পরদা খুলে রাখা আছে।

আজ সান্ধ্য প্রণাম হল ৫-৪৩ মিনিটে। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের টেম্পারেচার দেখা হল—৯৭.৮। মায়া-মাসীমার টেম্পারেচারও দেখতে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর। দেখা হল ৯৮.৪।

সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া বললেন—

সুন্দর যা'র চলন-বলন
নিষ্ঠানিপুণ যুক্তি-জ্ঞান,
মিষ্টিমধুর বোধ-ব্যবহার—
সৌন্দর্য্যেরই এইতো দান।

ছড়াটি শেষ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—আজ দুপুরে স্বপন দেখছিলাম, আমি যেন মুসলমান। মুসলমান-পাড়ার মধ্য দিয়ে আসছি। চারদিকে মেলা মুসলমান। ঘরের মধ্যে মেয়েলোক আছে। আমি তা' জানি নে। জিজ্ঞাসা করছি, আশ্রমে কোন্ পথে যাব মা! তা'রা ক'ল, অমনি দিয়ে যাও বাবা, অমনি দিয়ে যাও। তারপর ক'চ্ছে, এই ছাওয়াল কথা কয় এমন সুন্দর! আমরা তো জার-জার হয়ে গেছি। আমাদের ছোঁয়াচে আরো কত লোক এমন জার-জার হয়ে গেছে। স্বপনটা যখন দেখছি তখন যেন শীতকাল। চাদরটা আমার মাথায় এমনি ক'রে জড়ানো (কানের দুপাশে ঢেকে মাথায় চাদর জড়িয়ে দেখালেন)। ওই কথা ভাবতে ভাবতে এই ছড়াটা মনে আস্ল।

কিছু পরে প্যারীদা আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের টেম্পারেচার দেখলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কত?

প্যারীদা—এখন তো ৯৭-এরও একটু কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে তো আজ ভালই। কাল এ সময় কত ছিল?

বিশুদা—৯৮.৪।

কিছুদিন আগে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে পূজার আঙ্গিক, বীজমন্ত্র ইত্যাদির মরকোচগুলি উদ্‌ঘাটন ক'রে যুক্তিসহযোগে প্রবন্ধ-আকারে লিখতে আদেশ করেছিলেন। ঐ কাজ আরম্ভ করার পরে অনেক প্রশ্ন এসে দেখা দিচ্ছে। এখন তাঁর শরীর ভাল দেখে ঐ প্রসঙ্গে কিছু কথা সুরু করলাম।

দেবী—প্রতিমাপূজায় দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার সময় আমরা যং রং লং বং শং সং প্রভৃতি বীজমন্ত্র উচ্চারণ করি, আবার করন্যাসের সময় আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং

নমঃ বলে বুড়ো আঙ্গুল টিপে ধরি। এখন এই যং বং আং ইত্যাদি শব্দগুলি উচ্চারণের সার্থকতা বুঝতে পারি নে। কোন দেবতার ধ্যান মানে আপনি যেমন বলে দিয়েছেন, সেই দেবতার গুণমহিমা-চিন্তন। সেটা বোঝা যায়। কিন্তু ঐ শব্দগুলি কেন বলা হয়, ধরতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওগুলোও শব্দব্রহ্ম। ওগুলোরও মানে আছে, আমার মনে হয়। খুঁজে দেখলে হয় শব্দকল্পদ্রুমে। পণ্ডিত, দ্যাখ্ তো দেখি।

পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য) শব্দকল্পদ্রুম নামক সংস্কৃত অভিধান এনে, দেখে বললেন—'বীজ' কথাটা যেখানে আছে সেখানে রং লং হ্রীং ইত্যাদি বহু বীজমন্ত্রের উল্লেখ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ধর হ্রীং। হ্রী মানে লজ্জা। কথায় বলে, লজ্জা নারীর ভূষণ। সেইজন্য মেয়েলোকদের, মানে সরস্বতী, দুর্গা, ভদ্রকালী এইসব স্ত্রীদেবতার বীজমন্ত্র হ্রীং।

দেবী—আবার লক্ষ্মীর বীজমন্ত্র শ্রীং।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ঠিকই আছে। শ্রী মানে ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সৌন্দর্য্য। লক্ষ্মী তো শ্রী-এর অধিষ্ঠাত্রী।

দেবী—অর্থ ঠিকমত বুঝি না বলে এগুলি করতে ইচ্ছা করে না। এর উপর কোন বিশ্বাসও আসে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি জানি নে ব'লে ওর কোন মানে নেই তা' বলা যায় না। আর, অবিশ্বাস আসবে কি পাগল! (হেসে উঠে ব'সে বলতে লাগলেন) ঐ যে কী আছে—'আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী'। তাই, আবৃত্তি ক'রে যাওয়া ভাল। সাথে-সাথে ঐ শব্দগুলোর মানে খুঁজে দেখা লাগে। আমার ছোটবেলায়, তখন আমি কাজলের চাইতেও ছোট, শুনেছিলাম, ক্রোং ব'লে ডাক দিলে ব্যাঙ্ আসে। তা' ঐ পদ্মার পাড়ে বসে ক্রোং ক্রোং করতাম। কতদিন করেছি, কিছুই হয় নি। পা'ল (পালি বা পঙ্‌ক্তি) মত পড়ত না বোধ হয়। তারপর একদিন পা'ল মত প'ড়ে গেল। তখন রাশি রাশি ব্যাঙ্ আসতে লাগল চারপাশ দিয়ে।

দেবী—আপনার ওরকম করা দেখে লোকে কিছু বলত না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘাটের থেকে একটু ফাঁকে যেয়ে বসতাম। এখানে যেমন ঘাট, আর ঐ হরিনন্দনের চৌকি যেখানে অতটা দূরে যেয়ে বসতাম।

দেবী—কোন্ সময়ে এটা করতেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চান করতে যেয়ে ঐরকম করতাম। এতে সময় লাগত। দেরী ক'রে বাড়ী ফেরার জন্য কতদিন মারও খেতাম। তখন তো আর অত শত বুঝতাম না।

তা' সেই ব্যাপার থেকে এখন যদি আমি কই, ব্যাঙের বীজমন্ত্র ক্রোং, তাহলে কি দোষ হবে?

দেবী—হ্যাঁ, ব্যাঙের ডাক অনেকটা ক্রোং-ধ্বনির মত।

এই পর্য্যন্ত কথা হতেই শ্রীশ্রীঠাকুর কেমন এক আত্মস্থ ভাবে মগ্ন হয়ে পড়লেন। বহুদিন আগেকার এক সুখস্মৃতি রোমন্থন ক'রে কাটা-কাটা কথায় বলতে লাগলেন—আর একদিন। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। কোন্ একটা স্টেশনের কাছে। পেছন দিকে, একখানা ঘরের মধ্যে। আমি, মা আর মহারাজ, খুকীও বোধহয় ছিল। আরো কে কে। একটা রাত কাটিয়েছিলাম। ব্যাঙ্ ডাকছিল পাশে। সে সুখের কথা আর ভুলতে পারি নে।

দেবী—কোন্ স্টেশন মনে পড়ে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাঃ।

তারপর আবার পূর্ব্ব প্রসঙ্গের উল্লেখ ক'রে বললেন—তাহলে দেখ একটু আলো তো পেলে। এইভাবে ধ'রে ধ'রে এগোনো লাগে।

দেবী—কোন্ পথ দিয়ে এগোলে তাড়তাড়ি ধরতে পারব তা' যদি একটু ব'লে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে এক ভদ্রলোকের লেখা, বইখানা বোধ হয় বিশ্বকোষ। কার যেন লেখা। কেষ্টদার কাছে আছে বোধ হয়।

বলে পণ্ডিতদার (ভট্টাচার্য্য) দিকে তাকালেন। পণ্ডিতদা দৌড়ে যেয়ে জেনে এসে বললেন—লেখকের নাম নগেন্দ্রনাথ বসু। বইখানা সম্পূর্ণ বের হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ বইতে অনেকটা থাকতে পারে। আরো দেখা লাগে। ওসব বীজমন্ত্রের কোনটাকেই বাদ দেওয়া ভাল না। আমার মনে হয় ওর মানে আছে।

৪ঠা মাঘ, ১৩৬৬, সোমবার (ইং ১৮।১।১৯৬০)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে সমাসীন। সুধীর চৌধুরীদা একটি ভাইকে নিয়ে এসে বললেন—ডাক্তার ওর টি-বি সন্দেহ করেছিল। এখন আর কোন অসুবিধা নেই। ও এখন কাজ করবে কিনা জানতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করতে পারে, খুব slowly (আস্তে আস্তে)। ভার উঠানোর কাজ-টাজ যেন না করে। (ভাইটিকে) আর, যেখানকার-সেখানকার জল খাস্ নে, যার-তার বাড়ীতে খাস্ নে।

একটু পরে বলছেন—কী যেন আছে, জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) সমগ্র মন্ত্রটি আবৃত্তি ক'রে বললেন—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্ম্মদা-সিন্ধু-কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।

অনিলদা (গাঙ্গুলী)—এটা হল জলশুদ্ধিমন্ত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'সন্নিধিং কুরু' মানে?

আমি বললাম—এখানে সন্নিহিত হও।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, এই নদীগুলিকে বাঁচাও।

আমি—এ মন্ত্রটার মানে কি তাই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তাই মনে হয়। এই সাতটা নদীকে ঠিক রেখে বাঁচায়ে রাখলে সারা ভারতবর্ষের climate (জলবায়ু) ঠিক থাকবে। কিন্তু সরস্বতী তো এখন বোধ হয় মরেই গেছে।

প্রিয়নাথদা (সরকার) এসে দাঁড়ালেন। এক হাতে কয়েকটা কলা। আর এক হাতে একটা ছোট ঝুড়িতে কিছু কমলালেবু। কলাগুলি দেখিয়ে প্রিয়নাথদা বললেন—এই যে বীচে কলা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বীচে কলা যেন কা'র জন্য কইছিলাম।

অনিলদা—রমণের মার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেও, বীচে কলা রমণের মাকে দেও।

একটু দূরে রমণের মা শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে পরম ভক্তবৎ উপবিষ্টা। প্রিয়নাথদা এগিয়ে গিয়ে রমণের মার হাতে কলাগুলি দিলেন। তারপর কমলাগুলি ভোগের ঘরে দিতে গেলেন।

পাঁচটা বেজে গেছে। একটু পরেই সান্ধ্য প্রণাম হবে। ভক্তবৃন্দ অনেকে এসে বসেছেন। কথাপ্রসঙ্গে শরৎদা (হালদার) বললেন—আপনার বাণীগুলি যখন নিজে পড়ি তখন বুঝি। কিন্তু কেউ যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে আসে তখন আর বুঝতে চাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐগুলি যদি work out (কাজে) করেন তাহলে সব হয়।

শরৎদা—বাণীর নির্দ্দেশমত না চ'লে যখন বিপদে পড়ি তখন কই, ভাগ্যে ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুর্ভাগ্যের antedote (প্রতিষেধক) আছে, তা' তো আমরা নিই না। আবার সৌভাগ্যের পথও কেউ চাই না। আমাদের যদি কতকগুলি tornado worker (ঝড়ের বেগে কাজ করতে পারে এমন কর্ম্মী) থাকত, তারা যদি এগুলি বুঝত আর হাতেকলমে করত, তাহলে ঐরকম পঁচিশ জন worker (কর্ম্মী) পাঁচশ জন সৃষ্টি করে ফেলতে পারত। কিন্তু ওরকম worker (কর্ম্মী) জোগাড়ের চেষ্টা

আর আমরা করলাম না। আমাদের sufferings (দুঃখকষ্ট) যেন আমরা উঠিয়ে দিতে চাই না। ঐ যে কী একটা মটো আছে, Example is better than precept (উপদেশদানের চাইতে উদাহরণ হওয়া ভাল), কথাটা ঠিক। নিজে কয় কিন্তু করে না, সেইজন্য তার কথা কেউ ধরে না। দেখবেন, জগতের prophet-রা (প্রেরিত পুরুষরা) সবাই একই কথা বলেন। তাঁদের কথা ও কাজের সাথে যাদের মিল নেই, যারা otherwise (অন্যরকম) করে, তারা false prophets (ছদ্ম প্রেরিত)।

তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গে বললেন—ঐ যে একখানা বই বের হয়েছে, The Gita and The Quran, বইখানা ওকে অর্ডার দিতে বলেছি। অর্ডার দিছিস্?

বললাম—আজ দিতে পারি নি। কাল দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন। ইতিমধ্যে সন্ধ্যাপ্রদীপ আনা হয়েছে। সবাই ভক্তিভরে যুক্তকরে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হাত জোড় ক'রে বসতেই সবাই আভূমি প্রণাম করলেন।

প্রণামের পর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক সেবন করলেন। তারপর ডাঃ বনবিহারীদা (ঘোষ) পুরুষ সন্তান জন্মাবার কতরকম বৈজ্ঞানিক কারণ আছে সেই সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করলেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—জীন-থিওরি বেরোবার আগে জানা ছিল, অ্যালকালির ভাগ বেশী থাকলে ছেলে এবং অ্যাসিড্ বেশী থাকলে মেয়ে হয়।

তারপর মৎস্যগন্ধার জন্মবৃত্তান্ত, গান্ধারীর শত পুত্রের জন্মকাহিনী, ইত্যাদি উল্লেখ ক'রে বনবিহারীদা বললেন—এই অসম্ভব ঘটনাগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য্য কী! এগুলি scientifically (বিজ্ঞানসম্মতভাবে) প্রমাণিত না হলে সমগ্র মহাভারতটাই myth (কাল্পনিক রূপকথা) হয়ে যাবে।

অনেক কথা শোনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—এগুলি যদি ঠিক ব'লে স্বীকার ক'রে নাও তাহলে তা' support (সমর্থন) করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। আর, যদি অস্বীকার কর তাহলে কোন পরিশ্রম নেই। আর ওগুলি sperm ও ova-র combination (শুক্র ও ডিম্বকোষের মিলন) ছাড়া হয়েছে, একথা যদি কও তাহলে আর এগোনো যায় না।

বনবিহারীদা—দ্রোণাচার্য্য যে কলসীর মধ্যে জন্মালেন, সেটাই বা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো tube-baby (নলজাতক)-এর উদাহরণ।

জ্ঞানদা (গোস্বামী)—It is a very bad process (এটা খুব খারাপ পদ্ধতি)। ওরকম কি আর্য্যরা করতেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না করলে ওরকম হ'ল কি ক'রে?

এরপর গান্ধারীর কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গান্ধারী ছিল গান্ধারদেশের মেয়ে। গান্ধারদেশ জয় করে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর বাপ, ভাই, আরো ঢের আত্মীয়স্বজনকে বড় নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। কেবল একটা ঐ শকুনিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আর, গান্ধারীকে জোর ক'রে এনে বিয়ে করেছিল। সেইজন্য বিয়েতে ব্যত্যয় ছিলই। তার প্রমাণ গান্ধারীর ছেলেগুলো। ওদের সবগুলোই মদগর্ব্বী, ঈর্ষ্যা নিয়ে থাকত। আর, শকুনি সব সময় প্রতিশোধ গ্রহণের তালে ঘুরত। ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্বনাশ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

বনবিহারীদা—কিন্তু গান্ধারী তো খুব পতিপরায়ণা ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' থাকতে পারে। কিন্তু ব্যত্যয়ী বলে যে ব্যথা থাকবে না তা' না। তার প্রমাণ গান্ধারীর অনেক কথাতেও আছে। যেমন, দুর্য্যোধন যখন প্রণাম করতে আসল, গান্ধারী বলল, 'যথা ধর্ম্ম তথা জয়'। কিছুতেই বলল না, 'তোমার জয় হোক'। ঐরকম কথা আরো আছে। আবার পাণ্ডু সম্বন্ধে শোনা যায়, তার নাকি থাইসিস্ হয়েছিল। তার সন্তানগুলি সব ধর্ম্ম, ইন্দ্র, পবন এই সব দেবতাদের সন্তান। ব্যাপার তা' না। ব্যাপার হ'ল, সন্তান-গ্রহণের সময় কুন্তী পাণ্ডুর উপরে সেই সেই দেবতার ভাব আরোপ করেছিল। সেই সব ভাববৃত্তিরই প্রসব ঐ পাণ্ডবরা। আসলে সব পাণ্ডুরই সন্তান। আজও আমাদের দেশে মেয়েরা ঋতুস্নান করে উঠে স্বামীর মুখদর্শন করে। আর স্বামী কাছে না থাকলে সূর্য্যমুখ দর্শন করবে, অথবা বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতার সম্বন্ধে আলোচনা করবে। কুন্তীও তাই করেছিল, তাই, যখন যে-দেবতার গুণাবলীতে আবিষ্ট থেকে সে সন্তান গ্রহণ করেছিল, সেই সন্তান সেই দেবতার বলে কথিত আছে। এই custom-টা (প্রথাটা) যে শুধু এখনকার তাই নয়, এটা পাণ্ডুদের আমলেও ছিল।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—আবার সীতার ব্যাপারটাও বোঝা মুশকিল হয়। তিনি সারা জীবনে কারো কথা শোনেন নি। বনে যেতে বারণ করা হল, জোর ক'রে গেলেন। স্বর্ণমৃগ দেখে সেটা পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন—'ওটা আমাকে ধ'রে দাও'। তারপর লক্ষ্মণ গণ্ডী দিয়ে বললেন, 'এর বাইরে যেও না'। সে কথা না-শুনে সীতা ঐ গণ্ডীর বাইরেও গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলেও তিনি পতিপ্রাণা ছিলেন।

তারপর কথার মোড় ঘুরিয়ে বললেন—রামায়ণ মানে রামের জীবনগতি। ওর উপর দাঁড়িয়েই মানুষ অনেক কিছু ধরছে। এই যে রাশিয়া রামায়ণ, মহাভারত translation (অনুবাদ) করছে। তার মানে, ওর থেকে মাল বের করবে—কী ক'রে কিভাবে কী হয়েছে! এই যেমন আছে, চন্দ্রলোক থেকে নারদ নেমে এলেন, বৃহস্পতি থেকে অমুক নেমে এলেন। এসবের তাৎপর্য্যও ওরা ঐসব literature (সাহিত্য)

থেকে অনেক বের ক'রে ফেলেছে। তবে রাশিয়া করলেও আমি বুঝি ওসব German scientist-দের (জার্মান বৈজ্ঞানিকদের) কর্ম্ম। যুদ্ধের সময় রাশিয়া তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মেরে ফেলে নি, কাজে লাগিয়েছে। এই যে ভি-২ বা অ্যাটম বোম্ সবই তো হিটলারের ওখানকার। একটা কাগজে এসব কথা বেরিয়েছিল। পাবনায় আমি সেটা রাখতে বলেছিলাম। তা' কেউ আর রাখে নি।

শৈলেনদা—এসব রেকর্ড না রাখা দুর্ভাগ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুর্ভাগ্য যখন গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে তখন upkeeping attitude (ভাল থাকার ঝোঁক) থাকে না, আর energetic volition-ও (উদ্যমী ইচ্ছাশক্তিও) কমে যায়।

শৈলেনদা—কিরকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর তুমি একখানা কাগজ পেলে। তাতে যা' লেখা আছে, ঠিকমত বুঝতে পারছ না, বোঝার আগেই ফেলে দিলে। বললে, 'কী হবে ও দিয়ে'। অথচ ওর মধ্যে হয়তো তোমার জীবন-বৃদ্ধির কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য ছিল। সেটা জানতেও পারলে না, কাজেও লাগাতে পারলে না। আবার, যখন যে-কাজ করা দরকার তা' ঠিকমত করলে না। তাতেও অনেক সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। আমরা যদি কিছু নাও করতাম, শুধু গোপাল (মুখোপাধ্যায়) যে-কাজ আরম্ভ করেছিল সেটা যদি চালাতাম, তার experiment (পরীক্ষা), তার record (বিবরণী) যদি রাখতাম, conversation-গুলি (কথোপকথনগুলি) যদি ঠিকমত রাখা হত, তাহলে আজ বলা যেত, এসব প্রথম বের করেছে India (ভারতবর্ষ), Bengal (বঙ্গদেশ)। তখন ডাইরী রাখতে বলতাম, কত কী বলতাম। কেষ্টদা-সুশীলদাকেও খুব বলেছি। আর, যেটুকু যা' ছিল তাও তো এখানে আসতে যেয়ে কোথায় কী হয়ে গেল। কেষ্টদা ওরা মিলে একটা প্যাম্পপ্লেট্ বের করেছিল। তাতে ছিল মৃতকে কেমন ক'রে বাঁচানো যায়, এ্যাটমের কথা, আরো কত কী। সেটাও আর এখন পাওয়া যায় না। কেষ্টদার সাথে কেরল (বৈজ্ঞানিক) সাহেবের খুব বন্ধুত্ব ছিল। চিঠি লেখালেখি করত। এখানে তার আসার কথাও হয়েছিল। এর মধ্যে গোপাল মারা গেল। কেষ্টদা আর সাহস করল না। অত বড় লোক আসবে, আমাদের সব এই অবস্থায় দেখবে।

শৈলেনদা—আলোচনা প্রসঙ্গেও তো আপনি নিজে লিখিয়ে বের ক'রে নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ প্রফুল্ল লিখে-টিখে রাখত, তাই হচ্ছে। এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়ার আকারে বললেন—

ভাগ্য যাদের হীন—
ক্ষিপ্রকর্ম্মা নয়কো তারা
সংরক্ষণায় দীন।

৫ই মাঘ, ১৩৬৬, মঙ্গলবার (ইং ১৯। ১। ১৯৬০)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর ভাল বোধ করছেন না। রাতে খড়ের ঘরেই ছিলেন। বেলা উঠলে খড়ের ঘরের পূবের বারান্দায় বেশ রোদ ভ'রে গেল। ঐখানে বারান্দার মেঝেতেই বিছানা করা হ'ল। প্রভু এসে রোদে বসলেন। একটু পরে হরিপদদা (দাস) এসে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর বড় মেয়ের নাম কী হবে? শ্রীশ্রীঠাকুর একটু চিন্তা ক'রে বলে দিলেন—সৌর্য্যরাণী।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ শয্যায় শুয়ে পড়লেন। ঘরের চালের সঙ্গে একটি পরদা এমনভাবে লম্বা ক'রে টানিয়ে দেওয়া হল যাতে তাঁর শ্রীমুখমণ্ডলে রোদ না লাগে। ওখানেই আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমালেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটু টেম্পারেচার হয়েছে ৯৮-এর কাছে। ডাঃ সূর্য্যদাকে (বসু) ডেকে দয়াল ঠাকুর বললেন—দুর্ব্বল লাগে। আজ টের পেলাম হার্ট্-এরও দুর্ব্বলতা। মনে হল, হার্ট্-এর throbbing (ধড়ফড়ানি) আমি feel (অনুভব) করতে পারছি।

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ফাল্গুন মাসেও কি শীত থাকে?

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)—রাতের দিকে একটু ঠাণ্ডা ভাব থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শীতকাল পাড়ি দেওয়াই কঠিন।

বিশুদা—কঠিন তো দু'মাস আগেও বলতেন, এখন তো পাড়ি দেওয়া হয়েই গেল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিতে আরম্ভ করলেন—

আহাম্মক তবে কে?
নিজ ঐশ্বর্য্যে অজান যে-জন
পরপ্রত্যাশী যে।
কর্ম্মী কা'কে কয়?
কর্ম্মতপা হয়ে যে-জন
ত্বরিত নিষ্পাদয়।

এইভাবে পর পর একটানা ১৪টি ছড়া বলে থামলেন প্রভু। তারপর বললেন—এই যে এতগুলি ছড়া বললাম, এক একটা ক'রে মানুষ মনে পড়ছে, আর তার কথা লিখে দিচ্ছি। কবির ছড়ার মত না। কবির মত ক'রে মেলাতে গেলে আর মিলবি নানে। (ক্ষণেক পরে) এতগুলি ছড়া বলার পর এখন বুকের মধ্যে কেমন করছে। আগে ইংরাজী যখন বলেছি তখন এমনটা বোধ হয়নি।

ঘরে লোক বিশেষ নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ। এই শান্ত পরিবেশে, হিমের রাতে, একটু বিরতি নিয়ে, ভাবাবিষ্ট অবস্থায় আবার ছড়া বলে চললেন দয়াল ঠাকুর—

সুন্দর তবে কী?
দেখলে আদর উথলে ওঠে
শুভতে হয় স্থিতি।
ঋত্বিক্ বলে তাকে—
জীবন-ঋতুর মাধ্যমে যে
লোককে চালায় তুকে।

রাত সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত এভাবে একটানা ছড়া বলে যাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বুকের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করছেন। ডাঃ প্যারীদাকে (নন্দী) ডেকে বুক পরীক্ষা করতে বললেন। প্যারীদা তাঁর হার্ট্-বীট্, পাল্স্ ও প্রেসার পরীক্ষা করে বললেন—সবটাই একটু একটু বেড়েছে।

এরপর রাতের ভোগের আয়োজন হতে থাকল। সবাই প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন।

৬ই মাঘ, ১৩৬৬, বুধবার (ইং ২০। ১। ১৯৬০)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভাল। সারাদিনই মাঝে মাঝে ছড়া দিচ্ছেন। বিকালে শরৎদা (হালদার), জ্ঞানদা (গোস্বামী) প্রমুখ আসতেই ছড়াগুলি শোনাতে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর। শোনানো হল।

এর পরে শরৎদা জানতে চাইলেন একটা আত্মা কিভাবে বীজের ভিতর দিয়ে অনুপ্রবেশ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মা মানে আমার motive power (চালক শক্তি)। সেটা seed-এর (বীজের) মধ্য দিয়ে impregnated (অনুপ্রবিষ্ট) হয়, ova-র (ডিম্বকোষের) মধ্যে যেয়ে তাকে fertilise (উর্ব্বর) করে। এ কিন্তু বাইরের থেকে একটা আসে তা' না। আপনার রকমের মত হয়েই সেটা ঢোকে। আবার, প্রত্যেকটা grain-এরই (দানারই) latitude (বিস্তার) আছে। তা' আছে বলেই প্রত্যেকটা grain-এর (দানার) মধ্যেই acquisition (অর্জ্জন) করার ক্ষমতাও আছে। সেইজন্য আপনার ছেলের মধ্যে আপনার যে গুণ তা' তো আছেই, তা' ছাড়া আরো বহুরকম গুণের বিকাশ দেখা যায়। ঐ যে কথা আছে, 'পুত্রাৎ পিণ্ডপ্রয়োজনম্'। পিণ্ড মানে ঐ দেহ। দেহকে আশ্রয় ক'রেই গুণগুলি বিস্তার লাভ করে।

প্রফুল্লদা (দাস)—কোন বিগত মানুষ কি তার বংশের মধ্যেই আবার ফিরে আসে? সেটা কি সব সময় সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Affinity (সদৃশতা) সেখানে বেশী থাকে তো!

তারপর এক ঢোক জল খেয়ে সূর্য্যদার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার কেবল জলপিপাসা লাগছে। মুখেও অরুচি আছে। আজ বেশী খাইও নি।

নিখিলদার (ঘোষ) বাবার হার্ট-এর trouble (কষ্ট) খুব বেড়েছে। নিখিলদা সেকথা এসে জানালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সূর্য্যদাকে বললেন নিখিলদার বাবাকে ভালভাবে দেখে আসার জন্য, আর নিখিলদাকেও ওষুধ নিয়ে যেতে বললেন।

এক পাশে বসে জ্ঞানদা গীতার পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছেন। মনে হয় কিছু খুঁজছেন। গীতার দিকে তাকিয়ে দয়াল ঠাকুর বললেন—ওরকম একখানা genuine practical philosophy (নির্ভেজাল বাস্তব দর্শন) আর নেই।

তারপর ছড়া দিলেন—

ব্রহ্মচারী কে?
বাঁচাবাড়ার কৃতিচর্য্যায়
বিজ্ঞ যোগ্য যে।

ঐ প্রসঙ্গে বললেন—কাজটা ধরা এবং finish (শেষ) করার মধ্যে যেটুকু সময় লাগে তাই দিয়ে হয় তোমার যোগ্যতার বিচার। আবার, সেটা মেশিনে হলে হবে না। তুমি নিজে হাতেকলমে কতখানি পার, তার উপর দাঁড়িয়েই বিচারটা হবে।

কথার ফাঁকে ফাঁকে ছড়া দিয়ে চলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। একবার বললেন—

আশ্রম কা'রে কয়?
হাতে-কলমে কাজ ক'রে যেথা
বিজ্ঞতা লভয়।

ছড়াটি শোনার পরে চুনীদা (রায়চৌধুরী) বললেন—হাতে-কলমে কাজ শিখে যেখানে বিজ্ঞ হয় তাই যদি আশ্রম হয় তাহলে ফ্যাক্টরিগুলোকেও তো আশ্রম বলতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কি এর থেকে বাদ যায়? একজন ফায়ারম্যান আস্তে আস্তে বিজ্ঞ হতে হতে দেখা গেছে হয়তো সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে গেছে। টাটা ফ্যাক্টরিকেও যদি আশ্রম বল, দোষ কী?

এই বলে আবার ছড়া দিতে থাকলেন—

গৃহস্থ বলি তা'রে—
গৃহে থেকেও বিহিত চর্য্যায়
লোককে বিজ্ঞ করে।

মুক্তি এলো সেই—
মনের গ্রন্থি ভেঙ্গেচুরে
ইষ্টনিষ্ঠ যেই।

এইভাবে ছড়া দেওয়া চলেছে অনর্গল। ফাঁকে ফাঁকে চলছে তদ্‌বিষয়ক আলোচনা। তিন লাইনের এক একটি ছড়া—সৌন্দর্য্যসুষমায় মণ্ডিত, ভাবে ভাষায় অনন্য। কত কঠিন তত্ত্ব কত সহজ রকমে একের পর এক নেমে আসছে। প্রতিটি ছড়াই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসঘন আনন্দময় উদ্বেলনায় চিন্তারাজ্যের নূতন নূতন দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিচ্ছে। জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তি-জগতের সমস্ত মণিমাণিক্য আজ দু'হাতে উজাড় ক'রে দিতে বিশ্বপিতা যেন তৎপর হয়ে উঠেছেন। —ভোগের সময় পর্য্যন্ত এইরকম চলল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে বাথরুমে গেলেন।

৮ই মাঘ, ১৩৬৬, শুক্রবার (ইং ২২। ১। ১৯৬০)

আজও কিছু ছড়া বলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কাল থেকেই শরীর খারাপ বোধ করছেন। আজ বিকালে তাঁর চোখ দুটি বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মুখে অস্ফুট কাতরানি। কথা কমই বলছেন। ডাক্তারগণ সবাই নিকটেই আছেন। আর আছেন পূজ্যপাদ বড়দা, পণ্ডিত মশাই ও শ্রীশদা (রায়চৌধুরী)।

শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিত মশাইকে জিজ্ঞাসা করলেন—খারাপ ষাঁড় দিয়ে পাল দেওয়ালে কি বাচ্চা খারাপ হয়ে যায়?

পণ্ডিতমশাই—হ্যাঁ তা' হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(শ্রীশদাকে) ওসবের বই-টই আপনার কাছে নাই?

শ্রীশদা—পাবনায় ছিল, এখানে আর নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছাগলের বেলাতেও কিন্তু ঐ নিয়ম।

পণ্ডিতমশাই—ষাঁড়টার কুল দেখতে হয়, আবার স্বাস্থ্যটাও দেখা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কুল থাকলেই স্বাস্থ্য থাকে। (হেসে বলছেন) যেখানেই যাও, ঐ এক তরী করে পারাপার।

আজ কয়েকদিন যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুর স্নান করছেন না। শরীর বেশ দুর্ব্বল। গলায় কাশির ভাব। বার বার গলা টানছেন। নিজের দৈহিক অবস্থার কথা উল্লেখ ক'রে বললেন পরম দয়াল—খেতেও ইচ্ছা করে না বেশী। ডাল খাই। টক ভাল লাগে। ভাজা ভাল লাগে। ভাজা ভাল লাগা বোধ হয় লিভারের জন্য।

সূর্য্যদা—না, তা' না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে চেঁচাতাম, গান গাইতাম। এখন আর পারি না, ইচ্ছাও করে না।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর পান চাইলেন। পান এনে হাতে দিতে মুখে ফেলে দিলেন। আজকাল কাশির জন্য তাঁর পানের মধ্যে যষ্টিমধু দিয়ে সাজা হয়। তা ছাড়া মাঝে মাঝে যষ্টিমধু দিয়ে তৈরি একরকম লজেন্সও মুখে রাখেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তার ফলে কাশির কিছুটা উপশম হয়।

৯ই মাঘ, ১৩৬৬, শনিবার (ইং ২৩। ১। ১৯৬০)

কাল বিকাল থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অসুস্থ। ঠাণ্ডা লেগে গেছে। আজ সকালে বেশ শীতল হাওয়া চলছে। একখানা পাতলা রেজাই গায়ে দিয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় আছেন পরম দয়াল। গত রাতে তাঁর ঘুমও ভাল হয়নি।

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে বসতেই কালিষষ্ঠীমা এসে খবর দেন যে, তাঁর ছেলে আশু গতকাল সকালে ভাগলপুরে গেছে। কালই ফিরে আসার কথা, কিন্তু রাত দশটা পর্য্যন্ত আশুদার কোন খবর নেই। আবার শোনা গেছে যে, ভাগলপুরের পথেই একটা বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। সেই কারণে কালীষষ্ঠীমা খুবই চিন্তিত।

উপস্থিত যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই কালীষষ্ঠীমাকে অনুযোগ ক'রে বললেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অসুস্থ। এখনই সকালবেলায় ওরকম একটা দুশ্চিন্তার খবর তাঁকে না দিলেই কি হ'ত না?

মৃদু ভর্ৎসনা ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ সেবকদের বললেন—তা' ও করবে কী? ও মা তো! ব্যস্ত হ'য়ে এসে বলেছে।

তারপর তখনই ভাগলপুরে ফোন ক'রে সব খবর নিতে বললেন। সাথে সাথে বললেন—ভূপেশকেও (দত্ত) খবর দে। দরকার হ'লে যেন গাড়ী নিয়ে ঘটনাস্থলে যায়।

সব ব্যবস্থা ঠিকমত করা হ'তে থাকল। কালীষষ্ঠীমা আরো কিছুক্ষণ ব'সে থেকে উঠে চ'লে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর-মন কিছুই ভাল না। সকালের দিকে চুপচাপই রইলেন। বেলা এগারোটার পরে উঠে পায়খানায় গেলেন। তারপর স্নানাহার সম্পন্ন করলেন।

দুপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সুনিদ্রা হ'ল না। কিছুক্ষণ শয়ন ক'রে উঠে বসেছেন। বলছেন—ঘুম হ'ল না। মিনিট দশ-পনের যদি হ'য়ে থাকে।

বিকালের দিকেও বেশ জোর পশ্চিমা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। কলকাতা থেকে বিনোদ মণ্ডলদা এসেছেন। তিনি এখন এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। তাঁর সাথে কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—কাউকে কখনই bluff (ধাপ্পা) দিতে নেই। তুমি একজনকে বললে তার একটা কাজ করবে। কিন্তু করলে না। ঐ হ'ল bluff (ধাপ্পা) দেওয়া। তুমি যদি মানুষের সত্তাস্বার্থী হও, তাহলে তার জন্য কিছু না ক'রেও যদি শুধু মিষ্টি কথা ক'য়েই বিদায় দাও, তাহলেও সে খুশী হ'য়ে যাবে।

তারপর ছড়া দিলেন—

অলস যা'রা অবশ যা'রা
হোক্ না তাদের ভাঙা বুক,
ইষ্টনেশায় কৃতির রোলে
তোল্ তো উথলে তাদের সুখ।
নিজের নিয়েই বিবশ মনে
যা'রাই কেবল প'ড়ে থাকে,
পরিবেশের চর্য্যায় লাগা
ভরসা দিয়ে তাদের বুকে।

ছড়াগুলি হয়ে যাওয়ার পর বিনোদদা বললেন, ছড়া-টড়া শুনে ভাবি মানুষের জন্য করব। কিন্তু করার ক্ষেত্রে যেয়ে দেখি, আর পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ভাবটাকে উলটে নাও। মানুষ দেখ, তা'কে relief (সাহায্য) দাও। তার বিনিময়ে তার কাছ থেকে কিছু নিও না।

সামনে বসেছিলেন শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), তাঁকে দেখিয়ে দয়াল আবার বললেন—ঐ যে ওকে একজন হাজার টাকা দামের একটা সোনার ঘড়ি পরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ও কিছুতেই নিল না। বলল, ঘড়ি দিতে হয় এমনি একটা ঘড়ি দেন। Luxury-র (বিলাসিতার) জন্য অত দামী ঘড়ি আমি কিছুতে নিতে পারব না। নিলই না। ঐরকম principle (নীতি) ঠিক রেখে চলা লাগে। Principle (নীতি) হ'ল ধৃতি। ধৃতি ঠিক রেখে চলবে।

বিনোদদা—ভাবি যে করব, কিন্তু হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয় না মানে অভ্যেস তো নেই। সেইজন্য পিছলে যাও। তোমরা পণ্ডিত মানুষ, বোঝ-সোঝ। তেসরা চাষ যদি আগেই দাও তাহ'লে কি ফসল হয়?

তারপর আবার ছড়ায় বলতে থাকেন প্রভু—

আত্মগৌরব করিস্ নাকো
পরের গৌরব কর্ বেজায়,
ইষ্টানুগ পরচর্য্যা
থাকলে থাকে সব বজায়।

নিজের ধৃতি অটুট রেখে
পরধৃতির পূজায় থাক্,
ঐ চলনে ঠিকই জানিস
ভরবে রে তোর আপন ফাঁক।

ছড়াগুলি দেবার পর বিনোদদাকে দেখিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এগুলি ওর কথায় দিলাম।

ধীরে ধীরে দিনের আলো কমে আসে। সান্ধ্য প্রণামের সময় উপস্থিত। ভক্তবৃন্দ একে একে এসে সমবেত হ'চ্ছেন আশ্রম-প্রাঙ্গণে। কয়েকজন কাছে আসছিলেন। তাদের বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—কাছে আসিস্ নে। ঐ ফাঁকে থাক্। তারপর বললেন—আমার সর্দি আছে কিনা। তাই কই, প্রণাম বাইরের থেকে করা ভাল। Infection (ছোঁয়াচ) আমারও লাগতে পারে, তোরও লাগতে পারে।

পণ্ডিতমশাই (গিরিশচন্দ্র কাব্যতীর্থ) একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—কাল চান করব নাকি?

পণ্ডিত মশাই—কাল একাদশী, পরশু করা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা।

এই সময় পূজ্যপাদ বড়দা এসে আসন গ্রহণ করলেন। তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—গিরিশদা পরশুদিন চান করতে কয়। তারপর বলছেন—শরীর, মাথা, বুক কেমন-কেমন লাগে।

বড়দা—দুর্ব্বল হ'লে ওরকম লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটু emotional (ভাবাবেগপ্রবণ) হ'লেই বুকের মাঝে কেমন করে।

ইতিমধ্যে জনৈকা মা সান্ধ্য প্রণামের প্রদীপ থালায় ক'রে এনে দয়াল ঠাকুরের সম্মুখে রাখলেন। দয়াল তাঁর যুক্তকরদ্বয় প্রণামের ভঙ্গিমায় স্বীয় ললাটে স্থাপন করেছেন। পরমপূজ্যপাদ বড়দা-সহ ভক্তবৃন্দ সেই হৃদয়বিমোহন মূরতি অবলোকন করতে করতে বীরাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে আভূমি প্রণামে আনত হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ বিশেষ ভঙ্গিমায় অবস্থান করেন পনের থেকে কুড়ি মিনিট কাল পর্য্যন্ত। আজ মিনিট তিনেক অতিক্রান্ত হ'তেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাশি শুরু হল। প্রথমে অল্প-অল্প, তারপর জোর দমকে কাশি। কাশতে কাশতে তাঁর চোখমুখ লাল হ'য়ে উঠছে। একটু সামলাতে না-সামলাতেই আবার কাশির বেগ বেড়ে উঠছে। ভক্তদের মন উতলা হ'য়ে উঠছে প্রভুর কষ্ট দেখে। পূজ্যপাদ বড়দার দৃষ্টিও তাঁর পরমারাধ্য পিতৃদেবের পানে স্থিরনিবদ্ধ। কিছুই তো করার নেই। অতীব বিস্ময় এই যে, অত

কষ্ট এবং কাশির প্রাবল্য সত্ত্বেও শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর প্রণাম-ক্রিয়া থেকে এতটুকুও বিচ্যুত হচ্ছেন না। ললাটদেশে ন্যস্ত করদ্বয় কাশির দাপটে স'রে স'রে যাচ্ছে। আবার প্রভু তা' যথাস্থানে সন্নিবেশিত ক'রে নিচ্ছেন। নয়নযুগল তাঁর মুদ্রিত, ধ্যাননিবিষ্ট। এই অবস্থাতেই এত ধৈর্য্য। নির্দিষ্ট সময়সীমার লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে এত অবিচল গতি! এ নিষ্ঠা, এ অচ্যুতভাবের কি পরিমাপ করা যায়?

মিনিট দশেক পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কপাল থেকে হাত নামিয়ে নিলেন। চোখ মেলে চাইলেন। কাশি সমানে হ'য়ে চলেছে। তাড়াতাড়ি পিকদানি ধরা হ'ল। ডাক্তাররা কাছে এগিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পিকদানিতে থুতু ফেলে হাতমুখ ধুয়ে নাক ঝেড়ে একটু সুস্থ হয়ে বসলেন। তারপর একটু জল খেলেন।

কিছুক্ষণ পরে পূজ্যপাদ বড়দা বললেন—যে ক'দিন শরীর ভাল না হয়, সে ক'দিন প্রণাম বন্ধ থাকলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, দেখি, ঐ দূরের থেকে সকলে করিস্। আমি না পারলে তো করবই না।

সন্ধ্যার পরে ডাক্তাররা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীরের অবস্থা, কোন্ ওষুধ ঠিক কাজ করবে, ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন। ওঁদের কথা শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমরা ওষুধ দেবা system (শরীরের সংবিধান) দেখে। প্রয়োজন হ'লে দেবা, না হ'লে দেবা না। লাউ খাওয়া তো আমার পক্ষে ভাল। লাউতে প্রস্রাব করায়। আজ পায়খানায় যাওয়ার সময় এমন লাগছিল, মনে হচ্ছিল, কুঁথতে গেলে ম'রেই যাব। আর দেখ, (নিজের ডান হাতখানি দেখিয়ে) আমার এই হাতের অবশ ভাব সারল না। আগে অল্প ছিল। এখন একেবারে (কনুই পর্য্যন্ত দেখিয়ে) এই পর্য্যন্ত।

ননীদা (মণ্ডল)—শীতের জন্য নার্ভগুলি paralysed (অবশ) হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও হয়তো সেইজন্যেই হ'চ্ছে। কিন্তু অনেকদিন আগের থেকেই এটা বোধ করছি।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর একটা পান মুখে ফেলে তামাক খেলেন। কিছুক্ষণ পর চর্ব্বিত পান ফেলছেন পিকদানিতে। ফেলতে ফেলতে ব'লে উঠলেন—দাঁতের ফাঁকে বেধে গেছে রে।

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) তাড়াতাড়ি টর্চ ও দাঁত-খোঁটা নিয়ে এলেন। মুখ হাঁ করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তখন বিশুদা তাঁর মুখের মধ্যে টর্চের আলো ফেলে দাঁত খোঁটাটা দিয়ে সযত্নে দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা সুপারির কুচিটা বের ক'রে দিলেন। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ভালভাবে কুলকুচো ক'রে মুখ ধুয়ে গামছায় হাতমুখ মুছে বসলেন। বসার

পর অনেকগুলি ছড়া বললেন। রাত প্রায় নয়টা পর্য্যন্ত ছড়া দেওয়া চলল। এই সময় কালীষষ্ঠীমা এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কালীষষ্ঠীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর ছাওয়ালের খোঁজ পাইছিস?

কালীষষ্ঠীমার মন ভারাক্রান্ত। তাঁর মধ্যম পুত্র গতকাল সকালে ভাগলপুরে গেছেন। এখনও তার কোন খবর নেই। উত্তর দিলেন—ভূপেশ তো গেছে। আমি আর কী ক'ব। আপনি সব জানেন।

কালীষষ্ঠীমার ঐ ভাব দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বিষাদাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়লেন। দুঃখভরা কণ্ঠে বললেন—আমার সব যেন upset (উলটা-পালটা) হ'য়ে গেল। ওরা আজকাল আর আমার কথা শোনে না। পয়সা হ'য়ে আরো বেশী শোনে না। ছাওয়াল ছাড়লি কেন আজ ত্র্যহস্পর্শের দিন? হিন্দুর মেয়েছেলে। একটা দিন দেখা নেই কিছু না। আজ খিদে লাগিছিল খুব বিকাল থেকে। আর খাওয়া হয় কিনা কি জানি! সবই আমার কপাল!

ঘরের আবহাওয়াটা কেমন এক অজানা আতঙ্কে ভারী হ'য়ে এলো। কা'রো মুখে কোন কথা নেই। চুপচাপ সময় পার হ'য়ে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর কখনও একটু কাত হ'য়ে শুচ্ছেন, আবার উঠে বসছেন।

রাত প্রায় এগারোটার সময় আশুদাকে (রায়) সাথে নিয়ে এসে ভূপেশদা প্রণাম করলেন। সবার মুখে তখন হাসি। ভূপেশদা জানালেন, একটা বাস এ্যাকসিডেন্ট হ'য়েছিল। সেইজন্য রাস্তায় গাড়ী চলাচল বন্ধ ছিল ব'লে আশুদা আসতে পারে নি। আশুদার কোন ক্ষতি হয় নি।

সব শোনার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর হৃষ্টচিত্তে হাতমুখ ধুয়ে ভোগ গ্রহণ করতে বসলেন। সব আতঙ্কের নিরসন হওয়ায় উপস্থিত ভক্তগণও আনন্দিত মনে ঘরে ফিরলেন।

১০ই মাঘ, ১৩৬৬, রবিবার (ইং ২৪। ১। ১৯৬০)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরের মধ্যে আছেন। বেলা ৯-১৫ মিনিট। পূজ্যপাদ বড়দা কাছে উপবিষ্ট। কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) চোখে অসুখ হয়েছে। খুব যন্ত্রণা। এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে প্রণাম করলেন।

কেষ্টদার চোখের ঐ অবস্থা দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি কই, কলকাতায় যদি যাওয়া লাগে তো যান। যেয়ে চোখ দেখায়ে আসেন নীহার মুন্সীকে দিয়ে। এ চোখ জিনিস, এ তো ফাজলেমি না।

কেষ্টদা—এ তো ক'মে গেছে।

বড়দা—এ বেলা কমে, ও বেলা বাড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল দিন থাকলে যান।

কেষ্টদা—আজ ভাল দিন আছে। তাহলে যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন। কেষ্টদা প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন। আজ দুপুরে তিনি কলকাতায় রওনা হ'য়ে গেলেন মোটরযোগে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর আজও বিশেষ ভাল নেই।

১১ই মাঘ, ১৩৬৬, সোমবার (ইং ২৫। ১। ১৯৬০)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ করছেন। রোদ উঠতে খড়ের ঘরের পূবের বারান্দায় পাতা বিছানাতে এসে বসলেন।

বেলা সাড়ে আটটার পর আবার অস্বস্তি বোধ করছেন। বললেন—প্যারী কোথায়?

একজন তাড়াতাড়ি প্যারীদাকে ডাকতে গেল।

বিশুদা—প্রস্রাব করবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, কেমন লাগছে। পাল্স্ কত দেখাতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর অল্প অল্প কাতরাচ্ছেন। পণ্ডিত মশাই (গিরিশদা) এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে দয়াল প্রভু বললেন—গিরিশদা, আমার হাত দেখেন তো!

পণ্ডিতমশাই—আমি কি পারব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি পারতেন তো?

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)—জানা থাকলে নিশ্চয়ই পারবেন।

পণ্ডিতমশাই শ্রীশ্রীঠাকুরের হাত কিছুক্ষণ ধ'রে থেকে বললেন—বায়ু একটু চড়া মনে হয়। আর সব তো ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চান করব?

পণ্ডিতমশাই—আমি তো বুঝি করা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে আপনি তিত্তিরিকে ক'য়ে যান জল-টল ঠিক ক'রে রাখার জন্য।

পণ্ডিতমশাই—যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কইতে গেলেই হয়তো ফ্যাঁস করে উঠবে নে।

পণ্ডিতমশাই একটু হেসে চ'লে গেলেন। বেলা সাড়ে নয়টা। শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্বস্তির ভাব দেখে বিশুদা জিজ্ঞাসা করলেন—একটু শোবেন?

কাতর স্বরে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—শুয়েও স্বস্তি পাই নে, ব'সেও স্বস্তি পাই নে।

গতকাল চুনীদার (রায়চৌধুরী) ছেলে প'ড়ে যেয়ে ঠোঁট কেটে গেছে। ছেলেটির কথা উল্লেখ ক'রে দয়াল বললেন—চুনীর ছাওয়াল কেমন আছে খোঁজ নে।

এই সময় চুনীদা এসে বসলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ও কেমন আছে?

চুনীদা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠোঁটে দাগ থাকবি নানে তো?

চুনীদা—একটু থাকতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অমন সুন্দর মুখখানা। দাগ থাকলে কেমন হবে নে! একটা লোক রাখা লাগে ঐ সব ছাওয়াল-পাওয়াল দেখার জন্য। ডেকলাকে ক'ব?

চুনীদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ডেকলাল প্রণাম করতে এলে তাকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ডেকলা! একটু ভাল ছাওয়াল যদি না দাও তাহ'লে ঐ চুনীবাবুর ছাওয়ালদের যে সামাল দেওয়া যায় না। ভাল ছেলে, কথা শোনে এমনতর।

ডেকলাল—আচ্ছা, আমি দেখব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ, আজই দাও। আজ দ্বাদশী। ভাল দিন আছে। আজই দাও। মাইনে-টাইনে সব ঠিক ক'রে, বাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দিও।

ডেকলাল চ'লে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর চুনীদাকে নিম্নস্বরে বললেন—তুই ওর পাছে পাছে যা। ক'গে—আমি যেমন পারি সেইরকমভাবে ক'রে দিও।

চুনীদা উঠে গেলেন। এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরেজীতে একটি বাণী দিলেন। বাণীটি লেখা হ'য়ে যাওয়ার পর বলছেন—বুকের মধ্যে আবার খারাপ লাগে। পেটেও অস্বস্তি। কেমন যেন লাগে! দ্যাখ্ তো আমার হাত।

ডাঃ ননীদা (মণ্ডল) এগিয়ে এসে পাল্‌স্ দেখে বললেন—নব্বই-এর কাছাকাছি। সেইজন্য এরকম লাগছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চান করব তো?

ননীদা—হ্যাঁ, চান করেন।

তিত্তিরিদি সামনের উঠান দিয়ে একটা জলের বালতি নিয়ে যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সোহাগভরা কণ্ঠে বললেন—তিত্তিরি কাজ করে খুব।

পাশে দাঁড়িয়েছিল অনুরাধামা। সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস ক'রে উঠে বলল—খাটতে আমরাও পারি, দেখাতে তো পারলাম না।

বলতে বলতেই তিত্তিরিদি বালতি রেখে এসে অনুরাধামা'র উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তুমুল ঝগড়া লেগে গেল দুজনের মধ্যে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উপরে দোষারোপ ক'রে আকাশ ফাটাচ্ছে। রসরাজ শ্রীশ্রীঠাকুর যেন এরই অপেক্ষায় ছিলেন। ওদের বলছেন—এই, ঝগড়া করিস্ ক্যা? দ্যাখ্, তো দেখি, ঝগড়া করিস্ ক্যা?

তাঁর কথায় উপস্থিত সবার মধ্যে হাসির রোল উঠছে। কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করার পরে দুজনে বকবক করতে করতে দু'দিকে প্রস্থান করল। বিশুদা হাসতে হাসতে বললেন—এদের একেবারে Tit for tat (ঢিল মারলে পাটকেল খাওয়া)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখি, ওর উপরে দাঁড়ায়ে একটা বলি।

ব'লে ইংরাজীতে বললেন—

Tit not for tat,
rather treat for tat
compassionately.

(ঢিল মারলেই পাটকেল ছুঁড়ো না। বরং বিপর্য্যয়ের সময় অনুকম্পা-সহকারে বিহিত ব্যবস্থা কর)।

একটু আগে পরমপূজ্যপাদ বড়দা এসে বসেছেন। ১০ টা ১২ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর বারান্দা থেকে ওঠার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—ধর্।

পূজ্যপাদ বড়দা হাত ধ'রে তুললেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। তারপর এনে ঘরের ভিতরে চৌকিতে বসিয়ে দিলেন। ব'সে শ্রীচরণ দুখানি নীচে দোলাতে দোলাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওখান থেকে এখানে এসে মনে হচ্ছে যেন কতদূর হেঁটে এলাম।

একটু পরে বললেন—বন্ধ কর্, পায়খানায় যাই।

তাড়াতাড়ি ঘরের পরদা টেনে দিয়ে পাল্লাগুলি বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানায় গেলেন।

বিকালে খড়ের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে বসেছেন। এই সময় মায়ামাসীমা এসে তাঁর জন্য নির্দ্ধারিত জলচৌকিখানির উপরে বসলেন এবং ব্যক্তিগত কিছু কথা বলতে আরম্ভ করলেন। বেশীর ভাগ কথাই টাকাপয়সা নিয়ে, এবং মায়ামাসীমা বলছিলেন বেশ খোঁচা দিয়ে দিয়ে। কথাবার্ত্তার ধরন নিম্নরূপ।

মায়ামাসীমা—আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই নিই নি। যখন এসেছিলাম তখন একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে আসি নি। কিছু আমার ছিল। আমার মেয়ের বিয়েতে আমি দশ হাজার টাকা খরচ করেছিলাম। কে যে কত দিয়েছিল তা' তো জানি।

শ্রীশ্রীঠাকুর শান্তস্বরে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, তুমি আমার একটা চোতাও (বাজে কাগজও) নাও নি। আমি বরং তোমারে শুষেছি। খেপা তোমার কাছ থেকে তিন হাজার টাকা নিয়েছিল।

মায়ামাসীমা—তিন হাজার না, পাঁচ হাজার।

ওকথা আর না বাড়িয়ে ধীরে ধীরে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও অসুস্থ হলাম, তোমারও অসুখ করল। তুমি সুস্থ থাকলে আমার একটা ভরসা হ'ত।

মায়ামাসীমার ভিতরে সবসময় যেন একটা অসন্তোষ। কথা বলায় বিরক্তি। ইদানীং অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে কথা বলার সময়ে তিনি যত গরম হচ্ছেন, তাঁরই মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তত শান্তভাবে উত্তর দিয়ে চলেছেন।

কিছুদিন আগে শ্রীশ্রীঠাকুর মায়ামাসীমাকে কয়েকখানা সোনার গিনি দিয়েছেন। সেকথা উল্লেখ ক'রে মায়ামাসীমা বললেন—ওসব গিনি দিয়েই বা কী হবে! তোমার তো কত লোক আছে। কত লোক তোমাকে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্বের স্বরেই আবার বললেন—তুমি যে আমার কাছ থেকে কিছু নাও নি, একথা ঠিক।

মায়ামাসীমা আর বসতে পারলেন না। আপন মনে কথা বলতে বলতে উঠে চ'লে গেলেন। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে (নন্দী) ডেকে থার্মোমিটার দিতে বললেন। দেবার পর দেখা গেল টেম্পারেচার ৯৮.৪। শ্রীশ্রীঠাকুর ক্লান্ত বোধ করছেন। অনেকে এসে ঘরের ভিতরে বসেছেন।

পণ্ডিতমশাই—আজ চান করেছিলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, কিন্তু খারাপ ভাব আর কাটে না। মনে হয় যেন অজলে অস্থলে পড়ে গিছি। মুখের অরুচি আর কিছুতেই কাটে না। ভীষণ অরুচি।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিখিলদাকে (ঘোষ) ওমর খৈয়ামের সাকীর পোষাকের মত এক সেট পোষাক আনতে বলেছেন। এখন নিখিলদাকে সামনে দেখে বললেন—তোকে যা' বলেছি তা' জোগাড় কর। আর প্যান্ট-ট্যান্ট আনিস নে। বাঙ্গালী মতে আনিস।

নিখিলদা ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূজ্যপাদ বড়দার ব্যবহারের জন্য শ্রীশ্রীবড়মার দালানের সংলগ্ন উত্তর পূর্ব দিকে একটি বাথরুম ও পায়খানা তৈরী করিয়ে দিয়েছেন। বড়দাকে তাঁর পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর সেবার জন্য দিনের বেশীর ভাগ সময়েই ঠাকুরবাড়ীতে কাটাতে হয়। এই সময়ের মধ্যে যদি কখনও তাঁর পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন হয়, সেইজন্যই দয়াল ঠাকুরের এই ব্যবস্থা। পরম দয়াল পণ্ডিতমশাইকে দিয়ে ঐ পায়খানা প্রথম ব্যবহারের শুভদিনও দেখিয়ে রেখেছেন। এখন তিনি জানতে পারলেন যে, বড়দা ও-পায়খানা নির্দ্ধারিত দিনে ব্যবহার করেন নি, কারণ তিনি ভেবেছিলেন, পায়খানা নির্ম্মাণের কাজ এখনও বোধ হয় শেষ হয়নি।

একথা জানতে পেরেই শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিতমশাইকে ডেকে বললেন—গিরিশদা! বড় খোকার পায়খানায় যাওয়ার আর একটা দিন দেখে দেন। আর কাল ব'লে ও কলকাতায় যাবে।

পণ্ডিতমশাই—হ্যাঁ, কাল সব দিক দিয়েই ভাল দিন আছে। আর, পায়খানায় যাওয়ার দিন আমি দেখে রাখব।

সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। কিছুক্ষণ হ'ল সান্ধ্য প্রণাম হ'য়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর বেশ অবসন্ন মনে হ'চ্ছে। মাঝে মাঝে কাতরাচ্ছেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—বড় খোকা কি চ'লে গেছে?

পূজ্যপাদ বড়দা পাশেই শ্রীশ্রীবড়মার ঘরে ছিলেন। প্রভুর কণ্ঠস্বর কানে যেতেই উঠে এসে কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে বড় বেদনার্ত্ত স্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর উচ্চারণ করলেন—বড় খোকা! আর যে পারি নে।

বড়দা—তাহলে ডাক্তার হিমাংশু রায়কে আনলে হয়। সে-ই তো আপনাকে দেখে থাকে।

এই ব'লে একপাশে প্যারীদাকে ডেকে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের অরুচি কিভাবে দূর হ'তে পারে সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন। ছ'টার পর আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের টেম্পারেচার নেওয়া হ'ল—সাড়ে আটানব্বই।

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)—আগে যেমন আপনি এটা-ওটা দিয়ে ওষুধ ব'লে দিতেন, সেইরকম অরুচির জন্য একটা বললে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেরটা নিজে করা যায় না।

সমানে কাতরাচ্ছেন। তারপর হঠাৎ আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসে, সমস্ত অবসাদ ও কাতরতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ব'লে উঠলেন—দেখি, অন্যদিকে মন দিই।

ব'লে ছড়া বলতে শুরু করলেন। পর পর একটানা দশটি ছড়া ব'লে থামলেন। রাত ৭টা। পরমপূজ্যপাদ বড়দার নির্দ্দেশে প্যারীদা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাল্‌স্ দেখলেন ৯৬ এবং টেম্পারেচার ৯৭.৮। এর পর পূজ্যপাদ বড়দা উঠে বাইরের দিকে গেলেন।

রাত সাড়ে সাতটা। নিখিলদা এক সেট কাপড়, ব্লাউজ, ওড়না, সায়া ইত্যাদি এনে হাজির করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তিত্তিরিদিকে ডেকে সেগুলি দিয়ে বললেন—প'রে আয়।

তিত্তিরিদি ওগুলি নিয়ে শ্রীশ্রীবড়মার ঘরে গেল। তখন দয়াল ঠাকুর নিখিলদাকে বললেন—তুই একেবারে পাখীর মত আনিছিস। পাখীকে ভগবান যে কত রকমে বাবু করেছে তার আর ঠিক নেই। কত রকমের যে রঙ!

একটু পরে তিত্তিরিদি ঐসব প'রে এসে প্রণাম করল। তাকে দেখতে দেখতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভালই, তবে পরা ভাল হয় নি।

শিষ্ট শোধন, শিষ্ট বোধন,
সৎ-সাধু যা'র হৃদয় রাগ,
উচ্ছলায় সে দীপ্ত থাকে
নিয়ে তৃপ্ত নিষ্ঠা-ফাগ।

ছড়া বলার পর খগেনদাকে (তপাদার) ডাকতে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর। খগেনদা এলে তাকে বললেন—দেখ, বড় খোকার ওটা হল না। ওর এখানে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা যদি ক'রে দিতে পারতে তাহ'লে ও আমার চোখের 'পরে থাকত, আমিও ওর চোখের 'পরে থাকতাম। (উঠোনের নতুন ঘরটির কথায়) তারপরে এই ঘরটাও হ'ল না। Structure (কাঠামো) সব finished (হ'য়ে গেছে), কিন্তু আমি বাঁচি কি না-বাঁচি কওয়া যায় না। কাঠের জোগাড় ক'রে যদি ও-ঘর করতে হয়, তা' তিন মাসের আগে না। গরমকালে হয়তো হ'তে পারে। আবার এই তিন মাসের মধ্যে অনেক কিছু বেরিয়েও যাবে।

খগেনদার মুখে কোন কথা নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে চিন্তাকুল মনে বেরিয়ে গেলেন। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আরো কয়েকটি ছড়া দিলেন। রাত প্রায় দশটা বাজে। জিজ্ঞাসা করলেন—আজ ক'টা হ'ল রে? ১৮টা হয়েছে?

বললাম—না, ১৭টা।

আজকাল রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ১০-৮ মিনিটে উঠে বাথরুম থেকে এসে ভোগ গ্রহণ করেন। উঠতে যাবেন এখন, হঠাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে আলোগুলি সব নিভে গেল। তিনিও না উঠে বিছানায় ব'সে পড়লেন। আরো ৮ মিনিট অতিক্রান্ত হ'য়ে ১০-১৬ মিঃ হ'লে উঠে বাথরুমে গেলেন।

আজ সারারাতই প্রায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘুম হল না। থেকে থেকে খুব যন্ত্রণায় 'মা মা' বলে কাতরাচ্ছেন। মাঝে মাঝে চোখ দিয়ে জলও পড়ছে। ভোর প্রায় ৫টার সময় একটু শান্ত হ'য়ে ঘুমালেন।

১৩ই মাঘ, ১৩৬৬, বুধবার (ইং ২৭। ১। ১৯৬০)

প্রাতে পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে সমাসীন। গত কাল প্রায় সারাদিনই তাঁর শারীরিক অবস্থা সুস্থ ছিল না। দুর্ব্বলতাও ছিল বেশ। আজ অনেক ভাল আছেন। মধুলোভী ভৃঙ্গের ন্যায় ভক্তবৃন্দ তাঁর কাছে আসছেন, প্রণাম ক'রে বসছেন। প্রাণ ভ'রে দর্শন করছেন তাঁকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কা'রো কুশল জিজ্ঞাসা করছেন, কা'রো সাথে বা দরকারী কোন কথা বলছেন। সুরেশদা (রায়) এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। তাকে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর, এই, তুই আর ওসব culture (চর্চ্চা) করিস নে? সেই যে বেদ-টেদ কী কী বই জোগাড় করতিস্, এখন আর করিস নে?

সুরেশদা—না, এখন আর হ'য়ে ওঠে না।

তারপর উপস্থিত ভক্তদের দিকে তাকিয়ে প্রভু বললেন—এখন কি গেঞ্জি নিয়ে প'ড়ে আছে। ওরে, আসল সত্তা-গেঞ্জি বাদ দিয়ে কি গেঞ্জির ব্যবসা হয়? আবার মানুষকে infuse (সঞ্চারণা) করার বুদ্ধিও ওর ছিল। কত হিন্দু-মুসলমান ওর কথা শুনে বলত, 'ও পাগল যা' কয় তা' খাঁটি কথা।' মানুষ ছোটবেলা থেকে নাটক-নভেল পড়ে। কিন্তু ওর ঝোঁক ছিল ঐসব বইয়ের উপর। কোথা থেকে, কোথা থেকে কী সব জোগাড় করত!

তারপর ছড়া দিলেন—

সঞ্চারণা এমনি করিস্
যুক্ত চারু ভাবদীপনায়,
জীবনে সে ভুলতে নারে,
ভোলেই যেন ভুলে যাওয়ায়।

বোম্বে থেকে ভাস্করদা (মাত্রে) এসেছেন। তিনি বিকালে খড়ের ঘরে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে কথাবার্ত্তা বলছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বললেন—আমার ছেলে ম্যাট্রিক কোর্সে সায়েন্স নেবে না আর্টস্ পড়বে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ভাল লাগে সায়েন্স পড়ে আর্টস্ পড়া। আগে ছিল এ দুটির mixed course (মিলিত পাঠ্যবিষয়), এখন তো আর তা' নেই। এখন একটার কাছে আর একটা fool (মূর্খ) হ'য়ে থাকে। সায়েন্সের ছেলে বলে, আমি আর্টস্ বুঝি না। আবার আর্টস্ যারা পড়ে, তাদেরও সায়েন্স সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে না। সেইজন্য সায়েন্স পড়ে আর্টস্ পড়লে দু'টোরই জ্ঞান থাকে।

তারপর ভাস্করদা বোম্বের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে কথা তুলতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওখানে initiate (দীক্ষিত)-দের majority (সংখ্যাধিক্য) বাড়ানো লাগে। সবার মধ্যে এটা transmit (সঞ্চারিত) করতে না পারলে তো হবে না। Number of Satsangees (সৎসঙ্গীদের সংখ্যা) বেশী ক'রে নিয়ে তোমাদের লোক বাড়ানো লাগে।

এই সময় হরিনন্দনদা (প্রসাদ) জনৈক দাদাকে নিয়ে এসে বললেন—এক astrologer (জ্যোতিষী) এই দাদাকে ব'লে দিয়েছে, you will loose your job and everything (তুমি তোমার চাকরী এবং যা' কিছু সব হারাবে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর ঠিকুজীটা আমাদের পণ্ডিতমশাইকে দিয়ে দেখালে হয়। (মৃদু হেসে ব্যঙ্গচ্ছলে বললেন) 'বাগ্‌দেবীং বানরীং কৃত্বা নর্ত্তয়ামি রাধে রাধে' ঐরকম কয় ওরা।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিলেন—

দক্ষনিপুণ ত্বরিত কর্ম্ম
সমীচীন সুন্দর কৃতিদীপনা
নাই যদি হয়, লাখ বিভূতি
সত্ত্বেও হবে তেল-স্রক্ষণা।

ছড়াটি দেবার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একথা মনে হ'ল ঐ মেরাজের কথা থেকে। আমার অসুস্থ অবস্থার পরে যখনই একটু কথা বলার মত হয়েছি, তখনই বলেছি, মেরাজ সম্পর্কে বাণীটা পাঠিয়ে দিতে, কিন্তু আজও তা' পাঠানো হয় নি। সব কাজে এরকম পিছিয়ে থাকি আমরা। এখন শুনছি সে চিঠিই নাকি হারিয়ে গেছে। এতে হ'ল কি! —ঐ মেরাজের যদি কোন utility (প্রয়োজনীয়তা) থাকত তা' আমরা পেলাম না।

কিছুকাল আগে জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক চিঠিতে হজরত রসুলের মেরাজ-এর তাৎপর্য্য সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বিষয়টি নিবেদিত হয়। ঐ সম্পর্কে কিছু আলোচনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর মেরাজের অর্থ ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ক'রে একটি বড় বাণী প্রদান করেন। দিয়ে, উক্ত ভদ্রলোককে সেটি পাঠিয়ে দিতে আদেশ করেন। কিন্তু মাসাধিককাল হয়ে গেল, এখনও ওটা পাঠানো হয় নি। যাঁ'র উপর পাঠাবার দায়িত্ব ছিল, তাঁরই কর্ম্মশৈথিল্য এই না-পাঠাবার কারণ। সে-কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর উপরি-উক্ত মন্তব্য করলেন।

তারপর আবার বলতে লাগলেন—আমার সব কথাই কত আগে বলা। এই যে, এ্যাটম্-এর কথা-টথা, এ আমি অন্ততঃ ত্রিশ বছর আগে বলেছি। তোমরাই আগে এসব বের করলে, কিন্তু মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারলে না। তা' যদি করতে তাহলে আজ বুক ঠুকে বলতে পারতে যে তোমরাই এসব আগে বের করেছ।

এই বলে একটি ছড়ায় বললেন—

ভাগ্যদেবী আগে থেকেও
পিছু হ'টে যখন চলে,
আগে ক'রে থাকলেও তা'রা
পিছু হেঁটে পিছনে বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য কলকাতা থেকে এসেছেন ডাঃ অমিয় রায়চৌধুরী। সন্ধ্যা ছ'টায় তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখলেন।

দেখা শেষ হয়ে গেলে ডাঃ রায়চৌধুরী শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল বললেন। আরো দু'এক কথার পরে ডাঃ সূর্য্যদা (বসু) ডাঃ রায়চৌধুরী সম্বন্ধে বললেন—উনি Ayurvedic drugs (আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধপত্র) নিয়ে research (গবেষণা) করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দের অভিব্যক্তি-সহকারে বললেন—খুব ভাল। ও তো কেউ করে না। উনি যে করছেন, শুনে খুশী হলাম। আপনি বড় বৌ-কে কিন্তু দেখে যাবেন। আর ডাক্তারবাবু, মাসীমাকে (মায়ামাসীমাকে) একটু দেখবেন। সে বড় temper (মেজাজ)-ওয়ালা মানুষ। আপনাকে হয়ত গাল পাড়তে পারে, দেখতে নাও দিতে পারে।

ডাক্তার হেসে বললেন—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবশ্য সে আপনাদের অভ্যেস আছে। কতরকম রোগী নিয়ে তো চলা লাগে।

এরপর সূর্য্যদা ডাক্তারবাবুকে নিয়ে শ্রীশ্রীবড়মার ঘরে গেলেন। একবার তামাক খেয়ে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর পর পর অনেকগুলি ছড়া বলে গেলেন। পরে ঐ সম্পর্কে বলছেন—এই যে কথাগুলি বলেছি, এখন লেখার পরে জানতে পারি, অতগুলি বোধ আমার মধ্যে ছিল।

পরে আবার ছড়া দিলেন—

দেখবি শুনবি বুঝবি যা' সব
অনুকম্পী বোধটি নিয়ে,
বাস্তবে যা' করবি রে তুই
করিস্ ক্ষিপ্র হৃদয় দিয়ে।
ত্বরিত চিন্তা, বোধত্বারিত্য
যা'র করণে ঠিক,
চিন্তা-চলন সমীচীন তা'র
বুঝে চলে সব দিক।

বলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোন একটা বিষয় সম্বন্ধে অনুকম্পা যদি না থাকে, তবে তা'র innate nature (অন্তঃপ্রকৃতি) কিন্তু বোধ করতে পারা যায় না।

রাত প্রায় দশটা পর্য্যন্ত চলল ছড়া দেওয়া। এই সময় কালীষষ্ঠীমা এলেন। তাঁর বসার জন্য একটি আসন তিনি বাড়ী থেকে নিয়ে আসেন। এখন সেই আসনটি পেতে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই গান গাইতে জানিস্ নে?

কালীষষ্ঠীমা মাথা নেড়ে জানালেন যে জানেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর মেয়ে শিখ্‌ল কোথার থেকে?

কালীষষ্ঠীমা—মেয়ে কোথার থেকে শিখল তাও তো জানি নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর বাবা, ঠাকুর্দ্দা গান জানত না?

কালীষষ্ঠীমা—সন্তোষের বাবা (কালীষষ্ঠীমার স্বামী) একটু জানত।

১৪ই মাঘ, ১৩৬৬, বৃহস্পতিবার (ইং ২৮।১।১৯৬০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে শুভ্র শয্যায় সমাসীন। প্রাতঃপ্রণামের পর কর্ম্মিবৃন্দ স্ব স্ব কর্ম্মস্থলে চ'লে যাওয়ার পর মিনু-মা এসে নিবেদন করলেন যে তাঁর ছেলেটি খারাপ চলনে চলছে, বাগ মানাতে পারছেন না।

সেকথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ছাওয়াল ঠিক করতে কেউ পারে না। ছাওয়াল ঠিক করতে পারে তা'র মা। ছাওয়ালের মা'র আচার-ব্যবহার, চলন-চরিত্র যত মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে, তত ছাওয়ালের তা' ভাল লাগে। সে ঐরকম হতে চেষ্টা করে।

মিনু-মা—আচার-আচরণ আর ব্যবহার কিরকম ঠিক বুঝলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছাওয়ালের মধ্যে আছে তা'র বাপ আর মা। বাপের আচার-ব্যবহার যা'তে ঐ ছাওয়ালের মধ্যে ফুটে ওঠে, মা'র উচিত তা'ই করা। এই করতে করতে ছাওয়াল মাতৃভক্ত হয়ে ওঠে। এইরকম অভ্যাস করানোর ভিতর দিয়ে মা ছোটকাল থেকেই ছাওয়ালের জীবন ঠিক করে দিতে পারে। আর লক্ষ্য রাখতে হয়, ফাজিল হয়ে না ওঠে।

মিনু-মা—কয়েকদিন যাবৎ এমন করছে, ভাবি রাহুর দশা হ'ল না কী হ'ল!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে রাহুর দশা বললি, ওর কামড়, বড় সাংঘাতিক। সাবধান হয়ে থাকা লাগবে। শুধু বিয়োলেই কি মা'র দায়িত্ব শেষ হ'য়ে গেল? সন্তানের সবদিকে লক্ষ্য রাখা লাগবে না? ছাওয়াল যা'তে পিতৃভক্ত হয়, মাতৃভক্ত হয়, সেইভাবে চালানো লাগে শিশুকাল থেকে।

মিনু-মা আর কিছু না ব'লে প্রণাম করে উঠে গেলেন। —কুষ্ঠিয়ার ননী বিশ্বাসদা শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেক বাণী ও ছড়া-সম্বলিত একটা ক্যালেণ্ডার বের করেছেন। একটি ক্যালেণ্ডার শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে টাঙ্গানো ছিল। কয়েকদিন হ'ল ক্যালেন্ডারখানি পাওয়া যাচ্ছে না। যে দেওয়ালে ওটা ছিল, সেইদিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—সেই ক্যালেন্ডারখানা কোথায় গেল রে?

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)—কে যেন খুলে নিয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ননীর কাছে তাহলে লিখিস্, ভাই! কী ক'ব দুঃখের কথা! তুমি ঠাকুরকে যে ক্যালেন্ডারখানা দিয়েছিলে সেখানা কোথায় যেন হারায়ে গেছে। তা' তুমি যদি আর একখানা না পাঠাও তাহ'লে তো আর হয় না।

বিশুদা—আজ্ঞে লিখে দেব।

অরুণদা (জোয়ারদার) আইন পড়ছেন। তা'র পড়াশুনা কেমন হচ্ছে, পরীক্ষা কেমন হয়েছে, এই সব খোঁজখবর নিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তারপর প্যারীদাকে (নন্দী) বললেন—মাসীমাকে দেখে আসতে হয়।

প্যারীদা দেখতে গেলেন মায়ামাসীমাকে। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন—কাল রাতে যেন ক'টা হয়েছে?

বললাম—২৮টা। তা' শুনে দয়াল প্রভু একটু আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন—কম না। আমার এই অবস্থায়—

তারপর অরুণদার দিকে তাকিয়ে ছড়ায় বললেন—

বলবি কইবি ভাষণ দিবি
সব সময়েই সত্তা ধ'রে
কেমন চলায় সত্তা বাঁচে
জেনে জানিয়ে নিটোল ক'রে।
আমি বাঁচি, ধ্বংস হোক্ সব—
ধারণা যা'র এই মনের,
হিংসা-দ্বেষ তো তখনই আসে
ক্ষতি-বুদ্ধিও সেই জনের।

পর পর আরো কয়েকটি ছড়া বলে গেলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। এই সময় তামাক সেজে এনে দেওয়া হ'ল। তামাকের নলটি হাতে ধ'রে গড়গড়ার দিকে তাকিয়ে দয়াল ঠাকুর বলছেন—এই গড়গড়াটা আমাকে অনন্ত না কিশোরী কে যেন কিনে দিয়েছিল। তাই, ওটা আর ছাড়তে ইচ্ছা করে না।

এইসময় ডাঃ বনবিহারীদা (ঘোষ) এলেন। তাঁর সাথে খাদ্য ও ওষুধ সম্বন্ধে নানা কথা আলোচনা হচ্ছে। কথাপ্রসঙ্গে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—খাওয়ার সমস্ত বাসনের মধ্যে কবিরাজরা পদ্মপাতা ও কলাপাতাকেই সব চাইতে ভাল বলেছেন।

বনবিহারীদা—কলাপাতায় খাওয়ার কোন হাঙ্গামা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কলার পাতায় খাওয়া আমার পবিত্রও লাগে। (মুখের স্বাদ আনার জন্য আজকাল শ্রীশ্রীঠাকুর কচি শসা খাচ্ছেন।) সেই প্রসঙ্গে বললেন—কচি শসা পেটের পক্ষেও ভাল। ক্লোরোফিলও ওতে যথেষ্ট।

অন্য দিনের চাইতে আজ একটু দেরী ক'রে বেলা সাড়ে এগারোটায় শ্রীশ্রীঠাকুর স্নান করতে উঠলেন। শরীর ভাল বোধ করছেন না বললেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বুকের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করছেন। সেকথা শুনে ডাঃ প্যারীদা এসে তাঁর পাল্‌স্‌ দেখলেন। দেখা গেল নাড়ীর গতি ৯৫।

প্রণামের আগে ভক্তগণ এসে বসছেন। পূজ্যপাদ বড়দা কিছুক্ষণ আগে এসে আসন গ্রহণ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে কাত্‌রানির ধ্বনি। ঐ অবস্থায় বলছেন—আমার শরীরের এই অবস্থা। ক'বই বা কারে!

পূজ্যপাদ বড়দাকে দেখিয়ে বললেন—ও বড় হইছে। আমি এখন ওর ছাওয়ালের মত। তাই, সব ওরই কাছে কই, নালিশ জানাই, কত কী করি!

কিছু পরে সান্ধ্য প্রণাম হয়ে গেল। এখন সন্ধ্যা ৬টা। খবর এসেছে, কলকাতায় পূজনীয়া ছোটমার শরীর অসুস্থ। আগামী সরস্বতী পূজায় তিনি সম্ভবত আসতে পারবেন না। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর এখন বড়দাকে ডেকে বললেন—বড় খোকা, কাজলের মা যদি এবার না আসতে পারে, তাহলে তোমার বা মণিরই সব করা লাগবে নে। দেখেশুনে যেখানে যা' করা লাগে, ক'রো লক্ষ্মি!

পূজ্যপাদ বড়দা—আজ্ঞে করব।

বলে তিনি বাইরের দিকে গেলেন। লোকজন একটু পাতলা হতেই শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিতে আরম্ভ করলেন। রাত ৮টা পর্য্যন্ত চলল ঐ ছড়ার স্রোত।

১৫ই মাঘ, ১৩৬৬, শুক্রবার (ইং ২৯।১।১৯৬০)

সকালে প্রণাম হয়ে যাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে বারান্দায় যেয়ে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তদনুযায়ী রোদ উঠতেই খড়ের ঘরের পূবের বারান্দায় শয্যা প্রস্তুত করা হ'ল। একটু পরেই শয্যার উপরে তথা সমস্ত বারান্দায় রোদ ভ'রে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে এসে ঐ শয্যায় আরাম ক'রে বসলেন। এখনও বেশ শীত।

এখানে বসে শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি ছড়া বললেন। ছড়া প্রদানের মধ্যে এসে বসলেন শরৎদা (হালদার), প্রফুল্লদা (দাস), সুশীলদা (বসু) প্রমুখ।

ছড়া দেওয়া শেষ হলে শরৎদা বললেন—আপনার শরীরটা একটু ভাল থাকলে আমাদেরও কাজের আঁট হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের আঁট হলে তবে তো আমার আঁট হয়। বাঁচব তো আপনাদের দিয়ে। আপনাদের কাজে যদি শুধু ঢিলই হ'তে থাকে তাহলে কি তা' হয়? আপনারা কৃতিতপা যত স্বল্প হবেন, আমার range of advance (অগ্রগতির পাল্লাও) তত স্বল্প হবে।

এরপর ইদানীং প্রদত্ত ছড়াগুলি সম্পর্কে বললেন—আমি এসব কথা যে কইতে পারি, তাঁর জন্য ধন্যবাদ আসে কেষ্টদার উপর। কেষ্টদা কেমন ক'রে যে এগুলো বের করল। কেমন ক'রে যে এগুলো আমি জানলাম তা' বলতে ইচ্ছা করে না। জানলে পরে আমার এই রকমটা ভেঙ্গে যাবে।

শরৎদা—সব জেনেও কিছু না-জানার এই ভাবটা কিভাবে সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আর আমার কওয়ার উপায় নেই।

কথার ভঙ্গীতে সবাই হেসে উঠলেন।

বিশুদা এসে জানালেন যে তিনি মায়ামাসীমার জন্য লেমনেড্, ফলমূল, ইত্যাদির ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে এসেছেন। মাসীমা খুব খুশী।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—তোর মাথা থেকে যে এ বুদ্ধি বেরিয়েছে, শুনে একেবারে তৃপ্তি ভ'রে যায়। (অনিল গাঙ্গুলীদাকে দেখিয়ে আদরের সুরে) আর, ঐ মালও কম না। শয়তানের আঁধি। আবার, শয়তানকে কিভাবে ভাল করা যায় সে-বুদ্ধিরও গুরুঠাকুর। ওর ছাওয়ালটাও ঐ রকমের। তবে বিশুর যেরকম discerning (নির্দ্ধারণী) বুদ্ধি, অজিতের তা' নেই। তবে হ'য়ে যাবে মনে হয়, কারণ seed (বীজ) আছে।

তারপর নিজের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে বলছেন—আমার মনে হয়, গ্রীষ্ম আসলে আমার শরীর আর একটু ভাল হবে। শীতে কেমন গতাসু মতন হ'য়ে থাকি।

এরপর বঙ্কিমদার (রায়) দিকে নির্দ্দেশ করে সস্নেহ ভর্ৎসনায় বলছেন—আর ঐ এক বেকুব। আমি যখন পায়খানায় বসে কিছু কই, ও তখন খাতা খুঁজতে এখানে আসে। আমিও কই, ও-ও খাতা খোঁজে। আমি বলেছি খাতা পকেটে নিয়ে যাওয়ার কথা। তা' আর রাখে না। প্রস্রাব না আসা পর্য্যন্ত আমি কথা বলি। কিন্তু প্রস্রাব এসে পড়লে তো আর কথা কওয়ার উপায় নেই।

বলে একটু থেমে হাসতে হাসতে বললেন—কত কাণ্ড যে হয় তা' আর কওয়ার না।

ইতিমধ্যে কয়েকটি দাদা কচু ও অন্যান্য তরিতরকারী নিয়ে এসে পৌঁছালেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সব দেখালেন। দেখেই প্রভু সোল্লাসে ব'লে উঠলেন—বাঃ জবর মাল। দিয়ে আস গে'।

জিনিসপত্র নিয়ে ওঁরা শ্রীশ্রীবড়মার ঘরের দিকে গেলেন। গতকাল শরৎদা আসাম থেকে আসা একটি টেলিগ্রামের কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে নিবেদন করেছিলেন। টেলিগ্রামটিতে একটি সভায় যোগদান করতে যাওয়ার জন্য শরৎদাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আজ আবার শরৎদা সেই টেলিগ্রামের উল্লেখ ক'রে বললেন—আসামের ঐ meeting-এ (সভায়) যাওয়ার জন্য আপনি স্বচ্ছন্দ অনুমতি দিচ্ছেন তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাকে তো সবই বলেছি পরিষ্কার ক'রে। এখন না গেলে ওরা একটা অসুবিধাতেও পড়বে। যান, যেয়ে দেখেন আসার সময় আমার জন্যে বেতের আগা-টাগা পান কিনা! (একটু থেমে) এ কথা কেন বললাম তা' যদি কই তাহলে শরৎদার সম্বেগটা ভেঙ্গে যাবে নে। (শিশুর মত হাসতে হাসতে বললেন) তা'র মানে আমার জন্য ঐগুলি আনাই হোক primary (প্রধান)। আর, তা'র সাথে secondary (গৌণ ব্যাপার) হিসাবে meeting-টা (সভার কাজটা) সেরে আসবে।

বলে ছড়া দিলেন—

বিন্যাসে তার ব্যতিক্রমের
সূত্র কোথায় দৃষ্টি রাখিস্,
শুভসুন্দর যখন যেটা
তখন সেটা তেমন করিস্।

বিকালে খড়ের ঘরে বসে অনিল গাঙ্গুলীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে নানা বিষয়ে কথা বলছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—সৎসঙ্গের membership (সভ্যত্ব) কা'দের আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Member (সভ্য) সবাই। নয়তো কেউ না।

কথা চলাকালে জ্ঞানদা (গোস্বামী) ও কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে পৌঁছালেন কলকাতা থেকে। ওঁরা প্রণাম করার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁদের কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর অনিলদার কথার জের টেনে জ্ঞানদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—Education (শিক্ষা) কি democratic (গণতান্ত্রিক) হতে পারে? মানে আমি বলতে চাইছি, এটা Law of nature (স্বাভাবিক নিয়ম) নয় যে professors should follow the dictates of the students (অধ্যাপকগণ ছাত্রদের আদেশ পালন করবেন)।

জ্ঞানদা—কখনই না। Students-দের (ছাত্রদের) দ্বারা democracy guided (গণতন্ত্র পরিচালিত) হতে পারে, এটা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একথা যদি কই, institution should be guided by the students (একটা সংস্থা ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত), তাহলে কী হয়?

জ্ঞানদা—তাহলে institution (সংস্থা) আর থাকে না।

এরপর জ্ঞানদা ও কেষ্টদা উঠে গেলেন কাপড়-চোপড় ছেড়ে আসার জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিতে আরম্ভ করলেন। সহজাতসঞ্চারী জলধারার মত পর পর বহু ছড়া নেমে এল বিভিন্ন বিষয়ে। বলছিলেন—

শিবের শিঙা গর্জ্জে উঠুক
রংকারেরই রারং নাচে
নিথর যা'রা জেগে উঠুক,
মুহ্য যা'রা উঠুক বেঁচে।
সব জীবনের সত্তা রাজা
সত্তাচর্য্যাই রাজপূজা,
সত্তা যা'তে উথলে ওঠে
তাই-ই তোদের স্বার্থ-ধ্বজা।
ব্যবস্থিতি নাইকো যাদের
বিচারে যা'রা অপটু,
ভ্রান্তিভরা চলন-বলন
গুছিয়ে চলায় নয় পটু।

রাত প্রায় দশটা পর্য্যন্ত ছড়া দেওয়া চলল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ক'টা হ'ল?

দেওঘরে আসার পর মোট ছড়ার সংখ্যা জানতে চাইছেন।

তাই বললাম—১৫১৩টা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর ক'টা বাকী থাকল?

দেবী—আর ৪৮৭টা হলে ২০০০ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবছি, ১৮০০ হয়ে গেলে ওমর-খৈয়ামের মত ঐগুলি আরম্ভ করব।

ছড়া বাদে গদ্য-আকারে প্রদত্ত যে বাণীগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের আছে, সেগুলি বর্ত্তমানে বই ক'রে ছাপিয়ে ফেলার কথা উঠেছে। সেই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম।

দেবী—গদ্য বাণীগুলি যখন ছাপা হবে তখন কি এক বইয়ের মধ্যেই বিভিন্ন section (বিভাগ) দেওয়া থাকবে, না এক একটা section (বিভাগ) দিয়ে এক একটা বই হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুই রকমই করা যায়। একবার একটা বইয়ের মধ্যে অনেক রকম section (বিভাগ) থাকা ভাল। পরে আবার এক section (বিভাগ) দিয়ে একটা বইও করা যায়।

দেবী—তাহলে এখন এক section (বিভাগ) দিয়ে একটা বই হোক। পরে বিভিন্ন section (বিভাগ) দিয়ে একটা বই করা যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কত হইছে?

দেবী—৯১৪০-এর কাছাকাছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে যদি বেঁচে থাকি, ১০০০০ হয়ে যেতে পারে।

কালীষষ্ঠীমা এসে বসেছেন একটু আগে, বললেন, ১০০০০ তো হ'য়েই যাবে। আরো কত ১০০০০ হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—তাহলে তামুক দে।

তামাক খেয়ে উঠে বাথরুমে গেলেন।

১৬ই মাঘ, ১৩৬৬, শনিবার (ইং ৩০।১।১৯৬০)

আজ সকাল থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে ছড়া দিচ্ছেন। তাঁকে ঘিরে বসে আছেন জ্ঞানদা (গোস্বামী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্লদা (দাস), অনিলদা (গাঙ্গুলী), বিশুদা (মুখোপাধ্যায়), মণিদা (কর) প্রমুখ ভক্তবৃন্দ।

কথায়-কথায় অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহের প্রসঙ্গ উঠল। জ্ঞানদা বললেন—বর্ত্তমানে আইনে তো দুই বিবাহ নিষিদ্ধ। অথচ অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহ প্রবর্ত্তন ক'রতে হ'লে একাধিক বিবাহের প্রশ্ন এসেই যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কী করা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি এটা ক'রেই যেতাম যদি আমার পেছনে তেমন জোর থাকত। এখন হচ্ছে জেল খাটার জন্য যে রাজী থাকে সে করতে পারে।

প্রফুল্লদা—তাহলে এটা কি এখন stop (বন্ধ) থাকবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Stop (বন্ধ) আমরা করছি নে। Stop (বন্ধ) করছে আইন। আমরা stop (বন্ধ) করছি, একথা ঠিক না। আর এক শয়তানী বুদ্ধি আছে। দুই বিয়ে করা যাবে না, কিন্তু concubine (রক্ষিতা) রাখা যাবে। (পরে চিন্তান্বিত মনে বলছেন) এরকম একটা অবস্থা আসতে পারে তা' আমার মাথায় এসেছে অনেকদিন আগের থেকে। সেইজন্য আমি ঐ ১০ কোটি দীক্ষার কথা বলেছিলাম। তা হ'লে তোমাদের strength (শক্তি) আজ কত বেড়ে যেত। তোমরা অনেক কিছু করতেও পারতে।

জ্ঞানদা—আগে তিন মাসে যত সংখ্যক দীক্ষা হত, সেটা এখন ক'মে প্রায় অর্দ্ধেক হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'র মানে সঞ্চারণা ক'মে গেছে। দেখ, এক আগে থাকলে তবেই শূন্যর দাম আছে। এক না থাকলে শূন্যর কোন দাম নেই।

শৈলেনদা—আজকাল এখান থেকে বেরোবার লোকও কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি একাই যা' করেছ এক সময়, তাতেই মাত ক'রে দিছ। এখন তো সকলে মিলে আছ। লাগ। করতে আরম্ভ কর। করবে না তা'র হবে কী? আমরা যে কতরকমে আমাদের misfortune invite (দুর্ভাগ্য আমন্ত্রণ) করি তার ঠিক নেই।

প্রফুল্লদা—কিন্তু আজেবাজে দীক্ষা দিয়ে কতকগুলি বোঝা বাড়িয়ে তো লাভ নেই, তাতে ক্ষতিই বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতেও যেমন ক্ষতি, তেমনি দীক্ষা ক'মে যাওয়াতেও ক্ষতি হ'চ্ছে। মোট কথা, সবটা নিয়ে আমাদের যে progressive go (উন্নতিমুখর চলন), সেটা তো stunted (স্তব্ধ) হ'ল। কেষ্টদা একবার বের করেছিল, মাসে কত ক'রে যেন দীক্ষা হ'লে কতদিনে দশ কোটি হয়।

বেলা দশটা বাজে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে এক জায়গায় যদি পাঁচশ দীক্ষা হ'য়ে থাকে, সেখানকার মানুষ এত উল্টো চলতে আরম্ভ করেছে যে আর সেখানে দীক্ষা হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইগুলিকে ঠিক রাখতে গেলে আপনাদের কতখানি ধৃতিমান হ'তে হবে ভেবে দেখুন। যারা কিছু করে না তারাই উল্টো চলে। এদের ঠিক রাখতে হলে না-জানা, না-বোঝার বাধা যেগুলি আছে সেগুলি supersede (রহিত) ক'রে আপনাদের এমন flood-এর (বন্যার) মত চলা লাগবে যা'তে ওগুলি merge ক'রে (কবলিত ক'রে) চ'লে যেতে পারেন। Impart (সঞ্চারণা) করা লাগবে ঠিক মতন। এই যেমন আপনাকে কই, কেষ্টদা, আমাকে পাঁচখানা গাড়ী কিনে দেন—ভাল দেখে। এ যে শুধু ছেলেপেলের মত আবদার নিয়ে কই তা' না। এর পিছনে আমার উদ্দেশ্য থাকে। ঐ গাড়ীতে ক'রে যাতে প্রয়োজনমত আপনি ঘুরে বেড়াতে পারেন এদিক-ওদিক। কিন্তু আপনাকে তো ধরার উপায়ই নেই। আপনি এত engaged (ব্যস্ত) যে তা' আর কওয়ার না। আপনাকে কই কেন? কারণ, আপনাকে test (পরখ) করা আছে। সেই যে আমাদের ওখানে যেবার দুর্ভিক্ষ লেগেছিল, পাবনা শহরেও মানুষ খিদের জ্বালায় গলায় দড়ি দিয়েছিল। কিন্তু আমাদের ওখানে ধান এনে মজুত ক'রে কী ক'রে কী করেছিলেন। একজনেরও খারাপ কিছু হয় নি।

কেষ্টদা—এক একজন কর্ম্মী নিজেই তো ভাল রাখাল না। তাদের 'পরে কাজের ভারই দেওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষগুলিকে equipped (প্রস্তুত) ক'রে তোলা লাগে। এরা হ'য়েই আছে। প্রত্যেকেই অস্তিত্বকে ভালবাসে। আপনারা একটু উস্‌কে দিতে পারলেই হয়।

কেষ্টদা পুরানো দিনের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—আপনি যখন মাণিকতলায় ছিলেন, আশ্রমের কাজের জন্য লোহালক্কড় কেনা হ'ত, তখন আপনি বলেছিলেন, দোকানে পয়সা যেন একটাও বাকী না থাকে।

সেই স্মৃতি স্মরণ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর পুলকিত হ'য়ে বলতে লাগলেন—ওরে বাবারে বাবা! সে এক অসম্ভব কাণ্ড গেছে। যে পয়সাগুলি বাকী ছিল তা শোধ করার peculiarity (বিশেষত্ব) ছিল আমাদের। এক এক দরজায় পাঁচ-সাত কি দশবার

ঘুরে টাকা সংগ্রহ করা হ'ত। তারপর সব শোধ দেওয়া হ'ত। মানুষ দেখেশুনে বলত, সৎসঙ্গ কখনও barred by limitation (গণ্ডীবদ্ধ) হয় না। এসব এখন রূপকথার মত, folk tales of Bengal-এর (বাংলার প্রাচীন লোক-কাহিনীর) মত। পরমপিতার দয়ায় আপনাদের অসম্ভব সব কাণ্ড করতে দেখেছি। Factually (বাস্তবতঃ), আপনার এই সম্বেগ কিন্তু ক'মে গেল গোপাল মারা যাওয়ার পর থেকে। তখন আপনার সৎসঙ্গীদের নিয়ে থাকা লাগত, আরো কত কী করা লাগত। মোট কথা, ঐ সময় থেকে progress-এর (এগিয়ে যাওয়ার) মাথায়ই যেন বাড়ি পড়ল।

এই সময় সুকুমার নামে একটি ছেলে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলল—যতীনদা আমাকে স্কুলে free (বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ) ক'রে দেছেন। আপনি আমাকে একটু খাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চুনীর কাছে ক'। সে-ই সব করে।

সুকুমার—আপনি ক'য়ে দেন।

সুকুমারের এইরকম কথা বলার ধরন দেখে কেষ্টদা তাকে চড়া সুরে বললেন—যা' বললেন শুনলে তো! সেইভাবে চেষ্টা কর। মাথা খাটাও।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দেখেন, ঐ হ'ল test (পরখ)।

কেষ্টদা—ঠাকুর সব ক'রে দেবেন, এ বুদ্ধির মধ্যে otherwise purpose (অন্যরকম উদ্দেশ্য) থাকে।

সামনে কালোদা (জোয়ারদার) দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখিয়ে দয়াল ঠাকুর বললেন—ঐ যে কালো, লেখাপড়া জানে না বটে। কিন্তু যেখানেই ফেলে দেন, ঠিক লেগে যাবে।

এই সময় সুকুমার প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বলছেন—আমি আপনাকে কইছিলাম না, এই যে allurement-এর (প্রলোভনের) সৃষ্টি করলেন, এর দ্বারা সৎসঙ্গের progress (অগ্রগতি) নষ্ট করলেন।

আরো কিছু কথাবার্ত্তা চলতে চলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের সময় এগিয়ে আসে। আজ সকালে ছড়া বেশী হয় নি। সেই কথা উল্লেখ ক'রে দয়াল ঠাকুর এখন বলছেন—আজ আর কিছু হ'ল না।

বিশুদা—বিকালে হবে শরীর ভাল থাকলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর পাঁচশ' হ'লেই হয়। (কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে বললেন) আপনি একটু ক'রে দেন তো হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ওঠার জন্য সামনে চটিজোড়া এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যেন কিছুই বুঝতে পারেনি নি এমনভাবে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন—কী রে?

বিশুদা—ওঠার সময় হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রোস। পান দে। ভাবতিছিলাম পেচ্ছাপটা ক'রে নেব।

সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের পরদা টেনে দেওয়া হ'ল। প্রস্রাব-শেষে মুখ ধুয়ে পান মুখে দিয়ে বসেছেন প্রভু। তামাক সেজে দেওয়া হ'ল। আপন ভাবে মগ্ন হয়ে তামাক সেবন করছেন।

এই সময় কেষ্টদা বললেন—আমার মনে হয়, আমাদের মধ্যে অন্ততঃ ছয়জন লোক যদি বিলাতে যায়, ফিজিক্স্, কেমিষ্ট্রি, ম্যাথেমেটিকস, সংস্কৃত, এই সব বিষয় শিখে আসে তাহলে খুব ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। এরকম একশ জন হ'লেই ঠিক হয়। আর তা' এখন থেকেই আরম্ভ করলে হয়। কিন্তু আমি এতদিন বাঁচব না।

প্রফুল্লদা—কেষ্টদা! আমি একটা ব্যাপার দেখছি। আমার বন্ধুরা যারা বিলাত থেকে এসেছে তারা কিন্তু চাকরী করা ছাড়া আর কিছু চিন্তাও করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে ওরা অতখানি down হ'য়ে (নেমে) গেছে। আদর্শনেশা যদি ঠিক না থাকে, তাকে যে-কাজেই দেন না কেন, ঐ যা' ক'ল অমনতরই হ'য়ে থাকবে। ব'লে ছড়া দিলেন—

ইষ্টনেশা ঠিক থাকে তো
শিক্ষা উছল হয়,
নইলে শিক্ষা অবশ মনে
গোলামীকেই বয়।

ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার ব'লে চললেন—তারপর আপনি দেখেন, গোলামই যদি বলেন, দেশে একটা ভাল গোলাম নেই। শুনতে পাই, আলতামাস্ নাকি গোলাম ছিল। পরে emperor (সম্রাট) হয়েছিল।

কেষ্টদা—সে slave (ক্রীতদাস) ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে তো আরো খারাপ।

কেষ্টদা—আপনার এই উপদেশগুলি দেশের মধ্যে খাটাবার soil (ভূমি) নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই sound-টা (ভাবটা) মাথার মধ্যে সবসময় যাতে thrill করে (সাড়া জাগায়) সেইভাবে কাজ করতে হয়। Thrill করতে করতেই (সাড়া জাগাতে জাগাতেই) উপায় বের হয়।

কেষ্টদা—আগে গ্রামে গেলে কত শান্তি পাওয়া যেত। এখন আর তা' নেই। এখন মানুষ শুধু পেটের জন্য যা' করার করছে। প্রকাশকে এক গ্রামে পাঠিয়েছিলাম।

সেখানে এক বাড়ীতে কয়, ঠাকুরের ইষ্টভৃতি খেয়ে ফেলেছি, বৌয়ের গওনা খেয়ে ফেলেছি, লক্ষ্মীর কৌটার টাকাও খেয়েছি। আর কিছু নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বীজ সবসময় রাখাই লাগবে। বেছন না রাখলে পরে আর ফসল করা যাবে না। তারপর ছড়ায় বললেন—

বীজ খেয়ে তুই করবি ফসল
সেটি হবে না,
বীজ হ'তে তুই করলে ফসল
পাবি নন্দনা।

তারপর আবার ব'লে চললেন—আমার দেওয়া ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী, এ সবই হ'ল বীজ। এগুলিকে আগে ঠিক রাখা দরকার। আর, ঐ যে গ্রামে বলেছে, ওকথা আপনি গেলে বলতেই পারত না। সেইজন্য সেরকম লোক যাওয়া চাই। ঐ যে কী একটা কবিতা আছে—

কৃষক লাঙ্গল ধরে
দ্বিজ কোশাকুশি করে
উৎসাহে বসিল রোগী
শয্যার উপরে।

মানুষকে ঐরকম উৎসাহে জাগিয়ে দিতে এবং কর্ম্মতৎপর ক'রে তুলতে না পারলে তো imparting (সঞ্চারণা) হবে না। মানুষ নীচের দিকে নেমে যাবেই।

পৌনে এগারোটা হয়ে গেল কথা বলতে বলতে। আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের উঠতে দেরী হচ্ছে। উপস্থিত সকলে এখন উঠতে বলছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের দিকে একটু তাকিয়ে বললেন—দেখি, ওঠবানে।

বিশুদা—১০-৪৮ এ উঠলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা, ঐ সময় আমাকে কোস্।

তারপর ১০-৪৮ এর সময় উঠে প্রভু স্নানে গেলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর পেট ভার বলছেন। ডাঃ প্যারীদা (নন্দী) এসে ওষুধ দিলেন। দুদিন বাদে সরস্বতী পূজা। আজ ঠাকুরবাড়ীর পূজার প্রতিমা আনা হল। যতি-আশ্রমের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে প্যাণ্ডেল তৈরী ক'রে পূজার আয়োজন হচ্ছে।

১৭ই মাঘ, ১৩৬৬, রবিবার (ইং ৩১। ১। ১৯৬০)

সকালে বেশ শীত। খড়ের ঘরের পূর্ব্বের বারান্দায় রোদ ছড়িয়ে পড়ল বেলা হতেই। সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের শয্যা প্রস্তুত করা হল। সকাল আটটায় শ্রীশ্রীঠাকুর রোদে এসে বসলেন।

হাওড়া থেকে জগৎদা (চক্রবর্ত্তী) লাল ধানের বেসন নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখালেন। তারপর তাঁর নির্দ্দেশে ভোগের ঘরে দিয়ে এলেন। জগৎদা ফিরে আসার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার ছড়াগুলি ওদের শোনালে বোঝা যেত কিরকম হচ্ছে।

সম্প্রতি দেওয়া অনেকগুলি ছড়া আমি প'ড়ে শোনালাম। শোনার পরে জগৎদা বললেন—খুব সুন্দর আর খুব practical (বাস্তব)।

এই সময় বদ্রী দোবে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর জগৎদাকে বললেন—এই, তুই ওরে একটা গরম চাদর কিনে দিবি?

জগৎদা 'আজ্ঞে দেব' বলে তখনই বাজারে রওনা হলেন চাদর কিনতে।

সকালে মাঝে-মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুরের বেশ কাশি হচ্ছে। শ্রীশ্রীবড়মাও সর্দ্দিকাশিতে আক্রান্ত।

বিকাল হ'তে হ'তে শ্রীশ্রীঠাকুরের টেম্পারেচার বেড়ে হ'ল ৯৯। সান্ধ্য প্রণামের আগে সূর্য্যদা (বসু) এসে বললেন—খাটের কোণায় গুঁতো লেগে বড়দা পায়ে ব্যথা পেয়েছেন, তাই তিনি আজ আসবেন না।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর চিন্তান্বিত স্বরে বললেন—কাম হইছে তাহলে।

আজ সান্ধ্য প্রণামে পরমপূজনীয় ছোড়দাও এলেন না। এদিকে শ্রীশ্রীবড়মারও শরীর অসুস্থ। তাই, আজ কেবল ঠাকুর-প্রণামই হল। প্রণাম শেষ হওয়ার পর পূজনীয় কাজলদা সুশীলদার (বসু) সাথে এসে পৌঁছালেন কলকাতা থেকে। সাড়ে ছ'টায় শ্রীশ্রীবড়মার টেম্পারেচার দেখা হল ১০০.৮ এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ৯৮.২। নিজের টেম্পারেচার শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অন্যান্য দিন এ সময় ৯৭.৪ থাকে। তার মানে আজ বেশী।

আজকের আবহাওয়ায় শীত একটু কম বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য সারাদিন ধরে খুব জোর পশ্চিমা হাওয়া চলেছে।

নৈহাটি থেকে মহাদেবদা (পোদ্দার) চৈ গাছের দুটি চারা নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাতেই তিনি খগেনদাকে (মণ্ডল) ডাকতে বললেন। খগেনদা এলে বলছেন—দেখ্ তো, তোর জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে ওটা বাঁচাতে পারিস কিনা।

খগেন দা 'আজ্ঞে দেখি' বলে চারা দুটো নিয়ে চলে গেলেন।

মহাদেবদা—অনেকে স্বপ্ন দেখেন আপনি তার কাছে কিছু চাচ্ছেন। স্বপ্নে এই চাওয়াটাকেও কি নির্দ্দেশ বলে ধরে নিতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার bead of conscience (চৈতন্যের মালিকা) ওরকম দেখায়। আর, আমাকে দেখে, তার মানে আমাতে যুক্ত আছে সে। আমাকে দেওয়ার প্রেরণাটা তার ঐ টান থেকেই মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। ওটা ভাল লক্ষণ। বলে ছড়া দিলেন—

যোগ মানেই তো ইষ্টেতে যোগ
নিদেশপালী কৃতিদীপনায়,
নিদেশ-অনুশীলন সার্থকতায়
যেমন যোগে বোধ জন্মায়।
বুদ্ধ হয় তো যোগ-তপনায়
সুবিন্যাসী কৃতির জ্ঞানে,
যার ফলে সে হয় ফলবান
সার্থকতায় বোধির দানে।

রাত প্রায় নয়টা বাজে। আরো হাজার দুয়েক ছড়া দেবেন বলে মনস্থ করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সেই কথা উল্লেখ ক'রে বলছেন—এ কি পাড়ি দিতে পারব নে?

বিশুদা হেসে বললেন—ছড়ার সংখ্যা যখন মোটে পাঁচশ ছিল তখন থেকেই আপনি ঐ কথা বলছেন। এ দু'হাজার তো হয়েই যাবে, আরো কত দু'হাজার হবে।

এই সময় সুশীলদা (বসু) এসে বসতে দয়াল তাঁকে বললেন—আজ রে চিঠি লিখেছে। (হাউজারম্যানদা এখন আমেরিকায় আছেন। সেখান থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে চিঠি লিখেছেন)।

সুশীলদা—কী লিখেছে?

চিঠির বক্তব্য আমি সুশীলদাকে বললাম। তারপর বললাম—চিঠির মধ্যে, হাউজারম্যানদা ওখানে যাদের কাছে ঠাকুরের কথা বলেছে তাদের কয়েকজনের ঠাকুর সম্বন্ধে মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে দিয়েছে। মন্তব্যগুলি এইরকম—Your Thakur is more Christian than Christian. Your Thakur is a great scientist. Your Thakur is very practical. (তোমার ঠাকুর খ্রীস্টানদের থেকেও বেশী খ্রীস্টান। তোমার ঠাকুর একজন বিরাট বৈজ্ঞানিক। তোমার ঠাকুর অত্যন্ত বাস্তববাদী)।

মৃদু হেসে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি আবার scientist (বৈজ্ঞানিক), তা' আবার ওদেশের লোকেও কয়।

সুশীলদা—আপনার সবই তো science-এর (বিজ্ঞানের) ওপর base (ভিত্তি) ক'রে বলা।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর আর একটি ছড়া বললেন—

আবৃত্তি যদি বোধ না আনে
অনুশীলনী কর্ষণায়,
বাস্তব বোধ কোথায় পাবি
শুধু বাক্-এর বর্ষণায়?

মহাদেবদা—আপনার এই ছড়াগুলি হচ্ছে একেবারে unique (তুলনাহীন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চুট্‌কি মত হয় নি?

মহাদেবদা—তা' হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এগুলির কিন্তু এখনও final touch দেওয়া (পাকাপাকিভাবে ঠিক করা) হয় নি। আমারও তো বিদ্যে জানিস্। কী কইতে কী কই। তোরা একটু নজর রাখিস্।

বলে ছড়া বলতে থাকেন—

বাঁচাবাড়ার সমস্যা যাদের
অন্তরেতে স্বতঃই জাগে,
ধর্ম্মকথা, ধৃতিচলন
তাদের জানিস্ ভালই লাগে।

পর পর অনেকগুলি ছড়া বলে যাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—আজ মোট কত হল?

বললাম, ২৬ টা, তা' শুনে তিনি বললেন—চল্লিশ-পঞ্চাশটা ক'রে হলেই হয়।

রাত দশটায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আবার টেম্পারেচার নেওয়া হল ৯৮.২।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনও ৯৮.২ থাকে কি করে?

বিশুদা—হ্যাঁ, ওটা আর নামে নি।

১৮ই মাঘ, ১৩৬৬, সোমবার (ইং ১। ২। ১৯৬০)

আজ শ্রীপঞ্চমী। সকাল থেকেই সরস্বতী পূজামণ্ডপে পূজার আয়োজন। যথাসময়ে পূজা সুসম্পন্ন হল। প্রতিবারেই শ্রীশ্রীঠাকুর সরস্বতী-মণ্ডপে যেয়ে নতজানু হয়ে মায়ের সামনে পুষ্পাঞ্জলি দেন। এবার শরীর অসুস্থ থাকায় মণ্ডপে তাঁর যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। খড়ের ঘরের বারান্দাতেই পুষ্প-বিল্বপত্রাদি ও অর্ঘ্যপত্র এনে দেওয়া হল। পুরোহিত মশাই এলেন। বারান্দায় বসেই মায়ের উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ করে অঞ্জলি দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

আজ সন্ধ্যার পরে রঙ্গন-ভিলায় পরমপূজনীয় ছোড়দার পরিচালনায় বিরাট ভোজের ব্যবস্থা। আশ্রমের বহু লোক নিমন্ত্রিত। সারাদিন ধরে সেখানকার প্রস্তুতি-যজ্ঞ চলল। সন্ধ্যা হতেই দলে-দলে লোক রঙ্গন-ভিলায় সমবেত হতে থাকে। যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়। সব মিটতে রাত প্রায় সাড়ে এগারটা হয়ে যায়।

আজ সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ীতে সরস্বতীমণ্ডপে বিরাট সৎসঙ্গ অধিবেশন হয়।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের টেম্পারেচার ছিল সাড়ে আটানব্বুই। পূজ্যপাদ বড়দার আজ একটু জ্বর হয়েছে। টেম্পারেচার ১০০.২। রাতের দিকে কমে ৯৯-তে আসে।

আজ বিকালে শরৎদা (হালদার) শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ধ্যান সম্বন্ধে জানতে চাইছিলেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—আমি ধ্যান মানে শুনেছি মা'র মুখ দিয়ে। সেইমত করেছি। করতে করতে ঠেকেছি। আবার উঠেছি। এইভাবে ক'রে ক'রে ঠিক হয়েছে।

১৯শে মাঘ, ১৩৬৬, মঙ্গলবার (ইং ২। ২। ১৯৬০)

আজ শুক্লা ষষ্ঠী। সরস্বতী পূজা-উপলক্ষে পূজনীয় কাজলদা কলকাতা থেকে এসেছেন। তিনি এখন কলকাতায় থেকে ডাক্তারী পড়ছেন। আজ সকালে খড়ের ঘরে বসে শ্রীশ্রীঠাকুর কাজলদার সাথে বিভিন্ন রোগ ও ওষুধ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলছেন।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন দয়াল ঠাকুর—এ্যালোপ্যাথি আর হোমিওপ্যাথিতে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু ডোজ-এ। সেটা বিবেচনা ক'রে দিতে হয়। আমি আগে খুব মিষ্টি খেতেম চুরি করে। তার জন্য মারও খেতেম, গালাগালিও করত বোধ হয়। তারপর ভাবলাম, মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করে, তিতে খেতে ইচ্ছে করে না কেন? এই ভেবে একদিন ভাটির ডগা খেলাম। খাওয়ার পরে গা মোচড়াতে লাগল, মুখ দিয়ে জল উঠতে লাগল। তারপর একদিন আমরা সব একসঙ্গে আছি। আমাদের মধ্যে ছিল হেম চৌধুরী। সে হঠাৎ বলছে ভাই, আমার বড় পেট মোচড়াচ্ছে। মুখ দিয়ে জল উঠছে। আমি যাই। এই শুনে আমি বললাম, দাঁড়া, তোরে ঠিক ক'রে দিচ্ছি। বলে খানিকটা জলে ঐ ভাটির আগা গুলে ওরে খাওয়ায়ে দিলাম। মিনিট পনের পরে ও কয় 'গিয়েছ, গিয়েছ' (গেছে, মানে সেরে গেছে)।

বলে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে লাগলেন। তাঁর বলার ভঙ্গী শুনে সকলেই হাসছেন। তারপর দয়াল আবার বলছেন—ওষুধের chemical ও physical ingredients (রাসায়নিক ও পদার্থগত উপাদান) দুটোই দেখা লাগে।

বার বার কাশি আসছে শ্রীশ্রীঠাকুরের। একবার কাশি থামতে বললেন, এই যেমন আমার কাশি হচ্ছে। সাথে এই যে হাক্-থু হাক্-থু করছি, এমন ওষুধ বের করা লাগে যাতে এ দুটোই বন্ধ হয়। একটাতে যদি না হয় সেখানে তার সাথে আর একটা add (যোগ) করতে হয়।

কাজলদা—এ সব জানতে হলে আরো details-এ (বিশদভাবে) পড়া লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এখানে এই সব বইতে যা' আছে তাতে ভেসে যায়। বড় ডাক্তার হওয়ার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। তারপরে আরো culture (অনুশীলন) করা লাগে। ওষুধের compatibility (উপযোগিতা) দেখে দেখে ওষুধ দিতে পারলে ঠিক কাজ হয়।

কাজলদা—ওষুধের chemical compatibility (রাসায়নিক সংগতি) ঠিক থাকলেই তো হয়, physical compability (পদার্থগত সঙ্গতি) তো না দেখলেও চলতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তাও দেখা লাগে। Physiological compatibility (পদার্থগত সঙ্গতি) মানে constitutional compatibility (বৈধানিক সঙ্গতি)। যেমন ধর একটা ওষুধ আছে, তুমি দেখলে তার chemical compatibility (রাসায়নিক সঙ্গতি) ঠিক আছে। কিন্তু ওষুধটা খাওয়ানোর পর দেখলে রোগীর শরীরে sugar (শর্করা) বেড়ে গেছে। ফলে, সেটা কিড্‌নীর উপরও affect করতে (প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে) লাগল। তার মানে, ওষুধ নির্ব্বাচন তোমার ঠিক হয় নি। একটা ওষুধ কাউকে দিতে গেলে দেখতে হয়, কোন্ organ-এর (অঙ্গের) উপর তার কেমন effect (ক্রিয়া) হচ্ছে।

সেইজন্য আগে প্যাথোলজি পড়া লাগে। এইসবের উপর একবার যদি interest (আগ্রহ) এসে যায়, কেমন ক'রে কী হয় যদি ঠিকমত ধরতে পার, তাহলে ভুল কমই হবে। আচ্ছা, প্যাথোলজির বাংলা কি 'নিদান'?

কাজলদা—প্যাথোলজির সঙ্গে ফিজিওলজিও তো জানতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফিজিওলজি তো পড়ছই। প্যাথোলজিটা ভাল ক'রে জানা দরকার।

ইতিমধ্যে বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) অভিধান দেখে বললেন—নিদানের ইংরাজী আছে প্যাথোলজি। তারপর বললেন—সাধারণভাবে নাদকারণির বইটা ঘাঁটলেই অনেক জানা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, বই না ঘাঁটলে চিকিৎসা করা যায় না। আমার দুখানা বই ছিল, একখানা 'চিকিৎসাপ্রকাশ' আর একখানা কী যেন! আমি পড়তাম আর 'নোট' করতাম। সেই সব 'নোট' আমার রাখার ইচ্ছা ছিল। তা' আর হল না।

কাজলদার আজ কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা। ফোনে সেকথা জানাতে হবে। বিশুদাকে সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ফোন করবি নে?

বিশুদা কলকাতায় 'ফোন বুক' করতে গেলেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর কাজলদাকে বললেন—আজ তোর যাওয়ার কথা আছে। তোর মা একা আছে। কেমন আছে জানবি ফোন ক'রে। আর বলবি, হয়তো আজ যাব।

কাজলদা—হয়তো কেন? কাল তো একবার 'হয়তো' দিয়ে বলেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলিস্ যে বাবা এইভাবে বলতে বললেন। 'হয়তো' যোগ ক'রে বলতে বললাম এইজন্য যে, তোমার যাওয়া positive-ই (নিশ্চিতই) আছে, কিন্তু যদি কোন কারণে কোন গোলমাল হয়, তোমার যাওয়াতে বাধা পড়ে, ঐ 'হয়তো' থাকার জন্য তোমার মা ব্যস্ত হবেন না।

ইতিমধ্যে বীরেন ভট্টাচার্য্যদা এসে কাছে দাঁড়িয়েছেন। কিছুদিন আগে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে তুলসী, বাসক ইত্যাদি পাঁচ রকমের গাছের পাতা দিয়ে সর্দ্দিজ্বরের একটা ওষুধ তৈরী করতে বলেছেন। ওষুধটির নামকরণ এখনও হয় নি। সেই প্রসঙ্গে বীরেনদাকে বলছেন এখন—ওটার নাম Penta Folin (পেন্টা ফোলিন) রাখলে কেমন হয়?

বীরেনদা একটু চিন্তা ক'রে বললেন—হ্যাঁ, পাঁচটা পাতা যখন, Penta দিয়ে বলা যায়। কিন্তু এটা করতে অনেক তুলসী পাতা দরকার।

ডেকলাল (ভার্মা) সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখিয়ে দয়াল ঠাকুর বললেন—ওকে ক'লে হয়।

ডেকলাল—হ্যাঁ এনে দেব। কত চাই?

বীরেনদা—এক মণ।

ডেকলাল—অত হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' পারিস এনে দে। আর এবার বাড়ী বাড়ী তুলসীর বাগান ক'রে দিস্, যাতে দরকার হলে পাঁচ মণ তুলসীপাতা যখন-তখন জোগাড় ক'রে ফেলতে পারিস।

ডেকলাল খুশী মনে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হেসে বীরেনদাকে বললেন—এ সব কাজ কি হনুমানকে না বললে হয়? (সম্মুখে দণ্ডায়মান চৌধুরীকে দেখিয়ে বললেন)—চৌধুরীকে যদি আপনি খেতে দিতে পারেন, ওকে চাকরীটা ছাড়ায়ে দিতে পারেন, তাহলে ওকে দিয়ে আপনি ঢের কাম করিয়ে নিতে পারেন।

তারপর চৌধুরীকে বললেন—কিন্তু বীরেনদার একটা দোষ আছে। কেউ যদি তার সাথে কথার খেলাপ করে তাহলে তাকে কিছু কয় না, কিন্তু নিজের মনটা খারাপ হয়ে যায়। যেমন, তোমার হয়তো বিকালে আসার কথা, আসলে না। আবার ঐ আসার সময় যখন, তার আগে যদি একটা খবর পাঠাও যে তোমার শরীর খারাপ হওয়ার জন্য আসতে পারছ না বা আর কিছু, তাহলে বীরেনদা ভারি খুশী। নতুবা সময়মত আসলে না বা কোন খবরও দিলে না, এতে বীরেনদা ভাবে, আমার উপর ওর কোন ভালবাসা নেই।

কথায়-কথায় সকাল সাড়ে আটটা বাজল। গৌর সামন্তদা (মেদিনীপুর) এক হাঁড়ি ঘি ও কিছু শসা নিয়ে এসে পৌঁছাল। ঘি দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও তো শৈলেনের ঘি।

গৌরদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দিয়ে দে ওকে।

গৌরদা হাঁড়িটা শৈলেনদার (ভট্টাচার্য্য) হাতে দিয়ে দিল। কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন মহাদেবদা (পোদ্দার)। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘিটা মহাদেবদাকে দেখাতে বললেন। মহাদেবদা আঙ্গুলে একটু তুলে নিয়ে শুঁকে বললেন—ভাল। উপস্থিত আর সকলেও ঐভাবে শুঁকে দেখে ভাল বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার যে ঘি আছে সেটা পুরানো হয়ে গেছে, কিন্তু গন্ধ-রঙ ঠিকই আছে।

মহাদেবদা তাঁর দাদা সম্বন্ধে বলছিলেন—আমার দাদা খুব ভাল বলতে পারেন। তাঁকে যদি ধরে রাখা যায় এদিকে, কাজ বেশী হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বভাবেই যার ধরে থাকা থাকে, সে বড় হয়। আর, যাকে ধরে রাখা লাগে তার আর হয় না। বলে ছড়া দিলেন—

ধরে থাকাই স্বভাব যাদের—
থাকলে কৃতি-উর্জ্জনা
জীবন তাদের রয় না ফাঁকা
উথলে ওঠে নন্দনা।

মহাদেবদা—সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে মন মাঝে-মাঝে খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, ঢিলেমি আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও আসে, fatigue (ক্লান্তি) ওর নাম। কিন্তু ঐ fatigue-টা (ক্লান্তিটা) পার হয়ে গেলেই আবার কর্ম্মতৎপরতা আসে। জেমস্ ওটাকে fatigue layer (ক্লান্তিস্তর) না কী যেন বলেছে।

এই পর্য্যন্ত বলেই ছড়ায় বলতে থাকলেন—

করার পথেই হওয়া থাকে
থাকলে কৃতিনেশা অঢেল,
উচ্ছলাতে উথলে ওঠে
হয় না অবসাদে ঘায়েল।
বাঁচাবাড়ার কথা আরো
বিভব-বিদ্যায় কৃতির টান,
এ ছাড়া যে আলোচনা—
সত্তাস্বার্থের কোথায় স্থান?

বেলা প্রায় দশটা পর্য্যন্ত এরকম ছড়া দেওয়া চলল। কিছু পরে তুফান এক্সপ্রেসে সুশীলদা (বসু) কাজলদাকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হয়ে গেলেন।

দুপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাল ঘুম হ'ল না। বেলা দুটার সময়েই উঠে বসলেন। আজ বিকালে সরস্বতী প্রতিমা নিরঞ্জন হল।

২০শে মাঘ, ১৩৬৬, বুধবার (ইং ৩। ২। ১৯৬০)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরের বারান্দায় বিছানো শুভ্র শয্যায় যেয়ে বসেছিলেন রোদে। ন'টা বাজতে ওখান থেকে এসে ঘরে বসলেন। ভক্তগণ অনেকেই উপস্থিত। নানারকম কথাবার্ত্তা চলছে।

কথাপ্রসঙ্গে প্রফুল্লদা (দাস) বললেন—আপনি আমাদের কাছে কী প্রত্যাশা করেন তা' পরিষ্কার ক'রে একটা জায়গায় থাকলে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার পছন্দ কী তা' তো জানই। আমার ইচ্ছে ছিল এসব কাজকর্ম্মের সাথে টাকাপয়সার কোন সম্বন্ধই থাকবে না। (ক্ষণেক নীরব থেকে) আমি তালে আছি খোঁড়ার, দেখি কী হয়!

প্রফুল্লদা—আমাদের ছেলেদের মধ্যে কি ক'রে যেন চাকরী করার নেশা ঢুকে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি চাই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।

প্রফুল্লদা—কিন্তু আগেকার দিনের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা তো বিয়ে-থাওয়া করত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ও দুটোই চাই। বিয়েও করবা, আবার ওরকমও থাকবা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিতে থাকেন। স্নানবেলা পর্য্যন্ত চলল ছড়া দেওয়া। আবার, সন্ধ্যাতেও শুরু হল এই স্রোত। সারাদিনে ৫৯টি ছড়া বললেন আজ।

২১শে মাঘ, ১৩৬৬, বৃহস্পতিবার (ইং ৪। ২। ১৯৬০)

আজও সকালে উঠে কয়েকটি ছড়া পর পর বলে গেলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তারপর বেশ কাশি হল। কাশির দমক কমার পরে উঠে একবার পায়খানায় গেলেন।

পায়খানা থেকে এসে বসেছেন খড়ের ঘরের ভিতরে চৌকিতে। মদীয় পিতৃদেব শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কাছে ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—নবশায়করা কোন্ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো বের করতে বলেছি এগুলো। কত জনকে কইছি।

বাবা—কিন্তু দীক্ষাপত্রে লেখার সময় তাদের বর্ণের ঘরে আমরা কী লিখব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতদিন ওদের বর্ণ ঠিক ঠিক না বেরোয়, ততদিন 'নবশায়ক-তন্তুবায়', 'নবশায়ক-তিলি' এরকমভাবে লেখা লাগে। আর শোন্, তোরে আর এক কথা কয়ে রাখি। শৈলেনের (ভট্টাচার্য্য) জন্যে একটা ভাল মেয়ে দেখিস।

বাবা—আজ্ঞে দেখব।

এরপর আবার কয়েকটি ছড়া দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

২২শে মাঘ, ১৩৬৬, শুক্রবার (ইং ৫।২।১৯৬০)

আজও প্রায় সারাদিন ধরেই শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিচ্ছেন ও সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), প্রমুখ ভক্তগণ সকালে-সন্ধ্যায় দুবেলাই এসে বসছেন।

আজকের ছড়াগুলির মধ্যে দোল-পার্ব্বণের তাৎপর্য্য উদ্‌ঘাটন ক'রে কয়েকটি ছড়া প্রদান করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। যেমন—

কোকিল ডাকে গাছের ডালে
ডাকে পাপিয়া পিউ-পিউ,
উদ্দীপনার মিলনরাগে
উঠল যেন দীপন-ঢেউ।
ধুলোগুলি ছড়ায়ে বাতাস
করে কত ঘূর্ণিপাক,
প্রকৃতিরই ফাগুন-খেলা
আনন্দেরই স্ফূর্তিরাগ।
দুনিয়াটায় দোলের আবীর
যেমনতর উড়ছে ঐ,
ফাগুন মাসে দোলের ফাগ
নাচছে তেমন তাথৈ থৈ।
দোলার তালে উছল হয়ে
ওড়না দোলে কেমন রূপ,
আবীর-ওড়নার অস্তিত্বটা
সাজালো কেমন হোলির স্তূপ!

কিছু ছড়া দেবার পর উপস্থিত দাদাদের সাথে ঐ প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। আলোচনার পর আবার ছড়া দেওয়া চলছে।

উপরি-কথিত ছড়াগুলির অর্থ বুঝিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর এখন বললেন—ফাগুনটা কিরকম? ধরেন, আপনার নাতি আছে। আপনি বাড়ী গেলেই

সে আনন্দে নেচে ওঠে। সেইরকম ফাগুনও আমাদের কাছে tasteful—স্বাদনযুক্ত। আর, আনন্দ হল নন্দ্-ধাতু থেকে, মানে কম্পন, আবেগ। আবেগ হলেই আনন্দ হয়। আবেগের অভাব ঘটলেই দুঃখ হয়। তাই, আবেগের জোয়ারে আছে আনন্দ, আর ভাটায় দুঃখ। —ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এই যখন ঘূর্ণি ওড়ে, ধুলোপাতা সব ঘূর্ণিপাকের মতন উড়তে থাকে। সেগুলো আবার গাছটাকে, ঘরবাড়ীর উপর প'ড়ে একেবারে ঠেসে ধরে। এই ধুলোপাতা, খড়কুটো যেয়ে পড়ে গাছপালাগুলিকে যেন হোলির রাজা সাজায়। আর, ওরই অনুকরণে মানুষকেও নানা রংচং মাখিয়ে হোলির রাজা সাজানো হয়। এই ঘূর্ণি আবার কত রঙ্গ করে। মানুষের মাথায় ছাতা থাকলে তা' টান দিয়ে নিয়ে যায়।

তারপরের ছড়া—

বসন্তেরই আবাহনে
ঐ পরে বাসন্তী শাড়ী
দুলে দুলে উচ্ছলতায়
ঘুরছে কত সারি সারি।

এ ব্যাপারটা কেমন বোঝাতে যেয়ে দয়াল ঠাকুর বললেন—ফাল্গুন মাসে গাছের পাতাগুলি হল্‌দে হয়ে যায়, আর চৈত্র আসলেই ঝরা আরম্ভ হয়। এখন, ঐ যে পাতাগুলি হলদে হয়ে আছে, দেখলে মনে হয় গাছগুলি সব বাসন্তী রং-এর শাড়ী পরে আছে। প্রকৃতির দেখাদেখি মানুষের মধ্যেও ঐ বাসন্তী রং-এর শাড়ী পরার চল আসল।

পরের অবতীর্ণ ছড়া—

নিষ্ঠাদ্যুতির দ্যোতন-আলো
ঢুকলো রে সব অন্তরে,
আনন্দেরই রসাল লীলা
ঢুকলো হৃদয়-কন্দরে।
স্বাদনক্রিয়ায় থিয়া-নাচনে
উচ্ছ্বসিত ফোয়ারা রসের,
ইষ্টযোগের নিষ্ঠা নিয়ে
পান ক'রে সব হও না ঢের।

এই ছড়া দুটি সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—স্থির ও চরের ভিতরে নিয়ত চলেছে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। বিপরীত প্রান্তদ্বয়ের এই দোলায়মান অনুচলনই হল রস-নাচন বা দোললীলা। তাই, দোলপার্ব্বণ আমাদের remind (স্মরণ) করিয়ে দেয় সেই পুরুষোত্তমকে। তাঁর সাথে যুক্ত হওয়ার আবেগ বাড়িয়ে দেয়।

পরের ছড়া—

রসের ঈশ্বর যে জন তোমার
তিনিই মূর্ত্ত হন রসে,
নাচের তালে অমৃত বয়
বস্তু আসে জীবন-বশে।

এই ছড়া প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমার যা-কিছু আছে, তুমি যদি সেগুলিকে পুরুষোত্তম যেমন চান সেইভাবে ব্যবহার কর, তখন ঐগুলি হয়ে ওঠে জীবনের পক্ষে স্বাদু, মধুময়, অমৃততুল্য। তাঁকে প্রীত করার ধান্ধা থাকে বলে ঐ অমৃত তোমার বশেও থাকে, অর্থাৎ তোমার ইচ্ছামত তা' তুমি ব্যবহার করতে পার। আর তার ফলেই তোমার বোধে আসে, তিনিই 'রসো বৈ সঃ'।

পরের ছড়া—

দীপগুলি ঐ সারি সারি
জ্বলছে কেমন হেলেদুলে,
মিলনরসে মাতাল হয়ে
ক্রমান্বয়ে উঠছে ফুলে।

এই ছড়ার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পরম দয়াল বললেন—দোলের সময় দীপ দেয়। উপরে পুরুষোত্তম থাকেন। আর নীচের প্রত্যেক থাকে-থাকে দীপ থাকে। এই দীপগুলি মানে আমরা—এই গাছপালা, মানুষ, গরু, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি সব। দীপগুলি পুরুষোত্তমের আরতি করে। সম্বেগ নিয়ে যেন মিলিত হতে চায় তাঁর সঙ্গে। তেমনি আমরাও আমাদের মিলন-আকৃতি নিয়ে যেন সেই পুরুষোত্তমকেই কামনা করি, যুক্ত হতে চাই তাঁর সঙ্গে।

এগুলি শেষ হয়ে যাওয়ার পর অন্য প্রসঙ্গে আরো কিছু ছড়া বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

২৪শে মাঘ, ১৩৬৬, রবিবার (ইং ৭। ২। ১৯৬০)

সকাল আটটা। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসেছেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা চলছে। কথায়-কথায় কেষ্টদা বললেন—সত্য, ন্যায়, justice (বিচার), এ ক'টা কথার মানে তো বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লিখে রাখ্ ও-কয়টা কথা।

খাতায় লিখলাম। তারপর এ সম্বন্ধে ছড়া দিলেন—

বাস্তব বোধ গজায় যাতে
বিন্যাসদ্যুতি বর্ষণে,

সত্য জানিস্ তাকেই বলে
উৎসারিত কর্ষণে।
বাস্তবতার বিনায়নে
ন্যায্য হয়ে যেটাই নেয়,
ধী-তৃপণী উদ্বর্ত্তনা
তাকেই জানিস্ বলে ন্যায়।
বাস্তবতার তথ্য জেনে
ন্যায্য যেটা, উচিত যেটা,
তেমনতরই বুঝে করা
ছোট্ট কথায় বিচার সেটা।

পরে কেষ্টদা বললেন—ন্যায় এবং বিচারের কতরকম আদর্শ যে দেশে হয়েছে। দাঁত ভেঙ্গে দিলে তার দাঁত ভেঙ্গে দেবে। তোমাকে কেউ মারলে তাকে মারবে। এইসব কতরকম!

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা এক সময় ছিল। কিন্তু দাঁত ভাঙ্গলেই যদি উলটে দাঁত ভাঙ্গি তাহলে দাঁত আর কারো থাকবে নানে। দাঁতের utility (প্রয়োজনীয়তা) আমি যেমন বুঝি, অপরেও তেমনি করে বুঝুক, এইতো ন্যায়। সত্য মানে আমি তো বুঝি অস্তিত্বের ভাব।

কেষ্টদা—মানুষের পক্ষে কোন্‌টা হিতকর তা' বোঝা মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা বোঝা যায়। যাতে আমি ভাল থাকি, সম্বৃদ্ধ হই, তাই আমার পক্ষে হিতকর। শুধু টাকা-পয়সায় সম্বৃদ্ধ না, আমার ঐশ্বর্য্য আছে কিনা, তার মানে আমি ধারণ-পালন-সম্বেগশীল কিনা! তাই হ'ল সম্বৃদ্ধি। তারপর ধর, ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করছে। যে চিকিৎসা-ব্যবস্থা রোগীর পোষণ নিয়ে আসে না তাই হল অন্যায়।

কেষ্টদা—কিন্তু এসব ঠিক রেখে চলা অনেক সময় মুশকিল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, অনেকখানি ধী লাগে।

কেষ্টদা—অস্তিত্বের প্রতিকূলে একরকম হিংসা আছে, আবার অস্তিত্বের অনুকূলেও হিংসা হতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অস্তিত্বের অনুকূলে যখন হয়, সেটা আর হিংসা হয় না। অপারেশন ক'রে মানুষের গা থেকে যখন একটা টিউমার কেটে বার ক'রে নেওয়া হয়, সেটা কিন্তু হিংসা হয় না। হিংসা কথাটা আমদানী করেছিল মানুষের পারস্পরিক হনন-বুদ্ধি। গীতার মধ্যে কি হিংসার কথা আছে?

কেষ্টদা—হ্যাঁ, ইষ্টার্থে যদি লোকহত্যা কর তাহলে হিংসা হবে না।

আগামীকাল কলকাতায় রঞ্জি স্টেডিয়ামে বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সৎসঙ্গের পক্ষ থেকে প্রফুল্লদা (দাস) যোগ দিতে যাচ্ছেন। তাঁকে বক্তৃতাও করতে হবে সেখানে। বেলা সাড়ে দশটার সময় প্রফুল্লদা এসে প্রণাম ক'রে প্রভুর কাছে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করার পর প্রফুল্লদা রওনা হয়ে গেলেন।

ঘড়ির কাঁটা এগারোটার দিকে চলেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের বেলা হল। তাঁকে ওঠার জন্য বলছেন সবাই। শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—দাঁড়া, পান দে।

তিনি উঠবেন বলে গড়াগড়া, পিকদানী সব সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেদিকে দৃষ্টি পড়তে বললেন—তামাক-টামাক সব নিয়ে গিছিস্?

তাড়াতাড়ি ক'রে তাঁর হাতে পান দিয়ে তামাক সেজে এনে দেওয়া হল। প্রসন্নচিত্তে তামাকু সেবন করছেন প্রভু। তাঁর এই প্রসন্নতা সবারই মনে এনে দিয়েছে একটা খুশী-খুশী ভাব। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানাদি-ক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সেবকগণ দেরী হওয়ার জন্য একটু উসখুস করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিকে দেখেও দেখছেন না। পরিবেশটা চমৎকারভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

এই সময় কেষ্টদা বললেন—আপনি বলতেন, আড্ডাঘরে ঘড়ি থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হেসে) ঘড়ি থাকলে রুটিন-মাফিক চলা যায়, কিন্তু মনের উদ্বেলন-অববেলন ঠিকমত হয় না। যখন আমি নিজে invalid (অক্ষম) হয়ে গেলাম, ঐ প্যারালিসিস্-এর মতন হল, তখন থেকে আমার এগারোটায় খাওয়া ঠিক হল। তবে একথা ঠিক, আসল জিনিস হল শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক flow (প্রবহমানতা)। এ দুটো যদি combined way-তে (মিলিত রকমে) না চলে তাহলে মুশকিল।

কেষ্টদা—বুদ্ধদেব নাকি বেলা বারোটার আগে খেতে বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ঠিক। মোট কথা, শরীরের পক্ষে যা' suit করে (উপযুক্ত হয়) তাই ভাল। আগে আমি একটু অত্যাচারও করেছি।

কেষ্টদা—অত্যাচারের reaction-ও (প্রতিক্রিয়াও) হয়। জেমস্ বলেছেন, ৭/৮ ঘণ্টা ঘুমোনোই ভাল। কিন্তু আপনার তো অনেক দিন না-ঘুমিয়েই কেটেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ঠিক।

কেষ্টদা—আজকাল ঘরে আমাদের খাবার তৈরী থাকেই। যেয়ে খেলেই হল, তা খিদে লাগুক আর নাই লাগুক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যদি হয় তাহলে খাদ্যটা আর maintaining fuel (পরিপোষণী উপকরণ) থাকে না, হয়ে পড়ে luxury (বিলাসিতা)।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানে উঠলেন। আজ বিকাল ৫টার আগে থেকেই ছড়া দেওয়া শুরু হল, চলল রাত সাড়ে ১১টা পর্য্যন্ত। সারাদিনে মোট ৬৬টি ছড়া হল। রাত ১২টায় শ্রীশ্রীঠাকুর শয়ন করলেন।

২৫শে মাঘ, ১৩৬৬, সোমবার (ইং ৮। ২। ১৯৬০)

প্রাতে খড়ের ঘরের পূবের বারান্দায় রোদে বসে শ্রীশ্রীঠাকুর আত্মা, নাদ, ভাববৃত্তি, জীবনের উদ্ভব, সৃষ্টিধারায় শব্দের প্রকারভেদ, প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি ছড়া প্রদান করলেন। ছড়াগুলির আবির্ভাবকাল সকাল ৭-২০ মিঃ থেকে ৯-২০ মিঃ। ছড়া দেওয়ার শেষে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসতে শ্রীশ্রীঠাকুর সবগুলি ছড়া ওঁকে শোনাতে বললেন। শোনানো হল। তারপর এইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হল। একটি একটি করে ছড়া পড়তে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

প্রথম ছড়া—

গতি স্পন্দ—যেমন শব্দ
ক'রে থাকে যেমন প্রকাশ,
তেমনতরই হয়ে থাকে
শরীর, মন আর সত্তার বিকাশ।

পরে ঐ সম্বন্ধে বললেন—ঐ গতির স্পন্দনটা হল life-current (জীবনস্রোত), যা' সব যা'-কিছুকে integrated (সংহত) করে রেখেছে। এর অভাবে সব কিছু disintegrated (বিচ্ছিন্ন) হয়ে পড়ে।

এর আগের ছড়াটি পড়া হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে—

আত্মিকতার স্রোত-কম্পন
যেথায় যেমন ধ্বনি আনে,
বিধানসহ অস্তিকতায়
রাখে অমনি জীবন-প্রাণে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ধ্বনিটা আবার আদি নাদও বটে, auto-stimulation (স্বতঃ-অনুপ্রাণনী শক্তি)।

কেষ্টদা—এর basis psychological (ভূমি মনোজগতে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Psychological (মনোজাগতিক) কেন, এটা পুরাপুরি psycho-material বা psycho-physical (মানস তথা বস্তুগত ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত)। যেটা সব যা-কিছুর ভিতরে নিয়ত চলৎশীল।

কেষ্টদা—কানটাকে adjust (সুবিন্যস্ত) ক'রে নিতে পারলেই আমি কতকগুলি শব্দ শুনতে পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো আপনার brain-এর tension (মস্তিষ্কের উত্তেজিত হওন-ক্রিয়া)।

কেষ্টদা—কিন্তু সেটা তো objective কিছু না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শোনা যেমন object (বিষয়), ঐরকম, outword object (বাইরের বিষয়) না।

তারপরের ছড়া পড়া হ'ল—

চলাফেরার নাচনতালে
কম্পনার যে নন্দনা,
সংঘাতে তার হয় তেমনি
জাগে তেমনি এষণা।

এর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নন্দনার মধ্যে আছে বৃদ্ধি ও দীপ্তি। আর, এষণা হল will to do (করণ-ইচ্ছা)। সেই আদি নাদে নিরন্তর থাকতে থাকতে আমার ভিতর যেমন ধরনের কম্পন জাগল, তেমনতর এষণা আমার সৃষ্টি হল।

পরের ছড়া—

গতির বেগের প্রতিফলন
যেমনতর উচ্ছলা,
আবেগ সৃষ্টি ক'রে চলে
তেমনতর সচ্ছলা।

এ সম্বন্ধে দয়াল বললেন—প্রতিফলন হল reflection. Reflection (গভীর চিন্তা) আবার ভাবিয়ে তোলে। Reflection in the vital current gives out আবেগ accordingly (জীবন-প্রবাহের মধ্যস্থিত গভীর মনন অনুরূপ আবেগ সৃষ্টি করে)।

পরের একটি ছড়া—

মূর্চ্ছা আনে যেমন দ্যুতি
স্নায়ুপথে যেমন বয়,
মস্তিষ্কেও তার প্রতিফলন
তেমনতরই হয়ে রয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূর্চ্ছার মধ্যে আছে মূর্চ্ছ্-ধাতু মানে বৃদ্ধি, দীপ্তি। তোমার মাথার মধ্যে যেমনতর reflection (মনন) এসে পড়ল, তেমনতর reflection (প্রতিফলন) আবার বাইরে ফুটে বেরোল। Fine particle-গুলি (সূক্ষ্ম কণাগুলি) ঐ ভাবকে added (বর্দ্ধিত) হতে সাহায্য করল, গুণান্বিত ক'রে তুলল ঐ ভাবনাকে। তাই হ'ল মূর্চ্ছা। এই যে ওষুধপত্রে ভাবনা দেয়, মানে তার গুণটাকে বাড়িয়ে তোলে। এখানেও সেই ভাবনা বা মূর্চ্ছা তদ্‌গুণবৃদ্ধির জন্য।

পরের একটি ছড়া—

শব্দভেদেই সৃষ্টি-স্তর
ভাবন-তপন-পরিণয়ে
বাধা ও গতির সংবেদনায়
মূর্চ্ছনা নিয়ে যাচ্ছে বয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিভিন্ন শব্দস্তর থেকেই বিভিন্ন রকম সৃষ্টি আবির্ভূত হয়েছে। এই মানুষ, গরু, পশু, পাখি, সবই সৃষ্টি হয়েছে আলাদা আলাদা শব্দস্তর থেকে। ভাবন মানে তার হওনক্রিয়া। হয়ে সে যখন চলতে আরম্ভ করল, তখন তার সেই চলার গতির একটা তাপ থাকে। সেটা হল তপন। আবার চলার পথে আছে নানারকম বাধা, সংঘাত। সেখানে সে shocked (আহত) হয়ে পরিণাম সৃষ্টি করছে, ক'রে কিন্তু থেমে নেই, আবার বাঁচার আকৃতিতে উদ্বর্দ্ধনার পথে এগিয়ে চলেছে। তারই নাম হল পরিণয়।

তারপর একটি ছড়া—

বৃত্তিগুলি গ্রন্থি জানিস্
ভাবদ্যোতনার সংবেদনে,
রঞ্জনা নিয়ে সেই ভাবেতে
রঙ্গিল হয়ে ওঠে মনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনপথে চলতে চলতে মানুষ যেখানে 'শক্' পায়, সেখানেই তার গ্রন্থির সৃষ্টি হয়। এই গ্রন্থির মধ্যে যেগুলি সে অস্তিত্বের উপযোগী করে তুলতে পারে, তাই তার সত্তায় স্থিতি লাভ করে। ঐগুলিই তাকে বিভিন্ন অবস্থায় হাসায়, কাঁদায়, কাজ করায়।

তারপর পড়া হল—

কম্পনা যেথায় সূক্ষ্মতে যা'
আকর্ষণ-বিকর্ষণ বিরমনে,
দয়ালদেশটি তাকেই বলে
স্বতঃদীপ্ত সংরক্ষণে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দয়ালদেশ হল maintaining current of existence (অস্তিত্বের রক্ষণী প্রবাহ)। সেখানে আছে শুধু সূক্ষ্ম কম্পন। তাছাড়া আর কিছু নেই। এই দয়ালদেশকে পরমাত্মা বলে।

তারপর—

সৃষ্টিরাগের কম্পন যেটা
বাক্-এ মূর্ত্ত আগে হল,
কম্পনারই মূর্ত্ত শব্দ
বিচ্ছুরণায় মূর্ত্তি নিল।
রক্ত-মাংস যা' হ'ল তা'ই
ঐ সবেরই পরিণতি,
সৃষ্টি হ'ল তেমনতরই
স্রষ্টার যাতে হল রতি।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কম্পনা হচ্ছে অনুরণন। তার basis (ভিত্তি) হচ্ছে ভাব। আর, বাক্ মানে শব্দ। তাইই সৃষ্টিতে মূর্ত্ত হয়। এই মাটি, জল, গাছ, পাথর, মানুষ, গরু সবই সেই শব্দেরই পরিণতি।

তারপর পড়া হল—

স্বতঃস্ফূর্ত যে কম্পনা
অস্তিনেশায় ডেকে আনে,
তারই শব্দ অনাহত—
জ্ঞানীজনা তাইতো ভণে।
আহত নয় এমন থেকে
কম্পন-শব্দ যা আসে,
অনাহত তাকেই বলে
যেমন রেণু ভাসে ত্রসে।

ত্রসরেণুর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দয়াল ঠাকুর বললেন—ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করলে সূক্ষ্ম যে সূর্য্যকিরণ আসে ঘরের মধ্যে, তার মধ্যে যে অতি ক্ষুদ্র কণা কাঁপতে কাঁপতে ভাসতে দেখা যায়, ঐগুলি হল ত্রসরেণু। ত্রস-এর মধ্যে কম্পন আছে। ওগুলি নিরন্তর গতিশীল। সেই ত্রসরেণুর মত অনাহত নাদও নিরন্তর চলেছেই—চঞ্চল সুন্দরের মত। আমার তো সবসময় ঐরকম শব্দ লেগেই থাকে মাথার মধ্যে।

ছড়াগুলি পড়া হবার কালে অনেকে এসে বসেছেন। কেউ কেউ সামনের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে যেন সমস্ত আকুলতা দিয়ে পান করছেন এই অমিয় কথানির্ঝর। সাধারণ চিন্তার অতীত এই বিষয়গুলির বাস্তব সুন্দর অভিব্যক্তি শুনতে শুনতে সকলে

অভিভূত। যে ছড়াটি যখন ব্যাখ্যত হচ্ছে, মানুষ তখনকার মত দয়ালের সাথে যেন সেই লোকে বিচরণ করছে। ভূতভাবন পরমপুরুষের বচনসুধা, তৎসহ তাঁর হস্তসঞ্চালন ও নয়নভঙ্গিমা মানবমনের যুগসঞ্চিত অজ্ঞতার বাঁধ যেন ভেঙ্গে খান-খান ক'রে ফেলছে। এ এক অননুভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা!

ছড়াগুলির যে অর্থ শ্রীশ্রীঠাকুর করলেন এতক্ষণ, তা' শেষ হবার পর বলছেন—ওগুলো কেষ্টদাকে লিখে দিস্। আমার কাছে বসে শোনার ভিতর দিয়ে, আলোচনার ভিতর দিয়ে যেটুকু হয়েছে তাতে ঐ কেষ্টদাই এগুলি বুঝতে পারে!

কেষ্টদা—এগুলি আপনার সামনে বসেই ঠিক করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি নিজে আগে ওগুলো দেখেন।

তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—কোন কাজ কিছু না ক'রেও একরকম experience (অভিজ্ঞতা) হয়। সেগুলো কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা ঐ intuition-এর (স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রজ্ঞার) মত।

কেষ্টদা—কিন্তু তার পিছনেও তো observation ও experiment (পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ) আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

কেষ্টদা—এছাড়া অন্য পথে যদি knowledge (জ্ঞান) আসে, আপনি তাকে আমল দিতে চান না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবি, লেজা নেই, মুড়ো নেই, মাঝখান থেকে একটা body (দেহ) ধরা। এই যেমন পুরাণ পড়ে অনেকে জ্ঞান লাভ করে, আমি ওর অনেকগুলি বুঝি নে। মনে হয় fact-এর (বাস্তব তথ্যের) সাথে fiction (কল্পনা) মিশে আছে। - Observation of facts-এর (তথ্যগুলির পর্য্যবেক্ষণের) adjustment (বিনায়ন) না হলে জ্ঞান আসে না।

কেষ্টদা—ওর মধ্যে অনেক সামান্য ব্যাপারও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইভাবে করতে থাকলে সামান্যগুলি আর আপনার কাছে সামান্য মনে হবে নানে। সবগুলি আপনার কাছে meaningfully adjusted (সার্থকভাবে সুসঙ্গত) হয়ে উঠবে।

কেষ্টদা—আগে তো theory (মতবাদ) চাই। তারপর তাকে অবলম্বন ক'রে fact-এর (তথ্যের) দিকে যাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে আপনার পরিশ্রম অনেক বেশী হবে।

কেষ্টদা—কিন্তু যেমন light theory (আলোকতত্ত্ব) আছে—।

বাধা দিয়ে বললেন পরম দয়াল—সেখানে wave-ও (তরঙ্গও) মিথ্যে না। ঐ আলোর particle-এর wave (অণিকার তরঙ্গ) আছে। আমি আগে বলতাম, ঐ যে সূর্য্যকিরণ দেখছেন, ও-ও matter (বস্তু)। কণাগুলির পরস্পর সঙঘর্ষের ভিতর দিয়ে যেটা ফুটে বেরোয় সেটা জ্যোতি।

কেষ্টদা—আজকাল বলে light, matter (আলোক, পদার্থ) সবই নাকি wave (তরঙ্গ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৃষ্টিতে এই যা-কিছু আছে সবই wave (তরঙ্গ)। চলছেও wave-এ (তরঙ্গে)।

কেষ্টদা—কিন্তু আজকাল একটা ধারণাই হয়েছে যে ধর্ম্ম করতে গেলে ওসব observation (পর্য্যবেক্ষণ) বা ঐজাতীয় কিছু লাগে না।

সগর্জ্জনে বলে উঠলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—কে বলেছে? মিথ্যে কথা। ভাববৃত্তির উপর যেগুলি আঁকা ছিল, রূপায়িত হয়ে উঠেছে যা' thoughts (চিন্তারাশি) ধরে ধরে, সেগুলি visualise (প্রত্যক্ষীভূত) করাই লাগবে।

কেষ্টদা—অনেকে বলেন, যোগবলে জ্ঞান হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগবলে জ্ঞান হয় একথা ঠিকই। যোগ মানেই যুক্ত হওয়া। আপনি যদি কোন affair-এর (বিষয়ের) সাথে যুক্ত হন তাহলে সে বিষয়ে আপনার জ্ঞান হবেই।

কেষ্টদা—এই যে মনোযোগ কয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন না থাকলে যোগ হবে কী দিয়ে? ঐ যে কথা আছে 'যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ'। ওর মানে আমার মনে হয়, যেই যোগ হল, অমনি অন্য বৃত্তি নিরোধ হল। মন দিয়ে একখানা চিঠি পড়েন, দেখবেন অন্যদিককার বৃত্তি নিরোধ হয়ে গেল।

জ্ঞানদা (গোস্বামী)—যোগসাধনায় নাকি কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হেসে) কুলকুণ্ডলিনী কা'ক্ কয়? আমার কথা ধ'রো না, শাস্ত্রীয় কথা কিনা জানি না। কুলকুণ্ডলিনী ঐ zygote (ভ্রূণদেহ)।

ওর মধ্যে দেখবেন ঠিক অমনি পেঁচ আছে। তাকে জাগ্রত করতে হলে যেমন তাপের দরকার তা' দিতেই হবে। ঐ তাপই হল তপ বা তপস্যা, আর সেখানেও মনোযোগ বাদ দিয়ে কিছু হবে না।

কেষ্টদা—শ্রীঅরবিন্দ বলতেন, মনটাকে একেবারে ফাঁকা ক'রে দিলে ভেতরে কালীশক্তির আবির্ভাব হয়।

হাসতে হাসতে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' জানি নে। তবে কালীশক্তি আমার মনে হয় ঐ ভাববৃত্তি, ঐ যে ছড়ায় বললাম এতক্ষণ।

ডাঃ ননীদা (মণ্ডল)—Intuition (স্বতঃপ্রজ্ঞা) ব্যাপারটা ডাক্তারদের মধ্যে খুব প্রচলিত আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো এমনও কোথাও কোথাও হয়েছে যে রোগীই তার প্রেসক্রিপশ্‌ন ক'রে দিল। সেটা কি intuition (স্বতঃপ্রজ্ঞা)? তা' না। তুমি অনেকদিন ধ'রে রোগী দেখছ, তাদের নানারকম symptom (লক্ষণ) বিচার করছ, observation (পর্য্যবেক্ষণ) করছ, experiment (পরীক্ষা) করছ, সেগুলির ফল আবার মাথার ভিতর লেখা থাকে। তখন একটা রোগী দেখলেই তার symptom (লক্ষণ)-গুলি টক্ করে ধ'রে ফেলতে পার।

কেষ্টদা—অভিজ্ঞতা থাকলে এই ধরার কাজটা খুব swiftly (দ্রুত) হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হয়।

জ্ঞানদা—উকিলদের বেলাতেও তো অমনি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, আগে একটা বিষয়ের rulings (নিয়মকানুন) মনে হয়। তারপর সম্পূর্ণ case (মামলা)-টাও মনে হয়। শিক্ষা দেবার technique-ও (কৌশলও) তাই। আগে method-এ (পদ্ধতিতে) আনতে হয়। তারপর তাতে interest (অন্তরাস) আনিয়ে দিতে হয়।

কেষ্টদা—অনেকে বই মুখস্থ করে, কিন্তু কাজে লাগায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, handle (অনুশীলন) করতে পারে না ঠিকমত।

পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য) একপাশে বসে এতক্ষণ এইসব কথা শুনছিলেন। এখন বললেন—তাহলে সব জিনিস কি জানা যায় না?

উত্তরে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি experience ও observation (অভিজ্ঞতা ও পর্য্যবেক্ষণ) থেকে জানা যায়। কতকগুলি আবার তার essence (মূল তত্ত্ব) থেকে জানা যায়।

জ্ঞানদা)—অনেক family-তে (পরিবারে) ঐ essence (মূল তত্ত্ব) জানার tradition (ঐতিহ্য) আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে ওখানে ঐ কাম হয়েছে, সদৃশ ঘরের মধ্যে দিয়ে বিয়ে হয়েছে। তাই ছেলেপেলেও ঐরকম হয়ে উঠেছে।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন—আমাদের জানা, ভাবা, চলা, ভোগ-পরিচর্য্যা, আহার-বিহার যা-কিছু

সবারই তো সম্বন্ধ জীবনের সাথে। জীবনটা যদি স্বস্থ থাকে, বিহিতভাবে যদি বাড়তে পারে সব দিক দিয়ে, তাহলে ভাল। নতুবা কোন লাভ নেই। সেইজন্য বেড়ে চলার এই culture-টাকে (অনুশীলনটাকে) নষ্ট ক'রে কোন লাভ হয় না। এই করতে করতে ঐ অমৃতত্বলাভ না কী কয়, সেখানে যায়।

ইতিমধ্যে সকালের ছড়াগুলি একটা আলাদা কাগজে লিখে কেষ্টদার হাতে দিলাম। কাগজটির দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বলছেন—এইগুলি পড়বেন, আর adjust (বিন্যস্ত) করবেন। কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে, ১ নং ২ নং দিয়ে ঠিক করবেন।

এইসময় শ্রীশ্রীঠাকুরের খুব কাশি এল। কাশিটা সামলে নিয়ে স্মিতহাস্যে তিনি বললেন—আগে আগে যা' foretell (ভবিষ্যদ্‌বাণী) করতাম, সেগুলি সব বেরিয়ে গেছে। তাই মনে হয়, আমার ঐ লেখাগুলির মধ্যে যে একেবারে কিছু নেই, তা' না।

কথায়-কথায় বেলা ১০-৪৫ মিঃ হয়ে গেল। আজকাল রোজই একটু দেরীতে স্নানে উঠছেন প্রভু। সামনে ভাটুদাকে (পণ্ডা) দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—ফোন করলি নে?

কলকাতায় ফোন করা হবে, সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছেন। ভাটুদা জানালেন—হ্যাঁ, 'বুক' করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ক'রে সব জিজ্ঞাসা করিস্। কাজলের ওখানেও ফোন করিস্। কাজল সত্যি পাশ করেছে তো?

ভাটুদা—হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞাসা করেছি আগের বারে, definite (নিশ্চয়ই) তো? বলেছেন, definite (নিশ্চয়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় খোকা কেমন আছে?

ডাঃ প্যারীদা—এখন পায়খানায় যেতে পায়ে ব্যথা লাগে। এমনি বসে থাকতে বিশেষ লাগে না।

চিন্তান্বিত স্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাহলে এখনও আছে। আচ্ছা, একটা ক'রে দেখলে হয়। নিশিন্দার পাতা পাউডার ক'রে half (অর্দ্ধেক), আর এ্যান্টি-ফ্লোজেস্টিন্ half (অর্দ্ধেক) মিশিয়ে প্রয়োগ ক'রে দেখলে হয়।

প্যারীদা—আজ্ঞে দেব আজকেই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানে উঠলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে অবস্থান করছেন। এ-বেলাও বিকাল ৪টা থেকেই মাঝে মাঝে ছড়া দিচ্ছেন। ৪-৪৩ মিনিটে একটি ছড়া দিলেন—

জীবনবৃদ্ধির দ্যুতি সেটা
কম্পনটি জীবন যার,
সেই দেশই তো দয়ালদেশ
উৎসই যেটা রক্ষণার।

ছড়াটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দয়ালদেশ কয় কেন? এটা হল primordial urge of existence (অস্তিত্বের আদিম আকূতি)। দয়ালদেশ হল primary (প্রথম স্তরের) কম্পন। সেইটাই আর সব কিছুকে প্রাণন-কম্পনে উচ্ছল ক'রে রাখে।

রাতেও প্রায় ৯-৩০টা অবধি শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক ছড়া দিলেন। তাঁর মন বেশ প্রফুল্ল। একটু পরে রাতের ভোগের জন্য উঠবেন। এখন একটু তামাক খাবার ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু সোজাসুজি চাইলেন না। ননীমা একপাশে বসে। ননীমার দিকে একটু ঝুঁকে ছড়ার ঢঙেই বলে উঠলেন—

সোহাগরানি! ও পিয়ারী!
বসে কেন একলা হোথা!

ননীমা ইঙ্গিত বুঝে তামাক এনে দিলেন।

২৬শে মাঘ, ১৩৬৬, মঙ্গলবার (ইং ৯। ২। ১৯৬০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরের পূবের বারান্দায় রোদে এসে বসেছেন। তাঁর শয্যাটি বারান্দার মাঝখানে রচিত। বারান্দার দু'দিকেই ভক্তবৃন্দ সমাসীন। অনেকে আবার প্রাঙ্গণে রোদপিঠ ক'রে দাঁড়িয়ে প্রাণ ভরে দর্শন করছেন প্রভুর নয়নানন্দকর মূরতি। প্রভাতসূর্য্যের কিরণজাল সেই তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ ঐশী তনুর উপর প'ড়ে ঠিকরে পড়ছে। সমগ্র পরিবেশটিকেই তা' ক'রে তুলেছে আলোকোজ্জ্বল, আনন্দ-উচ্ছল।

কথাপ্রসঙ্গে ননীদা (চক্রবর্ত্তী) বললেন—আমরা যে কাজ-টাজ করি, তার যেন কেমন আঁট নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Energetic urge-ই (উদ্যমী সম্বেগই) তো আঁট। করব এই স্থির সঙ্কল্পটাই তো আঁট। (সামনে উপবিষ্ট রেবতী বিশ্বাসকে দেখিয়ে) ওকে আমি যেমন ক'লাম বি-এ পাশ করতে। পাশ ক'রে এখন বি-এ, বি-এস-সি হইছে। আবার আমি কইছি এম-এ, বি-এস-সি হতে। কিভাবে কী করছে ও জানে। এর মধ্যে আবার ওখানে (খ্রীষ্টান মিশনারি গার্লস স্কুলে) যেয়ে মাস্টারী করছে বিনা পয়সায়। এর মাঝ দিয়ে যদি এম-এ, বি-এস-সি হয়ে যেতে পারে তাহ'লে বিরাট পণ্ডিত হ'য়ে

যাবে নে। আবার, নিজে আঁটওয়ালা না হ'লে সেটা transmit-ও (সঞ্চারিতও) করা যায় না।

গত কাল শ্রীশ্রীঠাকুর শব্দব্রহ্ম ও নাদতত্ত্ব সম্পর্কে কয়েকটি ছড়া দিয়েছেন। এখন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলে সেগুলি শোনাতে বললেন। সব শোনানো হ'ল।

তারপর ঐ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে করতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নামের সময় ঐ যে মেঘগর্জ্জন শোনা যায়, সেটা objective-ও (বাহ্যবস্তু সম্বন্ধীও) হ'তে পারে, আবার স্মৃতিতে থাকে তাও হ'তে পারে। নাম করতে করতে brain cell-গুলি (মস্তিষ্কের কোষগুলি) sensitive (সাড়াপ্রবণ) হ'য়ে উঠলে ঐ শব্দ জেগে ওঠে। মেঘগর্জ্জন এমন হয় যে পৃথিবী যেন লাখ ফাটল হয়ে গেল। আমার ঐরকম হয়েছে। তখন মনে হয়েছে, পৃথিবী বুঝি ঐরকম হয়ে গেল। তারপর মৃদঙ্গের শব্দ শোনা যায়। সে যে কত মধুর, কত সলীল! Thrill of life current-এর (জীবনপ্রবাহের অনুরণনের) সাথে আমার ভাব বা দ্যোতনা যেমন সংশ্লিষ্ট হয়, শব্দেরও আবির্ভাব তেমন তেমন রকমে হ'য়ে থাকে। সে কতরকম হয়—টক-টক তক-তক-তক-তক, কচ-কচ-কচ-কচ, কতরকম শোনা যায়। (হাতে নানা জাতীয় বাজনা বাজাবার ভঙ্গী ক'রে এবং মুখে তদনুযায়ী শব্দের বোল তুলে দেখাচ্ছেন)। আর এগুলি কিন্তু ফাঁকা আওয়াজ না, এর বেশ তালও আছে। আবার বীণার শব্দ শোনা যায়, তারও তো গল্প করেছি। যখন বীণা শোনা যায় তার সাথে তবলাও থাকে না, কিছুই না। কিন্তু ওরই নানারকম লহর শোনা যায়। যেন একটা তান আছে, আর আছে তার নানারকম লহর, সে অপূর্ব্ব!

বহু লোক উপস্থিত। একমনে সবাই শুনছেন এই পরম তত্ত্ব। সমগ্র পরিবেশটা এত নিস্তব্ধ যে বোধ হয় একটা সূঁচ পড়লেও তার শব্দ শোনা যাবে। কেবল দেওয়াল ঘড়িটি মৃদু টিক-টিক শব্দে সময় ঘোষণা ক'রে চলেছে।

কেষ্টদা—আপনি ঝুনের কথা বলতেন, সেটা কিরকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হাত দুখানি বেহালা ধরার ভঙ্গীতে রেখে) ধরেন, তারে একটা টান দিলেন। ঝন্ ক'রে উঠল। তারপর সেটা আস্তে আস্তে ঝন্-ন্-ন্-ন্ ক'রে ক'রে চলল। এটা ঐ ঝুন-সঙ্গতি নিয়ে চলল। ঝুনের দ্যোতনাই অমনতর কম্পন সৃষ্টি করল। এই যে ওঙ্কার শোনা যায়। সেটা আবার কেমন? কোয়াড়ে ঘুড়ি দেখিছেন তো? অনেক দূরে যখন থাকে তখন ও-ও-ওম, ও-ও-ওম শোনা যায়। আবার লক্ষ্য করলে শোনা যায় ব-ম্-ম ব-ম্-ম-এর মত। কিন্তু আরো নীচে যখন নেমে আসে তখন ব-র্-র্র এইরকম শোনা যায়। দেখেন নি?

কেষ্টদা—হ্যাঁ। পাবনায় একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রাধাস্বামী নামের mechanism (গঠন-তুক) কী? কারখানায় একটা ইঞ্জিন চলছিল। আপনি আমার ঘাড়টা ধরলেন।

বললেন, কী শুনতে পাচ্ছেন! বললাম, ও-ও-ওম-এর মত একটানা শব্দ। আপনি আমাকে নিয়ে আরো কাছে, নিমতলার কাছে নিয়ে গেলেন। তখন আমি বললাম, এখন পরিষ্কার ঘট-ঘট-ঘট-ঘট শব্দ শোনা যাচ্ছে। আপনি বললেন, ঐরকম যত কাছে যাওয়া যাবে তত শোনা যাবে রাধা-রাধা-রাধা-রাধা। তখন আমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সাগ্রহে কেষ্টদার এই স্মৃতি-রোমন্থন শুনলেন। তারপর বললেন— ইঞ্জিনের পিস্‌টনটা যখন টান দেয় তখন (ডাইনে বামে হাত নেড়ে) স্বা-মী-স্বা-মী এইরকম শোনা যায়।

এরপর ভিন্ন প্রসঙ্গে কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—জড় আর চেতন তো আলাদা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে জড় ও চেতন বলে আলাদা কিছু নেই। একেরই দুটি রকম। চেতনা কী? চেতনা এলো কোথা থেকে? আমাদের ভেতরে আছে energetic life-urge (উদ্যমী জীবন-সম্বেগ)। সেই urge-এর (সম্বেগের) একটা thrill (স্পন্দন) আছে। সেটা আমাদের পরিবেশের সব-কিছুর উপরে যেয়ে লাগছে। তার ফলেই পারিবেশিক জগৎ সম্বন্ধে আমাদের বোধ হয়। যে-ক্রিয়া এই বোধ গজিয়ে তোলে তাইই চিৎ বা চেতনা। এই চেতনা যেখানে সংঘাতপ্রাপ্ত হয় তাকেই বলি আমরা জড়। সেইজন্য আমার কথা, হয় কও সবই matter (বস্তু), নয়তো কও সবই spirit (শক্তি)।

কেষ্টদা—এ একটা mental process-এর (মানসিক প্রক্রিয়ার) মতন বলা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Mental process (মানসিক প্রক্রিয়া) কেমন আমি জানি না। আমি বুঝি, আমার মাথার মধ্যে সবটার ছবি আছে। আর আমার নার্ভ আছে। নার্ভের মধ্যে দিয়ে চলে মননক্রিয়া। Laboratory work-এর (গবেষণাগারের অনুশীলনের) ভিতর দিয়ে যেমন একটা নির্দ্দিষ্ট ফল মিলে যায়, এই মননের ভিতর দিয়েও তেমনি নানারকম ছবি জেগে ওঠে। অবশ্য ওদিকে ঝোঁক থাকা চাই।

কেষ্টদা—কথাপ্রসঙ্গের মধ্যে অনুভূতির বর্ণনায় আপনি সব details-এ (বিশদভাবে) বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Details (বিশদ) হইছে কি না-হইছে জানি নে, তবে যা' কইছি তা' অল্প কইছি।

তারপর শব্দের বিস্তার কেমন ভাবে হয় সে-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—একটা ঘণ্টার শব্দ হ'ল। ঘণ্টার একটা নিজস্ব thrill বা কম্পন আছে। সেটা বেড়ে উঠে আপনার ভেতরের thrill-কে (কম্পনকে) যেমনভাবে shock (ধাক্কা) দিল, আপনি তেমনভাবে ঢং শব্দ শুনতে পেলেন। ঠিক ফটোগ্রাফির মত। ঘণ্টার একটা নিজস্ব শব্দ আছেই। সেটা পারিবেশিক impulse (প্রেরণা) পেয়ে যা'

হবার, তাই হল। তারপর ঐ যে শব্দটা হল, হ'তে হ'তে হঠাৎ হয়তো দেখতে পেলেন full moon (পূর্ণ চন্দ্র), বিরাট চাঁদ, ঐ অত বড় যেমন আকাশে দেখা যায় আর কি! বড় হতে হতে ঐ চাঁদটাই সমগ্র বিশ্ব হ'য়ে যেতে পারত, কিন্তু তা' হল না। ঐরকমই অত সুন্দর, অত মনোরম হ'য়ে থাকল। Entire environment-টাকেই (সমস্ত পরিবেশটাকেই) তা' অমনতর মনোরম ক'রে তুলল। এইভাবে শব্দের থেকে দর্শনও হয়।

কেষ্টদা—কিন্তু এই সব কিছুর মূলে তো আছে objective world (বস্তুভিত্তিক জগৎ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' দেখি বা শুনি তা' এই। তবে এটা ঠিকই যে subject (অনুভবকর্ত্তা) যে হয় তার একটা object (বাস্তব ভিত্তি) না থাকলে তো আর সে subject (অনুভবকর্ত্তা) হ'তে পারে না। নাম করতে ব'সে আমরা যে কম্পন বা অনুরণন পাই তারও object (বাস্তব ভিত্তি) আছে। ঐ কম্পনগুলির কতকগুলি cut up হয়ে (কেটে) যায়, কতকগুলি র'য়ে যায়।

কেষ্টদা—আমার শরীরের উপর সব সময় কোটি-কোটি ইলেকট্রন এসে পড়ছে। তা' যদি অনুভব করতে পারতাম তাহলে গেছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার (অনুভূতি-প্রসঙ্গে নির্দ্দেশ করে) ঐ রকমটা যদি সবসময় অনুভব করতে পারতেন তাহলেও গেছিলেন।

কেষ্টদা চিন্তান্বিতভাবে বললেন—ফিজিক্সের sound (শব্দ)-সঙ্গতি করতে পারলে হ'ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সঙ্গতি করা যায়। এই দেখেন মানুষের ভেতরে যে flow (ধারা) আছে সেটার ব্যাঘাত সৃষ্টি করলেই heat (তাপ) হয়। আপনি একটা কথা কইলেন, তার ফলে হয়তো শরীরে heat (তাপ) সৃষ্টি হ'য়ে গেল। আবার একজন হয়তো লেখাপড়া জানে না বেশী, একটা কথা ক'ল, শরীর একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। সে হয়তো হৃদয় বা মন পর্য্যন্ত বোঝেই না। আবার যে কয় 'হৃদয় ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল', তার মানে হৃদয় পর্য্যন্ত তার conception-এ (বোধে) আছে। এই সব রকমের সঙ্গতি যদি আমরা আমাদের ভিতরে ক'রে তুলতে পারি তাহলে ঐ অমরত্ব যাকে কই তা' আনা কিন্তু খুব কঠিন না।

তারপর বাণী-প্রসঙ্গে বলছেন—এই যে অত কথা লিখেছি, আমি জানতাম না অত কথা। কিন্তু এক-একটা ঘটনা কেমন যেন মোড় ফিরায়ে দিল। একটা কথাই কই নানাভাবে, নানা ডালে-পাতায় কই। সেইজন্য যখন কই একেবারে মুখস্থর মত কই।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সুরত-সম্বন্ধীয় ছড়াগুলি শুনতে চাইলেন। শোনানো হল। শোনবার পরে দয়াল বললেন—দেখি ওরকম আর কতকগুলি পারি কিনা।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই উপবিষ্ট। একজন এসে মুখের গন্ধ দূর করার একটি ওষুধের নাম চাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একটু ভেবে বললেন—ফাউলিন। আজ বিকালে তাঁর একটু টেম্পারেচার হয়েছে ৯৮.২।

তারপর ছড়া দিলেন—

ভেল্কি দেখায় যাদুকরে,
সাধুর কাজ তা' নয়কো ওরে,
ভেল্কি ভেঙ্গে বাস্তবতায়
কিসে কী হয় সাধু ধরে।
বাস্তবতায় কা'র কী অবস্থা
জেনেশুনে সেধে নিয়ে
অর্থ তাহার কেমনতর
সার্থকতায় দেখ বিনিয়ে।

ছড়ার বইয়ের নামকরণ শ্রীশ্রীঠাকুর করেছেন 'অনুশ্রুতি'। এখনও পর্য্যন্ত অনুশ্রুতি একটি খণ্ডই ছাপা হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ঐ খণ্ডের সমসংখ্যক আরো কিছু ছড়া দেবেন। বর্ত্তমানে সে সংখ্যা পূর্ণ হয়ে আরো বেশ কিছু এগিয়ে গেছে। আবার, ওমর খৈয়ামের ছন্দেও সুরত তত্ত্ব-বিষয়ক কিছু ছড়া দিয়েছেন। ঐরকম আরো কিছু ছড়া দিতে চান তিনি।

সেই প্রসঙ্গে বলছেন—ওমর খৈয়ামের মত আর কইতে পারি কিনা কি জানি। ধীয়োচ্ছি তো! ধীয়োয়ে ধীয়োয়ে কি আর হয়? আমারে ঐভাবে pile করতে (সাজিয়ে তুলতে) পারলে হয়। উস্‌কে দেওয়া লাগে আমারে।

আমি বললাম—কী ক'রে এত বিষয়ের এত রকমের ছড়া যে নেমে আসে তা' আমাদের কাছে একটা রহস্যই রয়ে গেল।

মৃদু হেসে বললেন পরম দয়াল—রহস্যই তো। কেমন হয় জানিস্। একটা স্টীমারের নাম ছিল এমু। আরো ছিল ভাল্‌চার, হিরণ, এইরকম অনেক। একসাথে অনেক স্টীমারের নাম মনে প'ড়ে গেল ঐ তালে।

আজ সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ওমর খৈয়ামের ছন্দে পরপর অনেকগুলি ছড়া বললেন—

বৃত্তিসকল আঙ্গুরসম
ফলছে গাছে থোকায় থোকায়,
পাকলে তারা ঝরেই যাবে
লাভ কি হ'ল অমন থাকায়?

প্রেয়চর্য্যা করতি যদি
ঐ আঙ্গুরের সরস নিয়ে,
একটি চুমুক প্রিয়র তোমার
ফুটত চুমু হাজার হয়ে।
ঐ আঙ্গুরের মতই কিগো
তুমি অমনি ঝরে যাবে?
বৃত্তিগুলি অমনতরই
ঐ মাটিতেই লুটিয়ে র'বে?

রূপকাশ্রিত এই ছড়াগুলির তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন— আমরা যখন finished (শেষ) হয়ে যাই তখন বৃত্তিগুলি পুড়ে যায় বা ঝ'রে প'ড়ে যায়। আবার, বৃত্তিগুলি মরে গেলে তখন কিন্তু আর বাঁচার সুবিধা থাকে না, জীবনকে উপভোগ করা যায় না। সেগুলি ইষ্টের সেবায় নিয়োজিত করতে পারাতেই জীবনের সার্থকতা।

রাতে এই প্রসঙ্গে আরো বেশ কয়েকটি ছড়া দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

২৭শে মাঘ, ১৩৬৬, বুধবার (ইং ১০।২।১৯৬০)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যথারীতি খড়ের ঘরের পূবের বারান্দায় রোদে এসে বসেছেন। মধুলোভী ভ্রমরের মত ভক্তবৃন্দ এক এক ক'রে এসে বসছেন তাঁর সান্নিধ্যে এবং জমে যাচ্ছেন। এ মধুময় সঙ্গ করতে থাকলে স্থান-কাল সবই বুঝি ভুল হয়ে যায়। সব ছাপিয়ে প্রোজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করেন একমাত্র সেই মদনবিমোহন পরমধ্যেয়।

কাল রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর সুরত-সাকীর যে মহাভাবদ্যোতক ছড়াগুলি দিয়েছেন, আজ সকালেও তৎসম্বন্ধীয় আলোচনা চলছে। সেই কথাগুলি যেন রণরণিয়ে গুণগুণিয়ে ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি ক'রে চলেছে মহা-অনন্তের অম্বরে। ছড়াগুলি কয়েকবার পড়াও হল। শুনতে শুনতে ঐ প্রসঙ্গের আরো একটি ছড়া নেমে এল তাঁর শ্রীমুখ হতে—

চাহিদাগুলি স্থাণু হয়ে
অন্তরেরই গহ্বরে,
লালসাতে পুষ্ট হয়ে
দ্রাক্ষাসম যায় বেড়ে।

বেলা সাড়ে আটটার পর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এলে তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর— আজ সকালে ভাবছিলাম, আপনি থাকলে ঐরকম সব ক'ব। কিন্তু কাশির যে চোট, অস্থির হয়ে যেতে হয়।

কিছু পরে পুরানো স্মৃতি রোমন্থন ক'রে বলতে লাগলেন দয়াল ঠাকুর—একবার ঝড়ের সময় একটা বাজপাখী এসে আমার কাঁধে অনেকক্ষণ বসেছিল। অনেকক্ষণ মানে ২/৪ মিনিট।

পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য)—সেইদিনই আবার এক বুড়ো জলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। রাস্তায় দেবার জন্য পাশ থেকে যে মাটি কেটে নেয়, একটু ক'রে থাকে, তাকে বলে সাক্ষী। তার একটার উপর প'ড়ে 'আল্লা আল্লা' (গলার স্বর বিপন্ন আর্ত্তের মত ক'রে) করছিল। সে বুড়ো অন্ধ। মাথাটা পড়েছিল ঠিক সেই সাক্ষীর উপর। নীচের দিকে পড়লে গিছিল আর কি!

কেষ্টদা—জ্যোতিষের ঐ সত্যটা—রবি-চন্দ্র-বুধের সমদৃষ্টি থাকলে memory (স্মৃতিশক্তি) বাড়ে—এটা দেখছি অনেক জায়গায় মেলে। বড় খোকার ওটা আছে।

পণ্ডিতদা—বড়দা ২৫ বছর আগে একটা গান যদি একবার শুনে থাকেন, এখন আবার তা' ঠিক বলে দিতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছোটবেলায় বড় খোকাকে একদিন একটা ইংরাজী পদ্য দেখিয়ে বলেছিলাম, একবার দেখে মুখস্থ কইতে পারিস্? ঠিক একবার দেখে কয়ে দিল।

কেষ্টদা—আমাদের ননী চক্রবর্ত্তীর memory-ও (স্মৃতিশক্তিও) খুব sharp (তীক্ষ্ণ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই এক ভদ্রলোক, রাশিয়া ও আরো কত জায়গা ঘুরে এখানে আইছিল। তারপর ননীর সাথে আলাপ ক'রে কয়, ওরকম একটা পণ্ডিত আমি সারা ইউরোপেও দেখি নি। আপনার মনে নেই?

কেষ্টদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পণ্ডিতের সব গ্রহগুলিই নীচস্থ। কিন্তু নীচস্থ হয়ে ভালই হয়েছে। এর আবার যে কত মহিমা লেখা আছে তার ঠিক নেই।

এই সময় জগজ্জ্যোতিদা (রায় চট্টোপাধ্যায়) একজনকে সাথে ক'রে নিয়ে এসে বললেন—এই দাদাটি দীক্ষা নেবেন। কার কাছে নেবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে ননী আছে।

জগজ্জ্যোতিদা দাদাটিকে নিয়ে গেলেন ননীদার (চক্রবর্ত্তী) কাছে। সকাল থেকেই মাঝে-মাঝে কাশি হচ্ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের। এখন আবার জোর কাশি এল। গলা টেনে-টেনে কাশি বের করতে হচ্ছে। হাঁফিয়ে পড়ছেন। ঐ অবস্থা একটু থামলে জল দেওয়া হ'ল। জল খেয়ে পান চাইলেন। ননীমা পান এনে দিলেন হাতে। পানটা মুখে ফেলে একটু শান্ত হয়ে বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

এরপরে শচীনদা (গাঙ্গুলী) ও শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) সুরত ও সাকীর রূপকের তাৎপর্য্য নিয়ে প্রশ্ন করলেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যেমন দ্রৌপদী আর শ্রীকৃষ্ণ। দ্রৌপদী হ'ল শ্রীকৃষ্ণের সখী—ঐ সাকী। এখানে সাকী মানে ধরতে হবে আমার মন। এই মনেরই উৎসারণা ঐ গোলাপ গাছ বা আর যা-কিছু।

শৈলেনদা—সুরতরাণীর কথা আপনি আমাদের কাছে কী উদ্দেশ্যে বলছেন?

মনোমোহন ভঙ্গীতে দক্ষিণ হস্তখানি ঊর্দ্ধে উত্তোলিত ক'রে, আঁখিতারায় অপূর্ব রহস্যঘন ইঙ্গিতের সঞ্চার ক'রে পরমদয়াল বললেন—সুরতিয়া! নিত গায়ে রহো রাধাস্বামী নাম। সুরত হল অনুরাগ।

শৈলেনদা—কার জন্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপুরুষের জন্য।

শৈলেনদা—তাঁর সাথে এর কী সম্বন্ধ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপুরুষের সাথে সুরতের সম্বন্ধ তো আছেই। আবার সুরতের সাথেও আছে পরমপুরুষের সম্বন্ধ। আন্তরিক অভিব্যক্তির সঙ্গে অভিনিবেশ আর তদনুগ বাহ্যিক অনুচলন, এই দুটো জিনিস থাকে। এই যেমন ও (জ্ঞানদা) আস্‌ল। জিজ্ঞাসা করলাম কী খবর, মানে কোন খবর আছে কিনা। এটা হল বাহ্যিক অভিব্যক্তি।

২৮শে মাঘ, ১৩৬৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১১।২।১৯৬০)

আজ সকালের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর ভাল বোধ করছিলেন না। কেমন একটা অবসাদ ভাব ছিল।

বিকালে অনেকটা ভাল আছেন। যথারীতি তাঁর সান্নিধ্যে ভক্তবৃন্দের সমাগম হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলছে। কথায়-কথায় সন্ধ্যা হয়ে এল। দান গ্রহণ করা সম্বন্ধে বলছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি কেউ স্বতঃস্বেচ্ছ অবদান দেয়, আর তা' না নিলে যদি সে অখুশী হয়, তাহলে তা' নেওয়াই উচিত।

সন্ধ্যার পরে খড়ের ঘরের চারিদিকের পরদা টেনে দেওয়া হ'ল। বাইরে ঠাণ্ডা আছে। ভিতরে ভক্তগণ শ্রীভগবানকে নিয়ে অমৃত-উপভোগে মশগুল।

কথায়-কথায় শচীনদা (গাঙ্গুলী) বললেন—কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) যে পাণ্ডিত্য, যে মেধা, তিনি যদি কিছু লিখে রেখে যেতেন তাহলে দুনিয়ার উপকার হত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে অসম্ভব আছে। কেষ্টদা একখানা ফিজিক্‌স্ লিখেছিল, কী সুন্দর! কত ক'রে ছাপাতে বললাম, কিছুতেই ছাপালো না। একখানা কেমিস্ট্রি লিখেছিল বাংলায়। সে একেবারে নভেলের মত। সেখানা নাকি হারায়েই গেল।

শচীনদা—পাবনা থেকে আসার সময়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী জানি কোন্ সময়।

পরিবেশটা একটু ভারী হয়ে উঠল। পরক্ষণেই তা' হালকা করে দিয়ে ব'লে উঠলেন দয়াল ঠাকুর—কিন্তু আমি যে এত লিখি আর যাই করি, এর কায়দা কিন্তু কেষ্টদার। নিজে ছড়া বলত না। কিন্তু কিভাবে আমাকে দিয়ে ছড়া লিখিয়েছে।

এমন সময় জ্ঞানদা (গোস্বামী) এলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—গরম কেমন পড়িছে রে?

জ্ঞানদা—ঠাণ্ডাই তো নাই।

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)—আজ দুপুরে একটু ঘামও হচ্ছিল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় বড়দার স্বাস্থ্যের খবর জিজ্ঞাসা করলেন—

জ্ঞানদা—ব্যথা আছে পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা তো কয় কমছে।

জ্ঞানদা—সেরকম তো বুঝি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী জানি, কিরকম কয় আমার কাছে। (একটু পরে গলার ফেরেঞ্জাইটিস-এর উল্লেখ ক'রে বলছেন) আমার গলার এটা কমলে হ'ত।

২৯শে মাঘ, ১৩৬৬, শুক্রবার (ইং ১২।২।১৯৬০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরের পূবের বারান্দায় রৌদ্রোজ্জ্বল প্রশস্ত শয্যায় এসে বসেছেন। ভক্তগণ একে-একে এসে প্রণাম ক'রে রোদপিঠ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। আজ পূর্ণিমা তিথি। শ্রীশ্রীঠাকুর বুকের বামদিকে একটা ব্যথা বোধ করছেন। বলছেন, বুকের উপর থেকে চাপ দিলেই ব্যথা লাগে। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে মাঝে মাঝে।

গত রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বপ্নে অনেক পোকা দেখেছেন। এখন সেবাদিকে স্বপ্নতত্ত্বের বই বের ক'রে দেখতে বললেন ওরকম স্বপ্নের অর্থ কী! সেবাদি বই দেখে জানালেন, illness (পীড়া)।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর চুপ ক'রে আছেন। বোধ হয় একটু চিন্তিত। তাঁকে চিন্তামুক্ত করার জন্য সেবাদি হাসতে হাসতে বললেন—কাল রাতে শোওয়ার সময় আপনার বিছানায় অনেকগুলি মশা ছিল। তারও আগে একটা পোকা দেখেছিলেন। সেই সব চিন্তা মাথায় ছিল, তাই ওরকম স্বপ্ন দেখেছেন।

সেবাদির দিকে প্রসন্ন নয়নে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—ওর বুদ্ধি খালি কিভাবে খারাপটা ভালর দিকে নেবে।

একটু পরে, পুরানো স্মৃতির সূত্র টেনে শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—খ্যাপার (শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা) বাড়ীর ধারে একটা গাছ ছিল। সেখানে (সেবাদিকে দেখিয়ে) ওর ঠাকুমা এসে আমারে একেবারে জড়ায়ে ধরল। বলল, 'বাবা! সেবাকে আমি আপনারে দিয়ে দিলাম। ও আপনার কাছেই থাকবে। আপনার সেবা করবে।' তার কিছুদিন পরেই ওর ঠাকুমা মারা গেল। আগের থেকে বুঝতে পেরেছিল কিনা কি জানি। সেই সময় থেকে ও আছে। তখন ও ছোট। চুল ওর পা পর্য্যন্ত পড়ত। ওর যত দোষই থাক আর যত গুণই থাক, কোনরকম বাজে নিন্দে কিন্তু ওর সম্বন্ধে শোনা যায় নি। আবার, রেণুর মা-ও এখানে এসে আমার কাছে ওরকম কইছিল।

সাড়ে আটটার পর শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরের ভিতরে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য) এলেন। Science-এর (বিজ্ঞানের) নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Combustion-radiation-wave (দহন, তাপ-বিকিরণ আর তরঙ্গ) তিনটি factor (উপাদান) আছে।

কেষ্টদা—Combustion (দহন) মানেই তো chemical wave (রাসায়নিক তরঙ্গ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Inter-chemical wave (আন্তঃ-রাসায়নিক তরঙ্গ)। এ্যাটমের একটা কণা থেকে আর একটা কণা ভাগ ক'রে নিলে পরে combustion হয়। আবার, combustion-এর (দহনের) ফলে যে-কণাটা আলাদা হয়ে যায়, সেটাও ঐরকম থাকে। আমার এইরকম মনে হয়। এই যে পাখীরা ডিমে তা দেয়, মানে heat (তাপ) দেয়। তার ফলে combustion (দহন) হয়। (চুনীদাকে) Combustion-এর (দহনের) root-meaning (ধাতুগত অর্থ) কী দেখ্ তো।

চুনীদা ডিকশনারি দেখে বললেন—Com মানে with (সহ), আর bust মানে to burn up (জ্বলন)।

কথার সঙ্গে ধাতুগত অর্থের মিল আছে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হলেন। পরে বললেন—আমি দেখছি, আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিদের যা' ছিল, India-র (ভারতের) সেই জিনিসগুলি কিন্তু revive (পুনরুদ্ধার) করল ঐ দেশের লোকেরা। ওরাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষকে জানিয়ে দিয়েছে। জানিয়ে দিয়েছে তাঁদের validity (ন্যায্যতা) কতখানি ছিল।

কেষ্টদা—ম্যাক্স্মূলার, কোলব্রুক, এরা খুঁজে খুঁজে বের ক'রে ফেলল কোন্ শব্দ কোন্ ভাষায় কী রূপ নিয়েছে। শব্দের ইতিহাস ও অর্থনিরূপণ, এতে তারা খুব পাণ্ডিত্য দেখিয়েছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের thoroughness (সম্পূর্ণতা) নিয়ে যেন ওরা কাজ করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের পূর্ব্বপুরুষকে তো চেনালোই ওরা। নতুবা গেছিলাম আর কি! ওদের 'পরে শ্রদ্ধা হয়—কিরকম খেটেছে! Talent-এর (মেধার) সাথে-সাথে preserving, procuring and proceeding urge (সংরক্ষণী, সংগ্রহণী এবং সঞ্চলনী সম্বেগ) প্রত্যেকেরই থাকে, কিছু কম বা কিছু বেশী। এই তিনটি যার সমান তালে থাকে, সে-মানুষ ঐসব কাজ করতে পারে।

কেষ্টদা—আমাদের দেশে তো preserving attitude (সংরক্ষণী মনোভাব) মোটেই ছিল না। ইতিহাস রেখে যাওয়ার প্রবৃত্তি ছিল না। ওরা এসে এসব সৃষ্টি করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু ছিল। না হ'লে আর ওরা পেল কোথা থেকে! Whole India (সারা ভারতবর্ষ) ঘুরে ঘুরে ওরা যা' বের করল, ঠিক মিলে গেল। আমাদের সেরকম hands (করার লোক) নেই। তাই কিছু করতে পারি না। এই যেমন, বিশেষ বিশেষ সংবাদের cutting (সংবাদপত্রের কাটা অংশ) ওদের রাখতে বলেছি। অনেক রেখেছে, কিন্তু সব রাখে নি। অনেক কিছু দেখার ও করার আছে। আমরা সেগুলি জানব না, দেখবও না ওর মধ্যে কী আছে। আমি একটু আগে কী কথাগুলো বললাম?

কেষ্টদা—Preserving, procuring and proceeding.

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, সংরক্ষণ, সংগ্রহণ আর সঞ্চলন।

বাইরের থেকে একটি মা চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন—ঋত্বিকরা যে দেড় পাট্টা চাদর ব্যবহার করেন, তার তাৎপর্য্য কী! দয়াল ঠাকুরকে জানালাম সেকথা। উত্তরে তিনি বললেন—ও আমি গায়ে দিতাম, তাই দেখাদেখি ঋত্বিকরা গায়ে দেয়।

আমি—কিন্তু ঠিক ঐরকম মাপমতন মাঝখান দিয়ে সেলাই করা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' জানি নে। বোধ হয় বড় করার জন্যে ওরকম করেছে।

আমি—তাহলে ওরকম সেলাই না দিয়ে যদি বড় বহরের একটা চাদর ব্যবহার করি তাতেও তো হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ—।

টাটানগরের বিশ্বনাথন এবং আরো কয়েকজন সৎসঙ্গী তাদের দীক্ষাদাতার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে আর একবার অন্য ঋত্বিকের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে চায়। তারা লিখেছে, দীক্ষা তাদের অসিদ্ধ হয়েছে। সব কথা নিবেদন করলাম দয়াল ঠাকুরের শ্রীচরণে।

শুনে তিনি বললেন—দীক্ষা আমি দেই। ঋত্বিকরা দেয় না। তারা নাম দেয় আমার পাঞ্জার শক্তিতে। আমি দেই ব'লেই দীক্ষা অসিদ্ধ হবার কোন কারণ নেই।

কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি মেয়ে খড়দহ থেকে লিখেছে, সংসারের প্রয়োজনে সে সিনেমায় কাজ নিয়েছে। কিন্তু তার বাবার সমাজ-সংস্কারের দিকে বেশী লক্ষ্য ব'লে মেয়েকে সিনেমায় নামার মত দিতে পারছেন না। মেয়েটি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সিনেমায় নামার অনুমতি চেয়েছে। চিঠিখানি সম্পূর্ণ প'ড়ে শোনালাম দয়াল ঠাকুরকে।

শুনে তিনি বললেন—খুব ভাল। সিনেমায় নেমে কাজ করা শ্রীশ্রীঠাকুর পছন্দ করেন। কিন্তু দেখো, সিনেমায় নামার পরে সেখানকার কু-environment (পরিবেশ) যেন তোমাকে কুৎসিত ক'রে না তোলে। আর, তুমি যদি এর মধ্য দিয়ে successful (কৃতকার্য্য) হয়ে উঠতে পার, ঠাকুর অত্যন্ত খুশী হবেন। আর, তোমার বাবার যখন সমাজ-সংস্কারের দিকে নজর আছে, তুমি সিনেমার ভিতর দিয়ে গেলেও সেখানকার সংস্কার যাতে করতে পার সেদিকে নজর রাখবে। তুমি ব্রাহ্মণের বাচ্চা। ব্রাহ্মণের তেজ বজায় রেখে যদি অক্ষুণ্ণ বর্দ্ধনায় চলতে পার, ঠাকুর খুশী হবেন।

কথাগুলি হুবহু লিখে আজকের ডাকেই মেয়েটিকে চিঠি দিয়ে দিলাম।

বিকালে—খড়ের ঘরে। আজ বিকাল ৩টার আগেই শ্রীশ্রীঠাকুর হাতমুখ ধোওয়া, পায়খানা, সব সেরে এসে শুভ্র শয্যায় উপবেশন করেছেন। জিজ্ঞাসা করলাম—বুকের ব্যথাটা কি এ-বেলাতেও আছে?

বুকে হাত দিয়ে প্রভু বললেন—হ্যাঁ, ব্যথা আছে। নিঃশ্বাস নিতে গেলে ব্যথা লাগে।

প্যারীদা (নন্দী)—ওষুধ দিয়েছি, ওতেই কমে যাবে। একটু সেঁক করলে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কর।

প্যারীদা ধীরেনদাকে (ভুক্ত) বলতেই ধীরেনদা ইলেকট্রিক হীটার এনে একখানা কাপড় গরম করলেন। তারপর সেই গরম কাপড়খানা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের বুকে, গলায় সেঁক দেওয়া হতে লাগল। একটু পরে প্যারীদা পূজ্যপাদ বড়দাকে দেখতে গেলেন। তিনি অসুস্থ আছেন।

১লা ফাল্গুন, ১৩৬৬, রবিবার (ইং ১৪।২।১৯৬০)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের মেম্বার শচীন গুহ এসেছেন। উনি লেখার কালি প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবসাও করেন। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে দেখা করতে এসেছেন। খড়ের ঘরে ব'সে শচীনবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। কথাপ্রসঙ্গে শচীনবাবু বললেন—মাস্টারমশাইরা বলেন, আজকাল প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট বেশী থাকার দরুন শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মান নামলেও, প্রাইভেট পরীক্ষা দেবার সুযোগ থাকাটা ছেলেদের একটা chance (সুযোগ)। ওটা থাকাই দরকার। একটা বড় ত্রুটি কোথায় হয়ে গেছে জানেন? Mixed course-টা (বিজ্ঞান ও কলার বিভিন্ন শাখার মিশ্রিত পাঠক্রমটা) তুলে দিয়ে ভাল হয় নি। ওটা আগে চালু ছিল। তখন অনেক বড় বড় মনীষীর সৃষ্টি হয়েছে। কে একজন নাকি এনট্রান্স পাশ ক'রে এমন ইংরাজী শিখেছিল যে তার ইংরাজী শুনলে মানুষ stunned হয়ে (চমকে) যেত।

শচীনবাবু—শিক্ষাটা কেমন হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ঢের কথা এ-সম্বন্ধে লেখা আছে। এই, শুনাস তো!

বললাম—রাতে শোনাব। শচীনবাবু আবার বললেন—ইংরাজীর জন্য অনেক ছাত্র ফেল করে। তাই, আমরা আই এস সি-তে ইংরাজীটা তুলে দিচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা ভাল হ'ল না। ধরেন, আমি science (বিজ্ঞান) পড়লাম। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় যদি দখল না থাকে তাহলে different phase-গুলি (বিভিন্ন বিভাগগুলি) বুঝতে পারব না। আমার তাই মনে হয়, আগের বুদ্ধিই ভাল ছিল। এই দেখেন না, স্যাডলার কমিশন কত প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আশু মুখুজ্জের সামনে তারা দাঁড়াতে পারে নি। Novelist (ঔপন্যাসিক) বঙ্কিমবাবুর কাছেও কেউ দাঁড়াতে পারত না। 'বন্দে মাতরম্' তার লেখা। সেটা মন্ত্রই হয়ে গেল। আবার, গুরুদাস বাঁড়ুজ্জের সাথেও কারোই তুলনা হয় না। সে আর্টস্ দেখত সায়েন্সের ভিতর দিয়ে, আবার সায়েন্স দেখত আর্টস্-এর ভিতর দিয়ে।

শচীনবাবু—যাদের পাণ্ডিত্য আছে, তারা বাড়ীতে পড়াশোনা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরিয়ে না দিলে কী ক'রে করবে? কলেজ থেকে আমাকে ধরিয়ে দেওয়া লাগবে কোন্ পথ ধরে এগোব। প্রত্যেকটি ছাত্রেরই acumen (তীক্ষ্ণতা) বাড়িয়ে দিতে হয়। আমি যদি আপনারা হতাম তাহলে প্রতিটি household-কেই (পরিবারকেই) একটা university (বিশ্ববিদ্যালয়) ক'রে গড়তাম। ঐটাই হ'ল আদি বিদ্যালয়। ওখান থেকেই শিক্ষার শুরু। আজকাল কোনোরকমে পাশ করতে পারলেই হয়ে গেল। কিন্তু লেখাপড়া তো স্কুলে হয় না, হয় practical field-এ (বাস্তব ক্ষেত্রে)। গ্র্যাজুয়েট মাঠে যেয়ে যদি হাল ধরে, সে অনেক শিখবে। আজ বার করেন তো আপনার মত কয়জন আছে। আপনার চিন্তা-ভাবনা আছে, কত কিছু দেখা লাগে। আপনি কালির ব্যবসা করেন। কিন্তু তার জন্য প্রত্যেকটা মানুষ সম্বন্ধে আপনাকে ভাবতে হয়। ভাবতে হয় কী ক'রে কোম্পানিকে বাড়াবেন। নেকটাই বেঁধে যারা অফিসে যায়, তারা কি এইরকম? আপনার কি তা' করলে চলে?

শচীনবাবু—না, তা' চলে না।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলতে লাগলেন—শিক্ষাক্ষেত্রে democracy (গণতন্ত্র) চলে না; কোনদিন চলে নি। ইউনিভার্সিটিকে যদি state (রাষ্ট্র) তার মত ক'রে mould (নিয়ন্ত্রিত) করে তাহলে আর ভাল হয় না। বড়লোক আর জন্মাবে না। প্রতিটি ছাত্র যাতে আত্মসম্মানবোধ নিয়ে বেড়ে ওঠে তাই করা চাই।

সকাল ৯টার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে চ'লে এলেন। শচীনবাবু এখনকার মত বিদায় নিলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। 'ভাববৃত্তি'-দেবতা নিয়ে কথা উঠল।

সেই প্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—একবার পাবনায় সারারাত্রি ধরে অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠ করলাম। পাঠ করতে করতে শেষে মনে হল, মন্ত্রের মধ্যে যা' আছে তা' সবই ঠিক। সে অনুভূতির কথা আপনাকে বলেছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তা' মনে নেই।

জনৈক দাদা এসে জিজ্ঞাসা করলেন—একটা বাড়ি করতে চাই, কোথায় করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে তোর সুবিধে।

উক্ত দাদা—সুবিধে-অসুবিধে বুঝতে পারি নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাউনের মধ্যে অনেক সময় habitable (বসবাসযোগ্য) হয় না। একটু ফাঁকে হলে ভাল হয়। আবার wartime-এ (যুদ্ধের সময়ে) bomb (বোমা) যদি মারে, ঐ টাউন-এলাকাতেই মারে।

দাদাটি প্রণাম ক'রে চলে গেলেন।

২রা ফাল্গুন, ১৩৬৬, সোমবার (ইং ১৫। ২। ১৯৬০)

প্রাতে খড়ের ঘরে ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীঠাকুর। কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সাথে পুরানো দিনের সব গল্প করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ-অনুযায়ী কাজ না-করার জন্য কিভাবে গোপালদার (মুখোপাধ্যায়) ও যতীনদার (আচার্য্য) মৃত্যু হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর পুনঃ পুনঃ নিষেধ করা সত্ত্বেও কিভাবে যতীনদা বাড়ী যাওয়ার জন্য জেদ ধরেছিলেন। তিনি নিশ্চিতই যাবেন জেনে, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কাছ থেকে তামাকের নল যতীনদা যেখান থেকে আনতেন সেই জায়গার ঠিকানা লিখে রেখে দিতে বলেছিলেন (কারণ, ঐ রাতেই যাত্রাপথে দুর্ঘটনায় যতীনদার মৃত্যু হয়)। গাছে পাখীর ছানা পাড়তে উঠে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি সাপ ধরে ফেলেছিলেন। রাস্তায় যেতে যেতে একদিন তিনি কিভাবে একটি ফণাতোলা সাপ লাফিয়ে পার হয়েছিলেন এবং পার হয়ে যাওয়ার পর তাঁর ভয় ধরেছিল। এই সব গল্প চলল অনেকক্ষণ যাবৎ।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—থেকে থেকে মাথায় টেলিভিশনের মত হয়। এটাকে যদি আর একটু বাড়ানো যায় তাহলে আমেরিকায় যা' হচ্ছে তা' এখানে বসেই জানতে পারেন।

কেষ্টদা—অনেকের নাকি এরকম বিভূতি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, বিভূতি মানে বি-ভূ-তি, বিশেষভাবে হওয়া। লোকে তা' বোঝে না, বোঝে miracle (অলৌকিকতা)। আর miracle (অলৌকিকতা) দেখলেই আমার ভয় করে। Miracle-monger (অলোকিকতার কারবারী) দেখলে আমার ভাল লাগে না। যারা এসে প্রণাম ক'রে কয়, আমার যেন এ হয়, তা' হয়, তাদের দেখে আমার ভয় করে। মানে, তাদের আর education (শিক্ষা) হবে না। আবার যাদের দেখি, আমাকে দেওয়ার বুদ্ধি, আমার জন্য পকেটে করে দুটো জামরুল নিয়ে এসেছে, বা হয়তো পাহাড়ে গেছে, দুটো বৈঁচী ফল দেখল, তুলে আমার জন্য নিয়ে আসল—এ দেখলে ভরসা জাগে। Auto-initiative serviceable attitude (স্বতঃদায়িত্বপূর্ণ সেবাপ্রবণ মনোভাব) দেখলে আমার খুব ভাল লাগে। (তারপর উপবিষ্ট জ্ঞান গোস্বামীদার দিকে তাকিয়ে বলছেন)—একটা জিনিস হয়তো লিখতে হবে। জ্ঞান সেখানে এসে দাঁড়াল। বললাম—এমন ক'রে এটা লেখ। এরকম যদি বলে কাজ করানো লাগে, সে ভাল না। আমি চাই, মানুষ নিজের থেকেই করবে।

কেষ্টদা—আচ্ছা, ভবিষ্যৎ ঘটনাগুলো আপনার কাছে কিভাবে appear করে (হাজির হয়)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাববৃত্তি-দেবতাকে রঙ্গিল ক'রে তুলতে পারলে ঐরকম হয়। শ্রদ্ধাটা নিটোল হওয়া চাই, নিটোল love (অনুরাগ)। কিরকম হয়! ঐ ওমর খৈয়ামের মতন। ঐ গোলাপ, সুরা, সাকী। মদ খাই নি, অথচ মাতাল। সুরতের 'পরে ঐরকম ভালবাসা চাই। এই যে আমি ছড়া কই। ছড়া লেখাটা আশ্চর্য্য না। কিন্তু আমার পক্ষে আশ্চর্য্য। আবার সংস্কৃতও লিখেছি। অবাক কাণ্ড হল আমার ইংরাজীতে কওয়া। কই কেমন ক'রে ভেবে ঠিক পাই নে।

জ্ঞানদা—ভাববৃত্তি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হওয়ায় থাকা, হয়ে থাকা, হতে থাকা—তিন রকমেরই হয়। যেমন একটা চিঠি লিখবে। তখন ভাববৃত্তি লাগে—কী কী দিয়ে লিখবে, কিভাবে লিখবে। তোমার মনের ভাব তুমি চিঠির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করতে যাচ্ছ, করছ। এই কোন কিছু চাওয়া, সেই বিষয়ের মধ্যে যাওয়া এবং তদনুপাতিক হয়ে ওঠা বা তাকে আয়ত্ত ক'রে তোলা, এই হল ভাববৃত্তি।

জ্ঞানদা—তাহলে ভাববৃত্তি দেবতা—

বাধা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাববৃত্তি-দ্যুতি কও, দেবতা না।

নিখিলদা (ঘোষ)—এই ভাববৃত্তিদ্যুতি তো শয়তানেরও থাকতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তাও পারে।

এরপর মৃত্যু নিয়ে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন, এই দেহ নিয়েই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়।

জ্ঞানদা—চিরকাল দেখে আসছি মানুষ মরে, পরেও মরবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা ধ'রে নিচ্ছ কেন? তুমি থাকবে, এটা ভাবাও ভাল। যা' চ'লে আসছে তা' নাও চলতে পারে। দেখ না, আজকাল মরা মানুষের চোখ জ্যান্ত মানুষের চোখে বসায়ে দিচ্ছে, তারপর সে মানুষটা দেখতে পাচ্ছে। এটা তো আগে ছিল না। এ যখন হতে পারছে তখন ওটাও হতে পারে। জীবনের উদ্দেশ্যই হল অমৃতত্বলাভ।

জ্ঞানদা—তা' তো এই body (শরীর) নিয়ে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাও হতে পারে। এতদিন পর্য্যন্ত যে fact (তথ্য) তুমি পেয়ে এসেছ তার থেকে superior (শ্রেষ্ঠ) একটা অবস্থা ভাব না কেন!

জ্ঞানদা—আজকাল যে হারে মানুষ বাড়ছে, তাতে কিছুদিন পর মানুষের উপর মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কেন? তখন এমন অবস্থা হবে, এখন যদি ৫০ বছরে ৩টি ছেলে হয়, তখন ২০০ বছরে বড় জোর একটা ছেলে হবে। উপনিষদ্ বলে, তুমি বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ কর। অমৃতত্বের যে conception (ধারণা) তাদের ছিল, তা' হল শরীরের অমৃত, মনের অমৃত, সব দিক দিয়ে অমৃততত্ব-লাভ।

সন্ধ্যার পর মহাদেবদার (পোদ্দার) ভাই ও পরিতোষদা নৈহাটি থেকে এলেন তুলসীর পাতা ও বরণ ধান নিয়ে। একটি ওষুধের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ওদের বহু তুলসীপাতা আনতে বলেছিলেন। ওঁরা এনেছেন দুই বস্তা, ওজন ২ মণ ৩০ সের। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রণাম ক'রে বসে দুজনে গল্প করছেন—এজন্য বহু বাড়ী ঘুরতে হয়েছে। ১০০ তুলসীপাতার ওজন ৬ আনা। ২৪০০০ পাতায় ১ সের ওজন পাওয়া গেছে, ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুব উৎফুল্ল। যাকে দেখছেন, তাকেই বলছেন পরিতোষদাদের কৃতিত্ব। বারবার বলছেন—বাবারে বাবা! অসম্ভব কাণ্ড করেছে।

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৬৬, বুধবার (ইং ১৭। ২। ১৯৬০)

গতকাল সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর সহশিক্ষার কুফল সম্বন্ধে একটি লেখা দিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে আলোচনা চলছে। কথা শুনতে শুনতে একসময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—একটা কলেজে co-education (সহশিক্ষা) হয়তো নেই। কিন্তু morning shift-এ (প্রাতঃকালীন বিভাগে) মেয়েরা এবং day shift-এ (দ্বিপ্রহর-বিভাগে) ছেলেরা পড়ে, এরকমটা চলতে পারে তো?

গম্ভীর হয়ে উত্তর করলেন পরম প্রেমময় ঠাকুর—আমার তা'ও ভাল লাগে না। Female-দের (মেয়েদের) female college (মহিলা কলেজ), male-দের (ছেলেদের) male-college (পুরুষ কলেজ) হওয়া উচিত। একেবারে আলাদা।

ব্যারাকপুর (২৪ পরগণা) থেকে মেঘলালদা এসেছেন। তিনি নতুন বাড়ী তৈরী করেছেন। বাড়ীর নাম প্রার্থনা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নাম দিলেন "ধৃতিবিতান"। একজন একটি স্নো বের করতে চাইছেন, তার নাম প্রার্থনা করলেন। প্রভু নাম দিলেন—"শ্রী স্নো"।

শীতকাল-ভোর ঠাকুর সকালে পূবের দিকের ছাউনিতে এসে বসতেন। এখন শীত কমে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশক্রমে গোল তাসুর ঘরের ঠিক পশ্চিমদিকে একটি ছাউনি করা হয়েছে। ছাউনির তলে চৌকি পেতে বিছানা ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের বসবার জায়গা প্রস্তুত। ছাউনির তলে একপাশে চেয়ার, বেঞ্চি, জলচৌকি, পিঁড়ি প্রভৃতি রাখা আছে মানুষদের বসবার জন্য। আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর এই পশ্চিমের ছাউনিতে এসে বসলেন।

৬ই ফাল্গুন, ১৩৬৬, শুক্রবার (ইং ১৯।২।১৯৬০)

জনৈকা বিধবা মাকে সান্ত্বনা দান প্রসঙ্গে আজ শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিলেন—

জগৎপিতাই তোমার পিতা
স্বামীহারা যদিও হ'লে,
সেই ভাবেতেই তুমি দেখো
স্বামী আছেন তাঁরই কোলে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা ও স্বস্তি বিধানের জন্য কয়েকজন বর্ষিয়সী মা তাঁর কাছে পালাক্রমে থাকেন। কিন্তু এই সেবার কাজে অহং-ভাব থাকায় তাদের মধ্যে কখনও কখনও বেধে যায় সঙ্ঘাত। সুরু হয় কথা-কাটাকাটি। ধীরে ধীরে তা' পরিণত হয় তুমুল ঝগড়ায়। ঐ সময় ওঁদের প্রত্যেকেই গলা ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে বোঝাতে চান যে তিনি নিজে কতখানি সাচ্চা এবং ঠাকুরকে তাঁর মত ভাল আর কেউ বাসে না। সাথে সাথে চলতে থাকে অপরের প্রতি দোষারোপ। এইরকম চীৎকার চেঁচামেচিটা আর কিছুই নয়, ঐ মায়েদের অনিয়মিত প্রবৃত্তিরাজিরই বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু বিশ্বেশ্বর স্বয়ং সম্মুখে উপস্থিত থাকার দরুন ঐ প্রবৃত্তির আঁচ তীব্র হয়ে অপরকে দগ্ধ করতে পারে না। পরম দয়াল তাঁর সোহাগমিশ্রিত শাসন-বিনায়নায় প্রত্যেকের অন্তরের ধূমায়মান বহ্নিশিখাকে প্রশমিত ক'রে দেন। তার ফলে, কলহের কুশীলবগণ ধীরে ধীরে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে শান্ত হয়।

এই সমস্ত ব্যাপারটাই দ্বাপরে ব্রজধামে অনুষ্ঠিত সেই দিব্যলীলার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আজ আবার রাত দশটার পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে কয়েকজন মায়ের মধ্যে সুরু হয়ে গেল সেইরকম তুমুল ঝগড়া। একজন এক কথা বলেন তো অপরজন

বলেন তার বিপরীত কথা। একটি মা ব'লে উঠলেন—আমার একমাত্র ঠাকুরের উপরেই আসক্তি, আর কিছুর উপরেই না।

একে ঠেস্ দিয়ে আর একজন বললেন—আমার আসক্তি সব-কিছুর 'পরেই। কার যে কতখানি ঠাকুরের 'পরে টান তা' বোঝা গেছে।

এর পরেই আর একজন মাঝখানে লাফিয়ে এসে হাত নাড়তে নাড়তে অঙ্গভঙ্গী ক'রে বললেন—থাক্ থাক্। মুখে সব বড় বড় কথা। ঠাকুরের কাছ থেকে নেবার বেলায় তো সকলের নোলা সক্‌সক্ করে।

এইরকম সব চলছে। দয়াল কিন্তু নির্ব্বিকারভাবে বসে তামাক খাচ্ছেন। এদের কথার তোড় একটু কমলে বললেন—আমি যদি কাউকে কিছু দেই, তাই নিয়ে যদি আর কেউ কিছু কয়, তাহলে হাসা ছাড়া আর উপায় কী। আমার কাছ থেকে পেয়ে কেউ যদি ধন্যবাদ বা কৃতার্থবাদ ছাড়া কিছু উচ্চারণ করে, রেগে ওঠে বা মাথাগরম করে তাহলে তার কাম সারা—এই আমি ক'য়ে দিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এইরকম উক্তি শুনে কলহরতা জনৈকা মা একটু চুপসে গিয়ে খানিকটা আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গীতে বললেন—ও ঐরকম ক'ল, তাইতো আমার রাগ হল। ঠাকুরকে ক'বে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের রাগ করা উচিত তখন, যখন দেখবা ঠাকুরের 'পরে কেউ অত্যাচার করছে বা তাঁর সম্বন্ধে অশ্লীল কেউ কিছু বলছে। তা' যদি কেউ করে বা বলে তখন কিন্তু কেউ এগোবানানে, সে ঠিক জানি। তোমাদের মধ্যে সে বান্দা কেউ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐরকম মৃদু ভর্ৎসনা শুনে ঐ মায়েরা নীরব এবং আস্তে আস্তে যে যার কাজে চ'লে গেলেন।

৭ই ফাল্গুন, ১৩৬৬, শনিবার (ইং ২০।২।১৯৬০)

যেসব মায়েরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-পরিচর্য্যা করেন, তাঁরা যাতে শৌচান্তে হাত-পা ভালভাবে পরিষ্কার রাখেন সেজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের বিশেষভাবে বলেছেন। তা' সত্ত্বেও এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে অবহেলা দেখা যায়। তাই, আজ বাজার থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর ৮টি বদনা, সাবান ও সাবানমাখা খোসা আনিয়ে সেবাকার্য্যে ব্রতী ৮ জন মাকে দিলেন, যাতে তাঁরা হাত-পা-মুখ ভালভাবে শুচি ও পরিচ্ছন্ন রেখে ঠাকুরসেবা করতে আসতে পারেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে সমাসীন। এই ঘরের পশ্চিমের দেওয়ালে একটি ক্যালেন্ডার টাঙ্গানো। ক্যালেন্ডারের ছবিতে দেখা যাচ্ছে—ঢেউভরা একটি নদী, নদীর

তীরে একটি বড় পাথর, আর সেই পাথরের উপর একটি পাখী আপনমনে বসে আছে।

ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐ ছবিটা দেখলেই আমার মনে পড়ে সেই বাবার সাথে যখন আমীরাবাদে থাকতাম তখনকার কথা। একদিন নদীর ধারে ঐরকম একটা পাথরের উপর বসে ছিলাম। হঠাৎ ঐ অতটুকু দূরে (পশ্চিমের দেওয়াল দেখিয়ে) এক প্রকাণ্ড কুমীর ভুস ক'রে ঠেলে উঠল। আমি উঠে প'ড়ে এক দৌড়।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সেই স্মৃতি যেন রোমন্থন করলেন। তারপর বললেন—ঐ ছবিটা ওখান থেকে সরায়ে রাখলে হয়।

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) তাড়াতাড়ি যেয়ে ক্যালেন্ডারটি উলটে রাখলেন। একটু পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। সাথে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য)।

কথায়-কথায় পৌরাণিক দেবদেবী সম্বন্ধে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগেকার দিনে মানুষের personify (নরত্ব আরোপ) করার বুদ্ধি ছিল। বিভিন্ন গুণগুলিকে তারা personify (মানুষ হিসাবে চিন্তা) ক'রে তাতে দেবত্ব আরোপ করেছে। এতে একটা সুবিধা আছে। মানুষের ভেতরে যে সদ্‌ভাব থাকে তার একটা মূর্ত্তি দেওয়া যায়। আর, এটা যদি meaningful personification (অর্থসমন্বিত নরত্ব-আরোপ) হয় তবে খুবই ভাল। ভাবটা কিভাবে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে? যেমন মেঘের নানারকম ছবি হয়। মেঘটাকে আমি জানি। তার নানারকম আকার দেখে আমি অনেকরকম কল্পনা করলাম।

কেষ্টদা—সাদৃশ্য দেখে—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাদৃশ্যের সাথে আর কল্পনার সাথে মিলে যায়।

কেষ্টদা—হয়তো একটা কুমীর হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর কুমীর। (কুমীরের কথা বলতেই তাঁর মনে পড়ে যায় ঘরের পশ্চিম দেওয়ালে অবস্থিত ক্যালেন্ডারের ছবির কথা। সেদিকে নির্দ্দেশ ক'রে বললেন) ঐ ছবিখানা দেখলেই আমার সেই কুমীরের কথা মনে পড়ে। ওদের বলেছি ওখানা সরায়ে রাখতে। কুমীরগুলোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি কম নাকি?

কেষ্টদা—কম কি ক'রে বলা যাবে? বিশ্ববিজ্ঞানে সেই কুমীরটা—

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, কুমীরটাকে ধরে আনিছিল। মড়ার মতন পড়ে ছিল। সেখানে তো অনেক লোক দাঁড়ানো। কিন্তু কয়েকজনকে বাদ দিয়ে ঝপ্ ক'রে উঠে সেই লোকটাকেই কামড়ালো, যে নাকি ঐ কুমীরটাকে দেখায়ে দিছিল।

কেষ্টদা—এটা একটা discretion (বিচার) ক'রেই কামড়ানো মনে হয়।

এরপর বাঘ, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি জন্তুর প্রকৃতি ও হাবভাব নিয়ে কথা চলতে থাকল। কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—যারা পোষ মানে এবং যারা পোষ মানে না, এদের মধ্যে higher (উচ্চশ্রেণীর) কা'রা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা পোষ মানে তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি আছে বলে মনে হয়। আর যারা পোষ মানে না তাদের থাকে pugnacious propensity (আক্রমণাত্মক মনোভাব)। রে'র একটা শালিক ছিল। রাতে গাছে থাকত, সকালে এসে একেবারে খাঁচার মধ্যেই ঢুকে যেত।

কেষ্টদা—আবার ওর কাঁধে কাঁধেও থাকত অনেক সময়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেকথা সমর্থন করলেন।

তপোবন বিদ্যালয়ের শিক্ষক হরিপদ দাস শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে আশ্রমে আছেন। তাঁর মা তাঁকে এখন বাড়ী নিয়ে যেতে এসেছেন। হরিপদদা এসে সেকথা বললেন। শুনেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যা' কই তাই শোন্। বেটা ছেলে বাড়ী গিয়ে কি ঘর লেপবে? মাসে মাসে যা' পারিস্ পাঠাবি, আর মাঝে মাঝে যেমন যাস্ তাই যাবি।

৮ই ফাল্গুন, ১৩৬৬, রবিবার (ইং ২১। ২। ১৯৬০)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন। দীনবন্ধু দত্তদার স্ত্রী এসে সাংসারিক অভাবের কথা জানালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ৭৫ টাকা ভিক্ষা ক'রে ঐ মাকে দিলেন।

এরপর রমণের মা এসে খড়ের ঘরের বারান্দাতেই গ্যাঁট হয়ে বসলেন। তাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন সামনের ঘরের বারান্দায় বসতে। কিন্তু সেখানে তিনি যাবেন না, এখানেই বসবেন। আজও এখানে বসতে গেলে সবাই নিষেধ করলেন এবং সামনের বারান্দায় যেতে বললেন, রমণের মা ভালভাবে বসতে বসতে বললেন—আমি এখানেই বস্‌ব।

শ্রীশ্রীঠাকুর তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে সুর ক'রে গেয়ে উঠলেন—

আমার কথা যে শোনে
তা'র কথা শুনি আমি।

৯ই ফাল্গুন, ১৩৬৬, সোমবার (ইং ২২। ২। ১৯৬০)

প্রাতঃপ্রণাম হয়ে যাওয়ার পর বাইরে তাসুতে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ প্রাইভেট কথা বললেন পরমপূজ্যপাদ বড়দার সঙ্গে। তারপর জ্ঞানদা (গোস্বামী) ও কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এলেন। তাঁদের সাথেও অনেক সময় ধ'রে প্রাইভেট করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

কথাবার্তা শেষ হয়ে যাওয়ার পর অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা সুরু হল। কেষ্টদা soul (আত্মা) সম্বন্ধে কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে দয়াল বললেন—

Soul (আত্মা) হল animating principle (অনুপ্রাণনী সূত্র)। এটা সব কিছুর মধ্যেই আছে, এমন-কি যাকে আপনারা জড় কন তার মধ্যেও। জড় বলে যেটাকে জানি সেটাও কিন্তু degree (মাত্রা)-অনুপাতিক চেতন। যেমন, এক তাল মাটিকে জড় বলছি। সেটা একটা শুয়োরের সাথে তুলনায় জড়। কিন্তু মাটির মতন ক'রে মাটিটার চৈতন্য আছে। এই চৈতন্য হল 'এনার্জি'। প্রতিটি ব্যষ্টিসত্তাই তার মতন ক'রে energy radiate (শক্তি বিচ্ছুরণ) করে। Energy-র (শক্তির) মধ্যে আবার urge (সম্বেগ) আছে। এ হল সেই সম্বেগ যার দ্বারা সব কিছু বিধৃত হয়ে আছে। আর তাই আত্মা। আবার, ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু concentric collaboration of that energetic urge (সেই উদ্যমী সম্বেগের কেন্দ্রায়িত নিবদ্ধতা)। ঐ একই wave (তরঙ্গ) নিরন্তর চলেছে প্রতিটি mass-এর (বস্তুসত্তার) মধ্যে।

কেষ্টদা—Attraction আর repulsion-ই তো wave (আকর্ষণ ও বিকর্ষণই তো তরঙ্গ)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মধ্যে stagnation-ও (বিরমণও) আছে। সেটাকে যদি উড়ায়ে দেওয়া যায় তাহলে আর wave (তরঙ্গ) ঠিক পাওয়া যাবে নানে।

Vibration, wave (স্পন্দন, তরঙ্গ) ইত্যাদির চর্চ্চায় ইউরোপ, আমেরিকা অনেক এগিয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা শব্দের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুরণন ধরে ফেলেছেন, তারপর তাকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারও করছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সব খবর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে পড়া হয়, এ সম্বন্ধে আলোচনাও হয়।

সেই প্রসঙ্গ টেনে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—আমার যদি পয়সা থাকত আর কিছু উপযুক্ত মানুষ থাকত তাহলে ওদের অনেক আগেই এসব বের ক'রে ফেলতে পারতাম। তাহলে আপনার কাছে আর কিছু কওয়া লাগত না। আমার এই পাগলামির গল্প দিয়েই সব ক'রে ফেলতে পারতাম।

কেষ্টদা—আপনি যেসব অনুভূতি এবং বোধের গল্প করেন তা' আপনার ছাড়া আর কারো হয়েছে বলে ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করলেই হয়। Clue-টা (সূত্রটা) ধরতে পারলেই হয়। আমার একটা কথা মনে হয়। যে-সমস্ত কথা আপনার কাছে বলেছি তার কিছু note-ও (লেখাও) আছে আপনার। তাই দিয়ে যদি এখনও একখানা বই লিখে রাখতেন, কাজে আসত। আমার জ্ঞান যদি সত্যি হয় তাহলে আমি যেমন কইছি, সেইভাবে চ'লে মানুষ তা' feel (বোধ) করতে পারে। I feel because I see it (আমি বোধ করি, কারণ

আমি তা' দেখি)। যে এ-পথে চলবে তার হবেই। হয়তো একবার দু'বার কি দশ-বিশ বার ভুল হল। কিন্তু conception (বোধ) তো ঠিক আছে। সেইজন্য শেষ পর্য্যন্ত হবেই। এই কারণে আমি বলি নিষ্ঠার কথা। মনটা তো সব সময় oscillate করে (দোল খায়), একটা liquid (তরল) অবস্থায় থাকে। যে-কোন দিকে গড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রায়িত হলে মন শক্ত হয়। তখন তা' থেকে energy (শক্তি) পাওয়া যায়। তাই, ঐ অর্জ্জুনের কথা মনে হয়। অস্ত্রশিক্ষার সময় master (শিক্ষক) সবাইকে জিজ্ঞাসা করছে, কী দেখছ! কেউ দেখে গাছের উপর একটা পাখী বসে আছে, কেউ দেখল পাখীটার সর্বশরীর। কিন্তু অর্জ্জুনের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল যে সে পাখীর চোখ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তখন শিক্ষক তাকে বললেন—ছোঁড় তীর। মানে, ঐ সময়ে অর্জ্জুনের মন নিবিষ্টভাবে লক্ষ্যবস্তুতে স্থিত হয়েছে। তাই সে পারল। ঐ হল নি-স্থা। সেইজন্যে এর এত দাম। দ্যাখেন, আমার মনে হয়, আমরা ঠ'কে গেছি। আমাদের ছেলেপেলেকে যদি সাথে-সাথে রাখতাম, এইসব কথা শেখাতাম, তাকে অনেক কাজ হত। আপনার দোষ হল কি—জানলেন অনেক, শুনলেন অনেক, করলেন কম। কিন্তু আমি বলছি, করলে নির্ঘাত হ'ত, একেবারে (জোর গলায় বললেন) নির্ঘাত হ'ত। আমাদের forefather-রা (পূর্ব্বপুরুষরা) যেমন সব দিক দিয়ে দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন—সেই বিমানে ক'রে যাওয়া কি মাটির তলার জিনিস দেখতে পাওয়া, এসবই অধিগত করতে পারতেন। এই সব herbs (লতাপাতা) দিয়ে যেসব ওষুধ করা যেতে পারে, আপনাকে তা' দেখায়েও দিচ্ছি, সে সবই হত, প্রফুল্ল আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখেছে, তাতে আবার এসব নেই। সে আবার সময়মত attend-ও করে (উপস্থিত থাকে) নি। এখানে (দেওঘরে) এসেও কত কথা বলেছি। যখনই একটা ভাল জিনিস সামনে আসে তখনই তার 'নোট' রাখার দরকার হয়।

বেলা বেড়ে যাওয়াতে এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাসু থেকে উঠে এলেন খড়ের ঘরে।

এখানে এসেও আলোচনার স্রোত বয়ে চলেছে জন্ম, মৃত্যু, পরলোক, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে। কথাপ্রসঙ্গে একসময় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার আর একটা কথা মনে হয়। মানুষ মরলে পরে যতক্ষণ পর্য্যন্ত putrefaction (পচনক্রিয়া) সুরু না হয়, ততক্ষণ তার brain consciousness (মস্তিষ্কের চেতনা) থাকে। এসব কথা চিন্তা করলে আমার মাথা এখনও excited (উত্তেজিত) হয়ে ওঠে। উপযুক্ত লোক পেলে আমি এগুলি বাস্তবে ক'রে দেখাতে পারতাম। লোক যারা আসল, তাদের মধ্যে অন্তত পাঁচজনও যদি টিঁকত! মানুষের জন্য আধ পয়সা, এক পয়সা, এক আনা কি দু'আনা করা হত। তাতেই তাদের চলে যেত। কিন্তু যেই টাকার ব্যবস্থা হল, টাকার বিনিময়ে ঠাকুরের কাজ করা আরম্ভ হ'ল, সেই ক্ষতি হ'ল।

এর পরে পুরানো দিনের কথা উঠল। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মহারাজের বাড়ি থেকে আসার পথে একটা মাঠ পড়ত। সেখানে ভূতের ভয় ছিল। একদিন আমি অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। হঠাৎ আকাশ থেকে যেন আলোর shower (ঝরণা) নামছে, আর আমি তার মধ্যে সাঁতার দিয়ে নামছি। ঐ আলোর ধারার মধ্যে লেখা 'বন্দে—' (স্মরণ করতে না পেরে) কী যেন ছিল। ঐগুলির solution (সমাধান) আমি পাই নে। মাঠের মধ্যে সেই গোলাপী আলো, শুধু আমি না, আরো অনেকে দেখেছে। সে আলোয় প্রতিটি বালুকণা, প্রত্যেকটি ঘাসের ডগা পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। সে যে কত বড় ডে-লাইটের মতন আলো, তা' বলা যায় না।

কেষ্টদা—দুর্গানাথদা বলেছিলেন, আপনার কপাল থেকে বেরোচ্ছিল সেই আলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা ঐরকম কয়।

সরোজিনী মা—বিরাট একটা আলোর মধ্যে ঠাকুর দাঁড়ায়ে আছেন। ঠাকুরের শরীরের চারদিক দিয়ে আলোর রশ্মি বেরোচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকে ছিল সে সময়। দুর্গানাথদা, ব্রহ্মচারী, নফর, আরো কে কে, এরকম বহু লোক ঐ আলো দেখেছিল। ঐ period-এ (কালে) অনেক সময় অনেকের কাঁধ ধ'রে চলতাম। তাদেরও চোখেমুখে ঐরকম আলো বেরোত।

কেষ্টদা—আপনি বলতেন, vital energy-কে (জীবনীশক্তিকে) ঠিকমত ধাক্কা দিতে পারলে অনেক সময় ঐরকম হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুদ্ধি ক'রে ঐসব বলতাম আর কি! আমার এই ১০০০০ dictation-এর (বাণীর) মধ্যেও ওর touch (ছোঁয়া) কিছু কিছু দেওয়া আছে।

কেষ্টদা—আগে আমরা বহু প্রশ্ন করলে আপনি একটা উত্তর দিতেন। এখন নিজের থেকেই ক'ন্। এখন নানা জনে যেসব প্রশ্ন করে, আলোচনা-প্রসঙ্গের মধ্যে আছে তার উত্তর। নানাপ্রসঙ্গে সবই আমার নিজের প্রশ্ন। কথাপ্রসঙ্গের প্রশ্নগুলিও আমার। সুশীলদা সেগুলি জিজ্ঞাসা করেছেন। ইসলাম-প্রসঙ্গেও আমারই প্রশ্ন। এখন আমার প্রশ্ন ও উত্তরগুলি আর 'নোট' করা হয় না। নিজেরটা নিজে করলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে করা সব চাইতে ভাল। তাতে একেবারে direct (সোজাসুজি) হয় কিনা—!

কেষ্টদা—তখন আমরা ৩/৪ জন বসতাম। তাদের আমি বলে রাখতাম। আমার টুকতে ভুল হলে তারা ঠিক ধরে নিত। আর লেখার পরেই ঠিক ক'রে তখন তখনই প্রেসে দিতাম। দেরি করতাম না। আজ যেগুলি বললেন, ঐগুলি লিখব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কবে কী ঘটেছে সে-সব দিন-তারিখ আমার ঠিক মনে নেই। তবে তা' না থাকলেও, Thakur—as I know Him (ঠাকুর—তাঁকে যেমনটি জানি)

এই নামে এবং আরো বিভিন্ন নাম দিয়ে কতরকমের বই লেখার material (উপকরণ) যে আপনার কাছে আছে তার ঠিক নেই। (বিষণ্ণ সুরে) তা' কামই মোটে সেরে দিল।

কেষ্টদা—আগে বোকা ছিলাম। তখন ইংরেজীতে ঐ life-sketch-টা (জীবনীখানা) লিখেছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(মৃদু ভর্ৎসনার সুরে) আর এখন বেকুব হইছেন। এখনও আপনার যা' আছে, আর আমার কথাগুলি যদি factual (তথ্যপূর্ণ) হয়, তাহলে তা' দিয়ে অসম্ভব কাণ্ড করতে পারেন।

১০ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৬৬ (ইং ২৩। ২। ১৯৬০)

প্রাতে—পশ্চিমের ছাউনিতে। সকাল ৮-৪৫। শ্রীশ্রীঠাকুর কালীষষ্ঠীমাকে ডাকতে বললেন। কলকাতা থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে একটি নতুন অল-ওয়েভ জি-ই-সি রেডিও এসে পৌঁছেছে। কালীষষ্ঠীমা আসতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে রেডিওটি দিতে আদেশ করলেন। একজন কালীষষ্ঠীমার সামনে এনে রেডিওটা রাখলেন।

কালীষষ্ঠীমা রেডিওর দিকে তাকিয়ে বললেন—বাড়ি নেই, ঘর নেই, রেডিও নিয়ে আমি কী করব!

শ্রীশ্রীঠাকুর আদেশের ভঙ্গিমায় বললেন—'নিয়ে যাও'। তারপর সুকুমারদাকে (সেনগুপ্ত) বললেন রেডিওটা কালীষষ্ঠীমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে।

সুকুমারদা রেডিও নিয়ে চলে গেলে কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সাথে এ্যাটম্ সংক্রান্ত নানা কথা সুরু হল। আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এ বিষয়ে আমার অনেক আঁকাও ছিল। সে কাগজগুলি আছে কিনা কি জানি! এসব তো একদিনে হয় না। অক্স্‌ফোর্ডের (ডিক্‌শনারির) এক জায়গায় আমার কথাগুলির কিছু কিছু মিল পাওয়া যায়।

কেষ্টদা—কোন্ বিষয়ে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইলেকট্রনগুলি কিভাবে ছোটে। আচ্ছা, ইলেকট্রনিক মাইক্রোসকোপ দিয়ে ইলেকট্রন দেখা যায় না?

কেষ্টদা—নাঃ। ইলেকট্রন চোখে দেখা যায় না। Mass-এর ভেতরে যে ইলেকট্রন আছে তাকে যদি আলাদা আলাদা ক'রে দেখতে পারতাম তাহলে ইলেকট্রন দেখা হত। আমাদের চোখে সব লেপা-পোঁছা। ইলেকট্রনের সাথে একটা wave (তরঙ্গ) আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে কোয়ান্টাম wave (তরঙ্গ) সৃষ্টি করে।

কেষ্টদা—কোয়ান্টা হল বুলেটের মত। আর ঢেউটা জলের ঢেউয়ের মত। আলো যেমন দেখা যায় না, কাঠে এসে লাগলে কাঠটা দেখা যায়, ইলেকট্রনও ঐরকম।

তারপর কেষ্টদা আইনস্টাইনের Light ও Mass theory-র গল্প করতে লাগলেন। শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—ওসব কথা আমার সাথে মেলে। প্রতিটি Mass-এর মধ্যেই expansion (প্রসারণ) আর contraction (সঙ্কোচন) চলছে। এর ফলে একটা throb (স্পন্দন) হচ্ছে। ঐ throbbing-টাই (স্পন্দন-ক্রিয়াটাই) life (জীবন)। ঐ throbbing (স্পন্দন-ক্রিয়া) থেকেই shock (ধাক্কা) লেগে কোয়ান্টাগুলি ছিটকে বেরিয়ে আসছে। সেটাই আলো। সব mass-এই এমনটা হয় বলে সব জিনিসেরই light (আলো) থাকে। এমন জিনিস নেই যার light (আলো) নেই।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে এসে বসলেন। বসে কেষ্টদাকে বলছেন—এখানে যারা কাজ করবে তাদের জন্য student allegiance form-এর (ছাত্র-আনুগত্য নিয়মাবলীর) মত একটা মুসাবিদা লিখে দেন। লিখতে হবে—এখানে যারা থাকবে তারা পয়সার জন্য থাকবে না, ঠাকুরের সেবক হয়ে থাকবে। খেতে দিলে খাবে, না দিলে না খাবে। (কিছুক্ষণ পরে) যত রকম রং-এর পেন্সিল পাওয়া যায়, আমাকে এনে দেবেন?

কেষ্টদা—হ্যাঁ। লেখার জন্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লেখার জন্যও বটে। লিখলাম, আঁকতে হলে আঁকলাম। এনে ঐ বিশুর কাছে রাখতে দিলে হয়। কয়টা ছেলে আমার কাছে থাকলে হয়। ভাবি, যতখানি পারি গাদাই। (ভাটুদাকে দেখিয়ে) ও আজকাল এখানে থাকে না। যদি থাকে, যতখানি পারি গাদাতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে, ওদের মাথায় কিছু গেঁথে দিয়ে যাই।

কেষ্টদা—ভাটু (পণ্ডা) আজকাল আনন্দবাজারে থাকে। ওখানে দেখাশুনা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(বিশুদা ও প্যারীদার দিকে নির্দ্দেশ করে) অবশ্য ওরা থাকে। পায়খানা-প্রস্রাব করানো লাগে, তা' ওরাও করাতে পারে। (তারপর আপন মনে বলছেন) আমার আগে যা' মনে হত সবই কেষ্টদার কাছে কইতাম। যত কিছু কইছি সব কিছুর সাথে কওয়া আছে, আমি কিছু জানি নে।

রাতে খড়ের ঘরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ আছেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—জগতে কিছুই static (স্থির) নয়। একটা মলিকুল থেকে আরম্ভ করে সূর্য্য পর্য্যন্ত সবই moving (গতিশীল)। একটা প্রোটন্‌ও তার নিজের axis-এর (অক্ষের) চারিদিকে ঘোরে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথাগুলি নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা চলল। কেষ্টদা জানালেন, প্রোটন্ ঘোরে এর সমর্থন কোথাও নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাল করে খোঁজ করতে বললেন। কথা চলছে। রাত সাড়ে ন'টার সময় মণিদা (চক্রবর্ত্তী) এসে বলল যে, একখানা বইতে সে ঐ কথা পেয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে লিখে এনে দেখাতে আদেশ করলেন।

মণিদা বেরিয়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলতে থাকেন—Moon (চন্দ্র) থাকে earth-এর (পৃথিবীর) টানে। এমনতর affinity (আকর্ষণ) এদের যে ছুটে যায় না। সেইজন্য moon-এর (চন্দ্রের) আমরা একটা দিকই দেখি। কিন্তু sun-এর (সূর্য্যের) সব কিছুই দেখি। Sun-এর (সূর্য্যের) cave (গুহা) দেখি, আরো কত কী দেখি! আমিই দেখেছি sun-এর (সূর্য্যের) cave (গুহা)। এখান থেকে ৩/৪ ইঞ্চি দেখেছি। এখান থেকে ৩/৪ ইঞ্চি হলে সেখানে তা' কতখানি ভাবো।

এরপর আলোচনা অন্য দিকে মোড় নেয়। এ্যাটম্-উৎপত্তি ও বোমের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বলতে লাগলেন কেষ্টদা। কিছুক্ষণ শোনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই যে atomic explosion (আণবিক বিস্ফোরণ), এ বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস। সেরকমভাবে করলে এ দিয়ে earth-কে (পৃথিবীকে) melt করিয়ে (গলিয়ে) দেওয়া যায়।

জনৈক দাদা—আচ্ছা, এ্যাটম্ বোম তো না ফাটিয়ে থামিয়েও দেওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় তা' সম্ভব। Solid (নিরেট) ক'রে ফেলানো যায় ফাটার আগেই। (তারপর পূর্ব্ব সূত্র ধরে বললেন) যাই হোক, এখন ঐ কথাটা পেলে হয়, Proton moves round its axis (প্রোটন নিজের অক্ষের চারিদিকে আবর্ত্তিত হয়)।

রাত বেশি হওয়ায় এবার সবাই উঠে পড়লেন। আলোচনা এখনকার মত স্থগিত হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগের ব্যবস্থা হতে থাকল।

১১ই ফাল্গুন, ১৩৬৬, বুধবার (ইং ২৪। ২। ১৯৬০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যথারীতি পশ্চিমের দিকের ছাউনিতে এসে বসেছেন। কিছুক্ষণ হ'ল প্রাতঃপ্রণাম হয়ে গেছে। একটু পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এলেন। প্রণাম ক'রে তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট জলচৌকিখানিতে বসলেন।

খবরের কাগজে প্রকাশিত, বর্ত্তমান দেশনেতাদের নানারকম মন্তব্যের কথা কেষ্টদা বলতে লাগলেন। শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর উদাস ভঙ্গীতে বললেন—কে যে কী কয়, ভেবে ঠিক পাই না।

পরে কেষ্টদা বললেন—ম্যাক্‌ডুগাল বলেছেন, সঙ্ঘে লোক কম থাকা একটা necessity (প্রয়োজন)। লোক বেশী বেড়ে গেলেই সেখানে force-এর (শক্তির) দরকার হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরকম ক্ষেত্রে, আমার মনে হয়, modest bitter (ভদ্রভাবে তিক্ত) হওয়া ভাল—যদি সেটা immediately propitious to every individual (প্রতিটি মানুষের কাছে তাৎক্ষণিক মঙ্গলজনক) হয়। এমন bitter (তিক্ত) হওয়া ভাল না যা' modest (ভদ্র) রকমটাকে নষ্ট করে। It is better to be bitter modestly (ভদ্রভাবে তিক্ত হওয়াটাই ভাল)। নিজের modesty (শিষ্টতা) যদি হারাই তাহলে আর কী থাকল!

কেষ্টদা—ইষ্টের যেখানে ক্ষতি হচ্ছে সেখানে তো modestly bitter (ভদ্রভাবে তিক্ত) হওয়ার কথা কেষ্ট ঠাকুর বলেন নি, বলেছেন wildly bitter (প্রচণ্ডভাবে তিক্ত) হওয়ার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ঐ চিন্তা ক'রে কই, bitter (তিক্ত) হতে গিয়ে bitterness (তিক্ততা) যদি পেয়ে বসে তাহলে মুশকিল। কেষ্ট ঠাকুর কিন্তু যুদ্ধের মধ্যেও bitter (তিক্ত) হন নি।

কেষ্টদা—কত অক্ষৌহিনী সেনা তো নষ্ট করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ক'রেও সে bitter (তিক্ত) হয় নি কারো কাছে। সেজন্য সে অস্ত্রধারণ করতে চাইল না। বলল আমি সারথিগিরি করব। আয়ুধ সে ধারণ করে নি। আয়ুধ মানে arms and amunitions (অস্ত্রশস্ত্র)। সেইজন্য কাউকে ভাল করতে যদি bitter (তিক্ত) হতেই হয় তা' হতে হবে modestly (ভদ্রভাবে)।

কেষ্টদা—Modesty-র (শিষ্টতার) নামে যদি weakness (দুর্ব্বলতা) দেখা দেয়, সেটা ঠিক হয় না। কিন্তু তা' যদি politics-এর (কূটনীতির) জন্য হয় তাহলে বোঝা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য কেষ্ট ঠাকুরের চরিত্র দ্যাখেন। যেসব অবস্থার মধ্য দিয়ে তার pass (অতিক্রম) করতে হয়েছে তাতে তার bitter (তিক্ত) হলে দোষ ছিল কী!

কেষ্টদা—কিন্তু যুদ্ধের সময় কেষ্ট ঠাকুরের রকমটা দেখা যায় no mercy, no compassion (কোন দয়া বা অনুকম্পা নয়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার কথা ছিল—যারা মরবে, মরার সব কিছু যাদের প্রস্তুত, তারা মরবেই। আর, যারা তেমন নয় তারা বাঁচুক।

এরপরে অন্ধরা স্বপ্ন দেখে কিনা সেই প্রসঙ্গে কথা উঠল। কিছুক্ষণ আলোচনা চলার পর দয়াল ঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, যারা দীক্ষা নেয় তারা নাম করে। নাম করতে করতে ভেতরে thrill (কম্পন) হয়। সেই thrill-এর (কম্পনের) ফলে মস্তিষ্কের দর্শন-ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়। তার থেকে নানারকম দেখতে পারে।

এরপরে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে এসে বসলেন। বেলা দশটা। ননীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—একটা জিনিসের কত দিক নিয়ে চিন্তা করতে পারিস্?

ননীমা—সব চাইতে বেশী দেখি, মানুষ এতে অসন্তুষ্ট হবে কিনা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—চার আল দেখে চলা লাগে, তাহলে হয় চৌকস।

১২ই ফাল্গুন, ১৩৬৬, বৃহস্পতিবার (ইং ২৫।২।১৯৬০)

সকালে পশ্চিমের ছাউনিতে বসে শ্রীশ্রীঠাকুর জনৈক ভাইকে বলছিলেন—মানুষের অন্তঃকরণেই স্বর্গ থাকে। অন্তঃকরণ নষ্ট হয়ে গেলেই সব গোলমাল হয়ে যায়।

প্রাঙ্গণে নির্ম্মীয়মান বড় এলুমিনিয়মের ঘরটির কাঠামোর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। এলুমিনিয়ম, টিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতা থেকে আনার ব্যবস্থা করতে বললেন।

পূজ্যপাদ বড়দার পায়ে ব্যথা। সকালে তিনি ঠাকুরবাড়ি আসতে পারেন নি। ডাঃ প্যারীদা (নন্দী) বড়দাকে দেখে এসে সব খবর নিবেদন করলেন দয়াল ঠাকুরের শ্রীচরণে।

এরপর রেবতী (বিশ্বাস) ও অরুণ (গাঙ্গুলী) এল। রেবতীর হাতে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত সংস্করণ। ওরা এসে আনন্দের সঙ্গে বলল—ঠাকুর! আপনি যে বলেছেন প্রোটন্‌ও তার অক্ষের চারদিকে ঘোরে সেটা এই বইটার মধ্যে পাওয়া গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(সোল্লাসে) নাকি? পড়্ পড়্।

রেবতী সবটা পড়ে শোনাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খুশী হয়ে বললেন—'ঠিক রাখিস্।'

এই সময়ে মণিদাকে (চক্রবর্ত্তী) নিয়ে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের বললেন ঐ এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার কথা। তারপর ঐ প্রসঙ্গে বলছেন—আল্‌ফা রে যা'তে বেরোয় সেটা প্রোটন্, গামা রে হয় নিউট্রনে, আর বিটা রে নেগেটিভ। একটা আছে পজিটিভ্, একটা নেগেটিভ। মাঝখানেরটার নাম আপনি কী যেন কইছিলেন?

কেষ্টদা—আপনার যা' মনে হয় সেটা লিখে রাখলে হয়। পরে মিলিয়ে দেখা যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'পজিটিভ্ পোল্' আর, 'নেগেটিভ পোল্'-এর মাঝখানে 'নিউট্রাল্ বডি' একটা থাকবেই। সেটা ভেঙ্গে দিলেই সবটা ফেটে যায়। কিন্তু দুটো 'পোল্' যদি কোনরকমে এক জায়গায় এঁটে যায়, তা'কে আর ভাঙ্গা যায় না।

কেষ্টদা—সাইক্লোটোন্ দিয়ে জোরে আঘাত করলে ভাঙ্গা যায়।

প্রবল অসম্মতি জ্ঞাপন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাইক্লোটোন্-এর বাবার ক্ষমতা নেই ওকে ভাঙ্গে। একটা পুরুষ আর একটা নারী আছে। এরা যদি অদম্য hankering (আকৃতি) নিয়ে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে, তাদের ভাঙ্গতে গেলে তারা যে কী করবে তার ঠিক নেই। দু'টো পোল্-এর একদিক দিয়ে আল্ফা বেরোয়, একদিক দিয়ে বিটা বেরোয়। আর মাঝখানে গামা থাকে। ঐ গামা হল 'নিউট্রাল বডি'। Ray is nothing. It is immaterial (রশ্মি কিছুই না, অমূর্ত্ত)। Ray shoot করে (রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়)। Existence in any shape (অস্তিত্ব যে-রূপেই) যেখানেই থাকুক না, সেখানেই ঐ ray emanate করে (রশ্মি নির্গত হয়)।

কথায়-কথায় দশটা বেজে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে চ'লে এলেন। বিছানায় বসার পরে বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) জিজ্ঞাসা করছেন—আজ হাঁটতে কালকের মত কষ্ট হয় নি তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাথা ঐরকম টলতে থাকে। গা-হাত-পাও দুলতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—স্বন মানে কী?

বললাম—স্বন্ ধাতুর মানে শব্দ। শুনে প্রভু বললেন—হ্যাঁ, শব্দ, কম্পন। আমি এক একটা শব্দ ঐরকম ক'রে ধরি। ল্যাবরেটরি একটা করতে পারলে ভাল হ'ত। কবে হবে—! আমি অতদিন বাঁচব কিনা জানি নে। ওখানকার (পাবনার বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্র) সবকিছুর নাকি কাম সেরে ফেলেছে। একটাও নাকি নেই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কাঁচড়াপাড়ার সুখেন্দু চক্রবর্ত্তীকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি science (বিজ্ঞান) পড় নি?

সুখেন্দুদা—আমি পুরোপুরি আর্টস্-এর ছাত্র। Eugenic Science-টা (প্রজনন-বিজ্ঞানটা) জানা না-থাকায় মুশকিল হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার একটা কথা মনে হয়, আই-এস-সি পড়ে বি-এ পড়া যায় না?

কেষ্টদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই করা ভাল।

কেষ্টদা—সেদিন কাগজে দেখলাম, higher education (উচ্চ শিক্ষা) আরো curtail (সংক্ষেপ) করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার বুদ্ধি, mixed course (মিশ্রিত পাঠ্যতালিকা) থাকবে। যে যেমনদিকে এগোতে চাইবে, তাই এগোবে। Education (শিক্ষা) মানে sending the children to the gallows (ছেলেপেলেদের ফাঁসিকাঠে ঝুলানো) হবে না।

এরপর কেষ্টদা ও সুখেন্দুদা বর্ত্তমান শিক্ষা-বিষয়ে কিছুক্ষণ পরস্পর আলোচনা করলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চিন্তা-চলন-ব্যবহার সব সময় এমন করা লাগে যাতে ভয়টা resisted (নিরুদ্ধ) হয়, আর স্ব-এর অর্থ যেন ব্যর্থ না হয়। স্ব-এর অর্থ হল তার পরিবেশ। আর, মানুষ নিয়েই তো পরিবেশ। সেইজন্য দেখতে হবে, চিন্তা-চলন-পারিবেশিক রকমটা যেন mistaken (ভ্রান্তপথগামী) না হয়। (চুনীদাকে বলছেন) এখনকার রকম হয়েছে কী! তুমি হয়তো ২৪ ঘণ্টা পরে রাত ১২টার সময় বাড়ী গেলে। তখন কতকগুলি ভাল topic (বিষয়) না হয়ে বৌ-এর সঙ্গে একটা বাজে topic (বিষয়) নিয়ে কথা হ'ল। ফলে, তোমার বৌ তোমার ধৃতি পেল না, তোমার trail (কৃষ্টি) পেল না। তারপর ঐরকম মানসিক অবস্থায় তোমাদের ছাওয়াল হ'ল। ফলে হ'ল কী! ছেলে ভাল হ'ল না। যেখানে ১২ টাকা পেতে, সেখানে ১২ পয়সাও পেলে না। সেইজন্য, সর্ব্বদা সাত্বত mood-এ (ভাবে) চলা ভাল। সাত্বত mood (ভাব) না হলে সাত্বত ভাববৃত্তি জাগে না। ধর, বাজারে গেলে। তোমার বৌ তোমার সাথে আছে। কেষ্টদাও থাকল। যেতে-যেতে নানা বিষয়ে তোমরা আলাপ-আলোচনা করলে। কিন্তু পণ্ডিত সাথে থাকলে আর সে-সুবিধা হবে নানে। Free talk (খোলামেলা কথাবার্ত্তা) হবে না।

কথায়-কথায় ১০-৪০ মিঃ হয়ে গেল। বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) বলছেন—এখন পান-তামাক খেলে ১০-৪৮-এ ওঠা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—১০-৪৮-এ উঠতে ইচ্ছে করছে না। (একটু থেমে) আমার এই ব্যারামেই কাম সেরে দেছে। বেড়াতে পারি নে।

বিকালে খড়ের ঘরে বসে শ্রীশ্রীঠাকুর সুখেন্দুদার (চক্রবর্ত্তী) সাথে কথা বলছেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আগে চাই মানুষ-সংগঠন। মানুষের urge (সম্বেগ), উৎসাহ যদি বিহিতপথে পরিচালিত হয়, তবেই character and conduct (চরিত্র ও আচরণ) গঠিত হতে পারে। পারিপার্শ্বিকের জন্য যদি আমরা এগুলি না করি তাহ'লে আমাদের economic (অর্থনৈতিক) সংগঠন হবে না। আমার স্বার্থটা কোথায়? আমার স্ব-এর অর্থ তোমার কাছে, মানে পরিবেশের কাছে।

সুখেন্দুদা—কোন্ centre (কেন্দ্র) এই করাগুলিকে guide (পরিচালনা) করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Existence (সত্তা)।

সুখেন্দুদা—কিন্তু এই যে বাজারদর বেড়ে যাচ্ছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হয় কেন? কারণ আমরা ব্যবসাদারদের হাতে। তাদের উপরে আমাদের নির্ভর করতেই হয়। আর তাদের পিছনে আছে গবর্নমেন্ট। একসময় ওরা

প্রচার করল, Dalda is the best thing (দালদা সর্ব্বোত্তম জিনিস)। ব্যস, তারপর থেকে আর দালদা খাওয়াটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল না খারাপ তা' আর কেউ বিচার করল না। কেউ ঘি খায় না, দালদাই কেনে। যাই কিছু করি, করতে হবে existence -এর (সত্তার) দিকে লক্ষ্য রেখে। আমার যদি existential propitiousness (সাত্বত শুভকামিতা) থাকে, তাহলেই অন্য যারা dishonest (অসাধু) হতে যাচ্ছে তাদের বাঁচাতে পারি।

সুখেন্দুদা—সে যদি morality (নৈতিকতা) থাকে তবেই সম্ভব।

শ্রীশ্রীঠাকুরর—আমার যদি honesty (সাধুতা) না থাকে, morality (নৈতিকতা) না থাকে, তবে কি আমি বাঁচব? আমি কই, মানুষকে প্রকৃত স্বার্থবোধে উদ্দীপ্ত ক'রে তোল। তাদের এমন ক'রে তোল যাতে গবর্নমেন্টের দরকারই না হয়। এমন ক'রে তাদের inter-interested (পারস্পরিকভাবে স্বার্থান্বিত) ক'রে তোল।

সুখেন্দুদা—দেশের কোথায় কী হচ্ছে, আমি জানব কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর একথার সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললেন—আমার আইসেনহাওয়ারের ঐ কথাগুলি ভাল লাগে, Farming (কৃষি), Friendship (বন্ধুত্ব), Family (পরিবার) এবং Freedom (স্বাধীনতা), এই চারটে ঠিক রাখা। কিন্তু co-operative farm (সমবায় কৃষি) সবসময় ভাল লাগে না। ওতে নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে। আমাদের আগে ছিল বেগারপ্রথা। তোমার জন্য ক'রে দিলাম, তুমি profitable (লাভবান) হ'লে। পরে আবার আমার জন্য করলে। এতে সবারই লাভ।

সুখেন্দুদা—কেন, এক জোড়া গরু যদি ৫ জনে কেনে তাহলে প্রত্যেকেই লাভবান হতে পারে। যে টাকা বাঁচল তা' দিয়ে অন্য কিছু করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক জোড়া করবে কেন? ৫ জনে যাতে ৫ জোড়া কিনতে পারে সেই ব্যবস্থা ক'রে ক'রে দাও। আমি কো-অপারেটিভ্ ক'রে দেখেছি, ওতে টাকা মারার বুদ্ধি আসে, কাজে ফাঁকি দেওয়ার বুদ্ধি আসে। কত কী আসে! আবার, সব যদি গবর্নমেন্টের হয়ে যায়, কারো যদি personal land (ব্যক্তিগত জমি) বলে কিছু না থাকে, তাহলে জমিজমার উপর তার interest (আগ্রহ) আর বাড়বে না।

সুখেন্দুদা—কিন্তু সবাইকেই তো কাজ করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করতে হবে, বলছ। ঠিকমত করে ক'জন?

সুখেন্দুদা—Honest mind (সাধুমনা) যদি কেউ থাকে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তাই কও, honest mind (সাধুমনা)। মানুষকে honest (সাধু) করতে হলে আগে নিজে honest (সাধু) হতে হয়। নিজে হলে তখন সবার ভিতরে ওটা চারিয়ে দিয়ে ঐ ভাব জাগিয়ে দেওয়া যায়। কথা হ'ল কী! আমার নিজের

character-এর (চরিত্রের) উপর দাঁড়াতে হবে। আমরা যে down (অধঃপতিত) হয়েছি তো হয়েই আছি। এখন উঠতে হ'লে নিজেদের character-এর (চরিত্রের) উপর দাঁড়ানো লাগবে।

সুখেন্দুদা—আপনার কথা আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার হ'ল না। যে যা' পায় তা' তার জীবনযাত্রার পক্ষে যথেষ্ট নয় বলেই মানুষ ধর্ম্মঘট ইত্যাদি করছে। আবার, যারা ইন্ডাস্ট্রীর মালিক তারাও ঠিকমত ভাবতে পারছে না। এ দুইয়ের মধ্যে adjustment (সামঞ্জস্য) করা লাগবে তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—গবর্নমেন্ট আমার কথা শুনবে কিনা জানি না। আমি বুঝি, আমার যদি ৫ জন মানুষ থাকে, তাহলে আমি তাদের সাহায্য করি, তারাও আমাকে সাহায্য করুক।

সুখেন্দুদা—এই সততার মূল্য যদি কেউ না দেয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না দিলে কী হবে?

সুখেন্দুদা—যা' ইচ্ছে তাই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গবর্নমেন্ট কি সব কিছু করতে পারবে?

সুখেন্দুদা—আজকাল দলাদলি ক'রে অনেকে কার্য্যসিদ্ধি ক'রে নিচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর আমাদের কী হচ্ছে?

সুখেন্দুদা—আমরা নষ্ট হচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে গোড়ায় আমরা। আমি যদি তোমার interest (স্বার্থ) হয়ে উঠি, তুমিও automatically (স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে) আমার interest (স্বার্থ) হয়ে উঠবে। আমার স্বার্থের অর্থ যদি তুমি হও, তোমারও আমি হব।

সুখেন্দুদা—কিন্তু উপরে মালিকপক্ষ যারা আছে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা খায় কার উপর দিয়ে? আমাদের মত চুনোপুঁটির উপর দিয়ে। এই চুনোপুঁটিগুলি যদি সত্তাস্বার্থে এক হয়ে যায় তাহলে রুই-কাতলা চিত হয়ে পড়বে। যাতে ভাল হয় তাইই হোক। কিন্তু আমাদের কথা, ability (সামর্থ্য) বাড়াতে হবে। Ability (সামর্থ্য) মানে আমি তোমাকে কতখানি ফাঁকি দিতে পারি, তা' না। বরং দেখব, কিসে তুমি বেড়ে ওঠ, তাই করব।

সুখেন্দুদা—কিন্তু এসব ক'রেও যদি আমার ability-র (সামর্থ্যের) মূল্য আমি না পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ability-র (সামর্থ্যের) মূল্য হ'ল ঐ যে আমি তাকে দাঁড় করালাম, তার বাড়ী-বাগান-গরু করে দিলাম। তারপর যদি তার কাছে কই, আমার এই কাজটা করে দেবা? তখন সে সানন্দে বলবে 'হ্যাঁ, বাবা, দেব।' এইতো মূল্য!

সুখেন্দুদা—সমাজে কিন্তু উৎপাদন বাড়ানো দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও তো তা' কই। কিন্তু পরের দিকে না তাকিয়ে নিজেরা কর।

সুখেন্দুদা—ব্যবসায়ীরা মুনাফা করে মানুষের জীবনের বিনিময়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'রা তা' করতে পারে, কারণ আমরা পরমুখাপেক্ষী হয়ে আছি। আমার যা' প্রয়োজন তা' যদি নিজেরা উৎপাদন ক'রে নিতে পারি তাহ'লে তো আর কারো অপেক্ষায় থাকতে হয় না। সেইজন্য আমরা যতটা পারি, উৎপাদন বাড়াব।

এরপর ঠাকুর একটি ছড়া দিলেন—

একটুখানি বাস্ না ভালো
কুটিল কালো তাড়িয়ে দিয়ে,
সবটা হৃদয় কর্-না আলো
ক্লেশ-সুখের আহুতি নিয়ে।

সান্ধ্যা প্রণামের সময় হয়ে এল। সেইজন্য আলোচনা আর এগোল না। সবাই প্রস্তুত হলেন প্রণামের জন্য।

আজ শিব-চতুর্দ্দশী। মায়েরা বিবিধ উপকরণ ও অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। সন্ধ্যার পর কালীষষ্ঠীমা জিজ্ঞাসা করছিলেন—এ সময়ে রাত্রি জাগা হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জেগে থাকাটা জীবনের পথ। শিব মঙ্গলের দেবতা। তাই, শিব-চতুর্দ্দশীতে জাগে। ঘুমটা মরণের পথ কিনা!

রাত ১০টা বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুর বঙ্কিমদাকে (রায়) জিজ্ঞাসা করলেন—'রেতঃ-নিক্বণ' কথাটা হয় না।

বঙ্কিমদা অভিধান দেখছেন, ভাবছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—'নিক্বণ' কইতে চাই কেন! রেতের ভিতরে thrill (স্পন্দন) আছে। সেই thrill-ই (স্পন্দনই) জীবনের উৎস। তা' আবার পুরুষানুক্রমে সংস্কার বহন ক'রে নিয়ে চলে।

বঙ্কিমদা—রেতঃ এসেছে রী-ধাতু থেকে, মানে গতি, কম্পন, শব্দ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রেতঃ-এর মধ্যে ঐ সব ক'টাই আছে। রকম-সকম দেখে রেতঃ সম্বন্ধে ঐ কথাই মনে হয়।

১৩ই ফাল্গুন, ১৩৬৬, শুক্রবার (ইং ২৬। ২। ১৯৬০)

আজ সকালে পশ্চিমবঙ্গের পাবলিসিটি অফিসার তারাপদ ঘোষ এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম ক'রে কিছুক্ষণ ব'সে বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন।

বেলা দশটায় বিহারের মন্ত্রী জগৎনারায়ণ লাল সস্ত্রীক জামাতা-সহ শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এলেন। তিনিও কিছু কথাবার্ত্তার পর চ'লে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে আছেন। শরৎদার (হালদার) সাথে গীতা-প্রসঙ্গে কথা চলছিল। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গীতা হ'ল practical life-এর (বাস্তব জীবনের) কথা আমাদের সাত্বত সম্বর্দ্ধনার জন্য। এটা science and philosophy combined (বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয়)।

বিকালে শরৎদা একটি দাদাকে এনে বললেন—ওঁর স্ত্রী কয়েকদিন আগে আত্মহত্যা করেছেন। ওঁর সেজন্য খুব কষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো! মনে দুঃখ তো হ'তেই পারে। তা' নিয়ে ব'সে থাকলে তো চলবে না। কাজ করা লাগবে। আর, এখানে বিয়েও ঠিকমত হয় নি। Compatible marriage (সদৃশ বিবাহ) হয় নি। আমি কই, ওরকম ক'রো না। বিয়ে করতে হ'লে ভালভাবে দেখেশুনে সদৃশ ঘরে ক'রো। হিন্দুদের নিয়ম ছিল, যারা আত্মহত্যা করবে তাদের জন্য শোক করা উচিত না।

গিরিশদা (ভট্টাচার্য্য)—তাদের জন্য শোক হয় না। তাদের জন্য অশৌচ পালন নেই, শ্রাদ্ধ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওসব করলে ঐ ভাব এসে চেপে ধরে। সেইজন্য করে না। ব'লে ছড়া দিলেন—

খণ্ড টুকরো যাই না হোক
ধৃতিধারা রাখিস ঠিক,
ব্যক্তিপরিবার সবাই যেন
ধ'রে চলে ঐ নিরীখ।

রাত আটটা। সুখেন্দুদা (চক্রবর্ত্তী) এসে বসছেন। কথা তুললেন—আজকাল গবর্ণমেন্ট ছেলেদের রিলিজিয়াস এডুকেশন দেবার কথা বলছে। কোন্ উপায়ে তা' দেওয়া সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Religious education-এর (ধর্ম্মীয় শিক্ষার) গোড়ার কথা হ'ল বাপ-মা'র প্রতি শ্রদ্ধা। মা-বাবার কাছেই শিক্ষার প্রথম হাতেখড়ি হয়। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাবার জন্য তোমরা কী করেছ? ছেলেমেয়েদের কি মা-বাপকে একখণ্ড পাথর দিতেও শিখিয়েছ। এটাকে বাদ দিলে হাজার সুশিক্ষাও ছেলেমেয়েদের ধর্ম্মানুরাগী করতে পারবে না। কারণ, বৈশিষ্ট্যের ভিতই ট'লে যাবে তাতে। আর বৈশিষ্ট্যকে sacrifice (বর্জ্জন) করলে personality-কে sacrifice (ব্যক্তিত্বকে বর্জ্জন) করা হয়। ঐরকমভাবে যারা গ'ড়ে ওঠে তারা তোমার মেয়েটাকে দেখে বলবে, 'মাস্টার

মশায়ের মেয়েটা কী সুন্দর, বাগাতে পারলে হয়।' এই সব কথা! মাস্টার মশাই তার ভাল করছে। তার কাম আগে কী ক'রে সারবে সেই চিন্তা। এখনও শিকড় আছে। মূল শিকড় ইঁদুরে ভাল ক'রে খেতে পারে নি এখনও। দেরী লাগছে। কিন্তু আমরা যে কিছুই করছি না। পলিটিকস করি, কিন্তু পলিটিকস্-এর 'প'ও নাই তার মধ্যে। সুরেন বাঁড়ুজ্জের আমলেও একটা ধাঁচ ছিল। তারপর সে ধাঁচ একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। তুমি এখনও আবার সেটা ফিরিয়ে আনতে পার চেষ্টা করলে। তার জন্য তোমার নিজের চরিত্র এমন হওয়া চাই যে তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, তোমাকে প্রণাম করার জন্য রাস্তায় যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

সুখেন্দুদা—আমি নিজে হাতে ধ'রে এটা শেখাই ছেলেদের। বলি, এখনও প্রণাম করাটুকুও শেখোনি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা তোমার বেলায় ক'রো না। অন্য মাস্টারের বেলায় ক'রো। আর, সেটা যেন খুব soothing (শান্ত) তিরস্কারের সুরে হয়।

সুখেন্দুদা—বাবা চেয়ারে ব'সে থাকলে সেখানে আর একখানা চেয়ারে যে ছেলের বসা উচিত না—।

বাধা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সেটা তোমার বাড়ীর মাকে আগে শেখায়ে দিও। তিনি যেন ছেলেকে শেখায়ে দেন, বাবার সাথে এই এই ভাবে চলবি। আমার ঐ বড় খোকা আর মণিকে দেখলে হয়, দাদার সামনে মণি কিভাবে চলে। তাই আমি কই, মা-ই ভাল minister (মন্ত্রণাদাতা)।

তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গে সুখেন্দুদা বললেন—আচ্ছা, evolution-এর (বিবর্ত্তনের) পথে যেতে গেলে তো কিছু interpolation (প্রক্ষেপ) হয়েই যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Interpolation-কে (অন্তঃক্ষেপকে) যারা resist (প্রতিরোধ) করেছে, তারা species-এর (প্রজাতির) মধ্যে টিকে আছে। আর, যারা interpolation-কে (অন্তঃক্ষেপকে) resist (প্রতিরোধ) করতে পারে নি, তারা extinct (লুপ্ত) হ'য়ে গেছে বা হবার মুখে। কেমন ব্যাপার হয় দেখ! এখানে ল্যাংড়া আম আছে। বৈজ্ঞানিকরা ক্যানাডা থেকে কী এক ভাল জাতের আমের pollen (রেণু) এনে ঐ ল্যাংড়া আমের pollen-এর (রেণুর) সাথে মিশিয়েছে। তা'তে sizeটা (আকারটা) বড় হয়েছে। কিন্তু ল্যাংড়ার সে taste বা flavour (স্বাদ বা গন্ধ) নেই।

সুখেন্দুদা—আচ্ছা, সমাজে যদি প্রতিলোম হ'য়ে যায়, তাহ'লে সেখানে রক্ষার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে back cross (বীজপ্রাধান্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে জনন-সংক্রান্ত ঊর্দ্ধগতি) ক'রে-টরে যদি হয়। এ বিষয়ে তোমাদের পূর্ব্বতন পুরুষরা কী

ক'রে গেছেন আমি জানি নে। মোট কথা, culture-টাকে (কৃষ্টিটাকে) seed-এর (বীজের) দিকে convert (রূপান্তরিত) করতে পার কতখানি তা' দেখা লাগবে।

সুখেন্দুদা—অনেক সময় শুনি, মানুষের পেটে সাপ হয়, কচ্ছপ হয়। তা' কেমন ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, ওখানে ভাববৃত্তি এমনতরই থাকে যাতে অমনটা হ'য়ে ওঠে।

১৪ই ফাল্গুন, ১৩৬৬, শনিবার (ইং ২৭। ২। ১৯৬০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর পশ্চিমের ছাউনিতে এসে বসেছেন। ননীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পান-তামাক দিচ্ছেন। কাছে আর কেউ নেই এখন।

তামাকের নলটা হাতে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ননীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি প্রয়োজন হয়, তুই আমারে খাওয়াতে পারবি?

ননীমা—হুঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে?

ননীমা—যেভাবে হয় আমি করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'তে যদি মানুষ তোরে বদ্‌মায়েশ মাগী, হারামজাদী ব'লে গাল দেয়?

ননীমা—তা' দিক।

একথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—শুনে রাখিস।

সকাল সাড়ে দশটা। কিছুক্ষণ আগে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে চ'লে এসেছেন। সুখেন্দুদা (চক্রবর্ত্তী) সস্ত্রীক এসে আজ বাড়ী যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

পরম দয়াল সস্নেহে সুখেন্দুদার স্ত্রীকে বললেন—তোরা আজই যাবি, হ্যাঁ মা!

উক্ত মা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোদের নিয়ে গল্পসল্পও করতে পারলাম না। এখন আর পেরেও উঠি না। যাহোক, আবার যখনই ইচ্ছে হবে চ'লে আসবি, ছাওয়াল-পাওয়াল নিয়ে ফূর্ত্তি ক'রে যাবি।

এরপর ওঁরা প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর 'বিশাসিত ব্যক্তিত্বের সহজ মাধুর্য্য' কেমন সেই প্রসঙ্গে একটি বাণী দিলেন। বাণীটির প্রথম লাইনেই আছে "রেতঃ-নিক্কণী সাত্বত সজ্ঞিত সম্বেগ"।

কথাগুলির অর্থ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি বললেন—রেতঃ এসেছে রী-ধাতু থেকে। রী মানে শব্দ। তার আবার নিক্বণ আছে, মানে thrill (স্পন্দন) আছে। আর সেটা হ'ল thrill of life (জীবন-স্পন্দন)। সেইজন্য রেতঃ-নিক্বণ মানে কওয়া যায়, systematic existential resonance (সুব্যবস্থ সাত্বত অনুরণন)। এটা ঠিক থাকলে existence-কে completely conquer (সাত্বত বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিগত) করা যায়।

তারপর শরৎদার (হালদার) দিকে ফিরে বললেন—রেতঃ-নিক্বণ বোঝা যাবে তো?

শরৎদা—আপনি যে-অর্থে বলেছেন তা' ওর মধ্যে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রেতঃ মানে শব্দ। Thrill (স্পন্দন) আছে ওর মধ্যে। রেতঃ মানে বীর্য্যও হয়। তাও ঐ নিক্বণবাহী পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ঐ নিক্বণ-বাহিত হ'য়ে চলে। সেইজন্য কয়, 'আত্মনঃ জায়তে পুত্রঃ, পুত্রাৎ পিণ্ডপ্রয়োজনম্।" (ক্ষণেক বিরতির পর) আমি যা' কই, আপনারা যদি সাথে সাথে এই কথাগুলির support (সমর্থন) বের ক'রে দিতে পারতেন, খুব ভাল হ'ত।

শরৎদা—এসব কথার support (সমর্থন) এখনও পাওয়া যাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা হ'চ্ছে কি। —আমি তো লেখাপড়া জানি নে। অথচ আমার fact (বাস্তব তথ্য) কওয়া লাগছে। Conception (ধারণা) একটা আছে তো! তার উপর দাঁড়ায়ে কই। মিলবে ঠিকই। অনেকের সাথে মিলেও যাচ্ছে। তারপর আর এক কথা। আগে আমরা যেসব বিষয় আলোচনা করেছিলাম তার কিছুই বের করতে পারলাম না। অন্য দেশ সেগুলি বের ক'রে ফেলল। আমরা প'ড়ে রইলাম back-এ (পিছনে)। সেই কবেকার কথা। তখন এ্যাটম ভাঙ্গার কথাও ছিল না। ছিল কিনা জানি নে। থাকলেও শুধু একটা আইডিয়া হয়তো থাকতে পারে। তখন ঐসব কথা বলি। তখন থেকে চেষ্টা করলে অনেক জিনিস বেরিয়ে যেত। সকলে জানত, একথা আমরাই প্রথম বলেছি। কিন্তু তা' আর হল না। এরকম অনেক ব্যাপারই আছে।

এরপর শব্দের অর্থ কিভাবে ঠিক করতে হয় সেই প্রসঙ্গে কথা উঠল। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শব্দের অর্থ সবসময় existential standpoint (সাত্বত দৃষ্টিভঙ্গী) দেখে ঠিক করা লাগবে। দেখতে হবে কোন্‌টা existence-কে support (সত্তাকে সমর্থন) করে।

সন্ধ্যার পর থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকগুলি ছড়া ও বাণী প্রদান করলেন। সবগুলি লিখে নেওয়া হ'ল, একবার ক'রে পড়াও হ'ল। তারপর দয়াল প্রভু বললেন—আমার কথাগুলি যেন physiology of creation (সৃষ্টিধারার শারীর-বিজ্ঞান)। এর

মধ্যে কোন philosophy (তথাকথিত দার্শনিকতা) নেই। এগুলি physiology of existential proficiency (সাত্বত সম্বেদনার শারীর-বিজ্ঞান), ভাল ক'রে সব দেখা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীপ্রদান ও এই কথাগুলি উচ্চারিত হবার পর ঘরের মধ্যে এক শান্ত অথচ ভাবগম্ভীর নীরবতা বিরাজ করছে। ঘরে অনেক লোক। সবারই মন ভাবমুখী।

কিছু পরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ইংরাজী ও বাংলায় বহু বিষয়ই তো আপনি বলেছেন। সমস্ত দুনিয়ার পক্ষেই তো এর প্রয়োজন আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ভাবি কোন দিক দিয়ে যেন ফাঁক না থাকে, তোমাদের কোন অসুবিধা না হয়।

১৬ই ফাল্গুন, ১৩৬৬, সোমবার (ইং ২৯। ২। ১৯৬০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর পশ্চিমের ছাউনিতে এসে বসেছেন। ভক্তবৃন্দ এসে প্রণাম ক'রে স্ব স্ব কর্ম্মে চ'লে যাচ্ছেন। কেউ বা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে প্রভুর শ্রীমুখ নিরীক্ষণ করছেন। শান্ত সুন্দর প্রভাত। চারিদিকে আনন্দময় পরিবেশ।

জামশেদপুর থেকে জনৈক দাদা সস্ত্রীক এসেছেন। বললেন তাঁর ব্যবসায়ে অসাফল্যের কথা। কিছুতেই দাঁড়াতে পারছেন না। জানতে চাইলেন, এখন কী করবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যবসাই আমার ভাল লাগে। ব্যবসা করতে মূলধনে কিছুতেই হাত দিও না। আর, তোমার যদি দু'পয়সাও থাকে, আধখানা পয়সাও অন্ততঃ মানুষকে দিও। মানুষের জন্য এইরকম করা মানে নারায়ণকে ধ'রে থাকা। আচার-নিয়ম ভাল ক'রে পেলো। আচার মানে স্বাস্থ্যের আচার, বাঁচার আচার, কেমন ক'রে সমৃদ্ধিশালী হ'তে হয়, বেঁচে থাকতে হয়, সেই আচার। নিজেরা পাললে ছেলেপেলেও পালা শিখবে।

ঐ দাদার স্ত্রী কেঁদে ফেলে বললেন—বাবা! বড় অশান্তি মনে।

পরম স্নেহভরা কণ্ঠে সান্ত্বনা দান ক'রে দয়াল ঠাকুর তাকে বললেন—তুমি ওরকম ভেঙ্গে পড়লে ও দাঁড়াবে কী ক'রে! ওকে আগে দাঁড় করাবি তো? ও দাঁড়ালে ওর ভাল হবে। মেয়েদের কয় গৃহলক্ষ্মী। সংসার ঠিক রাখে তারাই। আমার নীতিগুলি যে পেলেছে, সে-ই দাঁড়িয়ে গেছে।

উক্ত মা—আমার এখানে থাকতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাকিস, আগে ওকে দাঁড় করিয়ে আয়। তখন থাকাটা ফূর্ত্তির হবে নে।

এরপর ওঁরা প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন। আর একটি দাদা এসে জানালেন—আমি কাল স্বস্ত্যয়নী নিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালভাবে চ'লো। সবাই যেন তোমাকে ভালবাসে। তোমাকে দিয়ে কেউ যেন দুঃখ না পায়।

এইরকম কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়ে বেলা বেড়ে ওঠে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) বললেন—দশটা বাজল।

মৃদুহাস্যে শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর দিলেন—আমার মনে হয়, এখানে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণই ভাল থাকি। ওখানে (ঘরের মধ্যে) একটু পরেই গরম লেগে উঠবে।

আরো কিছুক্ষণ বসার পর স্নানবেলার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে চ'লে এলেন।

১৭ই ফাল্গুন, ১৩৬৬, মঙ্গলবার (ইং ১। ৩। ১৯৬০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর পশ্চিমের ছাউনির তলে পাতা শুভ্র শয্যায় এসে বসেছেন। প্রাতঃপ্রণাম হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট জলচৌকিখানিতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—এই যে বিজ্ঞ, প্রজ্ঞ কথা আছে, এখানে জ্ঞ মানে জানা হল কী করে?

কেষ্টদা—জ্ঞা-ধাতু মানে জানা। তার থেকে জ্ঞ হয়েছে।

এরপর দিন তিনেক আগে দেওয়া 'বিশাসিত ব্যক্তিত্বের সহজ মাধুর্য্য' সম্পর্কিত বাণীটি নিয়ে আলোচনা শুরু হল। আলোচনা-প্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—মেয়েদের আর এ ব্যক্তিত্ব হতে পারবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন?

কেষ্টদা—আপনি প্রথমেই তো বলেছেন, 'রেতঃ-নিক্বণী সাত্বত সঞ্জিত সম্বেগ'। তা' মেয়েদের তো sperm (শুক্র) নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sperm (শুক্র) নেই, কিন্তু sperm (শুক্র) দিয়ে গঠিত দেহ। ও কথাটা মনে হওয়ার কারণ, sperm-এর (শুক্রের) মধ্যে thrill (স্পন্দন) আছে। তখন নিক্বণ কথাটা মনে হল। মনে হতেই বললাম, লেখ্ তো!

কেষ্টদা—ওখানে যে 'সঞ্জিত সম্বেগ' বলেছেন তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে সম্বেগটা একেবারে cell to cell (কোষে কোষে) system-এর (শারীর বিধানের) মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

কেষ্টদা—বিশাসিত ব্যক্তিত্ব কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের মধ্যে conceptive conglomeration (বোধের গুটিকাভূত অবস্থা) আছে। সেটা সুবিন্যস্ত হয়ে যখন দানা বেঁধে ওঠে, তার থেকে ব্যক্তিত্ব grow করে (জন্মায়), তাই বিশাসিত ব্যক্তিত্ব। আমাদের মধ্যে কিছু inconsistent inherent aptitude (পরস্পরবিরোধী সহজাত যোগ্যতা) থাকতে পারে। তার মধ্যে যেগুলি existence-এর (সত্তার) পক্ষে unfavourable (প্রতিকূল), ঐ conceptive conglomeration (দানা-বাঁধা বোধশক্তি) সেগুলি বাদ দিয়ে দেয়।

কেষ্টদা—আগে লোকের বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীই বিশ্বের কেন্দ্র, সেটা contradict (প্রতিবাদ) করতে গ্যালিলিওর ফাঁসি হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু সে তার নিজের মতবাদে convinced (বিশ্বাসী) ছিল, তাই তার বুদ্ধিও ঐ রকম আস্‌ল। Determined (সঙ্কল্পবদ্ধ) হয়ে সে তার কথার support-এ (সমর্থনে) যুক্তি জোগাড় করল।

কেষ্টদা—কিন্তু traditional traits (ঐতিহ্যগত বিশেষ লক্ষণ) যা' ছিল তা' সে মানল না। বইতে যা' আছে তা' বিশ্বাস করত না। এটা খারাপ না ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Traditional traits (ঐতিহ্যগত বিশেষ লক্ষণ) যদি শুভ হয় তবে তা' মানা ভাল।

কেষ্টদা—নক্ষত্র-ব্যবসায়ীদের অপাঙক্তেয় বলা আছে। কিন্তু ভাস্করাচার্য্য, নিউটন, এঁরা তো ঐ বিষয়ে অনেক তথ্য বের করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকে ঐ নিয়ে ব্যবসা করে তো, তাই ওরকম বলে। কিন্তু এর মধ্যে প্রকৃত সত্যটাকে জানবার জন্য যারা চেষ্টা করে তাদের কথা আলাদা।

কেষ্টদা—Traditional trait মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Trait মানে গুণ, acumen (পাণ্ডিত্য)।

কেষ্টদা—চুরি করার acumen (পাণ্ডিত্য) আছে, ডাকাতি করারও acumen (পাণ্ডিত্য) আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খারাপটা জানতে হবে, করতে হবে না।

কেষ্টদা—তাহলে তো কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা খারাপ, সেই বিচারে বসা লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন্‌টা propitious to my existence (আমার অস্তিত্বের পক্ষে শুভ) তা' দেখা লাগবে। যেটা সেরকম হয় সেটা follow (পালন) কর। আর, যেগুলি

existence-কে (অস্তিত্বকে) খারাপ করে তাও জান। জেনে comparative study (তুলনামূলক আলোচনা) ক'রে ঠিক পথে চল। খারাপটা follow (পালন) করলে আর culture (কৃষ্টি) থাকবে নানে।

কেষ্টদা—Discerning capacity (নির্দ্ধারণী ক্ষমতা) তো বেশীর ভাগ লোকেরই থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাকে না সেটা তো ঠিক না। না থাকলে মানুষ ভুল করতে পারে।

কেষ্টদা—সত্য মানে যে লোকহিত, তা' ঠিকমত বুঝতে গেলে প্রত্যেককেই তাহলে জজ-এর আসনে বসতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Judging capacity (বিচারের ক্ষমতা) প্রত্যেকেরই আছে। সেটা ঠিকপথে জাগিয়ে তুলবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের দরকার হয়।

কেষ্টদা—Traditional trait (ঐতিহ্যগত বিশেষ লক্ষণ) ভাল হ'তে পারে তার উদাহরণ কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন, আপনি আমার কাছে দুষ্মন্তের গল্প করেছিলেন। শকুন্তলার প্রতি তার মন আকৃষ্ট হচ্ছে দেখে সে নিশ্চিত হল, এ নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়কন্যা। কারণ, এ যদি ব্রাহ্মণকন্যা হত তাহলে আমার বিশুদ্ধ আর্য্য মন কখনও এর প্রতি আকৃষ্ট হত না।

কেষ্টদা—আমাদের যে দশবিধ সংস্কারের tradition (ঐতিহ্য) আছে তাও সবাই মানে না। এখন ছেলেপেলের অন্নপ্রাশন দিতে হলে আপনার পাতের প্রসাদ একটু বড়মার হাত দিয়ে দিইয়ে নিলেই হয়। আর কিছু তো করেই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা ভাল। দেখবেন, একটু লক্ষ্য করলেই বাচ্চাকাচ্চাদের traditional traits (ঐতিহ্যের বিশেষ লক্ষণ) বোঝা যায়। হয়তো মা-বাবার সাথে বেড়াতে গেছে। 'ওটা লাল কেন, এটা হলদে কেন, পাখিটা অমন ক'রে উড়ে গেল কেন' এইরকম প্রশ্ন আছে। এ থেকে ঐ ছেলের অনুসন্ধিৎসার ঝোঁক বোঝা যায়। আবার কোন ছেলে হয়তো এইরকম অনেক কথা বলে চলেছে, তাকে থামাবার জন্য তার বাবা তাকে বলল, 'কথা বলিস্ নে। তোকে একটা জিনিস কিনে দেবানে।' অমনি সে চুপ ক'রে গেল। এতেও ঐ বাচ্চার রকম বোঝা যায়।

কেষ্টদা—বাচ্চাদের অমনতর প্রশ্ন তাদের স্বাভাবিক সম্পদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবার এটা হয় না।

কেষ্টদা—কোন কাজ বহুদিন ধরে করার ফলে সেটা tradition (ঐতিহ্য) হয়ে দাঁড়ায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের করাগুলির যে ধারা, যা' আমার সত্তায় সঙ্গতি লাভ করেছে তাই হল tradition (ঐতিহ্য)। এই যে আপনার চাউ (কেষ্টদার কনিষ্ঠ পুত্র) ছোটবেলায় যাকে তাকে মারত, আরো কী কী করত! এখন হয়তো আর করে না।

কেষ্টদা—এগুলিকে বলা হয় individual trait (ব্যক্তিগত গুণ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Individual trait-ও (ব্যক্তিগত গুণটিও) ঐ sperm-এর (শুক্রের) মধ্য দিয়েই ঢুকেছে। কথা হল কি! Traditional traits (ঐতিহ্যগত গুণলক্ষণ) বংশপরম্পরায় তৈরী হয়েই আসে। সেইজন্য যেগুলি hereditary traits (বংশগত গুণলক্ষণ) তাকেই কয় traditional traits (ঐতিহ্যগত গুণলক্ষণ)।

ভাটুদা (পাণ্ডা) কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই সময় তার দিকে ফিরে দয়াল ঠাকুর বললেন—পিঠটা একটু চুলকে দে তো!

ঠিক কোন্ জায়গাটায় চুলকাতে হবে ভাটুদা বুঝতে পারছিলেন না। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর নির্দেশ ক'রে দিলেন—Spine-এর (শিরদাঁড়ার) কাছে।

ভাটুদার চুলকানো হয়ে গেলে কেষ্টদা আবার পূর্ব্ব সূত্র ধরে বললেন—Hereditary trend-ও (বংশগত ঝোঁকও) আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Trends (ঝোঁক) কইলে আরো ভাল হয়। যে-সব শিশু হাঁটতে শিখেছে, ভাল ক'রে হাঁটতে পারে না, অথবা আড়াই-তিন বছর বয়স, তখন থেকে লক্ষ্য করলে তাদের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়। সেগুলি ঐ পূর্ব্বপুরুষ পিতৃপিতামহ থেকে চলে আসছে। এসে পিণ্ডীকৃত হয়ে এক একজনের বিশেষ ধরনের make up (সংগঠন) তৈরী করেছে।

কেষ্টদা—আজকাল রে প্রয়োগ ক'রে বহু বছরের seed-এর (বীজদানার) বৈশিষ্ট্য বদলে দিচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বদলে দিচ্ছে মানে ভেঙ্গে দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে রমণের মা এসে উপস্থিত। এক হাতে একটা খালি ঘটি, আর এক হাতে কিছু কাপড়-চোপড়। বৃদ্ধাটি এগিয়ে আসছেন, উদ্দেশ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকির কাছ ঘেঁসে বসবেন। প্যারীদা (নন্দী) তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, এখানে দরকারী কথাবার্ত্তা হচ্ছে, আপনি তাঁবুর বাইরে বসেন। কিন্তু রমণের মা সেকথা না শুনে কাছে বসার জোর করছেন।

তখন শ্রীশ্রীঠাকুর রমণের মাকে বললেন—তুমি কর কী! বোঝ না, সোঝ না। বস, ঐ কেষ্টদার কোলে বস।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে কুটিপাটি। রমণের মা একটু সরে যেয়ে বসলেন। আবার আলাপ-আলোচনা চলল।

কেষ্টদা—অ্যাটম্ বম্ ছাড়ার পরে আজকাল নাকি intellect (চিন্তাশক্তি) কমে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার সন্দেহ হয়, হয়তো অ্যাটম্ বম্ আগে আরো ছাড়া হয়েছে, আমরা তা' জানি না। তার ফলে বোধহয় মানুষ এতখানি impotent (হীনবল) হয়ে গেছে। এ গল্প আপনিও আমার কাছে করেছেন। আবার দেখেন, sperm (শুক্রকীট) মায়ের পেটে থেকে বাড়ে। মা sauce supply (স্বাদন-সম্বেগ সরবরাহ) ক'রে তাকে বাঁচায়ে রাখে। আর, যেখানে supply (সরবরাহ) করতে পারে না, সেখানে issue-ও (সন্তানও) ভাল হয় না।

সামনের আমগাছটি মুকুলে ভরে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই গাছগুলো নাকি অন্য species-এর (প্রজাতির) রেণু নিতেই চায় না। মুখ বন্ধ করে দেয়। Interpolation (অন্তঃপ্রক্ষেপ) হতেই দেয় না। পণ্ডিত আমারে এটা দেখাইছিল।

কথায়-কথায় বেলা সাড়ে এগারোটা বেজে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর এখনও স্নানে ওঠেন নি। বেশ মৌজে বসে কথাবার্ত্তা বলছেন, মাঝে-মাঝে তামাকু সেবন করছেন। দু-একবার ওঠার কথা বললেও সেদিকে কান না দিয়ে তামাক দিতে বলছেন। সকলেই বিভোর হয়ে আছেন।

ডাক্তারী ও ওষুধ-সংক্রান্ত কথা চলছে। সেই প্রসঙ্গে প্যারীদা বললেন—আমি মৌমাছিকে ক্লোরোফরম্ ক'রে তার বিষ বের করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার কথা যে কও, তোমার সামনে একটা empire (সাম্রাজ্য) ছিল। তুমি সে empire-এর (সাম্রাজ্যের) মুখ ভরে মুতে দিলে। করলে না কিছু। মানুষের জন্য না করলে কি হয়? মানুষে গাল পাড়লে অমনি চটে ওঠ। কত ক'রে কইছি যে নিজেরা তো পারলি নে, একটা বামুনের ছেলেকে সঙ্গে রাখ্, সব শেখা। তাও করলি নে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই ভর্ৎসনায় প্যারীদা মাথা নিচু করলেন। এরপর আর কথাবার্ত্তা হয় না। এগারোটা চল্লিশ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানে উঠলেন।

বিকালে খড়ের ঘরে। শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি বাণী ও ছড়া প্রদান করলেন। তার মধ্যে একটি ছড়া—

বাগ্‌দেবীকে করিস্ পূজা
বোধ-বিবেককে জাগিয়ে নিতে,

কৃতিদেবীর করিস্ পূজা
অনুশীলনে মূর্ত্তি দিতে।

ছড়াটি প'ড়ে শরৎদা (হালদার) জিজ্ঞাসা করলেন—আমি যার পূজা করব, তাকে বাড়িয়ে তুলব, না নিজে বেড়ে ওঠার জন্য তার পূজা করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার বুদ্ধি হল, যাকে পূজা করি সে-ই আমার soil (ভিত্তিভূমি)। আমি সেবা-পরিচর্য্যার ভিতর দিয়ে তাকেই বাড়িয়ে তুলব। আর, তখন নিজের বৃদ্ধি আপনা থেকেই হবে।

এর পরেও আরো অনেক ছড়া দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সেগুলি বারবার পড়া হল। প্রভু নিজেই আবার ছড়াগুলির কিছু পরিবর্ত্তন ও সংযোজন করলেন। আজ ভোগের জন্য উঠতে তাঁর বেশ দেরী হয়ে গেল। রাত ১১-৮ মিনিটে উঠলেন।

১৮ই ফাল্গুন, ১৩৬৬, বুধবার (ইং ২।৩।১৯৬০)

কাল রাত থেকে হাওয়া খুব জোরে বইছে। সকালেও বাতাসের বেগ কিছুমাত্র কম নয়। সকাল ৯টার পরে আকাশ ধীরে-ধীরে মেঘলা হয়ে এল। কিছুক্ষণ বাইরে বসে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরের ভিতরে এসে বসেছেন। হাওয়া আসছে পূব দিক থেকে। তাই, খড়ের ঘরের পূবদিকের পরদাগুলি টেনে এঁটে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

ঘরের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে উপবিষ্ট কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), প্যারীদা (নন্দী) প্রমুখ। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলছে। লোকচরিত্রের খারাপ ও ভাল দিক নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালর পাশেই খারাপ থাকে, আবার, খারাপের পাশেও ভাল থাকে। কারো ভাববৃত্তি যদি ভাল থাকে, তাহলে সে কিছুতেই তোমার খারাপ হতে দেবে না। তার কাছে গেলে খারাপটাও ভালতে পর্য্যবসিত হবে। সেই যে আপনি আমার কাছে গল্প করেছিলেন, মাও-সে-তুং-এর কাছে কোন্ ডাকাত তার দলবল নিয়ে এসেছিল। আস্তে আস্তে মাও-সে-তুং-এর উপর তার submission (আনুগত্য) এমন হ'ল যে তার সব গুণ সে ওঁর সেবায় নিয়োগ করল। ওরকম একটা মানুষ যদি সমাজে থাকে তাহলেই কাম হয়ে যায়। আমাদের দেশে একজন বড় ডাকাত ছিল—রঘু ডাকাত। সে কখনও নারী-ধর্ষণ করত না। আবার ধনীদের ঘরে ডাকাতি ক'রে সেই টাকা-পয়সা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করত। তারই direct descendent (প্রত্যক্ষ বংশধর) আমাদের বুড়ো বাবা (জনৈক প্রবীণ সৎসঙ্গী)। (তাঁর পুত্র) সতীশ খানের মধ্যেও ভাল trait (গুণ) বহু ছিল। সাধু তুকারাম ছিল। তার কাছে এক নষ্ট মেয়েমানুষ এসেছিল। কিন্তু ঐ সাধুর সংস্পর্শে মেয়েটার আমূল পরিবর্তন হয়ে

গেল। তার সব ভাল গুণগুলি ফুটে উঠল। এমন মেয়েমানুষ আছে, যে আজ আপনার সাথে পিরীত করছে, কাল আবার আর একজনের সাথে করছে। যখন আপনার সাথে করে, তখন যেন তার পূর্ণ হতে কিছুই বাকী নেই, একেবারে কানায়-কানায় ভ'রে উঠছে, এমন ভাব করে। আবার, আর একজনের কাছেও ঐ একই ভাব দেখায়। এই nature (স্বভাব)-গুলি হ'ল deceptive (প্রতারণাপূর্ণ)। আবার হনুমানের characteristics (চরিত্রলক্ষণ) দেখেন। আগে রামচন্দ্রের কাছে স্বার্থলোভেই গিছিল—মন্ত্রী হবে না কী হবে। শেষকালে কিন্তু আর তাঁকে ছেড়ে গেল না। বলে, আমি নরনারায়ণ পেয়েছি। তা' ছেড়ে যাব কোথায়?

নৈহাটি থেকে দামোদর ঘোষ কিছু লোকজন-সহ এসে প্রণাম করলেন। পাশে একটা বড় গাঁঠরি নামিয়ে রেখেছেন। প্রণামের পর দু'হাত জোড় ক'রে দামোদরদা বললেন—কিছুদিন আগে আমি স্বপ্ন দেখেছি, বড়মা আমাকে বলছেন, ঠাকুর যে ১০০ খানা গামছা আনতে বলেছেন তা' আনিস্। ঠাকুর! আমি এই ১০০ খানা গামছা নিয়ে এসেছি।

এক অর্থপূর্ণ হাসি হেসে দয়াল বললেন—ঐ গামছার মধ্যে কী আছে কে জানে? ১০০ খানা গামছা দিয়ে কত লোককে মোছানো যায়।

দামোদর-দা—আমাদের ওখানে একটি ঘটনা ঘটে গেছে। এক দাদার বড় ইচ্ছা যে, তাঁর ছোট ঘরখানিতে ঠাকুরের চৌকি, বিছানা, তাকিয়া, গড়গড়া এসব করেন। আস্তে-আস্তে ক'রেও ফেললেন। কিন্তু টাকা-পয়সা খরচ ক'রে এসব করার জন্য তাঁর স্ত্রী খুব অশান্তি করছিলেন। একদিন ঐ মা শোনেন, ঠাকুরঘরের চৌকিতে মচ্‌মচ্ শব্দ হচ্ছে, ঘর থেকে তামাক খাওয়ার শব্দও ভেসে আসছে। ঘরে ঢুকে উনি দেখেন, ঠাকুর তাকিয়াতে হেলান দিয়ে বসে তামাক খাচ্ছেন। তারপর ঠাকুর পাশ ফিরে আর একটি তাকিয়ে নিয়ে বসলেন। তখন ঐ মা চীৎকার ক'রে প'ড়ে যান। তারপর লোকজন সব ছুটে আসে। তাহলে দয়াল আপনি সব জায়গাতেই তো যান।

মৃদু হেসে শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর করলেন—ঐ যে ভাববৃত্তি দেবতা না কী কয়, কোথা দিয়ে কী হয় তার কি কোন ঠিক আছে?

দামোদর-দা—আরো একটি ঘটনার কথা বলব। একটি সৎসঙ্গী পরিবারের এক মা স্বামীর সাথে ঝগড়া ক'রে গলায় দড়ি দিতে যান। একটা বাগানের মধ্যে গিয়ে, কাপড়ের ফাঁস গলায় দিয়ে 'ঠাকুর! ওরা রইল, ওদের দেখো।' এই বলে ঝুলে পড়েন। এরপর কোথা থেকে একটা লম্বা কালো লোক এসে গ্রামের লোকদের বলে যায়, অমুক গাছতলায় একটি বৌ প'ড়ে আছে। সবাই ছুটে যেয়ে দেখে ঐ মা-টির গলায় কাপড় জড়ানো, অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছেন। আর, তার গলায় ফাঁসের কাপড়টার মাঝখানে ঠিক কাঁচি দিয়ে কাটার মত কাটা। এসব কিভাবে সম্ভব হয়?

এবারও রহস্যভরা হাসি হেসে দয়াল প্রভু উত্তর দিলেন—কোথা দিয়ে কী হয়! দুনিয়ায় যে কতরকম ব্যাপার আছে তার কি কোন ঠিক আছে?

এর পরে কেষ্টদা রুটিনমাফিক চলার উপকারিতা সম্বন্ধে কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রুটিন করা মানে পথের হিসাব ক'রে চলা। কোথায় কী করব, তারপর কী করব, তারপরে কী করব, এসব হিসাব-নিকাশ ক'রে চলা। কিন্তু এই যেমন সকালে উঠে চা খাব, পায়খানায় যাব, দাঁত মাজব, তারপর অমুকের সাথে আলাপ করব বা কোথায় যাব, কেবল এইগুলি ঠিক রাখাকেই রুটিন কয় না। করণীয় ব্যাপারগুলি ঠিকমত করাও রুটিনের মধ্যে। কাউকে যদি word (কথা) দিয়ে থাকেন যে তার ওখানে যাবেন, তাহলে অবশ্যই সেখানে যাবেন। আর, যদি কোন কারণে যাওয়া না-ই হয় তাহলে তাকে আগের থেকেই চিঠি লিখে জানিয়ে দেবেন যে, বিশেষ কারণে এখন আমার যাওয়া হ'ল না। পরে যাব।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিলেন—

প্রিয়র প্রতি নিষ্ঠা-নিটোল
অদম্য যার উর্জ্জনা,
শ্রেয়চর্য্যাই ঈপ্সা যাহার
হয়ই যে তার বর্দ্ধনা।

আজ দুপুরে আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায়। প্রবল ঝড় ওঠে, সাথে ঘূর্ণি হাওয়া। বাইরের টেম্পারেচারও অনেক নেমে যায়।

বিকালে ঘুম থেকে উঠে শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর বেশ খারাপ বোধ করছেন। খুব কাশি হচ্ছে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। তাঁর গলার স্বরও ভারী হয়ে এলো। সন্ধ্যা ৬টায় প্যারীদা (নন্দী) টেম্পারেচার দেখলেন, ৯৮.২। শরীর খারাপ হওয়ার জন্য সান্ধ্য প্রণামের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর পূজ্যপাদ বড়দাকে কাছে এসে প্রণাম করতে নিষেধ করলেন। তদনুযায়ী পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীবড়মার ঘরের মধ্যে থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণাম করলেন।

১৯শে ফাল্গুন, ১৩৬৬, বৃহস্পতিবার (ইং ৩। ৩। ১৯৬০)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অনেকটা ভাল। টেম্পারেচার—৯৭। আকাশে আজ মেঘ নেই। তবে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আজ আর বাইরে যেয়ে বসেন নি।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) ও ডাঃ বনবিহারীদা (ঘোষ) শ্রীশ্রীঠাকুর-সমীপে উপবিষ্ট। বর্ণ সম্বন্ধে কথা চলছিল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Inner

energetic volition of peculiarities-এর (বিশেষত্বসমূহের অন্তঃস্থ উদ্যমী এষণ-সম্বেগের) মধ্যে দিয়েই caste evolved (বর্ণের উদ্ভব) হয়। আরো দেখ, ডাক্তারী বামুনের ব্যবসা না। কিন্তু প্রায় ঋষিই ছিলেন normally physician (স্বভাব-চিকিৎসক)। (বনবিহারীদাকে) এই যে তুমি ক্ষত্রিয় আছ। ডাক্তারী করলে যে তোমার ক্ষত্রিয়ত্ব নষ্ট হয়ে গেল তা' মনে হয় না। কিন্তু ওটা তোমার জীবিকা হলে মুশকিল।

বনবিহারীদা—কোন বামুন যদি চামড়া-ট্যানার হয় তাহলে তাকে আর বামুন কওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, বামুন কওয়া যায় না তা' নয়। তাকে বলা যায় পতিত।

এই সময় সুষমা-মা (কেষ্টদার প্রথমা স্ত্রী) সুধা-মার (কেষ্টদার দ্বিতীয়া স্ত্রী) ছোট মেয়েটিকে কোলে নিয়ে এসে বললেন—সুধার মেয়ের একটা নাম দেবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ক্ষণেক চিন্তা করে বললেন—প্রত্যয়রাণী। প্রত্যয়সুন্দরীও হতে পারে। এই একটা ধারা, সম্বিতা প্রজ্ঞা প্রত্যয়। এর পরে আর কিছু নেই। এর পর যদি আবার মেয়ে হয়, তাহলে তার নাম রাখতে গেলে এ ক্রমটা ভেঙ্গে যাবে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন। শরীর তাঁর মোটামুটি ভালই। অনেকে এসে বসেছেন। নৈহাটির দামোদরদা (ঘোষ) প্রশ্ন করলেন—উচ্চযাজী কেমন ক'রে হওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হতে গেলে তোমার নিজেকে টেনে লম্বা করা লাগবে সব দিক দিয়ে। শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে, কর্ম্মে, ভক্তিতে।

দামোদরদা—আজকাল মানুষ খুব মির‍্যাক্‌ল্ পছন্দ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা তো miracle (অলৌকিকতা) চাই না, অলৌকিকতা ভাঙ্গতে চাই। অলৌকিকতা একটা আচ্ছাদনের মত, সেটা সরানো লাগবে। এই যেমন বড়-বৌ তোমার কাছে গামছা চাইল স্বপ্নে। গামছা তুমি নিয়েও আসলে। কিন্তু এর বিনিময়ে তুমি নিজের জন্য কিছু চাইলে না। তুমি বলতে পারতে, আমি গামছা দিচ্ছি, আমার যেন অমুকটা হয়। কই, তা' তো বললে না। কারণ, এটাই তোমার ভাববৃত্তি। সেইজন্য আমিও বললাম, দেখা যাক্ কী হয়।

একটু পরে কলকাতায় ফোন করা হ'ল। ফোনে জানা গেল, কলকাতায় খুব বৃষ্টি হ'চ্ছে। এখানেও আকাশ মেঘলা হয়ে আছে।

২১শে ফাল্গুন, ১৩৬৬, শনিবার (ইং ৫।৩।১৯৬০)

আজও আকাশে মেঘ, তবে ঘন নয়, কাটা-কাটা। মেঘের ফাঁক দিয়ে মাঝে-মাঝে সূর্য্যদেব উঁকি দিচ্ছেন।

বড় দালানের কড়িগুলি পুরানো হয়ে গেছে। সেগুলি পালটে নতুন কড়ি লাগানো হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন। একটা ছড়া দিলেন—

কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যাভার,
বুদ্ধি, বিবেক, চালচলন,
ভাল হয় যার হৃদয়গ্রাহী—
বিভূতি হয় তার বলন।

ছড়াটি দিয়ে ওটা সরোজিনীমাকে শোনাতে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তারপর দয়াল বলছেন—আমি যেভাবে চলি, যেভাবে যা' করি, তার একটা যদি তোমরা করতে যাও, তাহলে দেখতে পাবে কিরকম ঠেলা।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে স্নানের আগে পায়খানায় যান। তারপর তেল মেখে স্নান করেন। কোন কোনদিন পায়খানায় উঠতে বেশ দেরী হয়ে যায়। ঐকথা তুলে অনুযোগের সুরে সরোজিনীমা বললেন—এই যে আপনি এত দেরী ক'রে ওঠেন, এতে শরীর খারাপ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের হ'ল প্রয়োজন, আর আমার হ'ল শরীর। আমার বাঁচার ইচ্ছা আছে তো। আমি দেখি, এমন সময় উঠব যখন পায়খানায় বসলে আমার exertion-টা (পরিশ্রমটা) কম হবে। এই যে এটা বলে ফেললাম, তা' আবার ভাল হ'ল না।

২২শে ফাল্গুন, ১৩৬৬, রবিবার (ইং ৬।৩।১৯৬০)

আজ সারাদিনই শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ সুস্থ আছেন। তবে আজ কোন সময়ই বাইরে যান নি। কারণ, আকাশে জমাট মেঘ, সাথে ঠাণ্ডা হাওয়া। খড়ের ঘরেই আছেন।

সন্ধ্যার দিকে আকাশ কালো ক'রে বর্ষা নামল। সাথে বাতাসের বেগও বাড়ল। খড়ের ঘরের মধ্যে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), শরৎদা (হালদার) প্রমুখ। নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে। কথায়-কথায় দেশের দুরবস্থার কথা উঠল।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখানে যারা এসেছে, আমি সবাইকেই বলেছি প্রতিলোম বন্ধ করার কথা। যা' চলছে, এরকম অহরহ প্রতিলোম supported (সমর্থিত) হতে থাকলে এর পরে সেই কল্কি-অবতারের মতন কেউ আসবে, সব শেষ ক'রে দেবে। এ নিয়ে আমি ভাবি। তেমনতর মানুষ যে পাই না।

আমার এই সব লেখাগুলি যদি ছাপায়ে বের করা থাকে তাহলে সেরকম মানুষ যদি কোনদিন আসে, তখন এগুলি দেখে তার কর্ত্তব্য ঠিক করতে পারবে। এক ঠেলায় দেশ-জাতি ঠিক ক'রে ফেলবে। আর, তোমরা যদি কোনদিন মানুষ হও, তাহলে তোমাদের দিয়েও অসম্ভব কাম হতে পারে। এই হয়ে ওঠার জন্য তোমাদের ব্যক্তিগতভাবে করার দরকার যে কতখানি তা' কি জান? যদি হ'য়ে উঠতে পার, তৃপ্তি পাব আমি।

২৩শে ফাল্গুন, ১৩৬৬, সোমবার (ইং ৭।৩।১৯৬০)

কাল রাতে বেশ ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। অনেক আমের মুকুল ঝরে পড়েছে। আজ ভোরে বর্ষা থেমেছে। এখন সকাল নয়টা। প্রায় আকাশটাই মেঘে ঢাকা।

খড়ের ঘরের সংলগ্ন একটি বড় ঘর তৈরীর কাজ সুরু হয়েছে। এখানা তৈরী হবে কাঠ ও এলুমিনিয়ম-শীট দিয়ে। গতকাল ঐ ঘরের কাজের জন্য বহু জিনিস এসে গেছে। অজয়দা (গাঙ্গুলী) ও গৌরদা (মণ্ডল) সেগুলি একে একে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাচ্ছেন।

আজ দুপুর থেকেই ঐ বিরাট ঘরের দেওয়ালের বাইরের অংশে এলুমিনিয়ম-শীট লাগাবার কাজ আরম্ভ হয়েছে। খগেনদা (তপাদার), মনোহরদা (সরকার) অন্যান্য মিস্ত্রীদের সাথে নিয়ে কাজ করাচ্ছেন এবং দেখাশুনা করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দ্বিপ্রহরে খড়ের ঘরেই বিশ্রাম করছিলেন। বিকাল ৩টার আগেই উত্তরের বারান্দায় একখানা চেয়ারে বসলেন। তামাক খেতে খেতে মিস্ত্রীদের কাজ দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর ঘরের ভিতরে চৌকিতে এসে বসলেন।

বাইরে একেবারে যেন শ্রাবণের মেঘে-ঢাকা আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গুরু-গুরু মেঘও ডাকছে। ৫টা বাজার আগেই চেপে বৃষ্টি নামল। শ্রীশ্রীঠাকুর বালিশটা টেনে নিয়ে কাত হয়ে শুলেন। ফোটাদাকে (পণ্ডা) ডেকে বললেন—পা-টা একটু টিপে দে। (তারপর বললেন)—শরীরই ভাল লাগে না। ইচ্ছে করে, সব সময়েই শুয়ে থাকি।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে অনেকে এসে বসেছেন। কথাবার্ত্তা চলছে। একসময় কথাপ্রসঙ্গে দয়াল বললেন—লোভ, মান, স্বার্থলোভ ইত্যাদি যার থাকে, সে আর কিছুই করতে পারে না। কোন কিছু করতে গেলেই সে দেখে দুটো টাকা আসবে কি ক'রে। কোন বড়লোকের পাছ-পাছ সে যদি ঘোরে, সেখানে তার লক্ষ্য থাকে, এই করতে করতে যদি কাগজে নাম-টাম বেরোয়।

বাইরে বর্ষা থেমেছে। শরৎদা (হালদার) এসে বললেন—আগামী ১৪ই মার্চ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব-উৎসব কলকাতায় বড় ক'রে হচ্ছে। কলকাতা থেকে যতীনদা (দাস) চিঠি লিখেছেন যে, ঐ উৎসবে তিনি বক্তা হিসাবে আমার নাম দিয়ে দিয়েছেন। এখন তো যেতে হয়।

ক্ষণেক নীরব থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—উৎসব-কর্ত্তৃপক্ষ যদি নিজেরা আপনার নাম দিত বন্ধু হিসাবে, সেটাই ভাল হত।

তারপর ছড়া দিলেন—

অহংমূঢ় যাদের স্বভাব
বিনা চর্য্যায় চায় কর্ত্তা হতে,
কর্ত্তৃত্বটা বজায় রেখে
স্বার্থসেবায় চায় লাগাতে।
ধৃতিহারা চর্য্যা যাদের
কৃতিহারা হয়ই তারা,
ধাপ্পাবাজির কর্ত্তাবুদ্ধি
উছল চলা করেই খোঁড়া।

এইভাবে কিছুক্ষণ ছড়া দেওয়া চলল। তারপর জ্ঞানদা (গোস্বামী) জিজ্ঞাসা করলেন—আলোচনা-প্রসঙ্গের মধ্যে আছে, আঁচ করতে করতে ইনটিউশন grow করে (স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রজ্ঞা জন্মায়)। এটা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও অভ্যাস করতে করতে হয়। ধর, তুমি জানতে চাও একটা গাছে ক'টা পাতা আছে। গুনে দেখলে ৩৫০। পরে ঐরকম আর একটা গাছ দেখে অনুমান করতে চেষ্টা করলে। কিন্তু সেটা ৩৫০ না হয়ে ৩২০ বা ৩৭০ হল। এইরকম প্র্যাকটিস (অভ্যাস) যদি চালিয়ে যাও তখন দেখো, যা' বললে ঠিক লেগে গেছে।

জ্ঞানদা—তাহলে অনুমান থিওরেটিকালি (কাল্পনিকভাবে) করলেই হয়, প্র্যাকটিক্যালি (বাস্তবে) করার কিছু নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করা না থাকলে অনুমানও হয় না। ও চালাকি চলবি নানে। আমি আগে করতাম। ডাক্তারি করার সময় ওষুধ মাপতাম। ২/১ বার দেখে নিতাম ৫ গ্রেণ কতটা হয়। তারপর আন্দাজে মাপলেও ঠিক ঐ ৫ গ্রেণই হয়ে যেত। ঐ অনুমানে ২, ৫ গ্রেণ ঢালতাম। তাও দেখতাম ঠিক হয়ে যেত। আমি হাতে ক'রেই ঠিক করতাম। ঐ হাতই নিক্তির কাজ করত। আঁচ করার মধ্যে ডিস্যারন (বিচার) করা থাকে। ডিস্যারন (বিচার) করতে করতে ডিস্যারনিং ক্যাপাসিটি (বিবেচনী দক্ষতা) বাড়ে। আর, মাথাটাও সেইভাবে তৈরী হয়ে যায়।

এরপর আরো কিছু ছড়া দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ছড়া বলতে বলতে রাত প্রায় সওয়া দশটা হয়ে গেল। এইরকম আলাপ-আলোচনা চলতে থাকায় আজকাল দু'বেলাই শ্রীশ্রীঠাকুরের উঠতে দেরী হচ্ছে। ফলে, ভোগেরও দেরী হয়ে যাচ্ছে।

সেই কথা উল্লেখ করে কালীষষ্ঠীমা বললেন—একটু সকাল সকাল উঠলি হয়। উঠতি দেরী করলি শরীর খারাপ হয়।

রসিকশেখর শ্রীশ্রীঠাকুর কালীষষ্ঠীমার দিকে তাকিয়ে রঙ্গভরে বললেন—আমি কই 'হেই', বাঘ কয় 'ফ্যাঁ-স্'।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বলার রকম দেখে উপস্থিত সবাই হেসে অস্থির। এর পরে তিনি একবার তামাক খেয়ে উঠে পায়খানায় গেলেন।

২৪শে ফাল্গুন, ১৩৬৬, মঙ্গলবার (ইং ৮। ৩। ১৯৬০)

আজ ভোর থেকেই দারুণ কুয়াশা। সাথে ঠাণ্ডাও আছে। বেলা ৯টাতেও কুয়াশা সম্পূর্ণ কাটে নি। আকাশ মেঘে ঢাকা। সূর্য্যদেবের মুখ দেখা যায় নি আজ। শ্রীশ্রীঠাকুর আজ আর বাইরে যান নি। খড়ের ঘরেই আছেন। ঠাণ্ডা হাওয়াটা পূবদিক থেকে আসছে। তাই খড়ের ঘরের পূবদিকের পরদাগুলি ফেলে দেওয়া হয়েছে।

বেলা সাড়ে দশটা। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আছেন। তাঁর সাথে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের অগ্রগতি নিয়ে কথা চলছে। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মিথলজিক্যাল স্টোরি (পৌরাণিক গল্প) যেগুলি, তারমধ্যে কনসিলড্ ট্রুথ্ (লুক্কায়িত সত্য) আছে। ঐ যে আপনি একদিন আমার কাছে গল্প করেছিলেন, কোথায় যেন আছে, নারদ চন্দ্রলোক থেকে নেমে আসছে। নেমে পৃথিবীতে এসে দাঁড়াল। এর পিছনেও সত্য আছে। সত্য না থাকলে এসব গল্প এলো কোথা থেকে। সেইজন্য প্রত্যেকটা মিথ্ (উপকথা) ভেবে ভেবে দেখা লাগে, বাস্তবে কোন্টার সাথে কতখানি মিল পাওয়া যায়। ঐ যে নারদ নেমে এসে দাঁড়াল, ঐটুকু শুনেই যেন থেমে না যাই। তাহলে আর সত্য উদ্ঘাটিত করতে পারব না। (তারপর আনমনে বলছেন) এখন আর কিছু হবার জো নেই। আজকাল আমাদের অন্যের গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়া লাগে।

কেষ্টদা—আমাদের প্রাচীন কিছু জানতে হ'লেই এখন বিদেশে যেতে হয়। আমাদের দেশে তো কিছু নেই। যা' ছিল একেবারে ঝাঁটায়ে নিয়ে গেছে ওরা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঝাঁটায়ে নিয়ে গেছে মানে আমাদের অদৃষ্ট যে কতদূর নীচে নেমে গেছে তা' আর কওয়া যায় না।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন। ভক্তবৃন্দ চারিপাশে উপবিষ্ট। তপোবনের শিক্ষক ক্ষিতীশ সেনগুপ্ত আর একজন শিক্ষক ভোলানাথ ভদ্রকে নিয়ে এলেন। বললেন—ভোলার তো বিয়ে ঠিক হয়েছে।

ভোলাদা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওর গায়ে মাংস বেশী নেই। কিন্তু তাই নিয়ে ও স্ট্রাগ্‌ল্ (সংগ্রাম) ক'রে চলেছে সমানে। ওকে আমি অনেকদিন থেকেই স্টাডি (পরীক্ষা) করছি। আশ্রমের মধ্যে বেস্ট স্টুডেন্ট (সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্তেবাসী)। ওর মত ওয়ারকার (কর্ম্মী) যদি আর কয়টা হয় তাহলে হোল ইন্ডিয়া (গোটা ভারতবর্ষ) ক্যাপচার (কবজা) করতে কিছু লাগে না। তোমরা দুঃখ ক'রো না তোমার সামনে ওর সুখ্যাতি করছি বলে। যা' হওয়া দরকার, যা' করা দরকার, তা' আমরা পারি না কেন? কারণ, আমাদের মানি-র (অর্থের) উপর এ্যাট্রাকসন (টান) থাকে।

ক্ষিতীশদা সব কথা শুনে প্রণাম ক'রে উঠছেন। তাঁকে ডেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দ্যাখ্, এই ২/৩ দিনের মধ্যেই আমার ১০০ টাকা লাগবি নি। জোগাড় করতে পারবি তো?

ক্ষিতীশদা—দেখি।

এরপর ক্ষিতীশদা ভোলাদাকে নিয়ে বারান্দা দিয়ে নেমে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের যেন তখন নজর পড়ল ভোলাদার দিকে। ভোলাদাকে যে আগে তিনি লক্ষ্য করেননি, তা' আমরাও বুঝতে পারি নি। অথবা হয়তো তার সামনেই ঐ কথাগুলি বলার কোন গূঢ় প্রয়োজন ছিল।

যাহোক, শিক্ষকদের নেমে যেতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বলে উঠলেন—ওর সামনে ওর সুখ্যাতি করলাম না তো?

প্রফুল্লদা (দাস) আস্তে আস্তে বললেন—হ্যাঁ, ভোলানাথ ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর আক্ষেপের সুরে বললেন—কাম সারছি। অকাম ক'রে ফেলে দিলাম যে।

ইতিমধ্যে ভোলাদা আবার ফিরে এসে প্রভুর কাছে বললেন—আমি তো মেয়েপক্ষকে সবই বলেছি যে আমি কোন অ্যালাউয়েনস্ (ভাতা) নেব না, আমার কাছে এলে স্ট্রাগ্‌ল্ (সংগ্রাম) করা লাগবে। এতে তারা রাজী। তাহ'লে ওদের কি কথা দেব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। কিন্তু শোন্, তোর সামনে তোর সুখ্যাতি করলাম বলে যেন তোর অহঙ্কার না হয়। আমার ঐ সুখ্যাতিটা তুই আরো ক'রে তোল্। বুঝলি তো। কারো সামনে তার বেশী সুখ্যাতি করা ভাল না। যারা উইক-মাইনডেড (দুর্ব্বলমনা) তারা ওতে আনব্যালেনস্‌ড (ভারসাম্যহারা) হয়ে পড়তে পারে। আমার মা আমার সামনে কখনও আমার প্রশংসা করত না। কিন্তু আমার যে কত ইচ্ছা ছিল, মা আমার একটু প্রশংসা করুক।

এরপর ভোলাদা প্রণাম ক'রে চলে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে বললেন—শোব?

'হ্যাঁ' বলা হতেই বালিশটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে বললেন—তাহলে শুলাম। (ননীমাকে সামনে দেখে) ক'নে গিছিলি রে?

ননীমা—ঘরেই ছিলাম। আজ নীলুর (ননীমার পুত্র) ইকনমিক্স পরীক্ষা ছিল। ভাল হয় নি পরীক্ষা।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর চিন্তিত হলেন এবং হরিনন্দনদাকে (প্রসাদ) ডাকতে বললেন। হরিনন্দনদা এলে তাঁকে বললেন—ও হরিনন্দন! দেখ তো কী কয়। আজ বলে নীলু ইকনমিক্স্ ভাল করতে পারে নি।

হরিনন্দনদা 'দেখি' বলে চলে গেলেন।

আজ বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর নির্ম্মল ঘোষদাকে ডেকে রমণের মাকে কিছু ভাল মিষ্টি খাওয়াতে আদেশ করেছিলেন। এখন সন্ধ্যার পর নির্ম্মলদা সেই মিষ্টি নিয়ে এসেছেন, রমণের মার হাতে দিলেন। রমণের মা মিষ্টির হাঁড়িটা শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে ধরে বলছেন—নির্ম্মল আ'নে দেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেঁকে বললেন—খাও, খাও।

ধীরে ধীরে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে। রাত ৯টা বাজল। চারিদিকে বেশ একটা নিস্তব্ধ ভাব। পরমপ্রেমময়কে ঘিরে রচিত হয়েছে এক সুখসুন্দর মনোরম ধ্যানী পরিবেশ। সবাই শান্ত।

নীরবতা ভঙ্গ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর এক সময় বললেন—আমার এখানে যে ডিসকাসন (আলোচনা) হয় তা' অসম্ভব। এর মধ্যে কোনদিকই বাদ থাকে না। এখানে যা' হয় তা' কলেজ-টলেজে যা' শেখানো হয় তার থেকে ঢের বেশী। আগে গোপাল ছিল। সে হাতেকলমে অনেক কিছু করত। তাতে ছেলেপেলেরা শিখতও। ঐরকম ডজনখানেক মাস্টার হলেই অনেকখানি ক'রে ফেলা যেত।

২৫শে ফাল্গুন, ১৩৬৬, বুধবার (ইং ৯।৩।১৯৬০)

আজ সকাল থেকেই আকাশ বেশ পরিষ্কার। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বাইরের ছাউনিতে এসে বসলেন। সামনে পার্লার-ঘরখানির কাজ হচ্ছে। এখন চাটাইয়ের উপরে এলুমিনিয়ম-শীট লাগিয়ে বসানো হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে ঐ কাজ দেখলেন ও মিস্ত্রিদের প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দিলেন।

ভক্তবৃন্দ এসে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে তামাক খাচ্ছেন। সরোজিনীমা তামাক সেজে দিয়ে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া দিচ্ছেন প্রভুর শ্রীঅঙ্গে।

সরোজিনীমার দিকে অপাঙ্গে একবার তাকিয়ে দয়াল বললেন—এই যে আমার এখানে এরা থাকে, আমাকে জল দেয়, তামাক দেয়, হাওয়া দেয়, এ করে, তা' করে, এদের সাথে ঐ ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীওয়ালাদের পারার উপায় নেই। আবার, এখানে থাকলেও যার আমার উপর interest (অন্তরাস) নাই, নিষ্ঠানিপুণ অনুচর্য্যী প্রবৃত্তি নাই, তার অবশ্য কিছু হয় না।

সরোজিনীমা—এখানে কাজ করতে হলে আপনি যদি আমল না দেন তাহ'লে কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আবার কী কথা; আমার আমল না দেওয়া আছে নাকি; সর্দ্দি হলে হয়তো কই, ঐ একটু ফাঁকে যেয়ে বয়।

সরোজিনীমা আর কিছু বললেন না। আরো কিছু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়ায় বললেন—

পারিস্ যেমন রোজই দিবি
শিক্ষক যিনি তাঁরে তোর,
শ্রদ্ধানিপুণ তেমন অর্ঘ্যে
বৃদ্ধি পাবে জ্ঞানের জোর।

এর পরে একটা ইংরাজী বাণী দিলেন। বাণীটি সাজিয়ে ঠিক ক'রে লিখতে হবে। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিখিল আসুক। তুইও দেখতে থাক।

আমি বললাম—নিখিলদা থাকলে সব দেখেশুনে ঠিক করতে পারেন। আমি সবটা পারি না।

সস্নেহ ভর্ৎসনায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পারি না বললে আমার কাছে ক্ষমা নেই। Clean up (উচ্ছল হয়ে ওঠ), যাতে পার তাই কর।

২৬শে ফাল্গুন, ১৩৬৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১০। ৩। ১৯৬০)

সকালে যথারীতি পশ্চিমদিককার ছাউনিতে এসে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। পেছনে সেগুন গাছটায় নানারকম পাখীর কাকলী শোনা যাচ্ছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), জ্ঞানদা (গোস্বামী), অনিলদা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ আছেন। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলছে। সামনে পার্লার-ঘরের চালের উপরে বসে মিস্ত্রিরা কাজ ক'রে চলেছেন। মাঝে মাঝে সবাই ঘাড় ফিরিয়ে ঐ কাজ দেখছেন।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদা, চুনীদা (রায়চৌধুরী) ও ভাটুদার (পণ্ডা) সাথে প্রাইভেট কথা বললেন। বেলা দশটার পর খড়ের ঘরে এসে বসলেন। ঘরে এসে শুধু কেষ্টদার সাথে আবার কিছুক্ষণ প্রাইভেট কথা বললেন। তারপর কেষ্টদা চ'লে গেলেন।

এইবার মায়েরা একে একে এসে বসছেন। তাঁদের কাউকে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন, 'আজ কী রাঁধলি', কাউকে বা জিজ্ঞাসা করছেন 'আজ কী খাওয়ালি', ইত্যাদি। এইসব কথা চলছে। এর মধ্যে এক সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সরোজিনীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, সেই আমল থেকে, একেবারে সেই আদি আমল থেকে সুখই বেশী না দুঃখই বেশী?

সরোজিনীমা একটু ভেবে উত্তর করলেন—তা' তো আপনিই।

এই সময়ে রেবতী (বিশ্বাস) কয়েকজন দাদা ও মাকে নিয়ে এসে প্রণাম করল। বলল—এঁরা বর্ধমান থেকে বৈদ্যনাথ মন্দিরে পূজা দিতে এসেছেন। আপনাকেও দর্শন ক'রে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল। খাওয়াদাওয়া কোথায় হবে?

উক্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন—আমরা খেয়ে এসেছি।

ওঁরা বিদায় নেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে মানুষের inquisitive active urge (সক্রিয় সন্ধিৎসু সম্বেগ) থাকে, তার educated (শিক্ষিত) হতে দেরী লাগে না।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী), রাজেনদা (মজুমদার) প্রমুখ কয়েকজনকে নিয়ে পূজনীয় ছোড়দা দুর্গাপুরে গিয়েছিলেন যাজন-কাজে। আজ তাঁরা ফিরলেন। বিকালে ওঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ওঁদের যাজন-পরিক্রমার গল্প করছেন।

সন্ধ্যার পর বহিরাগত একটি দাদা এসে বললেন—আমি ঠিকমত ইষ্টভৃতি করতে পারছি না, পাঠাতেও পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে পাগল! ওটা তুই তোর ইষ্টকে খেতে দিস্। তোর স্বস্তি-যজ্ঞ। সেজন্যে ভোরে উঠে প্রথমেই ওটা করা লাগে।

উক্ত দাদা—এতদিন যে পাঠাই নি, সেজন্য কী করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। হবিষ্য করা লাগে। তা'ও কেষ্টদার কাছে শুনে নিস্।

রাত সাড়ে নটা বাজে। আজকাল শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত কেমন এবং আলোচনা-প্রসঙ্গেই বা কেমন হয়েছে। আর, এই দুই গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্যই বা কী। এখনও আবার সেই কথা জানতে চাইলেন। তারপর বলছেন—একথা বার বার জিজ্ঞাসা করি কেন! —দুজন এসেছিল এখানে। তারা নাকি শ্রীমার কাছে থাকত। তাঁর সেবা করত। তারা সব শুনল। শেষকালে যাওয়ার সময় বলে গেল, আমরা আবার আসব। আর, তাদের কথার মধ্যে একটা

taunt-এর (বিদ্রূপের) সুর ছিল যে, আমার কথাগুলো নাকি কথামৃতের নকল হয়ে যাচ্ছে। পরে আবার কেউ বলবে না তো যে কথামৃতকে নকল করেছে?

আমি বললাম—আপনার কথার সঙ্গে প্রেরিত পুরুষদের সকলের কথারই সঙ্গতি পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাথে তো খুবই মেলে। তা' দেখে কেউ যদি অমন মন্তব্য করে তার আর কী করা যাবে। তাছাড়া আলোচনা-প্রসঙ্গে আজ বহু জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। কেউ তো ও-জাতীয় কথা বলে নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের ঐ কথা শোনার পর থেকে আমার বার বার এটা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে। আর, ঐ dictation-গুলিও (বাণীগুলিও) তো খুব practical (বাস্তবধর্ম্মী) হয়েছে, তাই না?

আমি—আজ্ঞে হ্যাঁ, সবগুলি বাস্তবভিত্তিক তো বটেই। তাছাড়া কার্য্যকারণ ভাঙ্গা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, আমার কথার মধ্যে যতখানি পারি আমি তা' ভেঙ্গে দিয়ে গেছি।

কথায়-কথায় রাত দশটা বেজে যায়। পঙ্কজদা (সান্যাল) ঘরের পাল্লাগুলি টেনে দিলেন। ভোগের আয়োজন হবে। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের ওঠার কোন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। উঠে পায়খানায় যাবেন। হাত-মুখ ধোবেন, তারপর ভোগ গ্রহণ করতে বসবেন। তাঁর এইরকম অনীহা দেখে ননীমা জিজ্ঞাসা করলেন—১০টা ৮ মিনিটে উঠবেন না?

রহস্যভরা স্বরে বললেন পরম দয়াল—দেখি, ১১টা ৮ মিনিট হোক।

তাঁর বলার ভঙ্গীতে সবাই হাসছেন। এই সময় কালীষষ্ঠীমা এসে বসলেন। তাঁর সাথে নানারকম খাওয়ার গল্প করতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কথায় কথায় উঠল মাছের কথা। এক-একটি মাছের নাম বলে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন, ও মাছ তুই খাইছিস্?

কালীষষ্ঠীমা কোন সময় হ্যাঁ, কোন সময় না জবাব দিয়ে যাচ্ছেন। সরোজিনীমা এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সরোজিনী! কী খালি রে?

সরোজিনীমা—রুটি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী দিয়ে খালি?

সরোজিনীমা—দুধ দিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তরকারি খাস্ নি?

সরোজিনীমা—রাতে আর ওরা তরকারি রাঁধে নি।

ঠিক এই কথা শেষ হতে হতেই নেমে এল নাম ও নামী সম্বন্ধে ছড়ার ঝরণাধারা। রাত সাড়ে দশটা থেকে এগারটা পর্য্যন্ত চলল একটানা স্রোতে ছড়া দেওয়া। মায়েদের সঙ্গে খাবার গল্প করা কালেই কি পরমপুরুষের চৈতন্যজগতে এইসব ভাব পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল? কে জানে? চিররহস্যময় সেই অনন্ত অসীমের কতটুকু বা জানা যায়!

রাত এগারোটার পর একবার তামাক খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ৮ মিনিট হলে উঠে পায়খানায় গেলেন।

২৭শে ফাল্গুন, ১৩৬৬, শুক্রবার (ইং ১১।৩।১৯৬০)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর পশ্চিমের ছাউনিতে এসে বসেছেন। ভক্তবৃন্দ চারিপাশে আছেন। পণ্ডিত মশাই এসে জনৈক দাদার কথা জানালেন, দাদাটি তাঁর মেয়ের বিয়ে সগোত্রে দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের সগোত্র ছাড়া বিয়ে হবারই উপায় নেই, অর্থাৎ যাদের ভিতর কেবল একটিই গোত্র, তাদের বিয়ের সময় দেখা লাগে, পাত্র-পাত্রীর উভয় পরিবারের মধ্যে কোন রক্তের সম্বন্ধ যেন না থাকে।

পণ্ডিতমশাই—অন্তত দশ পুরুষ হিসাবে ক'রে দেখতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দশ পুরুষ কি! পারলে তারও বেশী দেখা ভাল। মোট কথা, এমন পরিবারের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করতে হবে যাদের সাথে কোনদিনই রক্তের সম্বন্ধ হয় নি।

কলকাতা থেকে সত্যেন মজুমদারদা এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে বললেন—এবার থেকে যেন ঠিক পথে চলতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যেন-টা ছেড়ে দাও। বল, চলবই। আর, চলও তেমনি করে।

সত্যেনদা—মনে বহুরকম সন্দেহ, দ্বিধা আসে মাঝে-মাঝে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চলার পথে সন্দেহ-দ্বিধা ঢের আছে। জীবনের পাশেই মৃত্যু থাকে। যা' করলে যা' হয় তা' করলে তাই হয়।

সত্যেনদা—কিসে যে কী হয় তা' যে বুঝি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বোঝাটাই তো intelligence (বোধি)। আর, সেটা আসে interest (অন্তরাস) থেকে।

একজন মুখের দুর্গন্ধনাশক একটি ওষুধ তৈরী করেছেন। এখন এসে ওষুধটির একটা নাম প্রার্থনা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নাম দিলেন 'ফাউলিন'। সুধাপাণিমা দাঁত

বাঁধাতে কলকাতায় গিয়েছিলেন বেশ কিছুকাল আগে। গত রাতে ফিরেছেন। আজ সকালে এসে বললেন—দাঁত বাঁধিয়ে এলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহুদিন পরে। আমি কতদিন আগে টাকা দিছিলাম। গেল কত পরে। এক দাঁত বাঁধাতে যেয়ে ৬ মাস। ভাবে যে, এইসব ঝগড়াঝাটি, ঝাঁকাঝাঁকি এর মধ্যে থেকে কাম কী! তার থেকে ঘুরে আসি দিন কয়েক ফূর্তি ক'রে। টাকা-পয়সা তো আছে। (আমাকে বললেন) দ্যাখ্ তো কেমন হল ওর দাঁত।

আমি সুধাপাণিমার কাছে এগিয়ে গেলাম দাঁত দেখার জন্য। কিন্তু উনি কিছুতেই দাঁত দেখাবেন না। মুখ ঢেকে আছেন কাপড় দিয়ে। তা' দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর ধমক দিয়ে বললেন—দেখা না ক্যা ওরে?

এখন সুধাপাণিমা দাঁত দেখালেন। দেখে এসে বললাম—ভালই হয়েছে মনে হয়।

এর মধ্যে খুব মেঘ ক'রে এল। ঠাণ্ডা বাতাস বইতে সুরু করল। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে ঘরে চ'লে এলেন। তারপর কিছুক্ষণ ধ'রে বর্ষা হল। রাজেনদা (মজুমদার) কলকাতা থেকে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন। সকাল সাড়ে ন'টার পরে সামনের বারান্দায় বসে সেগুলি দেখাচ্ছেন শ্রীশ্রীবড়মাকে। সেই দিকে দেখতে দেখতে শ্রীশ্রীঠাকুর হেঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—সুধাপাণি কী আন্‌ল?

শ্রীশ্রীবড়মা—ঐ একটা গেলাস এনেছে, আর সন্দেশ এনেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কই, গেলাস দেখি।

ফোটাদা (পণ্ডা) নিয়ে এসে দেখালেন—একটি কাচের গেলাস। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীবড়মাকে বললেন—তোমার কাছে রেখে দাও। এখানে থাকলে ভেঙ্গে যাবে।

শ্রীশ্রীবড়মা—আমার কাছেও ভেঙ্গে যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার কাছে ভাঙ্গলে আর জায়গাই নেই।

ইতিমধ্যে রাজেনদার শ্রীশ্রীবড়মাকে জিনিসপত্র দেখানো হয়ে গিয়েছিল। এখন তিনি এগিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে কলকাতার কাজকর্মের কথা বলতে লাগলেন। কথায়-কথায় জানালেন যে, এবার যতীনদার (দাস) সাথে তাঁর খুব কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। এই সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর রাজেনদাকে বললেন কেষ্টদার কাছে সব খুলে বলার জন্য। কেষ্টদা বললেন—শুনব নে। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর ক্ষোভের সুরে বলছেন, মানুষ কেউ কিছু করে না। সৎসঙ্গ গড়ে উঠেছে কিন্তু ইটের উপর ইট দিয়ে। অশেষ পরিশ্রম আছে এর পিছনে। এখন যদি এই সব কথা হয়, তা' খুব বিশ্রী। সব ঠিকঠাক ক'রে নেন। নিয়ে এ্যালাউন্স বন্ধ ক'রে দেন। সবাই আনন্দবাজারে খাবে আর কাজ করবে। তাতে যে পারে থাকবে, না পারে না থাকবে।

কেষ্টদা—এখন তো activity-ই (কাজকর্মই) বন্ধই হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sincere (একনিষ্ঠ) না হলে তো activity (কাজকর্ম) থাকে না।

কেষ্টদা—এই যেমন এখানে সতীশ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক কইছেন। ঐরকম মানুষ দরকার।

কেষ্টদা—ওখানে (পাবনায়) রাধিকা ছিল, নফর ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার জোরের সাথে সমর্থন করে বললেন—হ্যাঁ, ওদের মতন। বাঁশের মুথো তুলতে যেয়ে রাধিকা মাটির মধ্যে ৮০ টাকা পেয়েছিল। সে টাকা কিছুতেই নিজের কাছে রাখল না। বড় বৌকে না মাকে দিয়ে দিল।

আগামী দোলপূর্ণিমায় অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসের পক্ষ থেকে কলকাতায় মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব-উৎসব সাড়ম্বরে পালন করা হবে। উদ্যোক্তাগণ সকল ধর্মসম্প্রদায়কেই এই বিরাট অনুষ্ঠান-উপলক্ষে আহ্বান করেছেন। সৎসঙ্গও আহূত। সৎসঙ্গের যে-সব কর্মী কলকাতায় এই কাজে ব্যাপৃত আছেন, তাঁদের কেউ কেউ উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে কাজের বিনিময়ে অর্থ নিয়েছেন। রাজেনদার মুখে এই খবর শুনে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখমণ্ডল বেদনায় মলিন হয়ে এল। দুঃখের সাথে তিনি বললেন—আমার positively (দৃঢ়নিশ্চয় ক'রে) বলা আছে যে মানুষ যখনই কোন সাহায্যের জন্য ডাকবে, তোমরা সেখানে যাবে, যতটা পার তাদের সাহায্য করবে। সাথে সাথে আমার বিশেষভাবে বারণ করা আছে যে ঐ কাজের বিনিময়ে কেউ কিছু নেবে না, এমনকি আধ পয়সার বিড়িও খাবে না।

কেষ্টদা—আপনি তো আমাদের কত কথাই কন। আমাদের চরিত্র-অনুযায়ী তো আমরা শুনি।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন। সন্ধ্যার পরে আবার বেশ খানিকটা বর্ষা হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। শুক্লা ত্রয়োদশীর সুমধুর জ্যোৎস্না আশ্রম-প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নানা বিষয়ে কথাবার্তা চলছে।

এক সময় কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি একবার হোটেলে খাইছিলাম নারায়ণগঞ্জে। সেখানে মুসুরির ডাল দিচ্ছিল, একেবারে লাল। তখন আমার বয়স কত! খুব ছোট। আর একবার ঢাকায় যেতে গোয়ালন্দেও হোটেলে খাইছিলাম। এইরকম বার দুয়েক খাইছি। নারায়ণগঞ্জের কথা মনে আছে ঐ ডালের জন্য।

এরপর কালীষষ্ঠীমা নানারকম খাদ্যের ও রান্নার প্রণালীর গল্প করতে লাগলেন।

২৮শে ফাল্গুন, ১৩৬৬, শনিবার (১২।৩।১৯৬০)

গতকাল রাতে খুব বৃষ্টি হওয়ার জন্য আজ সকালের দিকে আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। ফাল্গুন মাসের শেষ হ'লেও রীতিমত চাদর গায়ে দিতে হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর

আজ সকালে আর বাইরে যান নি। খড়ের ঘরেই আছেন। গায়ে জামার উপরে সুতির সাদা চাদরখানা জড়ানো।

প্রাতঃপ্রণাম হয়ে যাওয়ার পরে সমস্তিপুরের এক উকিল দাদা আরো কয়েকজনের সাথে এসে বসলেন। এঁরা নতুন দীক্ষা নিয়েছেন।

উকিল দাদাটি কথা তুললেন। রাবণ ব্রাহ্মণের পুত্র হয়েও কেন খারাপ স্বভাবের হ'ল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে তার জন্মের soil (ভূমি) খারাপ, সেইজন্য অমন হয়েছে। সেইজন্য রাবণ যেমন একটা vanity (অহঙ্কার) নিয়ে ঘুরত, balanced (সাম্য) স্বভাবের না। যদি balanced (সাম্য) স্বভাবের হত তাহলে রামচন্দ্রের সাথে allied (সম্মিলিত) হয়ে যেত। তা' ছাড়া বিশ্বশ্রবা আর নিকষা এদের দুজনের অনুলোম হলেও খুব difference (তফাৎ) ছিল। অনুলোম বিয়ের বেলায় বেশী difference (তফাৎ) ভাল না। পরশুরামের মা-বাবার মধ্যেও difference (তফাৎ) ছিল। সেইজন্য সে-ও disaster (বিপদ) কম আনে নি। আবার, যেখানে racial difference (জাতিগত পার্থক্য), সেখানে আরো খারাপ হয়। রাক্ষস তো different race (ভিন্ন জাতি)।

প্রশ্ন—কিন্তু পরাশর ব্রাহ্মণ, মৎস্যগন্ধা শূদ্র, এদের ছেলে ভাল হয় কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা ছিল same culture-এর (একই কৃষ্টির) মধ্যে, একটা school-এর (অনুশীলনের) মধ্যেই।

প্রশ্ন—আচ্ছা, কুন্তীর সাথে পাণ্ডুর বিবাহ কি সদৃশ ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ভাল জানি না। বোধহয় দু'জনেই ক্ষত্রিয় ছিল।

প্রশ্ন—অনুলোমে তো পুরুষ অনেক উঁচু হবে। কিন্তু পাণ্ডু রোগী ছিলেন। এখানে অনুলোম কী ক'রে হল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুলোম তো না। কুন্তী ও পাণ্ডুর বিয়ে সদৃশ সবর্ণ। কিন্তু সবর্ণের মধ্যেও মেয়ে ঈষৎ নীচু হলে ভালই হয়। যেমন বামুনের মধ্যে আছে কুলীন আর শ্রোত্রিয়। কুলীন শ্রোত্রিয়ের মেয়ে নিতে পারে। কিন্তু শ্রোত্রিয়ের ঘরে মেয়ে দিতে পারে না। আবার, ধৃতরাষ্ট্র যে গান্ধারীকে বিয়ে করল, সেটা একটা dangerous (সাংঘাতিক) বিয়ে। গান্ধারী ছিল কান্দাহারের মেয়ে। ধৃতরাষ্ট্র সেই দেশটা invade (আক্রমণ) ক'রে একেবারে নিকেশ ক'রে দিল। সমস্ত দেশটাকে ছয়লাপ ক'রে ফেলল। গান্ধারীর সব ভাইদের মেরে ফেলল। বাঁচল শুধু গান্ধারী, আর এক ভাই শকুনি। তারপর ধৃতরাষ্ট্রকে নির্ব্বংশ ক'রে শোধ নিল শকুনি। তা'র একশ' পুত্রকে মারল। শকুনি যখন একা-একা থাকত তখন ঐ তার বাবার হাড় দিয়ে তৈরি পাশা হাতে

নিয়ে দেখত আর চীৎকার ক'রে উঠত 'প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা'। এইসব দেখেশুনে আমার মনে হয়, গান্ধারীরও ঐরকম ছিল। সেইজন্য যুদ্ধের আগে দুর্য্যোধন যখন প্রণাম করতে আসল তখন গান্ধারী বলল 'ধর্ম্মের জয় হোক'? ঐ কথা কয় ক্যা— 'ধর্ম্মের জয় হোক'। কুন্তী তো ছেলেদের বলল 'তোমাদের জয় হোক'। গান্ধারী তো ক'ল না। আবার, গান্ধারী যে চোখ বেঁধে রাখত, তার মানে সে ঘৃণায় ধৃতরাষ্ট্রের মুখও দেখতে চায়নি। তার ভেতরে ছিল প্রতিহিংসা। তাই, সবসময় চোখ বেঁধে রাখত।

গান্ধারীর চোখ বেঁধে রাখার এই অভিনব ব্যাখ্যা শুনে আমরা সকলেই বিস্মিত ও চমৎকৃত। প্রশ্ন করলাম—ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলেই না হয় পতিভক্তির ছদ্মবেশে গান্ধারীর চোখ বেঁধে রাখার সুবিধা হয়েছিল। ধৃতরাষ্ট্র যদি অন্ধ না হতেন তাহলে গান্ধারী তার মুখদর্শন কিভাবে এড়াতেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন অন্য pose (ভান) নিত। 'তোমার মুখদর্শন করতে চাই না' গান্ধারী যদি একথা ব্যক্ত করত তখন ওকে হয়তো কেটে ফেলত, শকুনিকেও কেটে ফেলত। তাতে ওদের প্রতিহিংসা নেওয়া হত না, কার্য্যোদ্ধার হত না।

প্রশ্ন—আগেরকার দিনে একটা মেয়েকে বিয়ে করার জন্য ক্ষত্রিয়রা পরস্পর যুদ্ধ করত। যে জয়লাভ করত সে-ই মেয়েটিকে বিয়ে করত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা sword (তরবারি) হাতে নিয়ে যুদ্ধ করত ক্ষত্রিয় valour (বিক্রম) ঠিক রাখার জন্য। ঐ ক'রে ওরা ক্ষত্রিয় custom (প্রথা) ঠিক রাখত। তা' যদি না হ'ত, তাহলে রুক্মিণীর বিয়ে হবার পরে তাদের সাথে শ্রীকৃষ্ণের বিরোধ লেগেই থাকত। তা' কিন্তু আর থাকল না। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তা' করেনি।

প্রশ্ন—বিপ্র পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতা থেকে জাত সন্তানের বিয়ে কা'র সাথে হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ওরকম যারা তাদের সাথেই হবে, সমান ঘরে। আর, ঐ মেয়েদের বিয়ে বামুনের সাথেও হতে পারে—যদিও একটু নীচু হ'ল। তবে এইরকম বিয়ে হওয়ার আগে ঐ বিপ্রের একটি সবর্ণা বিপ্রকন্যাকে বিয়ে করাই লাগবে।

প্রশ্ন—একেই তো অনুলোমের অনেকখানি division (বিভাগ)। এর ফলে তো division (বিভাগ) আরো বেড়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো যাবেই। আগেকার দিনে বামুনরা এইগুলি ঠিক রাখত। প্রতিলোম যাতে কিছুতেই ঢুকতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখত। সেইজন্য কয় 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।' সমাজে যেমন পুরোহিত থাকে, ঐরকম ঘটক থাকত। তারা eugenics-এ expert (প্রজনন-বিজ্ঞানে সুদক্ষ) ছিল। এমন expert (সুদক্ষ) ছিল যে আগের থেকেই বলে দিতে পারত, এই মেয়ের সাথে যদি ছেলের বিয়ে হয়

তাহলে তার সন্তান এইরকম হবে। আবার, তাদের কতগুলি ছেলে আর কতগুলি মেয়ে হবে তাও বলে দিতে পারত।

এই সময় পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য) দুই শিশি গঙ্গাজল নিয়ে এসে দেখিয়ে বললেন—এটা দুই বছরের, এটা পাঁচ বছরের। এখনও পোকা পড়ে নি। শুনেছি, গঙ্গাজলে নাকি পোকা পড়ে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুব হাসছেন, হাসতে হাসতে স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন—ঐ তো, পণ্ডিতের ঐসব দেখার বুদ্ধি আছে।

কিছু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জানতে চাইলেন ড্যানিয়ুব নদী কোথায়। ইউরোপের মানচিত্র দেখে বলা হল রুমানিয়ার দক্ষিণে। তখন দয়াল ঠাকুর বললেন,—আমার মনে হয়, ড্যানিয়ুব হয়েছে দানব থেকে। ওখানে ময়দানবের বাড়ী ছিল না তো? তার নামের সাথে নদীটার নামের মিল আছে। খুঁজলে এরকম মিল আরো পাওয়া যাবে। সেইজন্য আমি কই, যেমন ইন্দো-ইউরোপীয়ান আছে তেমনি ইউরো-ইন্ডিয়ানও আছে।

ননীদা (চক্রবর্তী) ইদানীং যাজন-কাজে দুর্গাপুর গিয়েছিলেন। সেখানকার মানুষের শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনতে আগ্রহ, শ্রদ্ধা ইত্যাদির গল্প করছেন এখন এসে। শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের inherent weakness-এর (স্বভাবজ দুর্ব্বলতার) জন্যই কাজ হয় না। আমরা অলস, inactive (অকর্ম্মণ্য), বসে বসে থাকাই আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। ঋত্বিকরা কাম করে। কী কাম করে তা' আর দেখতে পাইনে।

সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন। কোন্ দেবতার পূজায় কোন্ ফুল লাগে তাই নিয়ে কথা চলছিল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয় যে গন্ধপুষ্প যে দেবতার পূজায় লাগে তার দ্বারা ঐ দেবতার গুণাবলী exalted (উদ্দীপিত) হয়ে ওঠে। ধুতুরারও গন্ধ আছে, অপরাজিতারও গন্ধ আছে। পলাশেরও গন্ধ আছে কিনা কি জানি। আমার মনে হয়, গন্ধপুষ্প মানে গন্ধযুক্তপুষ্প।

একটু পরে সমস্তিপুরের সেই উকিল দাদাদের সাথে ক'রে নিয়ে এসে বসলেন হরিনন্দনদা (প্রসাদ)। বললেন—সকালে বিবাহ-সম্বন্ধীয় আলোচনা এঁদের খুব ভাল লেগেছে।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীত হলেন। তারপর সকালের সেই দাদা আবার কথা তুললেন—বিয়ের সময় সদৃশ ঘর তো ভালই। তারপর তো অনুলোম করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমেই হল সদৃশ ঘর। ওটাই বিবাহ। তার নীচে আছে অনুলোম। কিন্তু তার আগে সদৃশ বিবাহ একটা করাই উচিত।

প্রশ্ন—সদৃশ মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Similar clan (সমান বংশ)।

প্রশ্ন—কোথাও হয়তো দেখা গেল, বরের পরিবার মাছ খায়, কনের পরিবার মাছ খায় না। এখানে বিয়ে হলে প্রতিলোম হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এরকম বিয়ের উপর যদি প্রীতি থাকে তাহলে ব্যতিক্রমের আরম্ভ হ'ল বলা যায়। আর, ব্যতিক্রম ঘটতে থাকলে আস্তে আস্তে যা' হবার তাই হয়। মানুষ নীচের দিকে নামতে থাকে। বামুনের মেয়ে হয়তো চামারকে বিয়ে করে, আরো কী কী করে। আজ দেশে কায়স্থ যদি ঠিক থাকত, তারা সবটা control (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারত, এমনকি বামুনদেরও। যেখানে deviation (ব্যতিক্রম) হয় সেখানেই প্রতিলোমের সূত্রপাত হয়।

প্রশ্ন—Deviation (ব্যতিক্রম) কি প্রতিলোম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Deviation মানে ব্যতিক্রম। প্রতিলোম হল greater (বড় রকমের) ব্যতিক্রম।

প্রশ্ন—দেখেশুনে হয়তো সদৃশ ঘরেই বিয়ে হল। তারপর দেখা গেল স্বামীর উপর স্ত্রীর কোন শ্রদ্ধা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যদি না থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেখানে সদৃশত্ব maintained (পালিত) হয় নি। বিয়ে ঠিক করা একটা ফাঁকি কথা নয়। বিয়ে ঠিক করতে গেলে দেখতে হয় ছেলেমেয়ের বংশের আয়ু কেমন, বংশে কোন রোগ আছে কিনা, তাদের behaviour (ব্যবহার) কেমন, attribute (গুণাবলী) কেমন! শুধু শুধু গরু কিনে তো লাভ নেই, দুধ দেয় কিনা দেখা লাগবে তো! ওগুলি দেখা কিন্তু তোমাদের forefather-এরই (পূর্ব্বপুরুষেরই) trail (ধারা)। আবার দেখ, তোমার forefather (পূর্ব্বপুরুষ) হয়তো ১০০ বছর বেঁচে গেছেন। তুমি এমন সদৃশ ঘর থেকে মেয়ে আনলে, যাদের গড় আয়ু ৫০ বছর। তখন তোমার বংশের আয়ু হয়তো হয়ে গেল ৭০। এতখানি হিসাব ক'রে তারপর মেয়ে আনা দরকার। সেইজন্য কয় মা, মানে মাপ ক'রে দেয় যে।

প্রশ্ন—সদৃশ বিবাহের মধ্যেও তো অনুলোম-প্রতিলোম হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদৃশ যদি না-ই পাওয়া যায়, তাহলে nearly (কাছাকাছি) অনুলোম যাতে হয় তাই করা লাগে। প্রতিলোম avoid করতেই (এড়াতেই) হবে। কিন্তু সদৃশই সবদিক দিয়ে ভাল। আর, বিয়ের ব্যাপারে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই father side ও mohter side (পিতৃকুল ও মাতৃকুল) দু'দিকেরই history (ইতিহাস) বিচার ক'রে দেখা লাগে।

প্রশ্ন—আজকাল তো family tradition (পারিবারিক ঐতিহ্য) maintained (রক্ষিত) হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে খুবই খারাপ। অদৃষ্ট খারাপ বলতে হয়।

এরপর ঐ দাদা মহাভারত সম্পর্কীয় কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। বললেন—পাণ্ডু তো রোগী ছিলেন, আর কুন্তী ছিলেন সুস্থ। এ বিবাহটা প্রতিলোম হয় নি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রোগ থাকলেও existential deficiency (সত্তাগতভাবে কোন খাঁকতি) ছিল না। সেইজন্য তার ছেলেপেলেও পরাক্রমী হ'ল।

প্রশ্ন—কিন্তু ভীম-অর্জ্জুন এদের জন্মবৃত্তান্ত তো অন্যরকম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের দেশে আগে প্রথা ছিল, এখনও আছে যে মেয়েরা ঋতুস্নানের পরে, প্রথমে স্বামীর মুখ দেখবে, তার আগে আর কারো মুখ দেখবে না। তখন হয়তো ঋতুস্নানের পরে সূর্য্যের মুখ দেখেছিল, কোনবার পবনের মুখ দেখেছিল। তার মানে কুন্তী তাদের গুণাবলী ধ্যান করেছিল। আর ঐভাব তার conceive (গর্ভধারণ) করার সময়ে ছিল। তার ফলে, সেই গুণযুক্ত সন্তান লাভ করেছে। সূর্য্য তোমার মনে নেমে আসতে পারে। কিন্তু সূর্য্য the planet (গ্রহ) বা পবন, the wind (বাতাস), এরা conceive (গর্ভধারণ) করায় কী করে? Conceive (গর্ভধারণ) করার জন্য চাই একটা মানুষ। তাই, যেসব গল্পকথা চলিত আছে, সেগুলি deluding to me (আমার কাছে প্রবঞ্চনাপূর্ণ)।

বনবিহারীদা (ঘোষ)—এর উপর দাঁড়ালে মহাভারতের অনেক জিনিস explain (ব্যাখ্যা) করা যাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো ভাল ক'রে জানি না, meagre to understand (বুঝিও কম)। শুনেছিলাম, টার্কিতে একটা মেয়েলোক নাকি conception-এর (গর্ভধারণের) সময় নেপোলিয়ানের ছবি দেখত। তার ছেলে হ'ল ঠিক ঐ নেপোলিয়ানের মত। এরকম আরো ঢের উদাহরণ আছে, আমি শুনেছি। (একটু থেমে বললেন) কোন বিষয় যখন বোঝা না যায় তখন মানুষ সেটা নিয়ে ভাবে, বের করার চেষ্টা করে how it is possible (কিভাবে এটা সম্ভব)!

বনবিহারীদা—কর্ণ যে সূর্য্যোপাসনা ক'রে কবচ লাভ করেছিল সেটা কিভাবে explain (ব্যাখ্যা) করা যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, কোন ব্রাহ্মণ সূর্য্যপূজা করত। সেই পূজারই কোন কবচ সে কর্ণকে দিয়েছিল। তারপর যখন কর্ণের pride (গর্ব্ব) এসে গেল, দানের pride (গর্ব্ব), তখন যেয়ে আবার কেড়ে নিল।

বনবিহারীদা—কোন সূর্য্যোপাসক দিয়েছিল ঐ কবচ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' না হলে তুমি explain (ব্যাখ্যা) করবে কেমন ক'রে!

বনবিহারীদা—আচ্ছা, এই কথা যে আছে, কুমারী অবস্থায় কুন্তীর কাছে যাতায়াত করেন পাণ্ডু। তাহলে পাণ্ডু তো নারীমুখী!

মৃদু ধমক দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাতে কী হ'ল। নারীমুখীই হোক আর বারীমুখীই হোক্ তাদের চলন দেখ না কেন, তাদের সন্তান-সন্ততি কেমন হ'ল দেখ। বিয়ের আগে পরিচয় থাকে না? আমার সাথে বড় বৌ-এর চেনাজানা ছিল বিয়ের আগে। তা' আমার জীবনেই যদি এটা হয়ে থাকে, তাহলে আরো বড়জীবনে সেটা আরো কত রকমে হতে পারে। আবার এই যে কথা আছে, জনকের লাঙ্গলের ফালে সীতা উঠল। কিন্তু সীতা যে জনকের কন্যা নয় তার কি কোন প্রমাণ আছে? আবার, জনকের কন্যাই যদি না হয় তাহলে বিয়ের সময় রামচন্দ্রের বাবা ছিল, আরো গুরুজনেরা ছিল, তারা ভালমত খোঁজখবর না নিয়ে বিয়ে দিল?

হরিদা (গোস্বামী)—বিয়ের সময় দেখা যায়, জনক নিজের কুলজী বলে দিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হেসে) তবে? তবে দেখ দেখি।

এরপর মহাভারতের অন্যান্য কাহিনী নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। গান্ধারীর প্রসঙ্গ আসতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যুদ্ধে যাওয়ার সময় দুর্য্যোধন যখন গান্ধারীকে প্রণাম করতে আসে তখন গান্ধারী কয়, ধর্ম্মের জয় হোক। কেন, তা' কয় কেন? বলল না তো তোমাদের জয় হোক। এই দেখে আমার একটা সন্দেহ জাগে। ধৃতরাষ্ট্র কান্দাহার invade (আক্রমণ) করেছিল। ক'রে massacre (ব্যাপক হত্যাসাধন) করল। ঐ রাজপরিবারে বাঁচল শুধু গান্ধারী আর শকুনি। ধৃতরাষ্ট্র জোর ক'রে গান্ধারীকে নিয়ে এসে বিয়ে করল। গান্ধারী আসল, আসল যমের বাড়ী আসার মতন। সে ধৃতরাষ্ট্র এদের দারুণ against-এ (বিরুদ্ধে) ছিল। ওদের ঘৃণা করত। সেইজন্য চোখ বেঁধে রাখত, কারোই মুখ দেখত না। তার ঘৃণা ও বিদ্বেষভাবের মধ্য দিয়ে জন্ম নিল দুর্য্যোধন-দুঃশাসন এরা। তাই, যুদ্ধের সময় ওরা প্রণাম করতে এলে কায়দা ক'রে কথা ক'ল, ধর্ম্মের জয় হোক। আবার, শকুনিও তক্কে তক্কে ছিল কিভাবে প্রতিশোধ নেবে। সে বাবার হাড় দিয়ে পাশা তৈরি করেছিল। একা একা যখন থাকত তখন ঐ পাশা হাতে নিয়ে 'প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা' ক'রে উঠত।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর শকুনির ভঙ্গিতে হাতে পাশা নেওয়ার ভাব ক'রে চোখমুখেও ঐরকম ভাব ফুটিয়ে তুলে দেখাচ্ছেন। শকুনির কুটিলতা ও প্রতিহিংসার ভাব তাঁর সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

তারপর আবার স্বাভাবিকভাবে বলছেন—ধৃতরাষ্ট্র ওরা গুষ্টিশুদ্ধ সবাই কেষ্ট ঠাকুরকে refuse (প্রত্যাখ্যান) করেছিল। শকুনিও ওদের নির্ব্বংশ ক'রে ছেড়েছিল।

হরিনন্দনদা—যুদ্ধের পরে তো গান্ধারী খুব শোক করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শোক না করলে তো চলবে না। উপায়ই নেই তা'র শোক না ক'রে।

বনবিহারীদা—কিন্তু গান্ধারীর যে শতপুত্র হল, এটা কিভাবে support (সমর্থন) করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ কিভাবে হয়। আমার অত বিদ্যেবুদ্ধি নেই যে ওসব ক'ব। তুমি যেমন কও Zygote-এর (ভ্রূণাণুর) ভাগ হয়, ঐরকমভাবে কিছু হয় কিনা দেখ। এরকম অনেক কিংবদন্তী পুরাণেও আছে। এসবগুলির খোসা ছাড়ালে আসল বস্তুটা বার ক'রে নেওয়া যায়।

এরপর সমস্তিপুরের ঐ উকিল দাদা ভিন্ন প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুললেন। বললেন—আচ্ছা, acute case-এ (সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে) মেয়েদের তো লেডী ডাক্তার দিয়েই দেখানো উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লেডী ডাক্তার যদি পাই তো ভালই, নতুবা male (পুরুষ) ডাক্তার দিয়েই দেখাবো। জীবনের সাথে কোন প্রশ্ন নেই।

প্রশ্ন—ডাক্তারীতে তো কো-এডুকেশন ছাড়া উপায় নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কো-এডুকেশন হয়। একসাথে দুজনে পাশ করে। পড়তে পড়তে হয়ত couple-ও (স্বামী-স্ত্রীও) হয়ে যায়। আগে male (ছেলেদের) কলেজ ও female (মেয়েদের) কলেজ আলাদা থাকত। এখন তোমাদের বুদ্ধিই অন্যরকম। শুধু চেষ্টা—কি ক'রে infection (দুষ্ট সংক্রমণ) সৃষ্টি করবা।

এইসময় সৎসঙ্গ প্রেসের কর্ম্মাধ্যক্ষ অমূল্যদা (ঘোষ) এলেন। অর্ঘ্য-প্রস্বস্তি ও দীক্ষাপত্র নতুন ক'রে ছাপা হচ্ছে, তার নমুনা দেখালেন। দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অর্ঘ্য-প্রস্বস্তিতে এই কথা কয়টি দিয়ে দিবি, 'আপনার অনুরাগ-উদ্দীপী আগ্রহ-উচ্ছল স্বতঃস্বেচ্ছ অপ্রত্যাশী অর্ঘ্যাঞ্জলি'। আর, দীক্ষাপত্রের মধ্যে যেন থাকে 'আমার এই স্বতঃস্বেচ্ছ অপ্রত্যাশী অবদান'।

অমূল্যদাকে কথা কয়টি আলাদা কাগজে লিখে দিলাম। উনি নিয়ে চ'লে গেলেন।

রাত সাড়ে নয়টা হল। কৃষ্ণা (শ্রীশ্রীঠাকুরের দৌহিত্রী) এসে প্রণাম করল। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন দয়াল ঠাকুর—তুই কার সাথে এলি?

কৃষ্ণা—কালোদার সাথে।

হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের খুব কাশি এল। কাশি থামলে জিজ্ঞাসা করলেন—তা' এখন কী করবি?

কৃষ্ণা—আমার তো রিসার্চ করারই ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও তাই। এতে খাটুনি আছে। দেখাশোনা লাগবে অনেক, পরিশ্রম আছে। তবে তৃপ্তিও আছে। মুকুল (কৃষ্ণার কনিষ্ঠা ভগিনী) কেমন পড়ছে?

কৃষ্ণা—ফাইনালের জন্য পড়ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুকুলের আর ক'বছর?

কৃষ্ণা—এখনও তিন বছর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরো, তিন বছর। তুই কোনরকমে দিছিস্ পাড়ি দিয়ে। (একটু পরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলছেন) সেদিন স্বপ্ন দেখছি, ওর (কৃষ্ণার) মা এক বাক্স astrology-র (জ্যোতিষশাস্ত্রের) বই নিয়ে এসে বলছে, বাবা! এসব তো এনেছিলাম। কোন কাজেই তো লাগল না।

কৃষ্ণা—বড়মামা সেদিন বলছিলেন astrology-র (জ্যোতিষের) বই পড়ার জন্য। এখন তো অনেক সময় পাব। এখন ওসব পড়ব।

কালোদা (জোয়ারদার) এসে বসল। তার কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতার খবর সব শুনতে লাগলেন। কৃষ্ণা উঠে শ্রীশ্রীবড়মার ঘরে গেল।

২৯শে ফাল্গুন, ১৩৬৬, রবিবার (ইং ১৩। ৩। ১৯৬০)

আজ দোলপূর্ণিমা। সকালের দিকে শীত-শীত ভাব আছে। সমগ্র আশ্রম-পরিবেশ অতি প্রত্যূষ থেকেই প্রস্তুত হয়ে উঠছে দোল-উৎসব পালনের জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর-চরণে আবীর-নিবেদনের পরেই সুরু হয়ে যাবে রঙের খেলা।

প্রভু প্রাঙ্গণের ছাউনির তলে প্রশস্ত শয্যায় এসে বসেছেন। গায়ে পাতলা জামার উপরে একটা সূতির চাদর জড়ানো। প্রসাদমণ্ডিত মুখশ্রী তাঁর যেন শক্তিশালী চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে বিশ্বজনমন। সে রূপমাধুরী দেখে দেখে নয়ন আর তৃপ্ত হয় না।

তাঁর কাছে ধীরে ধীরে ভক্তসমাগম বেড়ে চলেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতা থেকে একটা ফিলিপ্স্ এ্যাট্লাস্ আনতে বলেছিলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এখন এনে তা' শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখালেন। দেখে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঠিক পছন্দ হ'ল না। বললেন—আর একটু বড় দেখে আনান একখানা ইংরাজী, একখানা বাংলা। কী ছিল তা' দেখার জন্য পুরানো এ্যাট্লাস্ চাই। আবার নতুনটাও দরকার কী হয়েছে তা' দেখার জন্য।

একটি বিশেষ কাজে শরৎদা (হালদার) আজ কলকাতায় যাবেন। অনুমতি প্রার্থনা করলেন। অনুমতি প্রদান ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওখানে যা' করণীয় ক'রে যত সত্বর পারেন চ'লে আসবেন।

শরৎদা—গতকাল হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় দেখলাম, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব উৎসবের এক সভায় বালক ব্রহ্মচারীর কাছে সভাপতি হওয়ার প্রস্তাব নিয়ে উদ্যোক্তারা যান। তিনি বলেন, এসব সভায় মুসলমানকে সভাপতি এবং ডোম-হাড়ি-মুচি-ইত্যাদি জাতির লোককে প্রধান অতিথি করতে হয়।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—চৈতন্যদেব কি জাতিভেদ মানতেন না?

বনবিহারীদা (ঘোষ)—খুব মানতেন, বহু প্রমাণ আছে।

ইতিমধ্যে ভক্তসমাগম আরো বেড়ে গেছে। সবাই উৎসুক সেই আনন্দময় মুহূর্তটির জন্য। বেলা ৯টার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে চ'লে এলেন। ঘরের ভিতর পূবদিকে আগের থেকেই সুসজ্জিত ছিল শ্রীশ্রীহুজুর মহারাজ, শ্রীশ্রীপিতৃদেব ও শ্রীশ্রীজননীদেবীর প্রতিকৃতি।

বেলা ৯-১৫ মিনিট। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথম হুজুর মহারাজ, পরে পিতৃদেব ও তৎপর মাতৃদেবীর প্রতিকৃতিতে চরণে আবীর দিলেন। তারপর সবারই চরণে টাকা ও ফুল দিয়ে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীবড়মা পাশেই ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পরে তিনিও একে একে সব প্রতিকৃতিতেই প্রণাম করলেন। তারপর তাঁর পরমারাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে আবীর ও ফুল নিবেদন ক'রে প্রণাম করলেন।

এইসব অনুষ্ঠান চলাকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে জল এসে যায়। চোখ দুটি লাল হয়ে ওঠে। বার বার তিনি তাঁর মাতৃদেবীর প্রতিকৃতির দিকে চাইছেন, বোধহয় পুরানো স্মৃতি ভেসে ভেসে উঠছে তাঁর মানসমুকুরে। চাপা ক্রন্দনরত অবস্থাতেই শ্রীশ্রীবড়মার দিকে তাকিয়ে বেদনাভরা কণ্ঠে বললেন—এমন কষ্ট যে তা' আর ক'বের (কইতে) পারি নে।

গামছা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ মুছিয়ে দেওয়া হল। এর পর তিনি দক্ষিণাস্য হয়ে বসলেন। শ্রীশ্রীবড়মা এসে বসলেন দক্ষিণের বারান্দায় পূর্ব্ব প্রান্তের একটা চেয়ারে। ঘরে ঢুকতেই বারান্দার উপর রাখা হয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের চটিজোড়া। সবাই সেখানে আবীর ও প্রণামী দিয়ে প্রণাম করছেন এখন, তৎপর প্রণাম করছেন শ্রীশ্রীবড়মাকে। শ্রীশ্রীবড়মা প্রত্যেকের কপালে আবীর মাখিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে দিচ্ছেন। এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর-পরিবারের সকলে এসে প্রণাম ক'রে গেলেন। চারিদিকে আনন্দের কলধ্বনি।

ঠাকুরঘরে প্রণামের পালা সারা হতেই সমগ্র আশ্রমচত্বর জুড়ে সুরু হয়ে যায় হোলির হুল্লোড়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ভিড় এখন পাতলা হয়ে এসেছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসেছেন। নানা কথা হচ্ছে।

একসময় কেষ্টদা বললেন—এমন লোক এখনও আছেন যাঁরা বেদের সব কিছু কাঁটায়-কাঁটায় মেনে চলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেদের বিধানমত যদি কাঁটায়-কাঁটায় চলি তাতেও বেদের অর্থ বোঝা যাবে না—যদি প্রকৃত তত্ত্ব এবং intent of the action (ক্রিয়ার তাৎপর্য্য) না ধরতে পারি।

কেষ্টদা—যেমন দোলে রং দেবার কথা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রংটাকে শুধু রং বলে ধ'রে রাখলে হবে না। রং দিলে কী কাজ হয়, না দিলে কী অসুবিধায় পড়তে হয়, সেই fact-টা (তথ্যটা) discern (নির্দ্ধারণ) করাই আসল কথা।

কেষ্টদা—অনেকে বলেন, এই সময় বসন্ত রোগ হয়, আবীর তার প্রতিষেধক। আবার, অন্তরের রঙে পরমপিতাকে রাঙিয়ে তোলার প্রতীক হচ্ছে আবীর, একথাও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে যাই হোক, ঠিকমত জানা লাগবে তা'।

বেলা ১০টা বাজে। ননীদা (চক্রবর্ত্তী) একটি দল নিয়ে কীর্ত্তন করতে করতে এলেন ঠাকুরঘরের সামনে। অনেকক্ষণ ওঁরা কীর্ত্তন করলেন নেচে নেচে। তারপর গাইতে গাইতে চ'লে গেলেন।

উত্তরপাড়া থেকে কৃষ্ণ রায়চৌধুরী চিঠি লিখেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে রুটি জোগাড় করতে বলেছেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি দক্ষিণ ভারতের দিকে বেরোলেন। এখন ঐ চিঠির বিষয় নিবেদন করলাম শ্রীশ্রীঠাকুরকে। শুনে তিনি বললেন—আমি তো শুধু রুটি জোগাড় করতে বলিনি। রুটি বানানো শিখে এসে এখানে মানুষকে তা' শিখিয়ে দিতে বলেছি।

আমি—ও আরো লিখেছে, ঠাকুরের উপর ইতিমধ্যেই আমার বেশ অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা এসে পড়েছিল। তাই আশ্রম থেকে আসার সময় তাঁর কাছে বিদায় নিয়েও আসিনি। এখন বুঝতে পারছি ঠাকুরের কথামত কাজ করা ছাড়া আমার অন্য উপায়ই নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যই তো ওকে ঐসব কাজ করার কথা কইছিলাম। ও কি তা' বুঝল? রুটি বানাতে শেখার কথাও ওকে জানানো দরকার। কিন্তু এখন তো আর লেখার উপায় নেই।

আমি—হ্যাঁ, বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে।

কথায়-কথায় বেলা ১১টা বেজে যায়। শ্রীশ্রীবড়মা স্নান করতে গেছেন। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুরও স্নানে উঠবেন। কিছু খাবার-দাবারের ব্যবস্থা আগের থেকেই করা ছিল। এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতে তিত্তিরিদি একথালা খাবার এনে দিল অনুরাধামাকে। রমণের মা সামনে দাঁড়িয়ে, তাকে দেওয়া হল না। ব্যস্, ভিতরের চাপা প্রবৃত্তি দেখতে

দেখতে ফণা মেলল। ঐ খাওয়ার ব্যাপার নিয়েই এক কথা দু'কথায় সুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড ঝগড়া। আশেপাশে সবাই দাঁড়িয়ে উপভোগ করছেন লালসার এই মৎসর প্রকাশ। স্নানের সময় হয়ে যেতে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে স্নানে গেলেন।

আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানের পর নতুন পৈতা ধারণ করেন। শ্রীযুত গোঁসাইদা (সতীশচন্দ্র গোস্বামী) পৈতা তৈরী ক'রে আনেন এবং স্নানের পর শ্রীশ্রীঠাকুরকে পরিয়ে দেন। আজও পৈতা প্রস্তুত ক'রে এনে গোঁসাইদা বসে আছেন ডিস্পেনসারির বারান্দায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নান হলে তাঁকে খবর দিতে একজনকে বলেছেন। কিন্তু যার উপর এ দায়িত্ব ছিল, সে খবর দেবার কথা ভুলে গিয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ হয়ে যাওয়ার পর তার মনে পড়ে এবং গোঁসাইদাকে এসে সেকথা জানায়। সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে দেখে গোঁসাইদা তখন বাড়ী চ'লে যান।

বিকালে এখবর শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব অস্থির হয়ে পড়েন এবং বার বার জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, তাহলে এখন কী করা যায়!

ইতিমধ্যে পণ্ডিতমশাই (গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) এলেন। তিনি সব ঘটনা শুনে বললেন—আগামী কালই তো ভাল দিন আছে। কাল পৈতা পরবেন।

গোঁসাইদাও এসে বসেছেন। তাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—পৈতা ঠিক ক'রে রাখবেন। কাল পরব।

সন্ধ্যার পর সমস্তিপুরের দাদারা এসে বসেছেন। কথায়-কথায় আলোচনা উঠল।

প্রশ্ন—মা কি কখনও চায় ছেলের মৃত্যু হোক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি দেখি নি। তবে bastard (জারজ) ছেলে হলে চাইতে পারে।

প্রশ্ন—তাহলে গান্ধারী কি ক'রে দুর্য্যোধনের মৃত্যু চাইত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মৃত্যু তো চায় নি, বলেছিল ধর্ম্মের জয় হোক।

প্রশ্ন—কিন্তু ওর মধ্যে revenge-এর (প্রতিশোধের) ভাব ছিল, আপনি বলেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেশুনে মনে হয় ছেলেরা যে অধর্ম্ম করছে গান্ধারী তা' বুঝত। সে ওটা চাইত না। গান্ধারীকে কখনও খারাপ চাইতে দেখা যায় না। সে বুঝেছিল, এদের রকমটা খারাপ; সেইজন্য কখনও কয় নি 'তোমাদের জয় হোক।' আবার, শ্রীকৃষ্ণকে যে ওরা insult (অপমান) করত, গান্ধারী তা' কখনও support (সমর্থন) করত না। তাতে মনে হয়, গান্ধারী in favour of শ্রীকৃষ্ণই (শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই) ছিল। প্রতিহিংসা নেওয়ার ঝোঁক প্রবল হয়েছিল শকুনির মধ্যে।

প্রশ্ন—মা কখনও ছেলের অসাফল্য কামনা করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহাভারতেও আছে। গান্ধারী বলতেন, ধর্ম্মের জয় হোক। তিনি বোধ হয় জানতেন, খারাপ ক'রে কারো কখনও ভাল হয় না। ওরা দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করেছিল, তাতেও বোধহয় গান্ধারীর support (সমর্থন) ছিল না। আমি জানি না। বড় বৌকে জিজ্ঞাসা ক'রে আয়।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) টক ক'রে উঠে গেলেন শ্রীশ্রীবড়মার কাছে জানতে। শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলছেন—

অবশ্য bastard (জারজ) হলে অনেকরকম হয়। Illegitimate child-দের (অবৈধ সন্তানদের) মায়েরা তাদের সন্তানদের অনেক সময় মেরে ফেলতে চায়। সেখানে 'কুপুত্র যদি হয়, কুমাতা কখনও নয়' এ আর খাটে না। তিনটা কি পাঁচটা পুরুষ দিয়ে যেসব মেয়েদের ছাওয়াল হয়, তাদের ঐ ছাওয়ালদের 'পরে কোন দরদ থাকে না। এইসব দেখেশুনে মনে হয়, ডাইভোর্স যারা সৃষ্টি করেছিল তারা কতখানি cruel-hearted (নিষ্ঠুর হৃদয়)।

এইসময় শৈলেন-দা এসে জানালেন—বড়মা বললেন, ওরা যখন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করছিল তখন গান্ধারী ভিতরে ছিলেন, কোন কথা কন নি। প্রতিবাদ করেছিলেন একমাত্র বিকর্ণ।

এরপর কো-এডুকেশনের নানারকম কুফল নিয়ে কথা উঠল। সমস্তিপুর থেকে আগত মহেশ্বরদা ঐ প্রসঙ্গে বললেন—যদি মেয়েরা ডাক্তারী পড়তে চায় তাহলে তো তাদের কো-এডুকেশনে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখা যায়, আগেও নারীরা খুবই শিক্ষিত ছিল। একজন তো শঙ্করাচার্য্যকে তর্কে হারায়ে দিছিল। তারা যুদ্ধবিদ্যাও যথেষ্ট জানত। বিদ্যার কিছু বাকী ছিল না, কিন্তু ঐ সময়ে কো-এডুকেশন ছিল না। তখন প্রত্যেকটা বাড়ীই ছিল এক একটা institution (প্রতিষ্ঠান)।

মহেশ্বরদা—যুদ্ধের জন্য মিলিটারী ট্রেনিং নেওয়া তো নারীর বৈশিষ্ট্যের প্রতিকূল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুর্গাপূজা কর না? কালীপূজা কর না? যোদ্ধা নারীর emblem (প্রতীক) ঐ। এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, শত্রু attack (আক্রমণ) করলে তখন defence নেবে (প্রতিরোধের ব্যবস্থা করবে)। সেইজন্য কয় 'দুর্গা', মানে সে দুর্গ-স্বরূপ হয়ে আছে।

মহেশ্বরদা—আমার দাদা কয়েকজনকে নিয়ে একটা কলেজ করতে চাইছেন। কাজ শুরু করার পরে অনেকেই ওঁর বিরুদ্ধাচরণ করছে। এখন উনি একাজে অগ্রসর হবেন কিনা জানতে চাইছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কলেজ করতে পারলে ভালই হয়। মানুষই মানুষের সম্পদ। একাজে মানুষ যদি সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে তো ভালই। আর কেউ যদি না

করে তো না-ই করবে, একলাই মাথা দিয়ে দাঁড়াতে হয়। (তারপর মুচকি হেসে বলছেন) কলেজ করলেও তাতে কো-এডুকেশন করা ভাল না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর খারাপ বোধ করতে থাকেন। সবাই উঠলেন এখন। শ্রীশ্রীঠাকুর পাশ ফিরে শুলেন। ঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। ঘুমালেন রাত ১১টা পর্য্যন্ত। তারপর উঠে ভোগ গ্রহণ করলেন।

৩০শে ফাল্গুন, ১৩৬৬, সোমবার (ইং ১৪। ৩। ১৯৬০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর যথারীতি পশ্চিমের ছাউনিতে এসে বসেছেন। ভক্তবৃন্দ আছেন চারপাশে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বা বসে। পরমদয়াময়ের করুণাঘন দৃষ্টিপাত সবাইকে স্পর্শ ক'রে ফিরছে। সে কম্রমধুর দৃষ্টির পরশে প্রত্যেকে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছেন। জন্মজন্মান্তরের সাধনায় চর্ম্মচক্ষে দর্শন করা সম্ভব ঈশ্বরের এই নরলীলা।

সমস্তিপুরের উকিল উমাদা কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সাথে গল্প করতে করতে এসে বসলেন। কেষ্টদা বললেন—উমাদা এখানে থাকতে চায়। বলে, বাইরে থাকতে ভাল লাগে না। এখানে ঠাকুরের কাজ-টাজ নিয়েই থাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠাকুরের কাছে আসতে হলে খোরপোষের আশা নিয়ে আসা ভাল না। আনন্দবাজার আছে, সেখানে খাবে। আর পরনের কাপড় জোগাড় ক'রে নিয়ে চলা লাগবে, এরকম extreme (চরম) ভাব নিয়েই আসা ভাল।

কেষ্টদা—উমাদা ডক্টরেটের জন্য থিসিস দেবার চেষ্টা করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার খুব ইচ্ছা।

কেষ্টদা—ওর ঠাকুরদা এবং বাবা খুব বড় উকিল ছিলেন। ওর আবার জার্নালিজ্‌মের দিকে খুব ঝোঁক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাইতে মনে হয়, ও যদি equiped (প্রস্তুত) হয় ভাল ক'রে তাহ'লে ভাল জার্নালিস্ট হতে পারে। মুরলীবাবুও (মুরলীমনোহর প্রসাদ : সার্চলাইট পত্রিকার সম্পাদক) জার্নালিস্ট ভাল। তাঁর শরীর-টরীর এখন খারাপ হয়ে গেছে। তবুও তাঁর কাছে যা' শেখা যায়।

উমাদা—আমাদের ওখানে শিবশঙ্করদার বাড়ী আছে—বিরাট joint family, about 100 members (প্রায় ১০০ জনের বিরাট একান্নবর্ত্তী পরিবার)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওঃ খুব ভাল। এরকম joint family (একান্নবর্ত্তী পরিবার) আমার দেখতে ইচ্ছা করে। (একটু পরে) দেখতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এখন আর উপায় নেই।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর মধুর হেসে, নয়নে মনোহর কটাক্ষ হেনে সুর ক'রে বলে উঠলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এখনও মনে হয়, 'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি'।

বেলা সাড়ে দশটা। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে এসে বসেছেন। সাথে আছেন কেষ্টদা, বিশুদা (মুখোপাধ্যায়), রেবতী (বিশ্বাস) প্রমুখ। কথাপ্রসঙ্গে দয়াল বললেন—সময়মত কথা না বলতে পারলে এত মুশকিল হয় যে তা' আর কওয়ার না। পরে আবার সেই কথা নিয়ে হয়তো গোলমাল হয়।

পায়ের জোর কমে যাওয়ার উল্লেখ ক'রে বললেন—আগের মতন তো আমার ঠ্যাং নেই। ঠ্যাং থাকলে এদিক-ওদিক চ'লে যেয়ে কথা ব'লে আসতাম।

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর সরোজিনীমার জন্য এক সেট বিছানা আনতে প্যারীদাকে (নন্দী) বলেছিলেন। প্যারীদা এখন নিয়ে এলেন সেই বিছানা, ধপাস্ করে ফেললেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে বারান্দায়। আনন্দের লহরী তুলে প্রভু বলে উঠলেন—বাবারে—বা-বা, তুই যে একেবারে গন্ধমাদন নিয়ে আইছিস্।

এরপর প্যারীদা বিছানার মোট খুলে দেখাতে লাগলেন। মাথার বালিশ, কোলবালিশ, তোয়ালে, তোষক, সতরঞ্চি, মশারি সবই আছে একটা বড় চৌকির মাপে। সব দেখে, শ্রীশ্রীঠাকুর ইঙ্গিতে মাথা নেড়ে সরোজিনীমার কাছে কেমন হয়েছে জানতে চাইলেন। সরোজিনীমাও সম্মতিসূচকভাবে মাথা কাত করলেন অর্থাৎ তাঁর পছন্দ হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে নিয়ে যাও।

সরোজিনীমা—আমি কি নিয়ে যেতে পারব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে বঙ্কিম আছে, প্যারী আছে, কইলেই নিয়ে যাবে নে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝে প্যারীদা বিছানার মোট ঘাড়ে ক'রে নিয়ে সরোজিনীমার চৌকিতে রেখে এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মশারি আনিছিস্?

প্যারীদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কই দেখলাম নাতো। দেখা আমারে।

প্যারীদা আবার বিছানার মোটটি এনে খুলে মশারিটা দেখালেন। দেখে প্রভু হাসতে হাসতে বললেন—ঠিক আছে। একেবারে ঠিক প্যারীর মত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই আদরভরা আপ্যায়নায় প্যারীদা আনন্দে ডগমগ। বিছানাটি গুছিয়ে নিয়ে আবার জায়গামত রেখে এলেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী দিলেন—

'ইঙ্গিতজ্ঞ হও,
অনুমানজ্ঞ হও,

অনুধায়নজ্ঞ হও—
আর, তা' বিহিত সতর্কতার সহিত..."

বাণীটি বেশ বড়। বলা হয়ে গেলে বলছেন—যেমন আমাকে অনেকে মনে করে, ঠাকুর কিছু বোঝে না। বোঝে কি না-বোঝে, তার পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে ঠাকুর কী করে দেখলেই বুঝতে পার। ২/৩ দিন পরে আরো পরিষ্কার বোঝা যায়।

ননীমা একপাশে দাঁড়ায়ে ছিলেন। মুখখানা গম্ভীর। বললেন—যারা মানুষকে ফাঁকি দেয় তারাই তো দেখি বড় হয়, সুখে থাকে।

আমি বললাম, —অসুররা দেবতাদের পরাস্ত ক'রে স্বর্গরাজ্য অধিকার করেছে। সাময়িক সুখভোগ করেছে। পরে ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে ধ্বংস হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইন্দ্রের বজ্র মানে কী জানিস তো। ইন্দ্র মানে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রের বজ্র মানে ইন্দ্রিয়ের বজ্র। অর্থাৎ তোমার কর্ম্মফলই তোমাকে নিকেশ করবে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরের বারান্দায় বসেছেন। তরুমা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের থালা-বাটি নিয়ে বাড়ী যাচ্ছেন। রাতে ঐ থালা-বাটিতে ভোগ আসবে। তরুমাকে দেখেই আদরভরা কণ্ঠে ডাক দিলেন দয়াল—এই, এদিক আয়, এদিক আয়। তোর সাথে কেবল খাওয়ার পিরীত, (তরুমা এগিয়ে এলেন) আজ কী খাওয়াবিনি রে?

তরুমা—আপনার কী খেতে ইচ্ছা হয় ক'ন।

কণ্ঠে রহস্যের ঢেউ তুলে পরম দয়াল বললেন—গরু কি জানে তার কী খেতে ইচ্ছা করে, আর কী খেতে ইচ্ছা করে না।

তরুমাও পাল্টা জবাব দিলেন—তাহলে তো আর জিজ্ঞাসাই করতাম না।

এইবার শ্রীশ্রীঠাকুর ননীমার দিকে ফিরে বললেন—কী খাব ক'।

ননীমা—আমি ক'ব কেমন করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর যেন নিরাশ হয়ে বললেন—ওরে বাবা!

তারপর আলোচনা ক'রে ঠিক হল রাতে সিঙাড়াই খাওয়া হবে।

এরপর ডাঃ বনবিহারীদা (ঘোষ) জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষ ভগবানকে পেয়েও ঠিকমত চলতে পারে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন—করে না, তাই পারে না।

বনবিহারীদা—যুধিষ্ঠির তো সব বুঝলেন, তা' সত্ত্বেও তাঁর বৌ-শুদ্ধ নীলাম হয়ে গেল। ঠেকাতে পারলেন না।

এবারেও সংক্ষেপে বললেন প্রভু—ব্যসনে আসক্ত না হলেই হ'ত।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বনবিহারীদাকে সকালে প্রদত্ত 'ইঙ্গিতজ্ঞ হও...' বাণীটি দেখতে বললেন। বনবিহারীদা দেখলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর জানতে চাইলেন—ওগুলি মিলবে তো?

বনবিহারীদা—খুব সুন্দর হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওগুলি আবার অভ্যাস করা লাগে। অভ্যাস করতে করতে প্রথমে হয়তো মেলে না। তারপরে একটু মেলে। তারপরে একটু বেশী মেলে। এইরকম ক'রে বাড়তে থাকে। একজন হয়তো তোমার বাড়ী এলো। তুমি তার কাছে এক গ্লাস জল নিয়ে গেলে। দেখে সে অবাক হয়ে গেল। ভাবল—বাবারে বাবা! আমার জলপিপাসা পেয়েছে ও জানল কী ক'রে? এইরকম করতে করতেই বেড়ে ওঠে।

এরপরে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকগুলি ছড়া বললেন। ছড়া দেওয়া চলল রাত ১১-২০ মিঃ পর্য্যন্ত।

১লা চৈত্র, ১৩৬৬, মঙ্গলবার (ইং ১৫।৩।১৯৬০)

আজ প্রাতে ছাউনিতে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) বলছিলেন কিভাবে কালজয়ী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, যা' fundamental fact of life নিয়ে deal করে (যা' জীবনের মৌলিক উপাদান নিয়ে কাজ করে), তাই কালজয়ী হয়।

বেলা বাড়লে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে এসে বসলেন। চুনীদা (রায়চৌধুরী), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), শশাঙ্কদা (গুহ), বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ আছেন। ঘরে এসে বিছানায় বসে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Character and conception (চরিত্র ও ধারণাশক্তি) যাদের ভাল, তাদের সাহিত্য আসে।

কেষ্টদা—তারা হয়তো সাহিত্যের ধার দিয়েও যাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরকম লোক দার্শনিক সাহিত্যিক হয়, মানে তাদের দর্শনগুলি যথাযথভাবে narrate (বর্ণনা) করে।

কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের বেলা হয়ে আসে। বেশ গরম লাগছে। কেষ্টদা বললেন—ওঠার সময় হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন ১১টা পর্য্যন্ত থাকি। থাকি আপনার লোভে লোভে। আর, ভাবি যে উঠেই বা কী করব। খেতেও ইচ্ছে করে না, মুখে অরুচি। তার চাইতে এ একটা excursion-এর (প্রমোদচর্য্যার) মত হয়।

কেষ্টদা—আগে তো বেলা ৩টা/৪টার সময় খেতেন।

পণ্ডিতদা—রোজ খেতেন?

কেষ্টদা—হ্যাঁ, দীর্ঘদিন। আমিও যেয়ে দেখেছি। তারপর খাওয়ার সময় ঠিক হ'ল।

এরপর ভিন্ন প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার লেখাগুলি, আমার acquisition-গুলি (অর্জ্জিত বিষয়গুলি) আগে conglomerated হ'য়ে (জমাট বেঁধে) আসে, যেমন ক'রে সুতোর গুটি পাকায়। তারপর আমি তা' কই আপনার কাছে। লেখাগুলি ঠিক আছে?

কেষ্টদা—এ তো অনেকদিন থেকেই established (প্রতিষ্ঠিত)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবুও মাঝে মাঝে ঐরকম মনে হয়।

কেষ্টদা—আগে আগে আপনি বলতেন, মনটাকে vacant (শূন্য) রাখেন, তারপর হঠাৎ বলতে আরম্ভ করেন। কিছু ভাবছেন বলে মনে হ'ত না। যেন কেউ আপনাকে বলে দিল, তারপর বললেন। এরকম হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—'আমি পরমপিতার ছোট ছেলে কিনা! তাই তিনি আমাকে সব বলে দেন।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যই তো ওর উপর আমার কোন control (অধিকার) নেই।

কেষ্টদা—Control (অধিকার) নেই, অথবা fullest control (পূর্ণ অধিকার)।

৩রা চৈত্র, ১৩৬৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১৭।৩।১৯৬০)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ও ছড়াগুলি নিয়ে কথা চলছিল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি ছড়াই লিখি আর যাইই লিখি, সেগুলি আমার দ্বারা tested (পরীক্ষিত)। এসবই আমার experience (অভিজ্ঞতা)।

সন্ধ্যাবেলায় খড়ের ঘরে বসে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে অপরের প্রতি অসৎ আচরণ করে সে কিন্তু নিজের অসৎ চায় না। আমি হয়তো অপরের সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করি, কিন্তু আমার নিজের বেলায় অমন ব্যবহার পছন্দ করি না।

কয়েকদিন আগে শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজীতে একটা বাণী দিয়েছেন। তার মধ্যে আছে, Sperm is ever dominant and ova is dormant always (জন্মের ব্যাপারে সব সময়ে শুক্রকীটের প্রাধান্য থাকে, ডিম্বকোষের স্থান সেখানে গৌণ)। বাণীটি নিয়ে আলোচনা চলছে। ডাঃ বনবিহারীদা (ঘোষ) বললেন— জেনেটিক্স্ এখনও একথা সমর্থন করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই খুঁজে দ্যাখ্ ভাল ক'রে।

বনবিহারীদা কতকগুলি জেনেটিক্সের বই এনে একপাশে বসে দেখছেন। বনবিহারীদার পড়ার দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর স্মিতহাস্যে বললেন—খুঁজে বার করাই চাই। আমি কিন্তু তোমারে একেবারে জ্বালায়ে মারব নে, সহজে ছাড়বনানে।

বনবিহারীদা সলজ্জভঙ্গীতে উত্তর দিলেন—আমি তো আর খারাপ বোধ করি না যে জ্বলব।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রে তো ঐ লেখাটা নিয়ে আমেরিকায় চ'লে গেছে। তাহলে ওকে লিখে দিস্ যে, ঠাকুর বলতে চান Sperm dominating and ova dormant (বীজপ্রাধান্য এবং ডিম্বকোষের গৌণতা), এর support (সমর্থন) নাকি এখনও জেনেটিক্‌সে পাওয়া যায়নি। সেজন্য ওগুলো এখন print ক'রো না (ছেপো না)।

এরপরে প্রসঙ্গান্তরে বললেন—ইলেকট্রিক আলো জ্বালাতে পজিটিভ ও নেগেটিভ দুটি তারই লাগে। কিন্তু নেগেটিভ always changing (সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল), স্থির নয়। যেই পজিটিভের সান্নিধ্য পায় অমনি সে flaming (উজ্জ্বল) হয়ে ওঠে। এই যে পাখী-টাখী উড়ে যায়। একটা তারের উপর বসলে কোনরকমে বেঁচে যায়। কিন্তু পজিটিভ-নেগেটিভ দুটোর ছোঁয়া একসঙ্গে লাগলেই মরে যায়।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—আজকাল আবার অনেক female male (স্ত্রীলোক পুরুষ) হয়ে যাচ্ছে, male-ও female (পুরুষ-ও স্ত্রীলোক) হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর সবগুলি কি ঠিকমত হয়? Defective'ও (খুঁতযুক্তও) তো হতে পারে।

এইসব নিয়ে অনেক রাত পর্য্যন্ত আলোচনা চলল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—দালানের ঐ ঘর কি পরিষ্কার করা হয়েছে?

'হয়েছে' বলা হলে জানতে চাইলেন—তাহলে কবে ঐ ঘরে যাওয়া যাবে?

পণ্ডিত মশাই দিন দেখে দিয়েছেন আগামী রবিবার। সেই কথা বলা হ'ল।

৪ঠা চৈত্র, ১৩৬৬, শুক্রবার (ইং ১৮।৩।১৯৬০)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর পশ্চিমদিকের ছাউনিতে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্লদা (দাস), বীরেনদা (মিত্র), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), অনিলদা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে ছড়া দিচ্ছেন। সেই ছড়াগুলি নিয়ে আলোচনা চলছে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে গরমও বাড়ছে।

কথার মধ্যে একবার শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বৈষ্ণবদের কী একটা গান আছে 'অগতির গতি তুমি, তোমার গতি রাইকিশোরী।'

শ্রীশ্রীঠাকুরের মন বেশ প্রফুল্ল। সাড়ে ন'টার সময় উঠছেন, খড়ের ঘরে যাবেন। উঠে চটি পায়ে দিতে দিতে ছড়ার ঢঙে বলছেন—

ত্রিকুটির ঐ লালিমতেজা
উঠছে যত......

আমি তাড়াতাড়ি খাতা খুলে ঐটুকু লিখে ফেলেছি। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বলছেন—'লিখিস্ নে, লিখিস্ নে' এবং আর বললেনও না। লেখাও আর হল না। কেন যে ঐটুকু বললেন এবং আর বললেন না, তা' জানেন লীলাময় প্রভু।

তারপর উঠে এসে বসলেন খড়ের ঘরে। একটি মা এসে বললেন—ফুলদির ছেলের বসন্ত হয়েছে। ছোট-বড় মিশিয়ে অনেক গুটি উঠেছে। ওর এবার আই-এ পরীক্ষা দেবার কথা ছিল, দিতে পারবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রোগ হলে আর করবি কী?

উক্ত মা—ছেলে সারবে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতাকে ডাক্, পরমপিতাকে ডাক্।

এরপর কেষ্টদা জানালেন—সত্যানুসরণ, নারীর নীতি আর আলোচনা-প্রসঙ্গে ওয়েস্টবেঙ্গল এডুকেশন বোর্ড তাদের লাইব্রেরীর জন্য নিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি যদি শাশ্বতী, সম্বিতী বইগুলির ইংরাজী করতেন, ভাল হ'ত। লাভ হ'ত এই যে, আমি তো আছিই, আপনিও করতেন, বহু বই হয়ে যেত।

কেষ্টদা—আমার করার মধ্যে ভুল থাকতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার যা' কওয়া আছে, সেখানে ভুল হলে আমি টের পেতাম তো!

কেষ্টদা—সত্যানুসরণের হিন্দী, ইংরাজী কয়েকটা সংস্করণ হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যানুসরণ একরকমের বই, আর এগুলি আর একরকমের। এখানে fact (তথ্য)-গুলিকে ভাঙ্গা, discern (সূক্ষ্মভাবে বিচার) করা, তার কারণ নির্দ্দেশ করা, এইসব আছে।

কেষ্টদা—আপনার গদ্যবাণীগুলির মানে বদলানো মুশকিল। কিন্তু ছড়ার মানে বদলানো সোজা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যে তো কই, আমি থাকতে থাকতে আমার সময়ে যদি এগুলি করতেন তাহলে ঐসব সম্ভাবনা কম থাকত। আপনার লেখা শুনে আমার যা' মনে হয় তা' বলতে পারতাম। আপনিও তদনুযায়ী গুছিয়ে ঠিক ক'রে রাখতে পারতেন।

কেষ্টদা—শাশ্বতী ১ম খণ্ডের ইংরাজী করা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সন্ধ্যামন্ত্রের ইংরাজী করা আছে?

কেষ্টদা—তা' নেই, তবে 'মেসেজ'-এ ওর ছায়া আছে। আর বাংলা করা আছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন দালানের হল ঘরটি দেখে আসতে। ঘরে চুনকাম ক'রে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করা হয়েছে। আগামী রবিবার শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ ঘরে যাওয়ার কথা। কেষ্টদা আসার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ওঘর কেমন দেখলেন?

কেষ্টদা—ভালই তো।

এরপর কেষ্টদা উঠে গেলেন।

কাউকে নিয়ন্ত্রিত করতে হলে তার সাথে একান্তে কথা বলা দরকার, এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—কারো মনকে treat (চিকিৎসা) করতে গেলে তদনুযায়ী কুশলকৌশলী ভাষা, ভাব ও ভঙ্গী দরকার। কিন্তু বহুজনের মধ্যে সেটা করা মুশকিল হয়। মানুষকে নিরিবিলিতে পেলে পরে অনেক বিষয় বুঝানো যায়। আর, সময়মত যদি তাকে বলতে পারা না যায়, তাহলে সে হয়তো একটা মিথ্যে রকম গড়ে তুলতে পারে। এই যেমন ওখানে (পাবনায়) অনেক জমি কিনেছিলাম হিন্দু বসাবার জন্য যাতে হিন্দু majority (সংখ্যাগুরুত্ব) বজায় থাকে। কিন্তু কারণটা সকলের কাছে বলতে পারলাম না। সবাই বুঝলও না এর উদ্দেশ্য। ফলে, সবটা নষ্ট হয়ে গেল। তারপর সেই বড় দুর্ভিক্ষের আগে অনেককে বলেছিলাম ধানের জমি কিনে রাখতে। সেই কথা শুনে আশ্রমের যারা জমি কিনে রেখেছিল তারা কেউ দুর্ভিক্ষে মরে নি। কিন্তু পাবনা বা তার আশপাশে বহু লোক মারা গেল।

এরপরে শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের হলঘরের দিকে নির্দ্দেশ ক'রে আমাকে বলছেন—ঐ ঘরে যখন যাব তখন তোরা এই সামনে আস্তানা ক'রে নিবি। আমারে যেন দেখা যায়, অথচ কথাবার্ত্তা না শোনা যায়। পাশেও থাকবি, পেছনের দিকে থাকলেও হয়। তা' না হলে মানুষকে deal করতে (ঠিকমত চালনা করতে) পারি না। এই যে ননীকে ভাল ক'রে deal (চালনা) করতেই পারলাম না। (ননীমা গত পরশু রাগ ক'রে আশ্রম ছেড়ে চলে গেছে)।

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)—ক'রে কী হবে। আমরা যারা বদলাবই না তাদের জন্য চেষ্টা করাই তো বৃথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হজরত মহম্মদের কথা ঠিকই। তিনি বলেছেন, প্রকৃতি বদলায় না। তবুও তোমরা ভাল হও, এই আমার স্বার্থ। সেইজন্যই যা' করার তা' করি। ঐ যে পাবনায় যে চোরটা ছিল তার কিন্তু এক কথাতেই পরিবর্ত্তন হল।

আমি—আমরা তো এখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন আছি। আপনি আমাদের ভাল করার জন্য চেষ্টা করছেন। এবাদে দুনিয়ায় তো আরো কত লোক পড়ে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা পাঁচজন যদি ভাল হও, তোমরা আর পাঁচজনকে ভাল করতে পার। এইভাবে চারিয়ে যেতে পারে।

বিশুদা—কিছুটা ভাল করলেও তো আবার ছেড়ে দিলেই যা' তাই হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো যাবেই। সেইজন্য লেগে থাকা লাগে।

বিশুদা—তাহলে তো জীবনভোর এই কম্ম করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হয়। তার প্রকৃতি পালটে যাবে, এটা তুমি আশা কর কেন? তাকে maintain কর (আয়ত্তে আনতে চেষ্টা কর)।

আজ সন্ধ্যার পর থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক ছড়া দিচ্ছেন। ছড়াগুলি পরিষ্কার ক'রে লেখার পর আবার তাঁকে শোনানো হচ্ছে। শোনার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সেগুলির মধ্যে প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করে দিচ্ছেন। সংশোধন করার পরে আবার তিনি শুনছেন কেমন হ'ল।

এই কাজ করতে করতে ধীরে ধীরে রাত গভীর হয়ে আসে। প্রায় ১০টা বাজে। ভোগের সময় এগিয়ে আসছে। মায়েরা অনেকে এসে বসেছেন। কালীষষ্ঠীমা শটির দই তৈরী করেছেন, খেতেও ভাল হয়েছে। কিভাবে করেছেন সেই গল্প করছেন।

ঐ গল্প শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর কৃষ্ণাকে (শ্রীশ্রীঠাকুরের দৌহিত্রী) ডাকতে বললেন। কৃষ্ণা শ্রীশ্রীবড়মার কাছে ছিল। দাদু ডাকছেন শুনে এলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(কৃষ্ণাকে) এই, কালীষষ্ঠী নাকি শটির দই করিছে। কেমন ক'রে করতে হয় শুনে নে।

কৃষ্ণা কালীষষ্ঠীমার কাছে বসল। কালীষষ্ঠীমা কিভাবে শটির দই পাততে হয় ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর কৃষ্ণাকে বললেন ঐভাবে শটির দই তৈরী করতে।

কৃষ্ণা—চেষ্টা করব। দাদু! আমি শান্তিনিকেতনে একটা সুবিধা পাচ্ছি। ওরা রিসার্চ করার জন্য কয়েকজনকে নেবে। আমি apply (দরখাস্ত) করেছি। যদি ডাকে তো যাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই ঘরে বসে এম-এ পাশ করেছিস্ এইই আমার ভাল লাগে। এখন কিভাবে সংসার ঠিক রাখতে হয় সেইসব শিখবি। বাড়ী ছেড়ে অত দূরে যাওয়া ভাল লাগে না। আর, কলকাতার অবস্থাও ভাল না।

কৃষ্ণা—কলকাতাতেও রিসার্চ করা যায়, কিন্তু স্কলারশিপ পাব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর আর কোন উত্তর দিলেন না। পরে অনেকগুলি ছড়া পর পর বললেন। রাত প্রায় সাড়ে দশটা হল। এবার সবাই প্রণাম ক'রে উঠছেন। ভোগের ব্যবস্থা হতে থাকল।

৫ই চৈত্র, ১৩৬৬, শনিবার (ইং ১৯।৩।১৯৬০)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখের সাথে পুরানো দিনের গল্প করছিলেন। বলছিলেন—ছোটবেলায়, আমি তখন খুব ছোট, বড় বৌও খুব ছোট, ল্যাংটা হয়ে কাপড় বগলে নিয়ে এসে ড্যাপল গাছের তলায় দাঁড়াত, আমি গাছে উঠে পেড়ে দিতাম, ও কুড়াত, খেত। মাঝে মাঝে টক লাগলে মুখ বিকৃত করত (বিকৃত করে দেখালেন। একটু থেমে পরে বললেন—) সেসব কথা মনে হলে, বার্দ্ধক্যের অভিসারে ক্ষান্ত তুমি আজ।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন ভক্তবৃন্দ-পরিবৃত হয়ে। শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) জিজ্ঞাসা করলেন—কমেডি আপনি এত ভালবাসেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sufferings-এর (কষ্টের) পর কমেডি মানুষের ভাল লাগে। যাই লেখ, একটা initial loll (মৌলিক লালসা) যেন থাকে কমেডির উপর।

শৈলেনদা—লিখলাম তো অনেক কিছু, কিন্তু ছাপা না হওয়ায় অপাঙক্তেয় হয়ে থাকল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লেখ। ছাপাবারও কায়দা খুঁজতে হয়। Printing-এর (ছাপার) জন্য কিছু কিছু সংগ্রহ ক'রে রাখতে হয়।

অমূল্য ঘোষদা বর্ত্তমানে প্রেসের ম্যানেজার। তাঁকে বললেন—ওরা যারা বই লেখে সেসব ছাপাবার জন্য একটা 'ফান্ড' তুলতে পারলে ভাল হয়। তুই চেষ্টা কর। আমিও সাহায্য করব। ওর হয়তো কাগজ কেনার ক্ষমতা নেই, কিন্তু যা' লেখে জিনিস ভাল। এই যেমন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) একখানা কেমিস্ট্রির বই লিখেছিল, একেবারে নভেলের মতন। সে wonderful (চমৎকার)। কিন্তু তা' আর বেরোল না। তুই কেষ্টদাকে বলতে পারিস, বই ছাপার চিন্তা আপনাকে করতে হবে না, আপনি আমাকে বই দেন।

অমূল্যদা—কেষ্টদা তাঁর লেখা 'মনের পথে' বইটা পুরানো জিনিস বলে আর ছাপতে চান না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বললে হয়, নতুন ক'রে একখানা লিখে দেন।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ইষ্টানুগ চলনে চলার রীতি সম্পর্কে খুব বড় একটা বাণী দিলেন। বাণী শেষ হ'ল রাত প্রায় ৯টায়। প্রফুল্লদাকে (দাস) বললেন বাণীটি তাড়াতাড়ি যতি-চিহ্নাদি ঠিক ক'রে পরিষ্কার ক'রে লিখে ফেলতে। প্রফুল্লদা একপাশে খাতা নিয়ে বসে লিখছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে খেতে বললেন—আমার একটা রকম আছে। যে কাজ করব ঠিক করি তা' তখনই করা চাই। কাউকে হয়তো একটা কাজের কথা বললাম।

ব'লে 'যা, ওরে যা, এখনই যা, এরকম কই। মানে, ঐ ঝোঁকে এমনভাবে চল যাতে কোন obstruction (বাধা) তোমাদের কাবু করতে না পারে। আগে আমি হাঁটতামও কী, শালা পা-ও ছিল তেমনতর। গোঁসাইবাড়ী থেকে স্টীমারের ফুঁ শুনে ঘাটের দিকে রওনা হলাম। বুঝলাম, স্টীমার ঘাটে ভেড়াচ্ছে। হেঁটে এসে দেখি, তখন স্টীমার থেকে সিঁড়ি ফেলাচ্ছে।

বঙ্কিমদা (রায়)—ওরে বাবা! ও রাস্তার দূরত্ব প্রায় সাড়ে তিন মাইল।

এই সময় গোবিন্দ মালী এসে বলল—বাবা! আমার মনটা বড় এদিক-ওদিক যায়। কিছুতেই ঠিক রাখতে পারি না। কিভাবে আপনার চরণে থাকবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যেমন যেখানেই যাও, খাওয়ার নেশাটা থাকেই, বাহ্যেটা করাই লাগে। ওটা ওরকম ক'রেই ঠিক রাখা লাগে। সব করার মধ্য দিয়েই হাগা-খাওয়ার মত ক'রে ঠিক রাখতে হয়।

বড় দালানের হলঘরটি আগেই পরিষ্কার চুনকাম করা হয়ে গেছে। আজ বারান্দার চুনকাম হয়েছে। এখন লোকজন নিয়ে খগেনদা (তপাদার) সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করছেন। খগেনদা একটু ফাঁক পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। দাঁড়াতে দয়াল রহস্যভরে বললেন—কী খবর রে শম্ভু?

সবাই হাসছেন। কাকে বলা হচ্ছে বুঝতে না পেরে খগেনদা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। ওঁর ঐ অবস্থা দেখে বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) বললেন—আপনাকেই।

এইবার বুঝতে পেরে খগেনদা হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আবার কাজকর্মের প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—কী খবর রে?

খগেনদা—বারান্দার আর দুটো খোপ পরিষ্কার করা বাকী আছে। আর সব হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যেও চৌকি, তোষক সব পাতা হয়ে গেছে।

শুনে প্রসন্নচিত্তে দয়াল বিশুদার দিকে ফিরে বললেন—দাও, আর এক ছিলিম তামুক দাও, খেয়ে উঠি।

৬ই চৈত্র, ১৩৬৬, রবিবার (ইং ২০।৩।১৯৬০)

আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘে ঢেকে আছে। বড় দালানের হলঘরটি চুনকাম ও পরিচ্ছন্ন করা হ'য়ে গেছে। আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ ঘরে যাবেন। দিন দেখা হয়েছে। প্রভাতে তিনি কিছুক্ষণ ছাউনিতে এসে বসলেন। তারপর সাড়ে আটটা বাজতে উঠলেন, হলঘরে যাবেন। ভক্তবৃন্দও সাথে চলেছেন।

হলের মাঝখানে বিরাট চৌকিতে প্রশস্ত শয্যা আগে থেকেই প্রস্তুত করা ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে এসে তা'র উপর বসলেন। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখছেন, বেশ প্রফুল্ল-প্রফুল্ল ভাব।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—এই ঘরের মধ্যে বহু বহু মহাপুরুষ বাস ক'রে গেছেন। কাগজেও বেরিয়েছিল তাঁদের কথা। এখানে ব'সে মনে হ'চ্ছে, আমি তাঁদের সাথেই আছি। এই সব sentiment commemorate (ভাবানুকম্পিতা স্মরণ) করার কথা আমি চিরকালই কই।

আশ্রমের কাজের জন্য ইঁট তৈরী ক'রে পোড়ানো হ'চ্ছে। নতুন পোড়ানো দু'খানা ইঁট নমুনা স্বরূপ এনে খগেনদা (তপাদার) দেখালেন। দেখেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে উঠলেন—বাঃ, বাঃ, দেখেছেন কী চেহারা!

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) হাত দিয়ে দেখে বললেন—হুঁ, ভাল হয়েছে।

এরপর শ্রীজয়দেব-বিরচিত দশাবতার-স্তোত্রের মধ্যে 'বিহিতবহিত্র চরিত্রমখেদম্' কথাটির মানে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কেষ্টদা প্রচলিত বাংলা অর্থ বললেন। তা' শোনার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—বহিত্র মানে যা বহন ক'রে নিয়ে যায়। বিহিতভাবে বহন ক'রে নিয়ে যায় যে চরিত্র, তা' হ'ল 'অখেদম্' মানে ক্লান্তিহীন, আগ্রহ-উদ্দীপ্ত অবিশ্রান্ত অনুবেদনাযুক্ত। এ-রকম চরিত্র নিয়েই অবতারপুরুষ আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন। এমন অনেক ছেলেপেলে আছে না যে, বারণ করলেও কথা শোনে না, সে যেটা করবে তা' করবেই। ঐ হ'ল 'অখেদম্' ভাব।

এরপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ঐ স্তোত্রে কল্কি-অবতারকে 'করাল' বলা হয়েছে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করাল মানে কী দ্যাখ্ তো। কৃ-ধাতু আছে নাকি ওর-মধ্যে?

অভিধান দেখে বললাম, করাল শব্দের মধ্যে কৃ ও অল্ দুটি ধাতু আছে। কৃ মানে করা, অল্ মানে ভূষণ, পর্য্যাপ্তি, সামর্থ্য। পরে লেখা আছে, ওটা কৄ-ধাতুও হতে পারে, তার মানে বিক্ষেপ ও হিংসা।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর যেন আশ্বস্ত হ'য়ে বললেন—ঐ তো ঠিক আছে। করাল মানে active indomitable energetic urge (সক্রিয় অদম্য উদ্যমী সম্বেগ)-ওয়ালা। করার পথে যেসব বিক্ষেপ তা'কে তিনি হিংসা করেন। (একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন) এগুলি ঠিক রাখিস, 'নোট' ক'রে রাখিস, লাগতে পারে।

এরপর একটা ছড়া বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

উদাম ধৃতি-আবেগ নিয়ে
আগ্রহ-আবেগ সমাহারে,
ভজনদীপী উৎসর্জ্জনায়
ভগবত্তা শরীর ধরে।

ছড়াটি ব'লে দয়াল প্রভু বললেন—এগুলো দেওয়ার কারণ হ'ল এই, ভগবান সম্বন্ধে এত কিংবদন্তী চ'লে আসছে যে শেষ পর্য্যন্ত miracle-এর (অলৌকিকত্বের) আশ্রয় নেওয়া ছাড়া মানুষের উপায়ই থাকবে না। আর, আমার এগুলির মধ্যে 'সাইকোলজি'-ও থাকল, 'জেনেটিকস'-ও থাকল। কিরকম? (ব'লে আবার ছড়ায় বলছেন)—

সম্মিলনী জননক্রিয়ার
উর্জ্জী আকুল অভিসারে,
সাম্য হ'য়েও উদাম সম্বেগ
পূত ভ্রূণে নিবাস করে।
নিষ্ঠানিপুণ ভালবাসায়
বিপুল আবেগ নেশার ভরে,
ভজনচর্য্যী অনুবেদনায়
ভগবানকে ধরতে পারে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় এসে বসেছেন। বিকাল ৫টা বাজে। পূজ্যপাদ বড়দা কলকাতায় গিয়েছিলেন। এখন কলকাতা থেকে এলেন। প্রণাম ক'রে বসেছেন। তিনি কলকাতা থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য দু'খানা ইংরাজী ও একখানা বাংলা এ্যাটলাস্ নিয়ে এসেছেন। সেগুলি দেখালেন। তারপর কলকাতার খবরাখবর বলতে লাগলেন।

একটু পরে পূজ্যপাদ বড়দা উঠে বাড়ীর দিকে গেলেন হাতমুখ ধোবার জন্য।

৮ই চৈত্র, ১৩৬৬, মঙ্গলবার (ইং ২২। ৩। ১৯৬০)

চৈত্রমাসের কয়েকদিন হ'য়ে গেল। এখনও গরম বিশেষ টের পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ, আজ কয়েকদিন যাবৎ আকাশ মেঘলা চলছে। রাতের দিকে একটু শীত-শীত ভাব থাকছে।

গতকাল শ্রীশ্রীঠাকুর বহু ছড়া দিয়েছেন। আজ সকালেও বিভিন্ন বিষয়ে আরো কয়েকটি বললেন। প্রতিটি ছড়াই তিনি ভালভাবে হিসাব ক'রে দেখতে বলছেন, নিখুঁতভাবে বুঝে নিতে বলছেন। ঐ প্রসঙ্গে এখন বললেন—একটা জিনিসের যতখানি long (দূর) পারিস চিন্তা করবি। দেখবি পক্ষে বা বিপক্ষে কী কী থাকতে পারে এর মধ্যে। সেটা কিন্তু apt (যথাযোগ্য) হওয়া চাই। তা' না হ'লে লোকে পাগল ক'বে। একটা মানুষকে বিচার করতে হ'লেও ঐরকম সবদিক দেখা লাগে। (তারপর ছড়ায় বললেন)—

তীক্ষ্ণ কঠোর দৃষ্টি দিয়ে
বোধবিবেকের সন্দীপনায়
বাস্তবে যা' দেখিস্ ও-তুই,
আন্ তাহাকে নিরূপণায়।
নিটোল যখন নিরূপণা
বাস্তবে ফোটে সব মিলিয়ে,
ব্যবস্থা তেমন করবি সেথায়
বিবেচনার ধীটি দিয়ে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরে সমাসীন। একটি ছড়া দিয়েছেন—

পিতামাতার যুক্ত মিলন
ইষ্টেই হয় রূপায়িত,
নিষ্ঠাচর্য্যার রাগদীপনায়
অন্তর হয় মুখরিত।

একটু পরে ডাঃ বনবিহারীদা (ঘোষ) এসে বসতে তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ছড়াটা ভাল ক'রে দেখে ঠিক কর।

বনবিহারীদা এগিয়ে এসে ছড়াটি পড়ছেন এবং ভাবছেন। পরে জানতে চাইলেন পিতামাতার যুক্ত মিলন ইষ্টে রূপায়িত থাকাটা কেমন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর দিলেন—আমি বলতে চাই, attributes of fatherhood and motherhood are united in the ইষ্ট (পিতৃগুণাবলী ও মাতৃগুণাবলী ইষ্টে সম্মিলিত থাকে)। Heart of the people becomes exposed through adhered love service to Him (ইষ্টে সুনিষ্ঠ সেবাচর্য্যার ভিতর দিয়ে মানুষের অন্তর বিকশিত হ'য়ে ওঠে)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্যটা ঠিকমত বোঝার পরে বনবিহারীদা বললেন—তাহলে প্রথম দুটি লাইন এইভাবে করলে কেমন হয়—

পিতামাতা যুগ্মভাবে
ইষ্টে থাকেন রূপায়িত,

তারপরের দুই লাইন ঠিকই আছে—

নিষ্ঠাচর্য্যার রাগদীপনায়
অন্তর হয় মুখরিত।

বনবিহারীদা যেভাবে বললেন—ঐভাবে সমস্ত ছড়াটি কয়েকবার প'ড়ে শোনালেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। শুনতে শুনতে তাঁর আননমণ্ডল স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

মনে হ'ল, ছড়াটি তিনি এইভাবেই বলতে চাইছিলেন। আদরভরা কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—বাঃ বাঃ, ধন্য বনবিহারী ধন্য!

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার ঢং-এ সবাই হাসছেন। এর পর দয়াল আবার রঙ্গচ্ছলে বলছেন—আস বনবিহারী, একটু প্রস্রাব ক'রে নিই এই ফাঁকে।

রোজ সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের মধ্যেই খানিকক্ষণ হাঁটাচলা করেন। এখন বাথরুম থেকে এসে বিছানায় বসেই বলছেন—আজ তো আর হাঁটলাম না রে!

বঙ্কিমদা (রায়) ও বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন। দু-হাত দিয়ে ওঁদের দু'জনকে ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে গাইতে লাগলেন তাঁর প্রিয় গান 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা......'। ঘরের মধ্যেকার প্রশস্ত চৌকিখানির চারপাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে হাঁটছেন দয়াল ঠাকুর। মুখে তাঁর ঐ মধুর সঙ্গীত......'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।'

কয়েকবার এইভাবে হাঁটার পর শ্রীশ্রীঠাকুর শয্যায় এসে উপবেশন করলেন। তারপর বললেন—আমি যেসব কথা কই সেগুলিতে চোর বা সাধু সবাই interested (অন্তরাসী) হয়, তাই না?

উপস্থিত সকলেই একথা সমর্থন করলেন। দয়াল তারপর আবার বললেন—সমস্ত মানুষকে তিন রকমে ভাগ করা যায়—সৎ, মাধ্য আর কালঙ্কী। আর, যারা প্রতিলোমের সৃষ্টি করে তারা কিন্তু এর মধ্যে কিছু না। তারা একেবারে অপসদ।

কথায়-কথায় রাত দশটা বেজে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের সময় এগিয়ে আসছে। কিন্তু না, তাঁর ওঠার কোন লক্ষণ নেই। একবার তামাক খেয়ে ছড়া বলতে আরম্ভ করলেন। নিষ্ঠা, প্রীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলি ছড়া দিলেন রাত ১১-৪০ মিনিট পর্য্যন্ত। এই সময় হঠাৎ 'কারেন্ট' চ'লে গেল। সমস্ত আলো নিভে গেল। আশ্রমকর্ম্মীরা তাড়াতাড়ি আশ্রমের 'জেনারেটর'টি চালু করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু জেনারেটর মেশিনটি খারাপ থাকায় শীঘ্র চালু করা সম্ভব হ'ল না।

হেরিকেনের আলো নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসে বসলেন। ভোগের ব্যবস্থা করার উপক্রম করতেই তিনি বললেন—আলো আসুক, তারপর খাব।

কর্ম্মীরা একথা শুনে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন মেশিন ঠিক করার। রাত ১২টা বেজে গেল, ১টা বেজে গেল। শেষে রাত ২টার সময় মেশিন ঠিক হল। আলোগুলি জ্বলে উঠল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর ভোগ গ্রহণ করলেন। ভোগের পর আরো কতকগুলি ছড়া ব'লে রাত আড়াইটার পর দয়াল প্রভু শয্যাগ্রহণ করলেন।

৯ই চৈত্র, ১৩৬৬, বুধবার (ইং ২৩।৩।১৯৬০)

গত রাতে বেশ খানিকটা বর্ষা ও বাতাস হয়ে গেছে। সেজন্য আজ সকালে শীত-শীত ভাব আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণের ছাউনিতে এসে বসেছেন।

বরাহনগর থেকে একটি দাদা এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে। প্রণাম ক'রে ব'সে হাত জোড় ক'রে বলছেন—আমরা মুখ্যু, অজ্ঞান, অন্তরে ভক্তির অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার চেয়ে মুখ্যু কেউ আছে কিনা জানি না।

উক্ত দাদা—যখন শৈলেনবাবুর মুখে শুনলাম আপনার ৫ লক্ষ শিষ্য, তখনই ভাবলাম কত বড় আপনি। আজকাল ২০০০ ভোট যে পায় তাকেই আমরা বড় মনে করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর হালকাভাবে জবাব দিলেন—শিষ্য কী! যারা আমাকে ভালবাসে তারা আমার কাছে থাকে। এই আর কি!

আরো কিছুক্ষণ বসার পর উক্ত ভদ্রলোক বিদায় গ্রহণ করলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ কয়েকটি ছড়া ও বাণী দিলেন। পরে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বড় খোকার মধ্যে তিনটা জিনিস খুব আছে, শাসন, পরিচর্য্যা আর পরিপালন। এই তিনটি সব সময় active (সক্রিয়) থাকে। এৎফাঁক খোঁজে কেমন ক'রে কাকে পরিপালন করা যায়।

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর বিশেষ ভাল বোধ করছেন না। স্নানের আগে অনেকক্ষণ ঘুমালেন। ঘুম থেকে ওঠার পরে দেখা গেল তাঁর ডান চোখটা বেশ লাল হয়েছে। সাড়ে এগারোটায় স্নান করতে উঠলেন।

বিকালেও তাঁর চোখের লাল ভাবটা আছে। ডাঃ প্যারীদা (নন্দী) চোখে ওষুধ দিয়ে দিলেন। তারপর একটি ছড়া দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

প্রীতির ধাপ্পাবাজি নিয়ে
করতে বিভব আত্মসাৎ
দুর্দ্দৈব যা' করছ সৃষ্টি—
তোমাতেও তা' হানবে আঘাত।

শরৎদা (হালদার) যাজনকার্য্যে কলকাতায় গিয়েছিলেন। এইমাত্র আশ্রমে এসে পৌঁছলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসতে দেখেই একজন বললেন, শরৎদা এসেছেন। শুনেই শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে আদরভরা ডাক দিলেন—কনে (কোথায়)? শরৎদা হাসিমুখে সামনে এগিয়ে এসে বললেন—এই যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাক, আইছেন ভাল হইছে।

এরপর শরৎদা আভূমি প্রণাম নিবেদন ক'রে বসলেন। কাজকর্ম্মের প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন হ'ল?

শরৎদা কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন, সেসব জায়গায় সভা-সমিতি ও অধিবেশনাদি কেমন হ'ল সেই সব গল্প করতে লাগলেন। গল্পের শেষে বললেন—নিজেদের কাগজ (দৈনিক সংবাদপত্র) যদি থাকে তবে প্রচারের কাজ আরো ভালভাবে হতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো ইচ্ছেই ছিল ৪ খানা কাগজ বের করা—বিহারে ১ খানা, কলকাতায় ১ খানা কি ২ খানা, আর এলাহাবাদ থেকে ১ খানা।

শরৎদা—এবার প্রফুল্লকে এক জায়গায় invite ক'রে (ডেকে) নিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বলতেই দিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য আমি কই, যেখানে আপনাদের বিশেষত্ব নেই, সেখানে না যাওয়াই ভাল।

এর পর অনেকগুলি ছড়া বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ভক্তগণ অনেকে এসে বসেছেন। ছড়া দেবার ফাঁকে ফাঁকে কথাবার্ত্তাও চলছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। সন্ধ্যা গড়িয়ে ৭টা বেজে গেছে।

৭-২০ মিনিটে একটি ছড়া দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

সুষ্ঠু সুন্দর সেবাচর্য্যা,
সত্তাপোষী আদান-প্রদান,
আপৎকালে পরিচর্য্যা—
সৎ-অন্তরের শুভ আধান।

বলে বললেন—কেষ্ট ঠাকুরের ঐরকম ছিল প্রতিটি step-এ (পদক্ষেপে)। সেই যে মথুরায় যেয়ে কুব্জার সঙ্গে প্রেম করল। তাতেই কংসবধ করা সহজ হয়েছিল।

কেষ্টদা সেকথা সমর্থন করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন যেন তখন মথুরায় বিচরণ করছে। বললেন—'কুব্জা কিন্তু অনেক সাহায্য করেছে।' তারপর আবৃত্তির ঢং-এ বলতে লাগলেন 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকের সেই বিখ্যাত অংশটি—

"অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল,
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল।
তুমি লজ্জাহীন, তোমারে কি লজ্জা দিব!
সম তব মান-অপমান,
নহে ক্ষত্র হয়ে কহ, কৃষ্ণ, ক্ষত্রিয়-সদনে,
পরাজয়-ভয়ে রণে হও পরাঙ্মুখ!
নিন্দাস্তুতি সমান তোমার,

কি হইবে রুষ্ট কথা কয়ে?
কিন্তু নাম ধর ভক্তাধীন,
কায়মন-প্রাণ অর্পণ করেছি রাঙ্গা পায়,
তথাপি যদ্যপি তুমি না বুঝ বেদনা,
রণস্থলে, দেবতামণ্ডলে
উচ্চকণ্ঠে করিব প্রচার—
নহ তুমি লজ্জানিবারণ!
নহ কভু ভক্তাধীন!
নহে কেন কর হতমান?
হলে কণ্ঠাগত প্রাণ—
কৃষ্ণনাম আর না আনিব মুখে!

একটানা এতখানি আবৃত্তি ক'রে থামলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সে কী বাচনভঙ্গী! স্বরক্ষেপণের কী যথামাত্রা আরোহ-অবরোহ! পরে বলছেন—আমি এখনও তো কইতে পারলাম। গলা ঠিক আছে তাহলে। Choked হয়ে (ধরে) যায় নি তো?

সবাই বলছেন—না, খুব সুন্দর হয়েছে। শিশুর সরলতা-মাখানো হাসি হেসে দয়াল বললেন—আমি থিয়েটার করলেও পারতাম, না? অবশ্য কোনদিন করি নি।

কেষ্টদা—আপনি নিজে করেন নি। কিন্তু যাত্রার দলের বই-টই লিখে দিতেন। তার কিছুটা ব্রজগোপালদা (দত্তরায়) তাঁর বইতে ছাপিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একবার সেই শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটার দেখে আমার যা' মনে হয় তা' আপনাকে বলেছিলাম।

কেষ্টদা—হ্যাঁ, সেই আলমগীরের অভিনয় দেখে আপনি বললেন, অভিনয় হচ্ছে খুব সুন্দর, কিন্তু mathematical (অঙ্কের মত হিসাব ক'রে ক'রে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভিনয়ে sentiment aroused (ভাবানুকম্পিতা জাগ্রত) হওয়া চাই।

কেষ্টদা—আমি দানীবাবুর চাণক্যের অভিনয়ও দেখেছি। কিন্তু এখানে প্রথমবার মণি (শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যম পুত্র—শ্রীবিবেক রঞ্জন চক্রবর্তী) ঐ পার্ট যা' করল, অতি সুন্দর! আপনিও দেখেছেন। শিশিরবাবু কোন কোন জায়গায় দানীবাবুর থেকে ভাল করলেও দানীবাবু অপূর্ব্বসুন্দর! আপনি বোধ হয় চণ্ডীদাসই শেষ দেখেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মার সাথে চণ্ডীদাস দেখেছিলাম। সেই শেষ। তারপরে আর কিছু দেখি নি।

এরপর পুরাতন স্মৃতি রোমন্থন ক'রে কেষ্টদা বললেন—শিশিরবাবু আমার বাবার ছাত্র ছিলেন। আমি আর উনি একসঙ্গে প্রফেসরি করেছি। ছোটবেলায় এক পাড়ায়

থাকতাম। তারপর বিদ্যাসাগর কলেজে যখন আমি প্রফেসর হয়ে গেলাম, উনিও ওখানে প্রফেসর হয়ে এলেন। ২৩ বছর বয়সে আমি প্রথম প্রফেসর হই। যেদিন প্রথম ক্লাসে গেলাম, আমার অল্প বয়স দেখে ছেলেরা পা ঘসতে লাগল। আমি সেদিক নজর না দিয়ে পড়াতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি, ওসব থেমে গেছে। পরদিন থেকে আর কিছু হয় নি। বর্ত্তমানে সিনেমার best actor (শ্রেষ্ঠ অভিনেতা) চুনী গোস্বামী আমার ছাত্র। ওর এখনকার নাম ছবি বিশ্বাস।

১৩ই চৈত্র, ১৩৬৬, রবিবার (ইং ২৭। ৩। ১৯৬০)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণে ছাউনিতে যেয়ে বসেছিলেন। বেলা সাড়ে ৯টার সময় উঠে এসে বসলেন বড় দালানের বারান্দায়। চৈত্রের মাঝামাঝি হ'লেও আজকাল সকালে বেশ শীত-শীত ভাব থাকে।

ভক্তবৃন্দ অনেকে আছেন। শরৎদার (হালদার) দিকে তাকিয়ে পরম দয়াল বললেন—আপনার সাথে মাঝে-মাঝে 'প্রাইভেট' কথা হওয়া দরকার। সবদিক দেখেশুনে ঠিকঠাক করা লাগে।

তারপর ছড়া বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

সূর্য্যের আলো আসে যখন
তার সাথেতেই শয্যাত্যাগ
ক'রে করিস সে-সব কর্ম্ম
যাতে সুস্থ স্বাস্থ্য-যাগ।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর মাথা ভার বোধ করছেন। সন্ধ্যার আগে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন।

সন্ধ্যার পর একটু সুস্থ বোধ করছেন। শরৎদার সাথে কথাপ্রসঙ্গে বলছেন—এই যে সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিটি সৃষ্টিই এক একটি বিশেষ একক, ঈশ্বরই মানুষ, জগৎ সব কিছু হয়েছেন। কিন্তু সব মানুষই সমান নয়। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বিশেষত্ব আছে।

শরৎদা—বৈষ্ণবরা শ্রীকৃষ্ণকে বলেন বিভু-চৈতন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিভুচৈতন্য মানে হওয়ার চৈতন্য। সব কিছু হয়েছেন তিনি।

শরৎদা—তাহ'লেও জীবের সাথে তাঁর তো ভেদ আছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভেদ হ'ল ঐ হওয়ার ভেদ।

শরৎদা—জীব কখনও তিনি হতে পারে না, এ ভেদ থেকে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য চৈতন্যদেবের কথা আছে, জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। কিন্তু প্রতিটি জীবই তার তার রকমে আলাদা। ঈশ্বর এক, তাই, প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই আছে এককত্ব, যা' তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শরৎদার সাথে একটু কথা বলতাম।

তাঁর ইচ্ছা বুঝতে পেরে আমরা সবাই দূরে সরে গেলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদার সাথে নিভৃতে কথা বলতে লাগলেন।

১৪ই চৈত্র, ১৩৬৬, সোমবার (ইং ২৮।৩।১৯৬০)

সকাল ৯টা। শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় সমাসীন। পূজ্যপাদ বড়দা এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সাথে কিছুক্ষণ প্রাইভেট কথা বললেন। তারপর বড়দা উঠে গেলেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। কাছে লোকজন বিশেষ নেই। হরিপদদা (সাহা) একটা তোয়ালে নেড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে মাছি তাড়াচ্ছেন। বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) তামাক সেজে এনে দিলেন। তামাক খেতে খেতে আনমনে প্রভু বলছেন—সামনে কন্‌ফারেন্স আসছে। এখন খাড়া থাকতে পারলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর ভাল বোধ করছেন না। কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন।

হাউজারম্যানদা আমেরিকায় গেছেন। সেখান থেকে প্রায়ই চিঠি লেখেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। চিঠিগুলি আগ্রহভরে শোনেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তারপর তাঁর নির্দ্দেশমত উত্তর লিখে দেওয়া হয়। এখন বলছেন—রে-এর চিঠি তো আর আসে না।

বঙ্কিমদা (রায়) তাঁর বরতনু মৃদু মৃদু কাঁপিয়ে দিচ্ছেন। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লেন দয়াল প্রভু। ঘুমালেন বেলা প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত। তারপর উঠে স্নানাহার সম্পন্ন করলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর হলঘরের সম্মুখস্থ বারান্দায় প্রশস্ত শয্যায় সমাসীন। চাকদা থেকে আশুদা (দত্ত) ও তাঁর ছেলে অতীশ এসে প্রণাম করলেন। কিছুদিন আগে আশুদার স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁদের কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করার পরে আশুদা জানতে চাইলেন—মৃত্যুর পরে আত্মাগুলি কোথায় থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বায়ুভূত নিরাশ্রয় অবস্থায় থাকে। আবার যখন যেখানে tuned হয় (একসুরে বাঁধা পড়ে) তখন সেখানে ফিরে আসে। এ তো জানই। এ বিষয়ে আমার ঢের ঢের কথা কওয়া আছে।

আশুদা—সেখানেও কি sphere (স্তর) আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানেও যেমন sphere আছে, সেখানেও সেইরকম। এখানে কি সব একরকম?

আশুদা—এই যে মহাশূন্য, এর মধ্যেই কি তারা বিচরণ করছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, যেমন আমেরিকায় কোন কথা হলে সেটা ইথার-তরঙ্গের মধ্যে থাকে। এখানে বসে রেডিওর কোন বিশেষ ওয়েভ্-এ তুমি সেটা শুনতে পাও।

এই সময় অতীশ জিজ্ঞাসা করল—ঠাকুর! মার যে বড় সাধ ছিল আমি পাশ করব। আমি যদি পাশ করতে পারি, মা দেখতে পাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাবে না কেন? তোর ভিতরে মায়ের ভাব আছে তো?

আবার পূর্ব্ব সূত্র ধরে আশুদা জিজ্ঞাসা করলেন—শুনতে পাই, প্ল্যানচেট করে, নানারকম ভাবে আত্মা নামিয়ে নিয়ে আসে, এসব কথা কি সত্যি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব হল ভাববৃত্তি। ভাববৃত্তি-দেবতার কথা সন্ধ্যামন্ত্রের মধ্যে আছে।

আশুদা—হরেন বোস মারা যাওয়ার পরে আপনি একদিন বললেন, ঐ যে হরেন যাচ্ছে। মহারাজ সম্বন্ধেও ঐরকম কথা বলতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই ভাব। ভাব হল ভূ-ধাতু থেকে, মানে হওয়া। ভাবটা অবাস্তব কিছু না। ওটা fact (বাস্তব তথ্য)। কোন বিষয়ের ভাব আমার মধ্যে থাকতে পারে। আমি সেই ভাবে ভাবিত হয়ে উঠি। তখন সেই ভাবের material conglomeration (বাস্তব-ভিত্তিক জমাট-বাঁধা অবস্থা) ঐরকম দেখাতে পারে।

আশুদা—ভাব তো একটা idea (ধারণা)। তার দ্বারা মানুষ অভিভূত হয়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Idea (ধারণা) হলেও সেটা fact (বাস্তব)। আর, ভিতরে ভাব জাগা মানে ভাবান্বিত হয়ে যাওয়া। সেটা অভিভূতি নয়।

আশুদা—(ছেলেকে দেখিয়ে) ওর মা মারা যাওয়ার পর কিছু ভাল লাগত না। একদিন চুপচাপ বসে আছি। মেয়ে এসে একখানা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত দিয়ে বলল, বাবা, এটা পড়ুন। পড়তে পড়তে দেখলাম, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা লেখা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে কামিনী-কাঞ্চনে যদি absorbed হয়ে (ডুবে) যাও তাহলে higher idea-গুলি (উচ্চতর চিন্তাগুলি) আর আসবে না। কামিনী আছে, কাঞ্চনও আছে, তুমিও আছ। ওগুলিকে তুমি ইষ্টসেবায় লাগাও। এই হ'ল কথা। যেমন সন্ন্যাস মানে অনেকে মনে করে গৃহত্যাগ করা। তা' নয়কো। সন্ন্যাস মানে ইষ্টে সম্যকপ্রকারে ন্যস্ত হওয়া যার ফলে তুমি বাঁচতে পার, বাড়তে পার।

আশুদা—তাহলে তো ওরকম ত্যাগের প্রশ্ন আমাদের থাকাই উচিত নয়।

আশুদার ঐ ভাব যেন এক ঝট্‌কায় উড়িয়ে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দূর, ত্যাগ! ত্যাগ করার ধান্ধা নিয়ে চলতে থাকলে তোমার মন ছোট হয়ে যেতে পারে।

কথায়-কথায় রাত হয়ে যায়। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সেই চোরটির কাহিনী বলছিলেন, যে তাঁর সংস্পর্শে এসে সম্পূর্ণ শুধরে গিয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে চুরি করার পরদিন চোরটি ধরা পড়ে। রাস্তায় সবাই তাকে গালি দিচ্ছে, মারছে। এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। চোরটির ব্যাপারে তিনি সহানুভূতি-ভরা কণ্ঠে বললেন, ও গরীব মানুষ। ও ভিক্ষে চাইলেও তো টাকা-পয়সা দিয়ে আমরা ওকে সাহায্য করব না। পেটের জ্বালায় ও চুরি করতে গেছে। এরকম কথা শুনে চোরটির মনে আসে এক বিরাট পরিবর্ত্তন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলে চলেছেন, রাতে ও কিছু বাসনপত্র নিয়ে আমার কাছে এলো। সামনে রেখে কয়, এই ক'খানা আছে, আর সব বিক্রী ক'রে ফেলেছি। আপনি যদি দয়া ক'রে ফিরিয়ে নেন। কিন্তু আমি তা' নিলাম না। বললাম, তুই রেখে দে। নিলাম না এইজন্য যে, তাতে ওর একটু satisfaction (সন্তুষ্টি) আসবে, বুকের জ্বালাটা কমে যাবে।

১৫ই চৈত্র, ১৩৬৬, মঙ্গলবার (ইং ২৯। ৩। ১৯৬০)

আজ সকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর খারাপ বোধ করছেন। প্রাতে বারান্দায় যেয়ে কিছুক্ষণ বসার পর ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন। ক্লান্ত দেহে ধীরে ধীরে ঘুম এসে গেল। সকাল সাড়ে নয়টার পর একবার উঠে বাথরুমে গেলেন। তারপর আবার এসে শুয়ে পড়লেন। উঠলেন বেলা সাড়ে এগারটায়। তারপর স্নানাহার ক'রে আবার বিশ্রাম করলেন।

বিকালে ঘুম থেকে উঠেও অস্বস্তি বোধ করছেন। কথার সুরে ক্লান্তি মেশানো। তাঁর কাছে লোকজনের ভিড় যাতে বেশী না হয় তার জন্য ডাক্তাররা তৎপর। শ্রীশ্রীঠাকুরের মাথা ভার, প্রেসার ১৭০।

সন্ধ্যার পরে একটু ভাল বোধ করছেন। আজ আমেরিকা থেকে হাউসারম্যানদার চিঠি এসেছে। হাউসারম্যানদার চিঠি এলেই শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে সবটা শোনেন, এবং যে উত্তর লিখতে হবে তাও বলে দেন। এখন সেই চিঠিটি তাঁর কাছে পড়লাম। চিঠির মধ্যে একজায়গায় আছে, হাউসারম্যানদা আমেরিকায় একজন অদ্ভুত লোকের সন্ধান পেয়েছে। সে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করে শুধু রোগীকে স্পর্শ ক'রে। হাউসারম্যানদার মা বহুদিন যাবৎ হচ্‌কিন্‌স্‌ রোগে ভুগছেন। হাউসারম্যানদার ইচ্ছা মাকে দেখাবেন সেই লোকটিকে দিয়ে।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—লিখিস্‌, এইসব লোককে ভগবান পাঠান। আবার, শয়তানও তাকে অনুসরণ করে। ভগবান অনেক কিছু করেন, কিন্তু শয়তানও কম

juggler (যাদুকর) না। (একটু থেমে) বেশ কায়দা ক'রে লিখিস্, ও যেন আবার বুঝতে না পারে যে দেখাতে বারণ করেছি।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর শুয়ে পড়লেন। বেশীক্ষণ শুতে পারলেন না, আবার উঠে বসলেন। কিন্তু চোখ ক্লান্ত। কিছু পরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙ্গল রাত এগারটায়। তারপর হাতমুখ ধুয়ে ভোগ গ্রহণ করলেন।

১৬ই চৈত্র, ১৩৬৬, বুধবার (ইং ৩০।৩।১৯৬০)

আজ সারাদিন শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক ভাল আছেন। সারাদিনে অনেকগুলি ছড়াও দিয়েছেন। রাত আটটার পরে আবার কষ্ট সুরু হ'ল। শয়ন করতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। আবার উঠে বসলেন। বলছেন—আগে এরকম ছিল না। এখন শুলেই কষ্ট হয়। শুয়ে থাকতে পারি নে।

এই সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—কিছুদিন ঐ গানটা গাইতাম 'সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে গো পড়ে মনে'। (একটু পরে) রামদাস-শিবাজী বইয়ের মধ্যে যেখানে রামদাসের উক্তি আছে, সেখানে একজায়গায় আছে 'কিন্তু সব কথা রাখিবে গোপন'।

কেষ্টদা—হ্যাঁ

"......কাজে তারে লাগাইবে,
পাইবে বাজারী অগণন,
সব কথা রাখিবে গোপন।"

ঘরের মধ্যে একটা গুমোট ভাব। অসংখ্য মশার গুনগুনানি। শ্রীশ্রীঠাকুরের দুপাশে দুজন দাঁড়িয়ে তোয়ালে নেড়ে মশা তাড়াচ্ছেন। উপরে সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ফ্যানটা খোলা যায় না?

একজন যেয়ে তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে পাখা চালিয়ে দিলেন। পাখাটা খুলে দেবার পর ঘরের মধ্যেকার গরমটা কমে এল। তিত্তিরিদি এসে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড়-বৌ কী করছে রে?

তিত্তিরিদি—শুয়ে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাছে কে কে আছে?

তিত্তিরিদি—অনেকে আছে—ধীরেনদা, পিরু, কৃষ্ণা, অমিয়াদি, কিরণদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ কি দিয়ে খাইছিলি?

তিত্তিরিদি খাওয়ার ফিরিস্তি দিল।

শুনে দয়াল ঠাকুর বললেন—ভাল। রেণুর আবার হার্টের ব্যথা হয়েছে।

কেষ্টদা—হৃদবল (শ্রীশ্রীঠাকুরের বিধানে প্রস্তুত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ) নাকি ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও খেয়ে নাকি ভাল হয়ে গিয়েছিল।

কেষ্টদা—বনবিহারী, গোকুল, সবাই কয় হৃদবল খুব ভাল।

এরপর কথায়-কথায় কলকাতার থিয়েটারের কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমিও সারারাত জেগে স্টারে থিয়েটার দেখেছি। ভোর হয়ে গিয়েছিল। কী বই তার নাম মনে নেই। তাতে তারাসুন্দরী অভিনয় করেছিল।

একটু আগে আজকের খবরের কাগজগুলি এসে পৌঁছেছে। কাগজ দেখছিলাম। একটা নতুন ধরনের ভয়েস রেকর্ডিং যন্ত্রের কথা কাগজে বেরিয়েছে। সেটা প'ড়ে শোনালাম শ্রীশ্রীঠাকুরকে।

শোনার পরে দয়াল ঠাকুর বলছেন—আমরা যে-যুগে জন্মেছি তাতে এই সব খুব দেখলাম। কিন্তু, আমি পৃথিবী নিয়েই কচ্ছি, এমন একজন মানুষ দেখি না, যার কাছে গেলে মনে হয় স্বর্গের কাছে এসেছি, যা' কোনদিন দেখিনি সেই দেবতা দেখলাম। দেখেছেন ওরকম all-round adjustment-ওয়ালা (সবদিকে সামঞ্জস্য-ওয়ালা) লোক—সেই আগেকার দিনে যা' জন্মাত?

কেষ্টদা—যন্ত্রেরই উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু উন্নত মানুষ ক্রমেই কমে যাচ্ছে।

রাত সাড়ে দশটা বাজে। নানা কথা চলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে একেবারে চুপ ক'রে আনমনা হয়ে থাকছেন। কী যেন ভাবছেন। হঠাৎ একসময় বললেন—দ্যাখ, আমার এই dictation-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার experience (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন disaster-এ (বিপর্য্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই, আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে disaster-এ (বিপর্য্যয়ে) নষ্ট না হয়।

আমি বললাম—আমার ঘরে গোদরেজ আলমারিতে ত সব বাণীরই একটা করে কপি আছে। তা ছাড়া একপ্রস্থ বড়দার ওখানেও পাঠিয়ে দিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে সুবিধা হবেনানে।

আমি—তাহলে কোথায় রাখলে ভাল হয় আপনি যদি বলে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা ঐ জাতীয় কোন জায়গায়।

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)—সেখানে থাকলেও কেউ নিয়ে পড়তে পারে। দরকার হলে ছাপিয়েও দিতে পারে। তখন আর আমাদের কিছু করার থাকবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অথবা একেবারে সবশুদ্ধ রে-এর (হাউসারম্যান) ওখানে পাঠিয়ে দিলে হয়।

আমি—কিন্তু disaster (বিপর্য্যয়) থেকে তা'রা যে বেঁচে যাবে তার নিশ্চয়তা কী! এক হতে পারে, গ্রামাঞ্চলে কোন নিষ্ঠাবান সৎসঙ্গীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ভাল হয় না।

বিশুদা—তাছাড়া আজ যে ভাল সৎসঙ্গী আছে, পাঁচ বছর পরে যে সে তেমন থাকবে তারই বা নিশ্চয়তা কী!

আমি—Disaster-টা (বিপর্য্যয়টা) কেমন আকারে আসতে পারে জানি না, এগুলি যেখানেই রাখা যাক, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলে হয়ত তার মধ্যে বেঁচে যেতেও পারে। কিন্তু বোমার আঘাতের মধ্যে পড়লে বাঁচানো মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর চিন্তান্বিতভাবে বললেন—হুঁ। তারপর আমি বললাম, তাছাড়া আমাদের resisting power-ও (প্রতিরোধ শক্তিও) এমন কিছু শক্ত না।

এই কথা প্রবলভাবে সমর্থন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর মাথা নেড়ে বললেন—না, না।

একটু পরে আবার বললাম—এগুলি কোথায় কিভাবে রাখলে ভাল হয় এ সম্বন্ধে শরৎদা (হালদার) হয়তো বলতে পারেন। উনি তো অনেক জায়গায় ঘোরেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, শরৎদা ওরা যদি করে তাহলে হতে পারে।

আমি—শরৎদাকে ডাকব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাকলে হয়।

শরৎদা খবর পেয়ে এসে বসলেন। তাঁকে বলছেন দয়াল ঠাকুর—দ্যাখেন, যদি কোন বিপর্য্যয় আসে, সে সময় আমার এই dictation-গুলি (বাণীগুলি) যাতে নষ্ট হয়ে না যায়, তার জন্য কোন এক জায়গায় সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয়।

শরৎদা—এর সব চাইতে ভাল উপায় হল, এগুলি print করা (ছেপে ফেলা)। Printed (মুদ্রিত) অবস্থায় কয়েক শত কি কয়েক হাজার কপি যদি থাকে তাহলে আর হঠাৎ সবগুলি কপি নষ্ট হয়ে যেতে পারবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো আর এখন পারছেন না।

বঙ্কিমদা (রায়) এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে এখন বললেন—কেন পারা যাবে না? আমি সবটার দায়িত্ব নিচ্ছি। (তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন) দাও, আমার হাতে দাও সব। কারো সাহায্য লাগবে না। ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়েই বলছি, আমি কাল থেকেই সবটা ছাপাবার ব্যবস্থা ক'রে দেব।

ওঁর আরো কিছু জোরাল কথাবার্ত্তার পর ঠিক হল—কাল থেকে আমরা বাণীগুলি শরৎদার কাছে দিতে থাকব। শরৎদা ওগুলিতে আর একবার ভাল ক'রে চোখ বুলিয়ে দিলেই বঙ্কিমদা ছাপার কাজ শুরু ক'রে দেবেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বিশুদাকে বললেন—তাহলেও তুই সবগুলি আলাদাভাবে টাইপ ক'রে রাখ্।

বিশুদা কাল থেকেই টাইপ করার কাজ শুরু করবেন বললেন।

১৭ই চৈত্র, ১৩৬৬, বৃহস্পতিবার (ইং ৩১।৩।১৯৬০)

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের হলঘরে সমাসীন। ভক্তবৃন্দ অনেকে উপস্থিত। কথাবার্ত্তা চলছে। মাঝে-মাঝে ছড়া দিচ্ছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। একসময় সুধীর বসুদা জিজ্ঞাসা করলেন—মেরী ম্যাগডালিন যীশুর ভক্তদের শিরোমণি ছিলেন, একথা তো ঠিক। কিন্তু তিনি কি সতী ছিলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে আমাদের আছে 'অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা। পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্'।

তার মানে, তারা অত অকাম ক'রেও শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রের উপর ছিল নিষ্ঠাপরায়ণা। আর, তাইই হল তাদের উদ্ধারের উপায়।

সুধীরদা—সতী হতে গেলেই কি স্বামিযুক্তা হতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের এইরকমই conception (ধারণা) আছে। অনেকে চিরকুমারী অথচ নিষ্ঠাবতী থাকে। সেও তো সতী থেকে কিছু কম না।

তারপর ছড়া দিলেন—

জীবনধারার প্রস্রবণটি
নয়কো যাদের সঙ্গতিশীল,
অহঙ্কার আর বদরাগী ভাব
হয় কি তাদের কভু শিথিল?

কার উপর তোর কি ধারণা
কথায়-কাজে-ব্যবহারে,
সাবধান হবি বুঝলে খারাপ
ইঙ্গিত করবি যাতে সারে।

ছড়া শেষ করে বললেন দয়াল প্রভু—আমার ঐরকম। দোষের কথা বলিই না প্রায়।

আমি—আর যেটা বলেন তাতে যার সংশোধন হওয়া সম্ভব তা' হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারে যারা ভালবাসে তারা কিছু-না-কিছু করেই—প্রায়ই। খুব বেশি না-করা কমই দেখি। (পাবনায়) ঐ যে রাধিকা ছিল, সে আমারে খুব ভালবাসত। নফরও খুব ভালবাসত।

১৮ই চৈত্র, ১৩৬৬, শুক্রবার (ইং ১।৪।১৯৬০)

চারদিন পর আজ শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে প্রাঙ্গণের ছাউনিতে এসে বসেছেন। চৈত্রের মাঝামাঝি, রোদ উঠতেই বেশ গরম বোধ হচ্ছে। দূরে দারোয়া নদীর ওপার থেকে ধেয়ে আসছে তপ্ত বাতাস। বেলা বাড়ার সাথে-সাথে বাতাসের বেগও বেড়ে উঠছে। পশ্চিমের দিকের পরদাটা ফেলে দেওয়া আছে। তার উপরে আছড়ে আছড়ে পড়ছে আগুনে পশ্চিমা হাওয়া। এখানে কিছু সময় কাটিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের হলঘরে এসে বসলেন।

হলঘরের প্রশস্ত শয্যাখানিতে উপবেশন ক'রে কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যারা কাজ করে অনেক, কথাও কয় অনেক, কিন্তু জ্ঞান নেই, তারা not interested in that work, otherwise interested (সেই কাজে অন্তরাসী নয়, অন্তরাস তাদের অন্যত্র)।

আরও কিছুক্ষণ পরে দয়াল বলছেন—মনে যখন আনন্দ থাকে তখন আমার এই গানটার সুর ভাঁজতে ইচ্ছে করে (ব'লে গুনগুন করে গাইছেন—'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা......)

যোগেনদা (সিং) এসে প্রণাম করে বলল—পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। (যোগেনদা বি. এ. পরীক্ষা দিচ্ছে)

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন হচ্ছে তোর?

যোগেনদা—ভালই। আজ শেষ পরীক্ষা।

মন্টুনও (রায়চৌধুরী) পরীক্ষা দিচ্ছে। তার কথা উল্লেখ করে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওর তো দেরি আছে?

যোগেনদা—হ্যাঁ, ওর ফিলজফি বাকী আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্যাখ্, পরমপিতার দয়ায় এবার পাড়ি দিতে পারলে হয়।

যোগেনদা প্রণাম ক'রে চলে গেল। কালোদা (জোয়ারদার) এসে বলল—কৃষ্ণাকে নিয়ে আজ কলকাতায় যাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাবধানে যাস।

কালোদা প্রণাম ক'রে রওনা হল। ......বেলা দশটা। পূজ্যপাদ বড়দা এসে বসলেন। একটা চড়াই পাখি উড়ে এসে তাঁর কাছে বসল। একটু বসে থেকে উড়ে চলে গেল। সেদিকে লক্ষ্য ক'রে পরম দয়াল স্মিতহাস্যে বললেন—ঐ দ্যাখ, তোরে গ্রাহ্য করে কমই।

বড়দা—পাখিগুলি আমার কাছে খুবই আসে। কলকাতার বাসায় যখন রুটি খেতাম বাইরে বসে, কাকগুলো এসে ঘিরে দাঁড়াত। রুটিগুলো তারাই প্রায় খেয়ে ফেলত। তারপর থেকে কল্যাণীর মা ঘরের মধ্যে খেতে দিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছোটবেলা থেকেই তোর সাথে পশুপাখির সহজে ভাব হয়ে যায়।

বড়দা—ঠাকুমার একটা কালো গরু ছিল। যে কাছে যেত তাকেই ঢুঁষাত। কিন্তু আমি গেলেই গলা বাড়িয়ে দিত। কিছু বলত না। সেদিন এখানে এক কাঁকড়া বিছে ধরেছিল এই এত বড়। গায়ে তার লোম উঠে গেছে। আমি ধরে আমার এই থোড়ার পরে ছেড়ে দিলাম। ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিছু করল না, কামড়ালোও না। সবাই তো চেঁচামেচি করতে লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরকম করিসনে, ও ভাল না।

কথায় কথায় স্নানের বেলা হয়ে আসে। স্নানে ওঠার আগে ছড়া দিলেন প্রভু—

স্নায়ুমণ্ডল বিক্ষুব্ধ যার
বিশ্বস্ত সে কমই হয়,
সত্তাসত্ত্ব দুর্বল বলে
বিকৃতি তার পিছুই ধায়।
অসম্মিলনী সংশ্লেষণে
রয়না জীবনে সাম্য,
বৃত্তি তাহাকে যে লোভে ঘোরায়
তাই হয় তার কাম্য।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর হলঘরের ভিতরে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), প্যারীদা (নন্দী), হরিদা (গোস্বামী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ উপস্থিত। ইদানীং আমেরিকা থেকে হাউসারম্যানদার যে চিঠি এসেছে তার

কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রে একখানা প্রাইভেট চিঠি লিখেছে। তার মধ্যে লেখা, খবরদার কাউকে দেখায়ো না। ও লিখেছে ওর মার হজকিনস রোগটা আবার বেড়েছে, বড় বিশ্রী অসুখ। তারপর, একটা আইরিশ মেয়েলোকের সন্ধান পেয়েছে। সে নাকি female (নারী) বলদেববাবু। সে শাণ্ডিল্য ইউনিভার্সিটির জন্য সব কিছু করতে রাজী। এরকম আরো কিছু লোক পেয়েছে। (পরে বলছেন) ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে আমার একটা প্ল্যান দেওয়া ছিল। কার কাছে যেন লেখাও ছিল। সেটা তো আর পাইনে।

কেষ্টদা—এখন যদি কোন মন্ত্রী বা কেউ আমাদের প্ল্যান দেখতে চায়, তাহলে এখনই আমরা কিছু দিতে পারব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ক্ষোভের সুরে)—ঐ তো আমাদের রকমই ওই।

কেষ্টদা—কতকগুলি ছড়া বা বাণী পড়লাম, তাতে তো আর প্ল্যান হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা লিখতে পারলে আমেরিকায় ওর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যেত।

কেষ্টদা—শরৎদা, প্রফুল্ল ওদের অনেক জানা আছে। ওরা চেষ্টা করলে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারও অনেক শোনা আছে?

কেষ্টদা—হরিনন্দনদা চেষ্টা করলে হয়। তারপর আমিও করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, হরিনন্দন চেষ্টা করলে পারে। ঐ যে কী আছে, Where varieties meet with a meaning at unity, it is university (যেখানে বিষয়গুলি সার্থক সমন্বয়ে একায়িত হয়ে ওঠে, তাকে বলে বিশ্ববিদ্যালয়।) এটা দিয়ে লেখা আরম্ভ করতে হয়।

হরিনন্দনদা—আমি তো বুঝি teacher (শিক্ষক) যদি Ideal-এ concentric (ইষ্টে কেন্দ্রায়িত) না হয় তাহলে সে শেখাবে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওকথা বললে তো পিছিয়ে যাবে। ইউনিভার্সিটি তো আরম্ভ কর। Teacher-ও (শিক্ষকও) লাগবে আস্তে আস্তে।

এরপর কী ক'রে জ্ঞান আসে তাই নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের শরীরে অনেক রকম নার্ভ আছে। তার আবার অনেক variety (বৈচিত্র্য)। এইগুলির মধ্যে যখন পারস্পরিক সঙ্গতি ক'রে নিয়ে আমরা চলতে পারি তখনই আমাদের conception correct (ধারণা নির্ভুল) হয়। এই consistent collaboration (সুসঙ্গত সম্মিলনী ক্রিয়া) না-থাকার জন্য জানাটা fine (সূক্ষ্ম) হয় না। হয়তো দেখল এরকম, শুনল আর এ-রকম, উত্তর দিল একেবারে অন্যরকম। তার চোখ যা' feel (বোধ) করে, কান তা' feel (বোধ) করে না। এইরকম যদি হয়, is there any possibility of education (সেখানে শিক্ষা থাকা কি সম্ভব)?

এই যে sense-গুলির (ইন্দ্রিয়গুলির) unadjusted (অনিয়ন্ত্রিত) রকম, এতে কি আমাদের education (শিক্ষা) হবে কিছু? আবার এটা যদি inborn (জন্মগত) হয়, তা' কিন্তু adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা যায় না। আমি হয়তো সাপ দেখে বাঘ ভাবছি, বিড়াল দেখে ইঁদুর ভাবছি। তার মানে, outward environment-এর (বাইরের পরিবেশের) সাথে আমার পরিচয়ই হয়নি। এই যে একেবারে inborn (জন্মগত) পরিচয় না হওয়া অবস্থা, তার মধ্যে কি কোন education (শিক্ষা) আছে? এ হ'ল mathematics (অঙ্ক)। We know the result of mathematics (আমরা অঙ্ক কষার ফল জানি।) অঙ্ক ক'রে যান, ফলে ঠিক মিলে যাবে। যতক্ষণ না মেলে, ততক্ষণ বুঝতে হবে করার ভুল হয়েছে। আমরা মন দিয়ে চিন্তা করি। Mind-এর (মনের) মধ্যে আছে আবার innumerable waves (অসংখ্য তরঙ্গ), সেগুলিকে আনতে হবে ঐ consistent collaboration-এ (সুসঙ্গত সমন্বয়ে)। কোনটা যেন আমাকে delude (প্রতারণা) না করে।

এখন, একটা রোগী আছে। তাকে পাঁচজন ডাক্তার যদি একই রকম diagnosis (রোগনির্ণয়) করে তাহলে বুঝতে হবে সেখানে consistent collaboration (সুসঙ্গত সমন্বয়) আছে। আর পাঁচজন যদি পাঁচরকম diagnosis (রোগনির্ণয়) করে তাহলে বুঝতে হবে সেখানে deficiency (খাঁকতি) আছে—কারো ভিতর কম, কারো ভিতর বেশি।

কেষ্টদা—সেদিন হাউজারম্যান বলছিল, ঠাকুরের কথা প্রত্যেকেই তার নিজের মত ক'রে বোঝে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(সহাস্যে) ওর কথা ঠিক।

তারপর প্রসঙ্গান্তরে বললেন—আপনারা যে behaviour (ব্যবহার) করেন, তার মধ্যেও যদি consistency (সঙ্গতি) না থাকে তাহলে তা' সঠিক behaviour (ব্যবহার) হবে না। Behaviour (ব্যবহার) করতে গেলেই sensory ও motor (সাড়াসংগ্রাহী ও সাড়াসংবাহী) দুইরকম নার্ভই ক্রিয়াশীল হয়। একটা নার্ভ যে impression carry (ছাপ বহন) করে, অন্য নার্ভ যদি তা' follow (অনুসরণ) না করে, তাহলে consistency (সঙ্গতি) আসে না। আবার, আমি behaviour (ব্যবহার) জানি বা না-জানি, আমার ভেতরে বোধ খারাপই থাকুক আর যাই থাকুক, I want to exist (আমি বেঁচে থাকতে চাই)। প্রত্যেকের ভিতরেই আছে আমার ভাল হোক। কিন্তু তার জন্য system-টাকে (বিধানটাকে) যেভাবে collaborating (সমন্বয়ী) রকমের মধ্য দিয়ে ঠিক করতে হয় তা' হয়তো করছি না। আমার মধ্যে evolutionary tendency (বিকশিত হওয়ার ঝোঁক) নেই, তবুও আমি থাকতে চাই। এই যে চিরযৌবন প্রাপ্তির কথা-টথা শুনি, তা' পেতে কি আমার লোভ হয় না?

হয়। তার কারণ, আমি দুনিয়ায় টিকে থাকতে চাই, ভেঙ্গে যেতে চাই না, বিক্ষিপ্ত হতে চাই না। আর, তারাই ভেঙ্গে যায় যাদের nervous system-এর (স্নায়বিক বিধানের) মধ্যে adjustment (বিনায়িত অবস্থা) নেই, collaboration (সমন্বয়) নেই। আমার মনে হয় থাকতে চায় সকলেই। মরার কষ্ট, মৃত্যু-বিভীষিকা সবারই আছে। সে একটা পিঁপড়েরও আছে। দ্যাখেন না, একটা টোকা দিলে পিঁপড়েটা কেমন করে। ঐ যে একজন নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে মরেছিল। শুনেছি, মরার আগে সে নাকি খুব কাকুতি-মিনতি করে বলেছিল, 'আমাকে এবার বাঁচায়ে দেন'। ঐ দ্যাখেন বাঁচতে সে চাইল বটে, কিন্তু চাওয়াটাকে সে আগেই betray ক'রে (চাওয়ার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে) বসে আছে। তাহলে চাওয়া-অনুপাতিক সে পাবে কি ক'রে? চাওয়া ও তদনুপাতিক চলনের মধ্যে এইরকম যে অসঙ্গতি, তাকেই কয় insanity (পাগলামি)।

শরীর-বিধানে ঐ সঙ্গতি ও সমন্বয় আনার জন্য ব্যক্তিগত সাধনার দরকার, কেষ্টদার এই কথার উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সেই সাধনাকে আমরা যদি প্রত্যেকের ভিতর নিয়ে আসতে পারি তাহলে তো হয়! ডিগ্রীর তফাৎ থাকতে পারে, কিন্তু বাঁচতে সবাই চায়। বাঁচতে চায় না এমন লোক তো দেখা যায় না।

কেষ্টদা—সবার ভিতর এই চেতনা আনা তো সোজা কথা নয়। হলে হবে হয়তো 'অদ্য বর্ষশতান্তে বা'—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'অদ্য বর্ষসহস্রান্তে বা' তাও হতে পারে। কিন্তু আমার determination (সঙ্কল্প) থাকবে যে সবার ভিতরে এটা জেগে উঠুক। এ করতে গেলে আমার হয়তো অনেক চড় খাওয়া লাগবে, অনেক নাজেহাল হতে হবে। কিন্তু চেষ্টা যদি না ছাড়ি, লেগে যদি থাকি, তাহলে অনেক mutation-এর (বিবর্ত্তনমুখী পরিবর্ত্তনের) সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি, আমি নিজেও mutate করতে (পরিবর্ত্তিত হতে) পারি।

এর পর একটু চুপচাপ কাটে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখমণ্ডলে রহস্যভরা মৃদু হাসি। কিছু ভাবছেন মনে হয়। একটু পরেই বললেন—আমার একটা বুদ্ধি আছে। এই যে চোর আছে, জুয়াচোর আছে, আধা সাধু আছে, এইসব দিয়ে অষ্টধাতুর একটা স্থণ্ডিল তৈরি হয়ে থাকছে। হয়তো একদিন ঐ স্থণ্ডিলের ভিতর দিয়ে ধূম জ্বলে উঠবে। সেদিন হয়তো থিয়েটারের ভঙ্গিমায় হাসব—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

—বলতে বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর হাত দুখানি সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। চোখ দুটি তাঁর ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। এক অপূর্ব দৃশ্য! উপস্থিত সকলেই বিস্মিত, নির্বাক। জানি না, এর ভিতর দিয়ে লীলাময় কোন্ প্রচ্ছন্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করলেন।

তারপর আবার পূর্ব প্রসঙ্গের সূত্র ধরে দয়াল বলছেন—এই যে আমাদের অসুখ-বিসুখ হয়, যা' নাকি detrimental to our existence (আমাদের অস্তিত্বের

প্রতিকূল), তা' সবই ঐ বিকৃত ব্যতিক্রম, যা' not in collaboration with our system (যা' আমাদের শরীর-বিধানের সাথে সঙ্গতি-আপন্ন নয়)। এই যে আমার তিনবার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে গেল, (আমাকে দেখিয়ে) ওর যে পেটে ব্যথা হয়, সবই ঐ। এইসব নিয়ে ছোট একটা প্যামপ্লেট লিখতে পারলে ভাল হত। (তারপর দুঃখের সাথে বলছেন) আমরা পেলেও নিতে জানি না। (তিনি যে নিয়ত দিয়ে চলেছেন আমাদের কল্যাণের জন্য। আমরা সেগুলি কতখানি আত্মীকৃত করে তুলতে পারছি?)

হরিনন্দনদা—এ সম্বন্ধে একটা dictation (বাণী) দিলে ভাল হত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Dictation (বাণী) দিয়ে তো আর কাম হবি নানে। (কেষ্টদাকে) আপনার dictation (বলা) হলে তো হয়।

কেষ্টদা—আপনার যা' বলা আছে তাই যথেষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য ওকে বলছিলাম, দ্যাখ্ ওগুলি হারাস নে। এসবই practical experience-এর (বাস্তব অভিজ্ঞতার) কথা। যদি হারায়ে যায়, তোমরা তো হারালেই, তুকটুক যদি কিছু থাকে তাও হারায়ে গেল।

কথায় কথায় রাত বেড়ে চলেছে। ঘড়ির দিকে কারো লক্ষ্য নেই। এক দিব্য ভাবাবেশে সবাই তন্ময়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ অনেকদিন পরে অনেকক্ষণ কথা বলে খিদে-খিদে লাগছে। কেষ্টদা-সহ সবাই এবার সচেতন হয়ে ঘড়ি দেখলেন।

কেষ্টদা বললেন—তাহলে উঠলে হয় একটু পরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উঠব নে। এখন একটা নেশার মত হয়েছে। উঠলে এটা ভেঙ্গে যাবে। (তারপর বালিশটা টেনে নিয়ে কাত হয়ে শুয়ে হরিনন্দনদাকে বলছেন) দেখ, লিখতে যদি পার একটা।

এরপর সবাই প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন।

১৯শে চৈত্র, ১৩৬৬, শনিবার (ইং ২। ৪। ১৯৬০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর হলঘরে সমাসীন। কথাবার্ত্তা চলছে। মাঝে-মাঝে বাণী দিচ্ছেন। একসময় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের মধ্যে দেখা যায়, কারো ঋক্‌বেদ, কারো সামবেদ, কারো বা যজুর্ব্বেদ। এরকম প্রভেদ কেন হয়েছে, এর তাৎপর্য্যই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋগ্‌বেদ থেকেই সব বেদ। ঋক্‌মন্ত্রগুলি গানের সুরে গাইলে হয় সামবেদ। যজুর্ব্বেদ যজ্ঞকর্ম্মের ব্যাপার নিয়ে লেখা। অথর্ববেদেও নানারকম ক্রিয়াকাণ্ডের কথা আছে। এখন, যাদের গোত্রপিতা—ঐ গুরু—যে বেদ নিয়ে চলতেন, তাদের সেই সেই বেদ হয়ে এসেছে।

এর পরে পারশবদের সম্পর্কে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওরা যেন বিপ্রবর্ণের একটা ঢাল ছিল। বামুনের শত্রু যারা তাদের ওরা হিংসা করত। তাই, আমার রাখা নাম শ্রীপালী। বারুজীবী সম্পর্কেও আমার সন্দেহ হয় ওরা বিপ্রবর্গের। এটা ওদের বের করতে বললাম। কিন্তু তা' আর ওরা পারল না।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসেছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্লদা (দাস), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), হরিদা (গোস্বামী) ও আরো অনেকে। সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটি লেখা দিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—ব্রহ্মবিদ্ মানে যেখানে যা' আছে তার সব attribute (গুণ)-কে জানা with all its adjustment (তার সর্ব্ববিধ বিনায়না-সহ)। এই যে কয় 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', খলু মানে কী?

কেষ্টদা—নিশ্চয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। আর ইদং, ইদং মানে?

কেষ্টদা—এই সব যাহা কিছু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, এই সব যা-কিছুই ব্রহ্ম।

কেষ্টদা—সবই যেন সেই আদি উপাদান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদি উপাদানের রকমারি adjustment (বিনায়না)। যাহা কিছু হইয়া তাহাই আছে। আবার, সেখানেই full stop (সমাপ্তি) না কিন্তু, হইয়া চলিতেছে।

এই 'চলিতেছে' শব্দটি বলার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কণ্ঠস্বর ও চাহনি বিশেষ ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি দ্বারা তিনি যেন নিজেকেই দেখিয়ে দিলেন।

তারপর আবার বলছেন—ব্রাহ্মী সত্তা যার, তার ব্রাহ্মী আচরণ এবং ব্রাহ্মী চরিত্র থাকবেই। এই চরিত্র গজায় conception-এর (ধারণার) ভিতর দিয়ে। কারণ, conception-এর (ধারণার) মধ্য দিয়ে আসলেই কোন কিছু সম্বন্ধে ঠিক ঠিক বোধ হয়।

এরপর শঙ্করাচার্য্যের কথা উল্লেখ ক'রে কেষ্টদা বললেন—শঙ্করের মতে ব্রহ্মই সত্য, আর সব মায়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি মায়া ওভাবে বুঝি না। এই যে আপনি কেষ্টদা হয়েছেন, এটা মায়া, মানে ঐভাবে পরিমাপিত হলেন। আপনার ছেলে যে পণ্ডিত হ'ল, সেটা মায়া। মানে, ব্রহ্ম ঐ পণ্ডিতরূপে পরিমাপিত হল।

কেষ্টদা—সে তো অন্য অর্থ। মায়া মানে illusion (ভ্রান্তি)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Illusion, delusion (মোহ-ভ্রান্তি) কিছু না। মায়া মানেই হ'ল পরিমাপিত হওয়া।

কেষ্টদা—অবশ্য শঙ্করাচার্য্যের মানে ধ'রে মায়া বুঝলে আর উপনিষদ ঠিকমত বোঝা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই সময় আপনমনে বললেন—'সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি'। তারপর কেষ্টদা আবার জিজ্ঞাসা করলেন—সবই কি এই ব্রাহ্মী সত্তা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পণ্ডিতলোকে জানে আপনি পণ্ডিত। কী ক'রে জানল? আপনার ডিগ্রী দিয়ে কিন্তু জানল না। জানে আপনার জ্ঞান দেখে। তেমনি ব্রাহ্মী সত্তাও জানা যায় ব্রাহ্মী চরিত্র দেখে।

প্রফুল্লদা—ব্রাহ্মী ভাব তো সবার মধ্যে আছে। কিন্তু একটা প্রতিলোম-জাতকের মধ্যে আছে সর্ব্বনাশ করার বুদ্ধি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে বাঘের মধ্যেও তো ব্রাহ্মী সত্তা আছে তা'র মতন ক'রে। তোমার মধ্যেও আছে। বাঘ তোমারে খেতে চায়। আর, তুমি বাঁচার পথের একটা সঙ্গতিশীল মানুষ হয়ে উঠেছ।

প্রফুল্লদা—কিন্তু প্রতিলোমীদের নিজেদের একটা বৃদ্ধিমুখী চলন থাকবে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আছে। সেটা কী? সে নিজে বাঁচতে চায় অপরকে মেরেও। সে ভাবে, অপরকে নিকেশ ক'রেও তার নিজের সত্তা ঠিক রাখতে। আর, ব্রাহ্মী সত্তার লক্ষণই হ'ল, সে নিজে থাকতে চায়, সাথে-সাথে চায় সবাই বাঁচুক, বাড়ুক, থাকুক।

প্রফুল্লদা—কিন্তু বাঘকে বাঁচাতে হলে তো বহু প্রাণ নষ্ট করা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ বাঘ বেটা কিন্তু নিজে মরতে চায় না।

শরৎদা (হালদার)—আমিও বাঁচব, বাঘও বাঁচবে, এটা কী ক'রে সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে কে একজন সেই জঙ্গলের মধ্যে একটা গুহায় ছিল। একটা সিংহ তার সামনে আস্তে আস্তে এসে থাবা তুলে দিল। সিংহের পায়ে কাঁটা ফুটেছিল বলে কষ্ট হচ্ছিল। ও সিংহের থাবাটা ধ'রে সেই কাঁটাটা বের ক'রে দিল। স্বস্তি পেয়ে সিংহটা চ'লে গেল। তারপর সে-লোকটা একদিন ধরা পড়ল। রাজার বিচারে তাকে সিংহের খাঁচায় ফেলে দেওয়া হ'ল। কিন্তু ওটা ছিল সেই সিংহ, যার পা থেকে ও-ই কাঁটা বের করে দিয়েছিল। সিংহটা ঠিক ওকে চিনল। কিছু বলল না। ও-ও সিংহটাকে আদর করতে লাগল। এটা কি গল্প না সত্যি ঘটনা?

শরৎদা—সত্যি ঘটনা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে গাইছেন—'মন তুমি কৃষিকাজ জান না'—। তারপর বলছেন—একথা আমারও কওয়া আছে অনেক জায়গায় অনেক ভাবে।

কিন্তু রামপ্রসাদের গানগুলি এক একটা একেবারে jewel-এর (মুক্তার) মত। আবার এত সহজ, এত মর্ম্মস্পর্শী। (কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে) মাস্তন গানগুলি মন্দ গাইত না।

কেষ্টদা—হ্যাঁ, এখন তো অন্যদিকে পড়ছে। Normal tendency (স্বাভাবিক ঝোঁক) যেদিকে সেদিক আর পড়া হ'ল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কার্লাইলের হিরো এ্যান্ড হিরো-ওয়ারশিপ বইখানা কলকাতা থেকে আনার কথা বলেছেন নাকি?

কেষ্টদা—হ্যাঁ, বলে তো দিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার কেমন মনে থাকে এখনও।

কেষ্টদা—অনেক জিনিস থাকেও না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে থাকাটা তো বোঝা যায় না। কোন affair (বিষয়) আসলে তখন মনে পড়ে, তখন বোঝা যায়।

কেষ্টদা—বিষয়টা মনে না থাকলেও তার conception-টা (ধারণাটা) হয়তো আমার মনে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেগুলি থাকে সেগুলি হ'ল factual conception (বাস্তবভিত্তিক ধারণা)। সেগুলি adjust (বিনায়িত) করতে হলে পরেই যুক্তি লাগে। যুক্তি মানে কার সাথে কোন্‌টা যোগ দেব, কোন্‌টা বিয়োগ দেব, তা' ঠিক করা। সেইজন্যেই বোধ হয় ওর নাম হয়েছে যুক্তি। কার সাথে কোন্‌টা মেলে সেটা ঠিক করাই তো যুক্তি, তাই না?

কেষ্টদা—হ্যাঁ, সেজন্য অঙ্কটাও একটা যুক্তি বা লজিক।

এর পর energy (শক্তি) নিয়ে কথা উঠল। দয়াল ঠাকুর বললেন—এ সম্পর্কে আমার conception (ধারণা) হল, জগতে যা'-কিছু সবেরই মূলে আছে energy and its wave (শক্তি ও তার তরঙ্গ)। আমরা যখন মায়ের পেটের মধ্যে জন্মগ্রহণ করি, ঐ energy-র (শক্তির) তরঙ্গই আমাদের জন্মায়। যখন বড় হই, ঐ তরঙ্গই আমাদের বড় ক'রে দেয়। আবার যখন আমরা আর থাকতে পারি না, জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে, ঐ তরঙ্গগুলি তখন short হয়ে (কমে) আসছে বুঝতে হবে। (ক্ষণেক নীরব থেকে বলছেন) আমার বোধ হয় তরঙ্গ কমে গেছে। অনেক কিছু আজকাল মনে থাকে না। আবার মনে এলে হয়তো কইতে যেয়ে ভুলে গেলাম। আপনার বোধ হয় মনে থাকে।

কেষ্টদা—আপনার মনে থাকা এখনও আমাদের ছাপায়ে আছে। পুরানো কথা ঠিক মনে থাকে আপনার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যে মনোরঞ্জনের নাম কিছুতেই মনে আসছিল না। ভবতারণ ভবতারণ মনে হচ্ছিল। কত বার চেষ্টা ক'রে তারপর মনে করার চেষ্টা ছেড়ে দিলাম। তখন আবার টক ক'রে মনে এসে গেল।

রাত ৯টা বাজে। কথার স্রোত নিরন্তর চলছে। কথা—কিছু অর্থবহ শব্দসমষ্টি। কিন্তু পরমপুরুষের শ্রীমুখনিঃসৃত সেই শব্দসম্ভারের কী অসীম শক্তি! তার অনন্যসাধারণ প্রয়োগ-বিন্যাসে দূর হয়ে যায় কত অজ্ঞান-তমসা, কেটে যায় কতদিনের যত্নলালিত কুসংস্কারের ঘুমঘোর!

ভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা চলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—দুনিয়ায় independent (অনধীন) কিছু নেই। সবই inter-dependent (পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল)। দেখ না, জন্ম নিতে হলেও মানুষকে মা-বাবার উপর depend (নির্ভর) করতে হয়। তাই আমি কই, প্রত্যেকেরই উচিত প্রত্যেকের জন্য করা। এইভাবে সবাই যখন inter-dependent (পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল) হয়ে ওঠে তখনই আসে প্রকৃত independence (স্বাধীনতা)।

প্রফুল্লদা—এটা বুঝতে পারছি যে আপনার একাজে যথেষ্ট কিস্মতের দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভেবো না। কিস্মত তোমার যা' আছে তাই নিয়ে লাগ। Be sincere to Him (তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হও)। Existential propitiousness-কে (সাত্বত কল্যাণকে) যা' resist (প্রতিহত) করে, সেটা তোমার নয়। সেইজন্য জন্মের সাথে সাথে ভগবান দুটি ক্ষমতা দিয়েছেন—একটা হল life (জীবন)-টাকে বজায় রাখা, আর একটা power of resistance (নিরোধ-ক্ষমতা)। ঐ power of resistance (নিরোধ-ক্ষমতা) না থাকলে তোমার হাড় ক'খানা নিয়ে তুমি কবে মাটি হয়ে যেতে। তাই আসল কথা হ'ল, তুমি বাঁচ and make others live (অপরকেও বাঁচিয়ে তোল)।

শৈলেনদা—আমরা এখন টাকার মধ্যে পড়ে গেছি। ছেলের বিয়ে, মেয়ের বিয়ে, এই সবের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কোথায়? মেয়ের বিয়ে তুমি কিন্তু একটাও দাও নি। এই যে আমার বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলোর বিয়ে হয় না। (পূজ্যপাদ ছোড়দার কন্যা উমার বিবাহের উল্লেখ ক'রে) এতদিন পরে একটা হয়েছে। কই, তুমি করনি তো কিছু। আমরা করি খারাপ। মেয়ে হয়তো ম্যাট্রিক বা বি-এ পাশ করল। তারপর চাকরী করছে। কিন্তু তার বিয়ের চেষ্টা তো করি না।

শৈলেনদা—আমরা বাইরে বলি, মেয়েদের বেশী লেখাপড়া করা ভাল না। কিন্তু এখানে ডজন-ডজন মেয়েকে প্রাণপাত ক'রে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করানো হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি তো একটু হেসে মেয়েদের মাকে বলতে পার—মা! আমরা নিজেরা যদি একটা স্কুল করতে পারতাম, কত ভাল হত! ধুত্তোর লেখাপড়া শিখে চাকরী করা—ও ভালই না।

শৈলেনদা—আমাদের জীবনে আমরা শুধু ফাঁকিই দিয়ে যাচ্ছি। আপনার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছি না, কিন্তু অফিস থেকে নিচ্ছি। তাতে আর conscience-এ (বিবেকে) লাগে না। এত ফাঁকি দিয়ে কি হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ উল্টানো তোমার পক্ষে কিছুই না। হরিনন্দনের পক্ষেও কঠিন কিছু না। একটু চেষ্টা করলেই হয়। ধর, এখানে তোমরা পাঁচ হাজার মানুষ আছ, তা' ছাড়াও তোমরা ৫/৬ লাখ মানুষের মধ্যে ঘোর। তোমাদের পক্ষে একাজ কিছু না। তাদের convince করতে (বিশ্বাস উৎপাদন করাতে) হয়। তবে এর মধ্যে অনেকের আছে idle brain (অলস বুদ্ধি), যার জন্য তাকে personally propitious (ব্যক্তিগতভাবে শুভদ) হতে দেয় না।

হরিদাস সিংহদা সামনে ব'সে। তাঁকে দেখিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—এখানে সোডা তৈরীর জন্য আমি ওকে সোডা ওয়াটারের মেশিন আনতে বলেছিলাম। তখন আনিছিল। আমি ওকে বলেছিলাম, লাগা। আরো ফরমুলা যদি আমার মাথায় আসে, ক'ব। তখন করল না। এখন কয়, আমারে ঠিক ক'রে দেন। কিন্তু এখন করতে হলে আবার লওয়াজিমা লাগবে নে। লেখাপড়া শিখতে হলে অ-আ থেকেই শেখা লাগে।

হরিদাসদা—আমাদের চিন্তার অলসতা আছে। অল্প টাকার মধ্যে হলে এরকম পারব, ভাবি। বেশী টাকার ব্যাপার হলেই ভয় করে—যদি না পারি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ শোন, ঐ শোন, কয় কিরকম! ওরে, শুধু শুধু ভবঘুরেরা পারে না। ভবঘুরে-গিরির মধ্যে যার একটা purpose (উদ্দেশ্য) আছে, সে পারে। দেখ, লোকে কাকে টাকা দেয়? যাকে দিয়ে স্বস্তি পায়, তাকেই তো দেয়! আমি কই, তোমাদের চরিত্র যেন মানুষকে স্বস্তিদান করে। তাহ'লে কী হয়? যার কাছে যেয়ে আমি স্বস্তি পাই, তাকে পঁচিশ বার মাথায় তুলে নিয়েও আমার তৃপ্তি হয় না, কোথায় যে রাখব ঠিক করতে পারি না।

কথায়-কথায় রাত হয়ে আসে। আর কয়েকদিন পরেই নববর্ষ-উৎসব। প্যান্ডেল বাঁধার কাজ এগিয়ে চলেছে। কর্ম্মীদের হৈ-হল্লা শোনা যাচ্ছে। জনৈক কর্ম্মী সামনে এসে দাঁড়াতে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কী খবর রে?

উক্ত কর্ম্মী—এখন এক লরি বাঁশ এল। কাল আরো তিন লরি আনতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (পুলকিত হয়ে)—বাব্বাঃ, এনে ফেলা।

তারপর হরিদাসদার দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললেন—যা, দেখে আয় গে।

হরিদাসদা উঠে গেলেন। এর পর দেওঘর শহরের কয়েকজন দেখা করতে এলেন। তাঁরা বসলে পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কন্ফারেন্স তো আসছে। সব দেখেশুনে যা' করার করবে। কোন গোল যেন না হয়। বহু লোক আসবে।

ওঁরা সব করবেন বলে কথা দিলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার আর একটা আরজি আছে। তপোবন স্কুলটা হোসেনী লজে এনে দেন। আর কেষ্টদার বাড়ীর পাশের জমিটা acquire (দখল) করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন।

ওঁরা এ-বিষয়ে চেষ্টা করবেন বললেন।

২১শে চৈত্র, ১৩৬৬, রবিবার (ইং ৪। ৪। ১৯৬০)

প্রাতে দালানের হল্‌ঘরে বসে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার সাথে কথাবার্ত্তা বলছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—Male female-এর (স্ত্রী-পুরুষের) মধ্যে যে affinity (আকর্ষণী সম্বেগ) থাকে তারই ফলে sperm ova-র (পুংবীজ স্ত্রীডিম্বকোষের) মধ্যে ঢুকে zygote (ভ্রূণদেহ) form (গঠন) করতে পারে। Affinity (আকর্ষণী সম্বেগ) যদি না থাকে তাহলে জন্মই হয় না। বেশ্যাদের ক্ষেত্রে এই affinity-র (আকর্ষণী সম্বেগের) অভাব থাকে। তাই, তারা প্রায়ই barren (বন্ধ্যা) হয়। অনেকে আবার ওষুধ-বিষুধের দ্বারাও নিজেদের ঐরকম ক'রে রাখে।

কেষ্টদা—তাহলে আপনি যে congenital affinity-র (জন্মগত আকর্ষণের) কথা বলেন, তার মানে হল affinity of the sperm for the ova (ডিম্বকোষের প্রতি পুংবীজের আকর্ষণ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sperm আর ova-র affinity (পুংবীজ ও ডিম্বকোষের আকর্ষণ) যদি least possible (অতি অল্প সম্ভব) রকমের থাকে তাহলে সেখানে conception (গর্ভসঞ্চার) হতে পারে, আর ওর least possible stand-ও (সামান্যতম সম্ভাব্য ভিত্তিও) যদি না থাকে তাহলে সেখানে আর soil (ভূমি) পায় না, barren (বন্ধ্যা) হয়ে যায়। আপনার যদি কোন শূদ্রা স্ত্রী থাকত, আর তাতে আপনি উপগত হতেন, তার ফলেও সন্তান হত। কিন্তু আপনার traditional trail (ঐতিহ্যের ধারা) ধ'রে রাখার মেকদার যার নেই, তাতে উপগত হলে আর issue (সন্তান) হ'ত না।

এর পর বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হয়। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের পূর্ব্বপুরুষের যেসব সম্পদ ছিল তার যদি যথাযথ ব্যবহার না করি তাহলে তা' আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে।

কেষ্টদা—এখন তো বর্ণাশ্রম কোথাও নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাও আমি কই, এই জাতি-বর্ণ মানাই ভাল। এটার ব্যভিচার করা ভাল না। যেটুকু এখনও টিকে আছে, তা' যদি অক্ষত রেখে চলতে পারেন, তবে ওর ভিতর দিয়েই একদিন বিরাট সম্ভাব্যতা sprout করবে (গজাবে)।

কেষ্টদা—কিন্তু আমি বামুন হয়ে যদি আমার করণীয় না করি তাহলে আমার ভেতরের possibility (সম্ভাব্যতা) তো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি কিছুও পালন করা হয় তাও ভাল। স্বল্পমপি গরীয়সী। সেজন্য আমি কই, কিছু কর।

কেষ্টদা—অন্ততঃ যাতে জন্মগত দুষ্টি না আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই করতে করতে যদি পাঁচ জোড়া মানুষও বেঁচে থাকে পরমপিতার দয়ায়, তাহলে ঐ পাঁচ জোড়া মানুষই সব উল্টায়ে দিতে পারে। ...... আগেকার দিনে বামুনরা একটা বিপ্র মেয়ে বিয়ে ক'রে তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বিয়ে করতে পারত। পারত, কিন্তু যা' খুশী তাই করার উপায় ছিল না। সমাজে systematic adjustment-টা (ব্যবস্থিত বিনায়নাটা) বজায় রাখার খুব চেষ্টা ছিল। (ডাঃ ননী মণ্ডলদাকে দেখিয়ে) ওরা হ'ল বিপ্রের শূদ্রাগর্ভজাত সন্তান। দেখেন ওদের জাতের মধ্যে একটা valour (শৌর্য্য) ছিল। ওদের নমশূদ্র কয়। কিন্তু এ নাম আগে ছিল না। এটা মনে হয় Buddhist period-এর (বৌদ্ধ যুগের) পরে এসেছে। Aryan cultureটা (আর্য্যকৃষ্টির অনুশীলনটা) যাতে অবাধে চলতে পারে সেইজন্যেই ভগবানের অপার দয়ায় বোধ হয় এই জাতের সৃষ্টি হয়েছে। এদের মস্তিষ্ক এবং বাহু সমানে চলে। কিন্তু ওরা যখন প্রতিলোম করে তখন আমার হাউ-হাউ ক'রে কাঁদতে ইচ্ছা করে। এ কই নি, এখন কয়ে ফেললাম। এখন শুনি, ওদের মধ্যে কেউ মুখুজ্জে, কেউ বাঁড়ুজ্জে হয়ে মুখুজ্জে-বাঁড়ুজ্জের মেয়ে বিয়ে করছে। ভাবে ওদের মেয়ে বিয়ে করলে বুঝি জাতে উঠলাম। কিন্তু আর ওঠা ভাল না। যা' আছিস সেইটাকেই adjust (নিয়ন্ত্রিত) ক'রে নেওয়া ভাল। আর, ঐরকম যদি বুদ্ধি থাকে তাহলে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সবাই ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে যাবে। ঐ যে আপনি কোন্ দেশের গল্প করেছিলেন যেখানে দুটা পয়সা দিলেই sodomy (পুংমৈথুন) করে?

কেষ্টদা—ইটালীতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ হ্যাঁ ইটালীতে। ঐ দেখেন কৃষ্টিকে অবজ্ঞা করার ফল। (আবার ননীদাকে) পূর্ব্বপুরুষের সেই ধারা এখনও তোমার মধ্যে আছে, ক্ষীণধারায় বইছে। এখন ক'রে তুলতে পারলেই হয়। তোমাদের সম্পদের অভাব ছিল না। এখন তো কৈ, সেরকম একটা লোক চোখে পড়ে না। এখন সব ব্যানার্জী হতে চায়, চ্যাটার্জী হতে চায়, গাঙ্গুলী হতে চায়।

কথা বলতে বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে আবেগ ও উৎকণ্ঠার ছায়া। উপস্থিত সবার অন্তর ঐ ভাবাবেগের রণনে অনুরণিত। স্নানের বেলা হয়ে গিয়েছিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সকলে প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরেই আছেন। চুনীদা (রায়চৌধুরী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্লদা (দাস), শরৎদা (হালদার) প্রমুখ উপস্থিত। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথাবার্ত্তা চলেছে।

একসময় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইষ্ট হলেন index of our existence (আমাদের অস্তিত্বের পথপ্রদর্শক)। ঐ মণিকেন্দ্র জীবনে অটুট ক'রে নিয়ে চলতে পারলে বিষয় ও ব্যাপারগুলি ঠিকমত বোঝা যায়। ......দ্যাখেন, আমি যা'-কিছু কই, তা' আমার নিজের বোধের উপর দাঁড়িয়ে। উল্লসিত হই তখনই যখন দেখি তা' science-এর (বিজ্ঞানের) সাথে বা শাস্ত্রের সাথে মেলে। তখন বুঝি আমার কথা ঠিক। অবশ্য না মিললেও বলি, this is as I know (আমি যা' জানি তা' এই)।

তারপর শরৎদাকে বলছেন দয়াল—ঐ যে আপনি বললেন, দুনিয়ায় কোন বাজে জিনিস নেই, কথাটা খুব ভাল। আমার কাছে যেটা অপ্রয়োজনীয়, সেটা অন্যের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এটা প্রকৃতিরই নিয়ম। সব-কিছুই কোন-না-কোনভাবে কাজে লাগে। প্রকৃতি কিছুই নষ্ট করে না। অমনতর গিন্নী তো আমি আর দেখি নে, একেবারে unfathomed (অপরিমেয়)। কী দিয়ে যে কী করে! যেমন একখানা ছেঁড়া কাপড় আপনি বাজে মনে ক'রে ফেলে দিলেন। কিন্তু আপনার বৌদির (পাশে দাঁড়ানো সুশীলামাকে নির্দ্দেশ ক'রে) কাছে সেটা প্রয়োজনীয়। ও সেখানা বাড়ীতে নিয়ে যেয়ে কেটে ছেলেপেলের কাঁথা বানালো। আবার দ্যাখেন, এই মেয়েলোকেরা আপনাদের খাওয়া-দাওয়া সারা হলে তারপর নিজেরা খায়। তার মানে আপনাকে দিয়েই ওর পাওয়া-থোওয়া। সেইজন্য আগে আপনাদের সুসার করিয়ে দিয়ে তারপর নিজেরা খায়। এগুলি কে কেন কী করে, কিসে কী হয়, কোনটা বাদ দিলে হয় না। সব বিষয়ের মধ্যেই ঢুকতে হয় উদ্দালকের মতন।

শরৎদা—এরকম ক'রে ঢোকাই তো wisdom (প্রজ্ঞা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Wisdom (প্রজ্ঞা) মানে আমার মনে হত wise-dom (প্রাজ্ঞতার বসতি)।

প্রফুল্লদা—আপনার কথাগুলি লিখছি, পড়ছি, শুনছি। কিন্তু নিজের মত ক'রে একটা বুঝ না হলে স্বস্তি লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর জন্য চাই valoured volition (অদম্য এষণা) নিয়ে লেগে থাকা—লেগেই থাকা। Valour (পরাক্রম) না থাকলে সবগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তাকে ছন্দায়িত ক'রে তোলা যায় না। আবার এই লেগে থাকার ভিতর দিয়ে যতটা

তুমি অধিগত করেছ তা' তোমার চরিত্রে ও কর্ম্মে ফুটে বেরোবে। ধর, একজন তোমার ঠাকুরকে অপমান করেছে। তখন in action (বাস্তবে) তোমার চরিত্র যেমন ফোটা দরকার তা' ফুটবেই।

এই সময় নিখিলদা (ঘোষ) এসে বললেন—রাজেনদা (মজুমদার) টেলিগ্রাম করেছেন, এবার উৎসবে উড়িষ্যা থেকে রাধানাথ রথ আসছেন।

শুনে সবাই আনন্দ প্রকাশ করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—লোকটা ভাল। বামনাই রকম আছে।

প্রফুল্লদাকে আলোচনা-প্রসঙ্গে-গুলি তাড়াতাড়ি লিখে শেষ করতে বলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। এখন পঞ্চম খণ্ডের কাজ চলছে। সেই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—এর মধ্যে তোর ও বই হয়ে যাবি নানে?

প্রফুল্লদা—নাঃ।

২২শে চৈত্র, ১৩৬৬, মঙ্গলবার (ইং ৫। ৪। ১৯৬০)

আজ ভোর থেকেই আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। ভাল ক'রে সূর্য্য উঠছেই না। শ্রীশ্রীঠাকুর আজ আর বাইরে যান নি। হলঘরের ভিতরেই আছেন। বাইরের দিকে লক্ষ্য ক'রে বলছেন—আজ weatherটা (আবহাওয়াটা) কিরকম হয়ে আছে!

কিছু পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য) এবং আরো অনেকে এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর 'সর্ব্বজ্ঞ' কথার মানে জানতে চাইলেন। পণ্ডিতদা অভিধান দেখে বলছেন—সর্ব্বজ্ঞ এসেছে জ্ঞা-ধাতু থেকে। জ্ঞা-ধাতুর মানে আছে- তেজন, তোষণ, স্তুতি, প্রেরণ, pulsating urge (স্পন্দন-সম্বেগ)।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে উল্লাস খেলে গেল। বললেন—তাহলে এই যে কয়, সর্ব্বজ্ঞ মানে 'যার সব জানা আছে' তা' নয়। বরং বলা যায়, he is the pulsating urge of everything (তিনি সব যা-কিছুর স্পন্দন-সম্বেগ), তিনি সব যা-কিছুর মধ্যে অনুপ্রেরিত হয়ে আছেন।

কেষ্টদা—এই সম্বেগ আছে একটা মানুষের মধ্যে। ইট-কাঠ, পাথরের মধ্যে কিন্তু নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছে। আমার তো মনে হয়, একটা বালুকণার মধ্যেও আছে ঐ pulsating urge (স্পন্দন-সম্বেগ)।

কেষ্টদা—জীবনের একটা purpose (উদ্দেশ্য) আছে, কিন্তু একটা বলের নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মধ্যে আছে imparted urge (যে সম্বেগ সঞ্চারিত ক'রে দেওয়া হয়েছে)।

কেষ্টদা—একটা বল যদি গড়িয়ে দেওয়া যায়, সে বাধা পেলেই থেমে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে বাধা তাকে থামাতে পারে, তাতে সে থামবে।

কেষ্টদা—জীবনের লক্ষণ তো গতিশীলতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনের উদ্দেশ্য হ'ল অস্তিত্বে বজায় থাকা এবং ঐ থাকার urge (সম্বেগ) নিয়ে চলা।

২৩শে চৈত্র, ১৩৬৬, বুধবার (ইং ৬।৪।১৯৬০)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যথারীতি হলঘরেই আছেন। পূজ্যপাদ বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) উপস্থিত আছেন। 'সর্ব্বজ্ঞত্ববীজ' নিয়ে কথা চলছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটা গাছে কয়টা পাতা থাকতে পারে হয়তো অনুমানে বলে দিলেন। প্রায় ঠিক লেগেও গেল। আমি কই, এগুলি intuition (প্রজ্ঞা)। আগে আমার রোগী দেখতে যেয়ে ঠিক প্রেসক্রিপশনটা অনেক সময় চোখের সামনে ভেসে উঠত। তবুও বই দেখতাম।

কেষ্টদা—আপনার ওগুলি কি অভ্যাসের দরুন হ'ত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি করছি তো অনেক দিন থেকে।

কেষ্টদা—ছোটবেলা থেকেই আপনার এইরকম।

বড়দা—হ্যাঁ, সেই ভাটিপাতা খাওয়ার ব্যাপারটা—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওসব আমার বুদ্ধিমত করতাম। ছোটকালে একবার ভাটিপাতা খেয়ে আমার মুখ দিয়ে জল উঠছিল আর পেট মোচড়াচ্ছিল। একদিন ঐ হেম চৌধুরী আমার কাছে বসেছিল, আরো কে কে যেন ছিল। তা' ওর ঐরকম মুখ দিয়ে জল উঠতে লাগল, আর পেট মোচড়াচ্ছে বলল। ভাবলাম, ভাটিপাতা খেয়ে যে যে লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, সেই সেই লক্ষণ যদি দেখা যায় তাহলে তার antidote (প্রতিষেধক) হচ্ছে ঐ ভাটিপাতা। সেইজন্য ওকে গোটাকয়েক ভাটির ডগা খাওয়ায়ে দিলে হয়। এটা আমার খামখেয়ালী। ওকে বললাম—দাঁড়া, রোস্। বলে ওকে ক'টা ভাটির ডগ খাওয়ায়ে দিলাম। খাওয়ার পরে কয় 'গিয়েছ্' (হেম চৌধুরীর বলার ঢং নকল করে বলছেন, বড় সুন্দর। সবাই হাসছেন)। এইরকম কেমন ক'রে বলত। ঐ আমার চিকিৎসার গোড়াপত্তন।

কেষ্টদা—এর মধ্যে intuition (প্রজ্ঞা) আছে।

বড়দা—Intuition (প্রজ্ঞা) ছাড়াও একটা feeling (অনুভব) ছিল, তা' না হলে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্ব সূত্র ধরেই বলছিলেন—আমি আগে ভাবতাম, কেবল মিষ্টি খেতে ভাল লাগে, তেতো খেতে ভাল লাগবে না কেন? সেইজন্য চিকিৎসার ব্যাপারে তেতো দিয়ে আমি অনেক জায়গায় ফল পেয়েছি।

কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুরের ছোটবেলার আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—তারপর সেই যেমন ফাউন্টেন পেন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, পেন তৈরি করেছিলাম। কালিও ভরেছিলাম। কিন্তু লিখতে যেয়ে দেখি কালি আর বেরোয় না। ছেলেমানুষ তখন আমি। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এত ক'রে করলাম, হ'ল না! তখন কামারের দোকানে যে টেকো থাকে তাই দিয়ে নিবের উপরে ফুটো করতে লাগলাম। ফুটো হয়ে তারপর কালি বেরোতে লাগল।

কেষ্টদা—ঐ ফুটোটা কেন করলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ খামখেয়ালী।

কেষ্টদা—কিন্তু খামখেয়ালীটা এমন জায়গায় পৌঁছে দিল যাতে কাজটা ঠিক ঠিক হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন কাকতালীয়বৎ ব্যাপারটা হয়ে গেল।

এর পরে পরমপূজ্যপাদ বড়দা উঠে গেলেন। আজও আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। বেলা দশটা, এখনও রোদের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

কিছু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জানতে চাইলেন, ইচ্ছা মানে কী? কেষ্টদা বললেন—ইংরেজীতে wish, will, desire এই সব বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ-সঙ্গতি যেটা, সেটাই will.

তারপর বললেন—আসল জিনিসই হল নিষ্ঠা, আনুগত্য with the stem of activity (কৃতিসম্বেগের ভূমিতে দাঁড়িয়ে)।

কেষ্টদা—সদ্‌বংশমাত্রেরই এগুলি থাকে। সদ্‌বংশ না হলে লাখবার বললেও কাজ হয় না। ভাগ্যে থাকলে পুরুষানুক্রমে ফুটে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে ভাগ্য বললেন, ভাগ্য হ'ল ভজন, মানে to serve, to observe (সেবা করা, পর্য্যবেক্ষণ করা)। ভাগ্যবান যে হয়, তার ওগুলি থাকবেই। ওগুলি যদি active (সক্রিয়) থাকে আর বিকৃত না হয়, তাহলে একশ' পুরুষ পরেও ভাগ্য ফুটে উঠতে পারে। কিন্তু বিকৃত হয়ে গেলে পরে মুশকিল। আমার মনে হয়, নার্ভগুলি যেমনভাবে ব্যবহার করা হয়, ভাগ্যও সেইভাবে গড়ে ওঠে। এর মধ্যে চোখ-কান-নাক-জিভের ব্যবহারও আছে। অসৎপথে ওগুলির ব্যবহার হ'লে ভাগ্য খারাপ হয়ে পড়ে, আর সদ্‌ভাবে ব্যবহার করতে থাকলে ভজন তখন ভালর দিকে চলতে লাগল, ভাগ্যও ফুটে উঠল।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে স্মিতহাস্যে বলছেন—আমার ঐ গানটার কথা মনে পড়ে। আগেও গাইতাম (বলে সুর করে গাইলেন—)

"ভালবাসার নিদানে
পালিয়ে যাওয়ার বিধান বঁধূ
লেখা কোন্‌খানে।"

কিছু পরে কেষ্টদা প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, অনুভূতির ব্যাপারের সাথে নার্ভের কী সম্পর্ক?

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, ও-কথা তো ঢের কইছি আপনার কাছে।

তারপর বলছেন—এই যে দশ হাজার না কত dictation (বাণী) আমার আছে, এ সবই কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা। কোথাও কোথাও আপনাদের কাছে যা' শুনেছি সেইরকম বলেছি। যেমন, আপনাদের কাছে gene (জীন্) কথাটা জানলাম। অবশ্য আমি আগেই ওটাকে বলতাম 'জনি'।

কেষ্টদা—অনেক জায়গায় ঐরকম ভাষা ও condensed form (সংক্ষিপ্ত আকার) থাকাতে অনেকের পক্ষে বোঝার অসুবিধা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপায় নেই তো!

কেষ্টদা—ধাতুর মানে ধ'রে বলতে গিয়ে আপনি যা' বলেছেন, তা' বোঝা অনেক সময় দুরূহ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম প্রথম আমি যা' বুঝি বলতাম, তা' ঐসব বইয়ের সাথে মিলত না। শেষে একদিন সুশীলদা (বসু) জ্ঞান দাসের ডিকশনারি নিয়ে গেল। তার মধ্যে বেশ কিছু মিল্‌ল। তখন থেকে ধাতুর পোঁদে লাগলাম। দেখলাম, ধাতুগত অর্থের মধ্য দিয়ে গেলে আমি যা' বলি সবই মেলে। আবার, ধাতু বলতে আমি কই intent of the word (শব্দটির মৌলিক তাৎপর্য্য)।

কেষ্টদা—বঙ্কিমদা (রায়), পঞ্চাননদা (সরকার), এরা ধাতু ধ'রে এমন কতকগুলি শব্দ coin (গঠন) করেছে, যার কিছুই বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন একটা শব্দ 'মূর্ত্তনা'। 'মূর্ত্ত' কথাটা আছে তো! তার থেকে আমি মূর্ত্তি দেওয়া অর্থে 'মূর্ত্তনা' বললাম।

কেষ্টদা—মানুষ সেগুলো বুঝতে পারে কিনা দেখা লাগবে তো! ভবিষ্যতে হয়তো ঐ মূর্ত্তনা কথার নানারকম মানে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বঙ্কিম, পঞ্চাননদা, এদের অনেক করা আছে বটে, কিন্তু আপনার কাছ থেকে সবই প্রায় শুনে নেওয়া আছে। এই যে ইলেকট্রন, অ্যাটম, এসব আপনি আমার কাছে যেমন বলেছেন, তাই শুনে আমার যা' মনে হয়েছে তা' ওদের কাছে বলেছি। তা' না হলে ওরকম পাগলের মত কইতেই পারতাম না।

কেষ্টদা—হ্যাঁ, আপনি ওগুলো যেভাবে বলেছেন, সে অঙ্গভঙ্গী, সে exposition (প্রকাশ) লিখে রাখাও সম্ভব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার আঁকিয়ে আঁকিয়েও দেখাতাম। ঐ সবগুলির মধ্যেই কিন্তু বাস্তবতা আছে। এ বিষয়ের ক খ না জেনেও, আপনার কাছে শিখলাম। সেইজন্য এখন আর আপনাকে না হলে চলেই না।

কেষ্টদা—ম্যাগডুগাল বলেছেন, এক একটা জিনিসের নাম দিতে হয় ভাষার মধ্যে তার পরিচয় দেবার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাষার মধ্যে থাকে ভাব, ভাব আবার এসেছে 'হওয়া' (ভূ-ধাতু) থেকে। আবার, ভাবই transmitted (সঞ্চারিত) হয় into word (শব্দে) এবং wordই (শব্দই) হয় ভাষা। সেইজন্য প্রতিটি word-এর (শব্দের) মধ্যে তার ভাব দেখতে হয়।

কেষ্টদা—এমনতর ভাষা-অনুপাতিক ভাবের সৃষ্টি আপনার মধ্যে হ'ত কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনিই তো নানাভাবে বলতে বলতে তা' অনেকখানি সোজা ক'রে দিয়েছেন আমার মধ্যে। আপনার কাছ থেকে যা' হয়েছে তা' অসম্ভব। সৃজন-প্রগতির যে dictation (বাণী) দিলাম, সে তো একেবারে অসহ্য ব্যাপার।

কেষ্টদা—তারপর মেসেজ্ বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ঐ একটা অসইলি কাণ্ড।

কেষ্টদা—মেসেজ বলার আগে আপনার কাছে কোনদিন একটা full correct English sentence (বিশুদ্ধ ইংরেজী বাক্য) শুনি নি।

বিকালে বড় দালানের বারন্দায় বসে শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে (হালদার) বলছিলেন—Greatest good for the greatest number (বহু জনের জন্য সর্ব্বোত্তম মঙ্গল), এ যে কত লোকে কত পণ্ডিতে কয় তার ঠিক নেই। এটা একটা চলতি কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হওয়া উচিত greatest good for every individual (প্রতিটি ব্যষ্টির জন্য সর্ব্বোত্তম মঙ্গল)। আগে প্রতিপ্রত্যেকের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হবে। প্রত্যেকে যদি থাকে, সেই প্রতিটির মধ্যে আমিও একজন, আমিও থাকব।

২৪শে চৈত্র, ১৩৬৬, বৃহস্পতিবার (ইং ৭। ৪। ১৯৬০)

আগামী ৩১শে চৈত্র নববর্ষ-উৎসব আরম্ভ। প্রতি উৎসবে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর একটি আশীর্ব্বাণী প্রদান করেন। এবারও আশীর্ব্বাণীর জন্য কয়েকদিন যাবৎ প্রার্থনা জানানো হচ্ছে। আজ শুক্লা একাদশী। আজ প্রাতে হল্‌ঘরে বসে শ্রীশ্রীঠাকুর আশীর্ব্বাণী দিতে আরম্ভ করলেন—

"চৈত্রের ধূলি-ধর্ষিত
অজস্র ঘূর্ণিকে অতিক্রম ক'রে
জননী প্রকৃতি আমার
বৈশাখে পদার্পণ করলেন আজ......"

লিখতে বেশ কয়েক পাতা হয়ে গেল। একটা ভাবগম্ভীর অবস্থায় একটানা বলে চললেন দয়াল আমার। চারিদিক যেন স্বভাবতঃই শান্ত হয়ে গেল। এক দিব্যমধুর পরিবেশে শুধু ধ্বনিত হতে লাগল তাঁর শ্রীমুখোচ্চারিত বেদমন্ত্রসদৃশ শব্দরাজি।

আশীর্ব্বাণী শেষ হতে ৯-৪০ মিনিট বেজে গেল। তারপর সেটা আবার কয়েকবার পড়া হ'ল, ও-সম্বন্ধে একটু আলোচনাও হল। হতে হতে স্নানের বেলা হয়ে গেল।

রাতে প্রফুল্লদা (দাস), শরৎদা (হালদার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ উপস্থিত আছেন। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলছে। শরৎদা একসময় জিজ্ঞাসা করলেন—আজকাল student-দের (ছাত্রদের) মধ্যে ভীষণ indiscipline (উচ্ছৃঙ্খলতা) চলছে। সবাই এজন্য চিন্তিত। এর মূল কারণটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূল কারণ, allegiance (আনুগত্য) বলে কোন জিনিস নেই, নিষ্ঠা নেই। আর, সেগুলি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অতি সযত্নে। Discipline (শৃঙ্খলা) কথার মধ্যেই আছে disciple (অনুশাসিত হওয়া)। Disciple (অনুশাসিত) হলে discipline (শৃঙ্খলা-বোধ) আপনা থেকেই আসে।

তারপর ইংরেজীতে বাণী দিলেন—

Achieve discipleship
of the Master, the Guide
in thoughts words and action
with every interested urge
and have discipline.

(অন্তরাসী আকৃতি নিয়ে বাক্য, কর্ম্ম ও ব্যবহারে প্রভু যিনি, পরিচালক যিনি, তাঁর শাসনে অনুশাসিত হও, এইভাবে শৃঙ্খলা অধিগত কর)।

প্রফুল্লদা—মানুষ তো ঐ হওয়াটা বাদ দিয়ে সব সমাধান করতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে হয় টেলিফোনের তার কেটে দেওয়ার মতন। টেলিফোন ঘরে থাকলেও তখন আর কিছু শোনা যায় না।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিলেন—

নিষ্ঠা যাদের নাই—
সঙ্গতিশীল সদ্-বিবাহে
নাইকো তাদের ঠাঁই।

কেষ্টদা—ঐ নিষ্ঠা মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিষ্ঠা মানেই principle-কে adopt (আদর্শকে গ্রহণ) ক'রে তদ্‌ভাবে ভাবিত হয়ে চলা। (ব'লে আপন মনে সুর ক'রে গাইছেন) 'এমন দিন কি হবে মা তারা......' (তারপর গেয়ে উঠলেন) 'জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যিনি দিয়ে নানা খাদ্যখানা......।

কেষ্টদা আরো কয়েকটা রামপ্রসাদী গান মুখে মুখে ব'লে শোনালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ডান কাত হ'য়ে আছেন ডান হাতের উপর মাথাটি রেখে। মন দিয়ে শুনছেন কেষ্টদার বলা গানগুলি। তারপর উঠে বসলেন। এই সময় সস্ত্রীক মেণ্টুদা (বসু) এসে বসেছেন। তাকে দেখিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও-ও অনেকগুলো গান লিখেছে।

কেষ্টদা আর বসলেন না, উঠে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মেণ্টুদাকে বলতে লাগলেন—গান যদি লিখিস্, এমনভাবে লিখবি যাতে কেউ twist (বিকৃত) করতে না পারে। যেমন, ভগবান সম্বন্ধে তুমি কোন গান লিখলে। একজন হয়তো সেটা মেয়েছেলে সম্বন্ধে গাইছে। অবশ্য গান কেউ মেয়েছেলে সম্বন্ধেও গাইতে পারে, পেচ্ছাপ করা সম্বন্ধেও গাইতে পারে। কিন্তু তুমি যে গান লিখেছ তার composition (রচনা) যদি কেউ পড়ে, তার হ'য়ে যাবে একেবারে, এমন হওয়া চাই। আর, গানগুলি যেন সহজ, সুন্দর, ছোট্ট হয়—স্বতঃ-উৎসারিত সন্দীপনায়। রামপ্রসাদের লেখা ঐরকম ছিল। আসল কথা হ'ল নিষ্ঠা আর আনুগত্য। নিষ্ঠা ছাড়া আনুগত্য থাকে না। নিষ্ঠা যার ভ্রান্ত, আনুগত্যও তার ভ্রান্ত। নিষ্ঠা যার থাকে, তার সব কিছুর মধ্যেই থাকে। হাগতে বসেছে তখনও নিষ্ঠা, কল্‌কল্ ক'রে প্রস্রাব করছে তারও মধ্যে নিষ্ঠাই বেরোচ্ছে। আবার, ঐ নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিচর্য্যা সব করা ও বলাগুলিকে একায়িত ক'রে তোলে। সব-কিছুর বিশেষত্ব বের করে, তারপর কোন্‌টার সাথে কোন্‌টার কী সঙ্গতি তাও বের করে।

মেণ্টুদা—আনুগত্য কি ইংরাজীতে obediance ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, allegiance. নিষ্ঠা থাকলেই আনুগত্য আসবে। সেবা-অনুরাগ এর central figure (কেন্দ্রীয় প্রতীক) আমার ইষ্ট, আদর্শ। তাঁর প্রতি সেবা-অনুরাগ নিয়ে চলা তোমার characteristics (চরিত্র-লক্ষণ) হ'য়ে উঠুক। আজ যদি তোমার গাল ভ'রে কেউ মুতে দেয় তবুও ঠিক থাকবে। ঐ যে রবি ঠাকুরের লেখা আছে 'কেষ্টা বেটাই চোর'। এত শুনেও সেই কেষ্টা ঠিক ছিল। ঐরকম হ'তে হয়।

মেণ্টুদা—সে নিজের সত্তাটাকে একটা universal being feel (বিশ্বসত্তার মত বোধ) করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Feel (বোধ) যে করে তা' সে কইতে পারবে না। ঐ characteristics (চরিত্র-লক্ষণ) তাকে স্পর্শ করেছে, এই তার লক্ষণ। হিরো এ্যান্ড হিরো-ওয়ারশিপ্

বইয়ের মধ্যে আছে, হিরোগুলি যখন আসে তখন তারা কী যে জানে আর কী জানে না তা' নিজে বোধ করতে পারে না। কিন্তু জানে সব। (ক্ষণেক বিরতির পর আবার বলছেন) কিছু একটা যখন পড়বে তার মধ্যে তোমার পক্ষে, অন্য সবার পক্ষে, এমন-কি গাছপালার পক্ষেও শুভ কী আছে, অশুভও বা কতটা আছে তা' হিসাব ক'রে নেবে। যেখানে অশুভটার আর সঙ্গতি করতে পারছ না সেখানে power of resistance (নিরোধী ক্ষমতা) খাটাবে, যেন নিজেরও ক্ষতি না হয়, অন্যেরও ক্ষতি না হয়। 'কিন্তু সব কথা রাখিবে গোপন'—রামদাসের কথা। যা' তুমি করবে তা' প্রকাশ করতে যেও না। রামদাস নাকি politician-ও (রাজনীতিকও) ছিলেন। শিবাজীর চালক তো উনিই। সেই শিবাজী আওরঙ্গজেবকেও ঘোল খাইয়ে দিল। আওরঙ্গজেব যখন ওকে বন্দী ক'রে রেখেছিল, তখন কী কৌশলে পালিয়ে আসল। একটা প্রবাদ আছে, শিবাজীর পায়ে নাকি পাখা ছিল, উড়ে যেত।

মেণ্টুদা—একটা লোক যদি অন্যায় না করে তাহলে তাকে যমেও ছুঁতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি অন্যায় কেন করবে? সাবধানে চলবে। একটা গাছ যখন বড় হ'তে থাকে, প্রকৃতি তাকে কত সাবধানে রাখে। এখন তুমি চেষ্টা কর how to manage thyself (কিভাবে তোমাকে গ'ড়ে তুলবে)। আবার, চারাগাছটা যদি ছাগল খেয়েও ফেলে, সেখান থেকে আবার কুসি পাতা বেরোয়।

রাত ১০টা বেজে ১০ মিনিট হ'ল। বঙ্কিমদা (রায়) এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে—কি রে, ওঠার সময় হয়েছে নাকি?

বঙ্কিমদা—যদি একটু সকাল-সকাল ওঠেন; তাহলে হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, না, সময় হয়েছে নাকি?

বঙ্কিমদা—দেরি আছে ১১টা বাজতে। (শ্রীশ্রীঠাকুর আজকাল ১১-৮ মিনিটে উঠছেন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও, তাহ'লে দে (হাত পাতলেন)। তুই ওরকম ক'রে তো সেই সময়েই দাঁড়াস্, তাই আমার মনে হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে পান-সুপারি দেওয়া হ'ল। মুখে ফেলে দিয়ে বললেন—আরো গান আছে রামপ্রসাদের। ছিল শাক্ত। কিন্তু রকমটা কেমন! কী সুন্দর লিখল—মাকে খাওয়াতে চাস্ তুই ভেড়া বক্‌রী আর ছাগলছানা!—না কি?

মেণ্টুদা—আজকাল বেশি লোকজন ভাল লাগে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন লাগে তখন বাইরে যাস্, না লাগলে যাস্‌নে। মদ-মাতালের মতন মাতাল হ'য়ে ওঠ্। ঐ যে আমি সুধা খাই জয় কালী ব'লে।

মেণ্টুদা—মিশন নিয়ে যে চলব তা'র আর impetus (প্রেরণা) পাচ্ছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরে মিশন-টিশন পরে। আগে নিজের জীবনের মণিকেন্দ্র ঠিক রাখা লাগে। সবসময় দেখতে হয়, আমার আচার ব্যবহার চালচলন যেন অন্যের কষ্টদায়ক না হয়, আর সবার পরিচর্য্যী হয়। কারণ, মা আছেন সর্ব্বঘটে। সবাই তাঁর সন্তান। সেই বোধে সবদিকে নজর রাখতে হবে।

অনেকক্ষণ ধ'রে আলোচনা চলছে। তাই, বঙ্কিমদা কাছে এগিয়ে এসে বললেন—১০টা ৩২-এ উঠলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাকু সেবন করছিলেন। মুখের থেকে নলটি সরিয়ে বললেন—দাঁড়া, রোস, উঠব নে। আবার কিছুক্ষণ নলে টান দিয়ে ধূম উদ্‌গীরণ ক'রে বলতে লাগলেন—মানুষকে কষ্ট না দেওয়া, সৎ-পরিচর্য্যা করা, এইতো মানুষের পূজা। তাই ক'রে চল। মনে রেখো, মা বিরাজেন সর্ব্বঘটে। তাই বলি, বিশ্লিষ্ট হ'য়ো না, বিশ্লিষ্ট ক'রো না, সংশ্লিষ্ট থাক, সংশ্লিষ্ট কর। তোমার শাসন, তর্জ্জন, গর্জ্জন, ক্রোধ যেখানে লোককল্যাণ না আনে, তা' ব্যবহার ক'রো না। তখনই ব্যবহার ক'রো যখন তা' কল্যাণপ্রসূ হয়। অকল্যাণ যা'-কিছু, বিচ্ছেদপরায়ণ যা'-কিছু তাকে আমাদের ভাষায় বলে কাল, ওরা কয় satan (শাতন)।

এই সময় মেণ্টুদা সবাইকে নিয়ে উঠে গেলেন। সুধাপাণিমা এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ দুপুরে কখন খাইছিলি?

সুধাপাণিমা—আপনি ঘুমিয়ে পড়লে আপনার এখান থেকে যেয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অত দেরি ক'রে খেতে কষ্ট হয় না তোর?

সুধাপাণিমা—না।

সরোজিনীমা এলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন দয়াল—আজ কী দিয়ে খেলি রে?

সরোজিনীমা—ডাল, আলুভাতে, বড়িভাজা, আলুর ঝোল, আর একটু দুধ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কে রাঁধিছিল?

সরোজিনীমা—এ বেলা বিন্দু রাঁধিছে। ওবেলা বৌমা রাঁধিছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিন্দু কেমন রাঁধে?

সরোজিনীমা—ভাল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠছেন। চটি পায়ে দিতে দিতে সকালে দেওয়া আশীর্ব্বাণী প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা কেমন হ'ল বুঝতে পারলাম না।

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)—খুব সুন্দর হয়েছে, খুব সহজ।

২৫শে চৈত্র, ১৩৬৬, শুক্রবার (ইং ৮। ৪। ১৯৬০)

আজকাল রোজ সকালেই শ্রীশ্রীঠাকুর একটু ক'রে হাঁটছেন। রাতে বড় দালানের হলঘরেই থাকেন। সকালে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন ক'রে ওখান থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পূবদিকে হাঁটতে থাকেন। শ্রীশ্রীবড়মার দালানঘরের পাশ দিয়ে যতি-আশ্রমের সামনে দিয়ে ঘুরে অশত্থতলা ও কাঠের কারখানার পাশ দিয়ে এসে পশ্চিমের ছাউনিতে বসেন। কিছুক্ষণ সেখানে বসে রোদে তেজ হবার আগেই উঠে হেঁটে চলে আসেন আবার হলঘরে।

আজও যথারীতি এসেছেন পশ্চিমের ছাউনিতে। ৮-৪৫ মিনিটের সময় চটিজোড়া পায়ে দিয়ে উঠে পড়লেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বিশুদা (মুখোপাধ্যায়), চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ সাথে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। বড় দালানের দিকে এগিয়ে চলেছেন। বেলতলা ছাড়িয়ে এসেই গান ধরলেন—

'যেদিন সুনীল জলধি হইতে
উঠিলে জননী ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব,
সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ?'

গাইতে গাইতে চ'লে এসেছেন দালানের প্রশস্ত সিঁড়ির কাছে। এই বয়সেও কী অপূর্ব কণ্ঠ তাঁর! আত্মভোলা আনন্দে গেয়ে চলেছেন। গান শেষ হ'ল সিঁড়ির উপর উঠে।

ধীরে-ধীরে ঘরের ভিতর প্রশস্ত শয্যায় এসে উপবেশন করলেন দয়াল ঠাকুর। সামনের উঠান দিয়ে প্রফুল্লদা (দাস) যাচ্ছিলেন। দেখতে পেয়ে ডাক দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—"এই প্রফুল্ল!" প্রফুল্লদা 'আজ্ঞে' বলে এগিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে একটি নতুন পাইলট পেন দিলেন। কলমটি ভক্তিভরে গ্রহণ ক'রে, দয়ালের শ্রীচরণে আভূমি প্রণাম নিবেদন ক'রে প্রফুল্লদা চ'লে গেলেন।

আমেরিকান গুরুভ্রাতা ডন লুটম্যান শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে চিঠি দিয়েছেন, জানিয়েছেন তাঁর ও তাঁর সহধর্মিণী জোনির কুশলবার্ত্তা। চিঠিখানি শ্রীশ্রীঠাকুরকে পড়ে শুনিয়ে কী উত্তর লিখব জানতে চাইলাম। তিনি লুটকে উদ্দেশ্য করে বললেন—অনেকদিন পর তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দ হ'ল। সে কি কলরব! সে কি হর্ষ! অদম্য কর্ম্মী হওয়া ভালই, কিন্তু তা' in the service of the people (মানুষের সেবার জন্য)। লক্ষ্য রেখো, ভিতরে-বাইরে তোমার স্বাস্থ্যের equilibrium (সাম্য) না হারাও। মা জোনিও যেন স্বাস্থ্য ঠিক রেখে চলে।

অজিতদাকে (গাঙ্গুলী) শ্রীশ্রীঠাকুর স্কুল ফাইনাল পাশ করতে বলেছিলেন। এই বছরই অজিতদা পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষা শেষ ক'রে গতকাল আশ্রমে এসে

পৌঁছেছেন। এখন এসে প্রণাম করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখন ইংরাজী literature (সাহিত্য), science (বিজ্ঞান) ইত্যাদি এমনভাবে প'ড়ে ঠিক করে নিবি যে যেখানে যেয়েই কথা বলবি, তা' শুনে লোকে যেন মনে করে, 'এ লোকটা ডক্টরেট না কি?' রেবতী (বিশ্বাস) science (বিজ্ঞান) জানে। ওর কাছ থেকে আই-এস-সি-র জিনিসগুলি শিখে নিবি।

অজিতদা—আই-এস-সি না আই-এ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আই-এ তো নিজে নিজেই পারবি। আই-এস-সি-টা আগে ঠিক ক'রে নে।

এই সময় সুধীর দাসদাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—এক সের কাঁচাগোল্লা দেখতে কতখানি?

সুধীরদা হাত দিয়ে আয়তনটা দেখালেন। তাঁকে আবার বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে দেড় সের লাগবে। বেশ রসালো হওয়া চাই। শুকনো না। রমণের মার জন্যে তৈরী ক'রে দাও।

সুধীরদা প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। ওঁর নিজের খাবারের দোকান আছে। একটু পরে সুশীলদা (বসু) বললেন—জাস্টিস জে, এন, মজুমদার এখানে এসেছেন। ওঁর করোনারী অ্যাটাক হয়েছিল। এখানে কয়েকদিন থাকবেন। আমাদের কাছে একজন ডাক্তার চেয়েছেন। কাকে পাঠাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ননী (মণ্ডল) থাকলে ভাল হ'ত। অগত্যা প্যারীচরণ (নন্দী)। ও তো আবার কী কইতে কী কয়! ওকে ভাল ক'রে শেখায়ে দেবেন যেন ঘাবড়ায়ে না দেয়। তাহলে অবিশ্বাস এসে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ পেয়ে প্যারীদা মিঃ মজুমদারকে দেখতে রওনা হয়ে গেলেন। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খগেনদাকে (তপাদার) বলেছিলেন, তিত্তিরিদিকে দু-খানা পাউরুটি এনে দিতে। এখন তিত্তিরিদিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—রুটি পাইছিস?

তিত্তিরিদি—এখনও আসে নি।

সামনে বৈকুণ্ঠদা (সিং) দাঁড়িয়ে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈকুণ্ঠ! দুখানা বড় পাউরুটি এনে দেবে?

'হ্যাঁ' বলে বৈকুণ্ঠদা চ'লে গেলেন। রুটি এনে দিলেন তিত্তিরিদিকে। উড়িষ্যা থেকে বিকাশদা (ভৌমিক) একটি দাদাকে সঙ্গে ক'রে এসেছেন। দাদাটি জিজ্ঞাসা করলেন—আমি চাকরি করব না ব্যবসা করব? অনেক কষ্টে এই চাকরি পেয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাকরি আমার ভালই লাগে না। তবে টক ক'রে চাকরি ছেড়ে দিয়ে যেন অজলে অস্থলে পড়ো না।

বিকাশদা—ভুবনেশ্বরে ও পুরীতে আপনি বাড়ীর খোঁজ করতে বলেছিলেন—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, পুরীতে আমি যে বাড়ীখানায় (হরনাথ লজ) ছিলাম, সেখানার উপর আমার লোভ আছে। বাড়ীটার মধ্যে একটা উঁচু জায়গা আছে, একটা নিমগাছ আছে। ঐ বাড়িটার 'পরে আমার একটা sentiment (ভাবানুকম্পিতা) আছে। যখন ওখানে ছিলাম তখন আমার মা আমার সাথে ছিলেন, আর সব সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল। একদিন ওখান থেকে সাক্ষীগোপাল পর্য্যন্ত খড়ম পায়ে দিয়ে চ'লে গিয়েছিলাম, আর বিকালে ফিরেছিলাম।

বহুদিন আগেকার এই সব সুখস্মৃতি রোমন্থন করতে করতে শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে বিভোর হয়ে পড়েছেন। কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে কাটে। তারপর বিকাশদা নিজের সাংসারিক কথা-প্রসঙ্গে বললেন—আমার বোনের বিয়ে নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছে। একটা ছেলে বিয়ে করতে চায়। তারা কায়স্থ, পাল।

মৃদু ভর্ৎসনা করে শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর দিলেন—অমন করবের (করতে) যাস্ ক্যা? সদৃশ ঘরই সব চাইতে ভাল। সদৃশর মত জিনিসই নেই। অবশ্য ওটাতে অনুলোমই হয়। তাহলেও কোথা দিয়ে যায়, কী দিয়ে কী হয় বলা যায় না।

বিকাশদা—আমার লিউকোডার্মা হয়েছিল। ডাক্তারী চিকিৎসায় সেরে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কলার পাতায় বা পদ্মপাতায় ভাত খেও, ওর মধ্যে ক্লোরোফিল থাকে।

বিকাশদা—রান্না করতে কি মাটির হাঁড়ি ভাল না এনামেল বা টিনের পাত্র ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাটির মত আর জিনিসই নেই। মাটি হল মা-টি।

বেলা সাড়ে দশটা। শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার সাথে কিছুক্ষণ 'প্রাইভেট' কথা বললেন। তারপর বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পা-দুখানি উপরে তোলার চেষ্টা করলেন বার তিনেক। পা অনেকটা উঠল। আজকাল মাঝে-মাঝেই এটা অভ্যাস করছেন।

তারপর উঠে বসে বিকাশদাকে দেখিয়ে কেষ্টদাকে বলছেন—ওরা পুরীতে থাকে। আমি ওদের বললাম হরনাথ লজটা যদি কিনে দিতে পারে। টাকা-পয়সা জোগাড় ক'রে যেভাবে যা' করা লাগে সেইভাবে যদি কেনবার চেষ্টা করে তাহলে ভাল হয়। এই বাড়ীতেই পূবের দিকে একটা উঁচু জংলা জমি ছিল। সেখানে বসতাম, গল্প করতাম।

বিকাশদা—আমি ওখানে আমার মতন ক'রে যাজন-টাজন করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করবে। খুব ভাল। তোমাদের খাওয়া-দাওয়া যেমন জীবনীয় কর্ম্ম, এও তেমনি জীবনীয় কর্ম্ম। আবার, নিজেদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক রেখে তারপর যদি একাজ করতে যাও, তখন কিন্তু একাজের জন্য যে energy (উদ্যম) দরকার তা' আর পাবে না।

বিকাশদা'র সঙ্গে আগত যে দাদাটি নিজের চাকরীর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এখন তাঁর দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ছড়া দিলেন—

চাকরিবাজির বেকুব আবেগ
ক্রীতদাসবুদ্ধি আনেই আনে,
ঐতিহ্য আর শ্রেষ্ঠনিষ্ঠায়
করেই ব্যাঘাত আঘাত দানে।

স্নানের বেলা হল। শ্রীশ্রীঠাকুর এখন উঠছেন। সকলেই উঠে পড়লেন এবেলার মত।

সকালে ডাঃ প্যারীদা জাস্টিস জে, এন, মজুমদারকে দেখে এসেছেন। সন্ধ্যার পর উনি শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এলেন। মিঃ মজুমদার পাবনার মানুষ। শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় চৌকিতে সমাসীন। মিঃ মজুমদার ধীরে ধীরে সুশীলদার কাঁধে ভর দিয়ে প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন। শরীর দুর্ব্বল। আগেই ওঁর বসার জন্য চেয়ার আনা ছিল। উনি উঠে আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর ত্রস্তে বললেন—বসেন, বসেন।

মিঃ মজুমদার—একটা প্রণাম করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে বসেন।

নত হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে প্রণাম নিবেদন ক'রে চেয়ারে বসলেন মিঃ মজুমদার। বসে বললেন—শরীর খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকদিন পর আপনাকে দেখলাম, আমার মহাভাগ্যি। আমি তো নড়তে পারি না, চড়তে পারি না, আপনাকে সেই আগের মতন দেখতে ইচ্ছে করে। সেইরকম লাঠি ভর দিয়ে আবার ঘুরে বেড়ান। মধু খান না?

মিঃ মজুমদার—মাঝে মাঝে খাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মধু খাবেন। ঠাণ্ডা জলে মধু খেলে পেট ঠাণ্ডা হয়।

আরো কিছু কথাবার্ত্তার পরে মিঃ মজুমদার বিদায় গ্রহণ করলেন। উঠে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাবধান, ধরে নামবেন।

সিঁড়ির উপর পা রাখতে রাখতে মিঃ মজুমদার বললেন—আপনার এখান থেকে আমি কাউকে ধরে নামব না। সে যদি প'ড়ে মরেও যাই তাও ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলাই-বালাই! মরবেন কেন?

নেমে যেয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন মিঃ মজুমদার। শ্রীশ্রীঠাকুরের পানে সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—আর একবার দেখে যাই।

প্রভুর আননকমলে বরাভয়পূর্ণ স্মিত হাসির রেখা। করযুগল অঞ্জলিবদ্ধ। এই অচিন্ত্যসুন্দর মূরতি দর্শন করতে করতে মিঃ মজুমদার সঙ্গীদের সাথে বেরিয়ে গেলেন। যতদূর ওঁকে দেখা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর সুধীর দাসদাকে কাঁচাগোল্লা তৈরী করতে বলেছিলেন। সুধীরদা এখন তা' নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতে আসামের ধীরু বিশ্বাসদা হাতে ক'রে নিলেন এবং রমণের মা ও অনুরাধা-মাকে সমান ভাগে ভাগ ক'রে দিলেন। কাঁচাগোল্লা পেয়ে ঐ দুজনে খুব খুশি, শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখালেন। রসিক-চূড়ামণি দয়াল ঠাকুরও খাওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়ে বললেন—লাগাও। কে খাওয়ালো?

প্রত্যক্ষভাবে ধীরেনদা হাতে ক'রে দিয়েছেন। তাই রমণের মা বললেন—ধীরেন।

সবাই হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে শ্রীশ্রীঠাকুরও বললেন—যে তোমাকে অত গাল পাড়ে, সে-ই খাওয়ালো? ভগবানের কী লীলা!

এই সময় শরৎদা (হালদার) কার্লাইলের 'হিরো অ্যান্ড হিরো-ওয়ারশিপ' বইখানা হাতে ক'রে এলেন। কিছু বাছা-বাছা অংশ পড়ে শোনালেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, 'পরিত্রাণায় সাধুনাং' মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিত্রাণকে আমি একটা continuity (নিরবচ্ছিন্ন ধারা) বলে মনে করি। পরিত্রাণ হল gradual uplifting movement (উন্নতিমুখর চলনের ক্রমাগতি)। ওর মধ্যে আবার 'পরি' আছে, তার মানে completely (সম্পূর্ণভাবে)। অচ্যুত নিরন্তরতায় চ'লে সাধুরা যখন ঐ complete upliftment-এ (পূর্ণ উন্নতিতে) পৌঁছায়, তখন হয় তাদের পরিত্রাণ। আর, ঠিক উল্টোটা হল 'বিনাশায়'—gradual decaying (ক্রমশঃ ক্ষয়মুখী)।

শরৎদা—'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্', এখানে 'দুষ্কৃতাম্' বলতে আপনি কি দুষ্ট কর্ম্মকে বোঝেন না দুষ্টপ্রবৃত্তিসম্পন্ন লোককে বোঝান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুষ্ট মন থাকলেই লোকে দুষ্ট কর্ম্ম করে। তাই, মন ঠিক করা দরকার আগে। আমি যে এত কিছু করি, সবসময় দেখি, মানুষের মন কিভাবে adjust (বিনায়িত) করা যায়। মন দুষ্ট না হলে কর্ম্মও দুষ্ট হবে না। ঐ যে সেই চোরের গল্প করেছিলাম। তার মনটা যেই ঘুরে গেল, সে হয়ে পড়ল একটা ভাল মানুষ।

শরৎদা—এই যে কথা আছে, 'অবতার নাহি কহে আমি অবতার', তা' কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, তাঁর অবতারত্বের অভিমান নেই। অভিমান থাকা মানেই 'আমি যে জ্ঞানী' এই বোধ থাকা। তা' তাঁর থাকে না। 'আমি জানি' জানার এই অহঙ্কার কিন্তু জ্ঞানলাভের অন্তরায়। তিনি শুধু বলেন, 'তোমরা আমার কাছে এসো। আমার উপর যদি তোমাদের নিষ্ঠা থাকে, faith (বিশ্বাস) থাকে, I shall make

you fishers of men (আমি তোমাদের মানুষ-ধরা জেলে তৈরী ক'রে দেব)'। আবার কেষ্ট ঠাকুর অর্জুনকে বলেছিলেন, 'তোমার-আমার বহু জন্ম হয়ে গেছে। তা' তোমার মনে নেই, কিন্তু আমার মনে আছে।'

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—তাহলে তো তিনি নিজের সম্বন্ধে conscious (সচেতন)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐরকম conscious (সচেতন)। অভিমান নেই। কি রকম? যেমন ধর, ঐ কাঠটার বিষয়ে তোমার জ্ঞান আছে। সে জ্ঞানটা হল তোমার element (উপাদান) কাঠের মধ্যে কতখানি আছে, আবার কাঠের element-ও (উপাদানও) বা তোমার মধ্যে কতখানি আছে, সেটা জানা। তেমনি তিনিও সর্বজ্ঞ। এই sense-এ (অর্থে) সর্বজ্ঞ যে তাঁর identity (অভিন্নত্ব) আছে সব কিছুর সাথে, তিনি সব যা-কিছুর মধ্যে অনুপ্রেরিত হয়ে আছেন (জ্ঞা ধাতু—প্রেরণ)। আমার এইরকম ক'রে ভাবতে ভাল লাগে। (ক্ষণেক নীরব থেকে শরৎদার দিকে তাকিয়ে বলছেন) এই যেমন আপনি যখন হেঁটে যান, ভুলে যান যে আপনি শরৎদা। কিন্তু আপনাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি 'কে রে?' 'আজ্ঞে আমি শরৎদা', ঐ তখন conscious (সচেতন) হলেন। এই যে আপনি শরৎ। এ নাম কে রেখেছে? এটা তো innate (জন্মগত) না। কিন্তু এর দ্বারা আপনি identified (চিহ্নিত) হচ্ছেন। সেইরকম অবতারকেও অন্য লোকে কয় অবতার। তিনি জানেন না যে তিনি অবতার। সেইজন্য গৌরাঙ্গদেবের ঐ রকম কথা আছে, 'অবতার নাহি কহে আমি অবতার'। এই যে আমার কথা, আমি যে জানি—এ আমার কখনও মনে হয় না।

শরৎদা—সত্যিই মনে হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' না হলে ঐরকম করি। (তাঁর বলার ঢং-এ সবাই হাসছেন)। কিন্তু একটা impulse (প্রেরণা) দেন, তখন হয়তো সেই বিষয়ে বলব। আমি যে এত কথা ক'লেম, আমি যে এত জানি, এ আমার বিশ্বাসই হয় না। আমার মনে হয়, আপনারা ঢের বেশী জানেন।

এরপর নিষ্ঠা নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—নিষ্ঠা থাকলেই active allegiance (সক্রিয় আনুগত্য) থাকে। এই যে বড় বৌয়ের কথা দেখ না। বড়-বৌ পা ছড়ায়ে বসে রান্না করে (নিজে ঐভাবে বসে দেখালেন। তারপর) ঐ রকম করতে করতে কড়াই নামাতে যেয়ে পায়ে লেগে পুড়ে গেছে। সে কথা আমার কাছে কয়ও না, কিছুই না। ভাবে, কইলে ঠাকুর unnerved (অস্থির) হয়ে পড়ে না কি! কিন্তু ঐ নিয়েই কাজ ক'রে যাচ্ছে, কত কী করছে।

রাত সাড়ে দশটা বাজে। আবহাওয়ায় একটু গরম ভাব আছে বলে শ্রীশ্রীঠাকুর আজ এখনও ঘরে যান নি, বারান্দাতেই আছেন। কালীষষ্ঠীমা, সুশীলামা, শৈলমা,

প্রমুখ মায়েরা এসে একে একে বসলেন। দয়াল তাঁদের সাথে ছোটবেলার নানারকম গল্প করছেন। এই সময় স্পেন্সারদা ও মেণ্টুদা (বসু) এসে বসলেন।

ছোটবেলার কথা শুনতে শুনতে স্পেন্সারদা জিজ্ঞাসা করলেন—ছোটবেলার স্মৃতি কি আপনার কিছু মনে আছে?

একেবারে শিশু বয়সের স্মৃতি উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—ছোটকালে আমার মনে আছে, যখন নড়তে-চড়তে পারি নে, একটা খাঁচার মত ছিল, তার মধ্যে থাকতাম। চোখের সামনে যে রং দেখতাম, ভাবতাম, আমি যেন সেই রং হয়ে গেছি। আস্তে আস্তে রং-এর একটার সাথে আর একটার contrast (পার্থক্য) বুঝতে পারলাম। তারপর যখন হাঁটতে পারতাম, তখন মনে হ'ত একটা বাঁশ দিয়ে আকাশটা ফুটো করা যায়। যত বড় হ'তে লাগলাম, আকাশও তত দূরে সরে যেতে লাগল। ঐ সময় আমার মাজায় পুটো ছিল, মাথায় চাঁদ ছিল সামনে ঝোলানো। আর দোলাই পরতাম। তখন কাশীপুরে ঐ bridge-টা (পোলটা) ছিল। বাবা সেখানে থাকতেন। একদিন হাঁটতে হাঁটতে সেখানে চ'লে গেলাম। জায়গাটা খুব দূর মনে হ'ল। ঐ সময় সকালে উঠে কর্ত্তামা আমাকে এক কাঠা ক'রে মুড়ি দিত। একটা আকন্দবাগান মত ছিল। সেখানে বসে মুড়ি খেতাম। কয়েকদিন পর ওখানে পাখী আসতে আরম্ভ করল। প্রথম প্রথম আমি ওদের দিকে তাকালেই উড়ে পালাত। তারপর আমি কিছু বলতাম না দেখে ওদের সাহস বাড়তে লাগল। বুলবুলি আসত, দোয়েল আসত, ঘুঘু আসত, শালিকের তো কথাই নেই, ফিচকে আসত, কাক আসত। কোনটা 'আমার গায়ে বসে, কোনটা মাথায় বসে, ঘাড়ে বসে, আরো কী করে সব। একদিন কামারের দোকানে বসে আছি, একটা দোয়েল এসে একেবারে আমার কোলের উপর বসল। এইরকম হ'ত।

এই পুরাতন সুখস্মৃতির বিবরণ দিতে দিতে শ্রীশ্রীঠাকুর যেন সেই ছোট্ট বয়সে চ'লে গেছেন। উপস্থিত সবাই নীরবে উপভোগ ক'রে চলেছেন দয়াল ঠাকুরের ঐ সানন্দ সরল অভিব্যক্তি। একটু পরে প্রভু আবার বলছেন—আমার যে কোন বুদ্ধি আছে তা' আমার এখনও মনে হয় না। মনে হয়, সবারই বুদ্ধি আমার থেকে বেশী। সেইজন্য কোন লেখা দেবার পরে সবাইকে দেখতে বলি—এই দ্যাখ্‌তো হ'ল কি না! আবার সেই ছোটকালে মার কাছে, কর্ত্তামার কাছে সবসময় জিজ্ঞাসা করতাম—উঠব? উঠব? যাব? যাব? শোব? শোব? এখনও আমার সেই রকমটা আছে। শোবার সময় এখনও বড়-বৌয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করি—শোব? বড়-বৌ ওখান থেকে চেঁচিয়ে কয়—শোও। এই জিজ্ঞাসা করার প্রবৃত্তিটা আমার এখনও আছে। ওটা আর ছাড়ি না। যা' ভাল তার একটু বেশী করাও ভাল। এক হাত ভাল হলে তার থেকে চার আঙ্গুল বেশী ক'রে রাখা ভাল।

মেণ্টুদা—কোন বিষয়ে failure (ব্যর্থতা) বোধ করেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Failure (ব্যর্থতা) বোধ করি না। বাস্তবে আমি যা' সেটাই বোধ করি। ছোটবেলায় গাঁ-শুদ্ধ লোক ছিল আমার 'গার্জেন'। আমার কোন অন্যায় কেউ মার কাছে এসে বলে দিলে মা আবার আমাকে মারত। তারপর বোধহয় সিক্সথ্ ক্লাসে পড়লাম, 'Do unto others as you wish to be done by' (অপরের প্রতি তেমনতর আচরণ কর যা' তুমি নিজে পেতে ইচ্ছা কর)। ঐটা পড়েই যেন আমার জ্বর ছেড়ে গেল, কোন্‌টা পাপ আর কোন্‌টা পাপ না তা' ঠিক হয়ে গেল। এর পর থেকে আর 'থিওরি'র 'পরে চলতাম না। হাতে-কলমে যেটা ঠিক বলে বুঝতাম তাই করতাম।

এর মধ্যে তামাক সেজে এনে দেওয়া হল। গড়গড়ার নলে কয়েকটা টান দিয়ে সুগন্ধি ধূম উদ্‌গিরণ ক'রে দয়াল ঠাকুর স্নেহভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—স্পেন্সার! তোমার খাওয়া হয়েছে?

স্পেন্সারদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(মেণ্টুদাকে) তোর?

মেণ্টুদা—না, দেরী আছে।

তামাকের নলে শেষ সুখটানটি দিয়ে নলটি একপাশে রেখে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলছেন—আমার নিজেকে একটা 'জিরোর' মত মনে হয়। তোমরা সকলেই এক একটি একক। আমি যখন তোমার সাথে যুক্ত হই, তোমার intelligence এবং education-এর (বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষার) সঙ্গে যুক্ত হই, তখন ten (দশ) হয়ে যাই।

মেণ্টুদা—একজনের জীবনী লিখতে গেলে কোন্ কোন্ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার জীবনী লিখবে তার সাথে সঙ্গ করা না থাকলে তোমার লেখাই বেরোবে নানে। তার সাথে থাকতে থাকতে কোন্ ঘটনায় তুমি কেমন ক'রে ফুটলে, কী করলে, কী করলে, এই রকমটার মধ্যে আছ তুমি। এটাকে যে unfurl করতে (ফুটিয়ে তুলতে) পারে, সে life (জীবনী) লিখতে পারে। এই unfurl করতে (ফুটিয়ে তুলতে) যেয়ে যা'-কিছু discern (নির্ধারণ) করবে তা' এই মণিকেন্দ্রের সাথে কাঁটায়-কাঁটায় মেলা চাই। তাহলে life-এর (জীবনীর) তাৎপর্য্যটা ফোটে। আবার, সেই মানুষটির উপর তোমার love (প্রীতি) থাকা চাই, নতুবা লেখার মধ্যে শুধু fact (ঘটনা) এবং তার কয়েকটা conclusion (মন্তব্য) থাকবে নে। তা' তো আর life (জীবনী) না। রামচন্দ্রের life (জীবনী) লিখেছিলেন বাল্মীকি। ওরকম life (জীবনী) নাকি আর নেই, এরকম গল্প শুনি। রামায়ণ একটা মহাকাব্য।

কথায়-কথায় অনেক রাত হয়ে গেল। এবার সবাই প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন।

২৭শে চৈত্র, ১৩৬৬, রবিবার (ইং ১০।৪।১৯৬০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের হলঘরেই আছেন। কবিরাজের নির্দ্দেশমত আজ থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের দক্ষিণ বাহুতে নিরামিষ মহামাস তেল মালিশ করা আরম্ভ হ'ল। এই মালিশে নাকি হাতের জোর অনেকখানি ফিরে আসবে।

বেলা সাড়ে আটটা। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), জ্ঞানদা (গোস্বামী), প্রফুল্লদা (দাস) ও আরো অনেকে এসে বসেছেন। কথাবার্ত্তা চলছে। কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—মহাভারতে আছে গুরুজনকে দান করলে তা' নিষ্ফল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ফলকামনা ক'রে গুরুজনকে কিছু দান করলে, আমাদের প্রতি তাঁদের যে well wish normally (শুভ-ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবে) আসে, সেটা আসার পথে একটা resistance (বাধা) সৃষ্টি হয়। গুরুজনকে কিছু দিতে পারলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। কিন্তু সেখানে ওরকম গোল থাকলে কিছু হওয়া মুশকিল। সেইজন্য অপ্রত্যাশী মনোভাব নিয়ে গুরুজনের সেবা করতে হয়, পরিচর্য্যা করতে হয়, তাঁদের experience (অভিজ্ঞতা)-গুলি নিতে হয়, নিয়ে একটা store (ভাণ্ডার)-মত ক'রে রাখতে হয়।

কেষ্টদা—আমাদের শাস্ত্রে আছে গর্ব্ববিহীন দানের কথা, সৎপাত্রে দান করার কথা। আমি ভাবছি, আমাদের উৎসব উপলক্ষে তেমনতর উপযুক্ত লোকদের যদি অর্থ, বস্ত্র, উপাধি ইত্যাদি দান করা যায়, তাহলে কেমন হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের এখনও সময় হয় নি।

কেষ্টদা—রাজনীতির উপদেশের মধ্যে আছে 'জয়েৎ কদর্য্যং দানেন' (কদর্য্যকে দানের দ্বারা জয় করবে)। আর, কদর্য্য মানে কৃপণ।

প্রফুল্লদা—তাই নাকি? আমরা এতদিন জানতাম, কদর্য্য মানে খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃপণের মধ্যে সব পড়ে। ঐ যে কী একখানা বই এনে আমাকে দেখিয়েছিল, তাতে কী আছে 'লুব্ধকে করিও বশ ধন দ্বারা'।

কেষ্টদা—মহাভারতে দেখা যায়, ভীষ্ম সারাজীবন প্রতিজ্ঞা পালন ক'রে গেলেন। কিন্তু 'অস্ত্র ধারণ করব না' প্রতিজ্ঞা ক'রেও শ্রীকৃষ্ণ মুহূর্ত্তে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে রথচক্র ধারণ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই দেখে ভীষ্ম আবার তাঁকে ভগবান বলে স্তুতি করলেন। আশ্রিতকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অমন করেছিলেন। কিন্তু কোন অস্ত্র-শস্ত্র নেননি। একখানা রথের চাকা ভেঙে নিয়ে গেলেন।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে (নন্দী) ডেকে বললেন—এই, মধুর কি এরকম গুণ আছে যে মধু খেলে ডায়াবেটিস্ একদম সেরে যায়?

'বই দেখি' বলে প্যারীদা চ'লে গেলেন। এর পরে ঈশ্বর ও ব্রহ্ম-দর্শন নিয়ে কথা উঠল। ঐ প্রসঙ্গে বললেন দয়াল ঠাকুর—পাতঞ্জলে ঈশ্বর-প্রণিধানের কথা আছে। দেখবেন পাতঞ্জলের কথাগুলি একেবারে science-এর (বিজ্ঞান) মত। পাতঞ্জল হ'ল দর্শনশাস্ত্র। দর্শনশাস্ত্র মানে বোধশাস্ত্র। আবার, অর্থবোধ এবং যুক্তি ঐ বোধের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

নববর্ষ-উৎসবের আর দুদিন বাকী আছে। বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভক্তবৃন্দ আসতে শুরু করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছেও দেখতে দেখতে ভীড় জমে উঠেছে। কেউ বসে, কেউ বা দাঁড়িয়ে আকুল নয়নে দর্শন করছেন জীবনের আরাধ্য দেবতা, তাঁদের প্রিয়পরমকে।

এই সময় প্যারীদা এসে জানালেন, মধু খেলে নিশ্চিত ডায়াবেটিস্ সারে, ঠিক এমন কথা বইতে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্যারীদা কথা ব'লে চ'লে যাওয়ার পরে আবার পূর্ব্ববৎ আলোচনা চলতে লাগল। একসময় শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, জ্যোতি, দ্যুতি, ভাতি, দীপ্তি, এ কথাগুলির মানে কী?

শরৎদা (হালদার)—দ্যুতি মানে তো প্রকাশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকাশ হলে তো হয়ই। আমি আপনাকে দেখছি, এই আলমারিটা দেখছি। মানে, এগুলি আমার কাছে প্রকাশিত হচ্ছে। (কেষ্টদাকে) এই কথাগুলির মানে দেখবেন তো! (শরৎদাকে) আপনিও দেখবেন।

পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য)—ঈশ্বর-প্রাপ্তির গল্প বলতে বলতে আপনি একদিন সেই বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শনের কথা বলেছিলেন। তাতে মনে হয় ওরকম একটা দর্শনও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রাপ্তির মধ্যে আছে আপ্তি। আর, আপ্তি মানেই তার attribute (গুণ)-গুলি আপনার ক'রে নেওয়া।

কেষ্টদা—ব্রহ্মদর্শন বলে কিছু নেই। মানুষই ব্রহ্ম হয়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, সেইজন্য কয় ব্রহ্মবোধ। আমি যে সেই বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখেছিলাম, তখন বিষ্ণু কেমন তা' জানতেম না। তখনও ল্যাংটা হয়ে থাকি।

কেষ্টদা—মহাভারত-রামায়ণে বিষ্ণুকে আদিদেব বলা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তা' জানতেম না। এ দোতলার ঘর যেখানে হয়েছে সেখানে ছিল সেই ঘরখানা। পরে সেটা দোতলার পেটের মধ্যে চলে গেছে। ঘরের বেড়ার উপর মাটি দিয়ে লেপা। ঐ ঘরে শুয়েছিলাম সেদিন রাতে। তখন কৃষ্ণপক্ষ, চারিদিক ঘোর অন্ধকার। হঠাৎ ঐ বেড়ার উপরে একটা বড় আলো ফুটে উঠল। মাত্র একটা আলো—সিনেমার ফিলমের মত। আমি কল্পনাও করিনি যে অমনতর হতে পারে।

সেই আলোর মধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তি। কথা-টথা কয় না। কিন্তু এত স্পষ্ট যে তার চোখের পালক শুদ্ধ দেখা যাচ্ছে। দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মূর্ত্তি disappear করল (অদৃশ্য হয়ে গেল)। আমি ঠিক দেখলাম কিনা বুঝতে পারলাম না। তখন ওর থেকে ছোট একটা আলো এসে বেড়ার উপর পড়ল তার মধ্যে আবার ঐ মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তি হাত নেড়ে দেখাল 'না'। তখনকার মতন সেই ভাষায় বলল (যা দেখেছি) 'মিথ্যে না'। (নিজের দক্ষিণ হস্তখানি অভয়দানের ভঙ্গিমায় নেড়ে দেখাচ্ছেন)।

এইসময় খেপুকাকা একখানা লাঠি হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে বললেন—কাল আমার আমাশার মত হয়েছিল।

যে আলোচনা চলছিল তাতে ছেদ পড়ল। খেপুকাকা তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কথা কিছুক্ষণ বলে চ'লে গেলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর ইষ্টভৃতি বিষয়ে বেশ কয়েকটি ছড়া বললেন।

আজ সন্ধ্যার পরেও শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক ছড়া দিচ্ছেন। রাত আটটায় কেষ্টদা এসে বসেছেন। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ী নিয়ে কথা উঠল। কথাপ্রসঙ্গে প্রভু বললেন—রামপ্রসাদের গানের মধ্যে ব্রহ্মময়ী অনেকবার আছে।

তারপর ছড়া দিলেন—

সব কথারই সেরা কথা
ইষ্টীতপা জীবন ক'রে
ভক্তি, প্রণাম, মনন কর
উর্জ্জীতপা যাজন ধ'রে।

এই প্রসঙ্গ ধরেই শ্রীশ্রীঠাকুর বলে চলেছেন—কেষ্ট ঠাকুর শেষ পর্য্যন্ত বলে গেলেন 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু'। তাঁকে ধরলে সব ধরার কোহিনূর হয়। তখন হয় (সুর করে গাইছেন)—'সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে গো, পড়ে মনে।' এ গানটি গেয়েছিল থিয়েটারে তারাসুন্দরী—'সে মুখ কেন অহরহ'।

বলে আবার সুর ক'রে গাইছেন 'সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে গো, পড়ে মনে।'

পরে বলছেন—আমাকে ঐ যে বেশ্যাবাড়ী ধরে নিয়ে গিয়েছিল, যে মেয়েটার কাছে নিয়েছিল, সে পরে সব বেচে-টেচে বৃন্দাবন চ'লে গিয়েছিল। তাতে মনে হয়, আমার attitude (মনোভাব) তার মধ্যে imparted (সঞ্চারিত) হয়েছিল।

কথায়-কথায় রাত দশটা বেজে যায়। মিঃ স্পেন্সার এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার ছোটবেলার স্মৃতি কী কী মনে পড়ে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে আছে, গ্রামের সব লোক আমার কর্ত্তা ছিল, আমাকে সামান্য কারণেও মারত।

মিঃ স্পেন্সার—আরো তো অনেকে ছিল। কিন্তু আপনার উপরেই আক্রোশটা হ'ত কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার কারণ, মারলেও আমি কিছু ক'ব না এটা তারা জানত। আবার, মার কাছে নালিশ গেলে মাও মারবে।

মিঃ স্পেন্সার—স্কুলে কোন্ subject (বিষয়) ভাল লাগত আপনার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল লাগাতে আর পারলাম কই? এক আর একে দুই হয় কেমন ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন "বদমাইশ পাজী ছেলে" বলে আমাকে সে কি মার! Connjugation (ধাতুরূপ) শিখতে যেয়েও ঐরকম অবস্থা হল। আমার inquisitiveness-ই (অনুসন্ধিৎসাই) জাগাতে দেয় নি। মনে হয় ছোটবেলায় আমি যদি স্পেন্সারের মত একটা মাস্টার পেতাম, স্পেন্সারের বোধহয় তখন জন্মই হয়নি। তখন আমার কোন why-এর (কেন'র) উত্তর পেতাম না। জিজ্ঞাসা করলেই ঐরকম হত। এখানে কাজলের ঐরকমটা দেখেছি। এটা হয় কেন, ওটা করব কেন, করলে কী লাভ, এইসব খুব জিজ্ঞাসা করত। আগে আমাদের বাড়ীর অবস্থা খারাপ ছিল। মামাবাড়ীতে আসার পর, বাবা তখন নায়েবী করতেন, অবস্থা ভাল হ'ল। তাই দেখে অনেকের inferiority (হীনম্মন্যতা) জেগে উঠল। ঐ inferiority-র (হীনম্মন্যতা বোধের) জন্যই বোধ হয় আমাকে মারত। শুধু আমি কেন, বড় খোকা, মণিও এরকম মার খেয়েছে—out of nothing (বিনা কারণে)।

মিঃ স্পেন্সার—সেই সময় ঠাকুর কি পদ্মায় সাঁতার কাটতেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, অনেকবার।

এরপর মিঃ স্পেন্সার জানতে চাইলেন, কিভাবে সুন্দর হয়ে ওঠা যায়। উত্তরে বললেন পরম দয়াল—Providental attribute (ভাগবত গুণাবলী) যার মধ্যে যতটুকু থাকে, সে ততখানি সুন্দর হয়ে ওঠে।

এই বলে আবার বললেন—মনুষ্যত্বের সাথে ভগবত্তা যত থাকে, ঐ ব্যক্তিত্বটাও মানুষের কাছে ততই সুন্দর হয়ে ওঠে।

২৮শে চৈত্র, ১৩৬৬, সোমবার (ইং ১১। ৪। ১৯৬০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর পশ্চিমের ছাউনির তলায় এসে বসেছেন। সামনে নির্মীয়মাণ পার্লার ঘরখানিতে কাজ চলেছে। ইলেকট্রিকের কর্মীগণ 'অয়ারিং' করার কাজে ব্যস্ত। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। পরে বললেন—আলোর সুইচ্‌গুলো সব ভেতরের দিকে লাগানো ভাল। আর দ্যাখ্, সব সমান লাইনেও হয় নি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে কর্ম্মীরা সুইচবোর্ডগুলি খুলে আবার ঠিক এক লাইনে লাগাতে লাগলেন।

বেলা নয়টা। কিছু আগে শ্রীশ্রীঠাকুর হলঘরে এসে বসেছেন। জাস্টিস জে. এন. মজুমদার ঠাকুর-দর্শনে এলেন। উনি ঘরে ঢুকতেই শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যস্ত হয়ে বললেন—বসেন, বসেন।

মিঃ মজুমদার—আপনি আছেন কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ একরকম।

নববর্ষ-উৎসবের কথা উল্লেখ ক'রে মজুমদার বললেন—এ ক'দিন তো আপনার খুব পরিশ্রম যাবে।

মৃদু হেসে শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর করলেন—পরিশ্রম, বসে থেকে আরও পরিশ্রম।

মিঃ মজুমদার—হাঁটাচলা একদম করেন না? কিছু হাঁটাচলা আপনার পক্ষে ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাঁটতে হলে আবার সাথে দু'জন থাকা লাগে।

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)—আপনার শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে উৎসবের মধ্যে যদি আসতে পারেন।

মিঃ মজুমদার—আমারও খুব ইচ্ছা—

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—না, না, সে কি কথা! থ্রম্বসিস্ হয়েছিল। এই ভীড়ের মধ্যে অসুস্থতা নিয়ে—।

শুনে মিঃ মজুমদার আর কিছু বললেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা যেন মেনে নিলেন। একটু পরে উনি বিদায় গ্রহণ করলেন। শরৎদা (হালদার) ও কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। রামায়ণ নিয়ে কথা তুললেন কেষ্টদা। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—রামায়ণে ইষ্টনিষ্ঠার চরম দেখানো আছে। সীতা যে হার দিয়েছিলেন, তাতে রামনাম লেখা নেই দেখে হনূমান চিবিয়ে ফেলে দিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' দিয়ে রামচন্দ্রের সেবা করা যাবে না, রামনাম যাতে নেই, তা' দিয়ে কী হবে—তা' সে মা-সীতাই দিক আর যেই দিক।

সত্যদা (দে) কলকাতা থেকে এলেন এই সময়। বললেন—এবার উৎসবে কলকাতা থেকে আমেরিকান কন্‌সাল্ আসছেন। রাশিয়ান কন্‌সাল্‌ও আসতে পারেন।

কথাবার্ত্তা চলছে। এর মধ্যে খেপুকাকা এসে বসলেন। এসে বললেন—আমি কলকাতায় যাব। এবার তো আমাকে একাই যেতে হবে। শরদিন্দু উৎসব না দেখে যাবে না। (শরদিন্দু'দা খেপুকাকার সঙ্গেই থাকেন সবসময়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি যাওয়াই লাগে তাহলে লোক নিয়ে যাবি। (তারপর চিন্তিতভাবে) আমার মনে হয়, তোর পা ঐরকম, আমাশার মত হয়েছে, আবার আর একটা disturbance (বিপদ) না হয়।

'আমার একটা ইনজেকশন নিতে হবে' বলে খেপুকাকা এর পর উঠে গেলেন। প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে কথা উঠল। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পরিবেশের ব্যঞ্জনার ভিতর দিয়ে আমার যে existential-adjustment (সাত্বত সঙ্গতি) হয়ে আছে, সেটাকে জানতে পারলে তবেই হবে education (শিক্ষা)। সেইজন্য science-এর মধ্যেই আছে scio, মানে to test and know (হাতেকলমে করা ও জানা)।

ক্ষণেক নীরবতার পর আত্মগতভাবে প্রভু বলছেন—Eternally (অনন্তকাল) থাকবে তুমি, থাকব আমি। তোমায় ভালবাসব, তোমার সেবা করব। তুমি প্রভু, আমি দাস। আমি গুড় হতে চাই না, গুড় খেতে চাই। এই আসল সত্যটুকু ধরা পড়েছে বৈষ্ণব ফিলজফিতে। আমার Trance-এর (সমাধির) অনেক কথাই আছে ঐ বিষয়ে। (হঠাৎ এক প্রত্যয়দৃপ্ত তেজস্বী ভঙ্গীতে বলছেন) আমি যা' যা' বলেছি আপনাদের কাছে এ সবই fact (বাস্তব তথ্য)—in toto (সম্পূর্ণরূপে)। —এ কেউ কয় নি, পাবেন না কোথাও।

মেঘমন্দ্রস্বরে উচ্চারিত এই ওজোদীপ্ত বাক্যে ঘরের ভিতরে অবতীর্ণ হ'ল সমীহ, শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের যুগপৎ ভাবাবেশ। ঐ ভাবদীপ্ত প্রতিটি প্রাণ।

কিছু পরে শরৎদা বললেন—একটা লেখায় পড়ছিলাম, নিজের কথার support (সমর্থন) কোথাও পেলে তাকে admire (প্রশংসা) করতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(মধুর হেসে) হ্যাঁ self-complacence (আত্মসন্তুষ্টি) না কী হয়, তাই হয়।

তারপর প্রসঙ্গান্তরে বললেন—যাজন হওয়া চাই factful (বাস্তবতথ্যভিত্তিক) এবং তা' যেন সবসময় existence-কে support (সত্তাকে সমর্থন) করে। এ না হলে সে-যাজন মানুষের কোন কাজে আসবে না। রামকৃষ্ণ ঠাকুরের যেসব sayings (কথা), সব ঐরকম। আমি আগে বলতাম, রামকৃষ্ণ ঠাকুর না এলে আমার এই কথাগুলির কোন value (মূল্য) থাকত না।

কেষ্টদা—আপনার কথাগুলি এমন scientific (বিজ্ঞানভিত্তিক) যে, যে-কোন up-to-date scientist (আধুনিক বৈজ্ঞানিক) আপনার কথা বুঝতে পারবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জ্ঞানমার্গী হ'লে কিন্তু জ্ঞান লাভ হয় না। ভক্তিমার্গী হ'য়ে চললে জ্ঞান will come to you automatically through your service (তোমার সেবার ভিতর দিয়ে জ্ঞান তোমার কাছে আপনিই আসবে)। কারণ ভক্তির মধ্যেই

আছে ভজন, কৃতি, অনুরাগের সাথে সেবা, আছে doing and discerning (বাস্তবকরণ ও বিচারসমন্বিত চলন)। আর, এগুলি থাকলে পরেই knowledge (জ্ঞান) আসে। আর, সত্যি সত্যি ভালবাসলে পরে কী হয়! ঐ গানটার মত (ব'লে সুরে গাইলেন)—

'ভালবাসার নিদানে
পালিয়ে যাওয়ার বিধান বঁধু
পেলে কোন্‌খানে?'

ভালবাসার কথা ব'লে তারপর যে পালিয়ে যায়, তার ভালবাসা থাকে না, ভেঙ্গে যায়। আসল কথা হ'ল নিষ্ঠা। অস্খলিত নিষ্ঠা যেখানে, সেখানে আনুগত্য থাকেই। আর, আনুগত্য বা অনুগতি হ'ল radiation of নিষ্ঠা (নিষ্ঠার বিচ্ছুরণ)। আর, যেই অনুগতি আসে, অমনিই মানুষ কৃতিমুখর হ'য়ে ওঠে—না হয়েই কিন্তু পারে না। আবার হাত নেড়ে, চোখ টেনে টেনে, মোহন ভঙ্গীতে সুর ক'রে গাইছেন—

'ভালবাসার নিদানে
পালিয়ে যাওয়ার বিধান বঁধু
পেলে কোন্‌খানে!'

এর পর প্রসঙ্গ বদলে কেষ্টদাকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আপনার কাছে যে মাল চেয়েছি, তাড়াতাড়ি দেবেন। আর এক কথা। বড় বৌমার অপারেশন যদি হয়, টাকা লাগতে পারে একেবারে জলের মত। (তারপর রেণুমার দিকে তাকিয়ে বললেন) তামুক খাওয়া।

রেণুমা—সরোজিনীদি সাজতে গেছে।

রায় কোম্পানী থেকে এক ভদ্রলোক কেষ্টদাকে একখানা বই দিয়ে গেছেন, নাম 'উপনয়নের উপহার'। কেষ্টদা সেকথা জানালেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। তাতে দয়াল ঠাকুর বললেন—দ্যাখেন, বইখানা যদি ভাল হয়, বাঁধাবেন। আর একখানা কিনে এনে বাঁধিয়ে রেখে দেবেন। এইরকম নামকরণকে কী কয়?

প্রফুল্লদা (দাস)—অনুপ্রাস।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই অনুপ্রাস যার কথায়, জীবনে যত বেশী, মনে হয় তার জীবনে মাল আছে। বইখানার নামকরণ ঐভাবে করেছে দেখে মনে হয় একেবারে বাজে না।

হঠাৎ যেন শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠলেন। বললেন—এই দ্যাখেন, এই যে এত কথা বলতে পারছি, আমার মনে হয় মধু খাওয়ার জন্য।

কেষ্টদা—হুঁ। গলার স্বরও স্পষ্ট হয়েছে অনেক।

বিকালে বড় দালানের বারান্দায় আবার নিষ্ঠা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলেছে। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিষ্ঠা না থাকলে ভালবাসা আসে না। আবার, love-এর (ভালবাসার) মধ্যে যদি activity (সক্রিয়তা) না থাকে তাহলে সেটা love (ভালবাসা) না। সেইজন্য attention (মনোযোগ) মানে আমার বলতে ইচ্ছা করে at tension (তৎপরতা নিয়ে চলা), love (ভালবাসা) সবসময় tension (তৎপরতা) নিয়ে আসে।

সত্যদা (দে)—নিষ্ঠা আর আনুগত্যে পার্থক্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন সূর্য্য আর তার কিরণ।

কেষ্টদা—আচার-আচরণ নিয়েই তো নিষ্ঠা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিষ্ঠা হ'লে আচার-আচরণও হয় তদনুগ।

কেষ্টদা—তাহলে নিষ্ঠা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিষ্ঠা মানেই হ'ল লেগে থাকা। যার উপরে নিষ্ঠা থাকে, আমি তার part and parcel (অবিচ্ছেদ্য অংশ) হয়ে থাকি। এই যেমন আমার এই হাতখানা শরীরের সঙ্গে লাগানো আছে—এটা একেবারে নিতান্তভাবেই।

কথায়-কথায় রাত দশটা বেজে যায়। সবাই প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন।

২৯শে চৈত্র, ১৩৬৬, মঙ্গলবার (ইং ১২। ৪। ১৯৬০)

আগামী কাল থেকে নববর্ষ-উৎসব আরম্ভ। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাত্রীরা সব এসে পৌঁছাচ্ছেন। ভক্তজন-কলরবে আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত। সবার চোখেমুখে আনন্দের উদ্ভাস, যেন কতকাল পরে আপনজনদের সঙ্গে দেখা। তাই চলেছে পরস্পর কুশল-জিজ্ঞাসা, প্রণাম-অভিনন্দনাদি বিনিময়ের পালা।

কিন্তু সবার আগে চাই ঠাকুর-দর্শন। তাই, প্রত্যেকেই নিজের বিছানাপত্র এক জায়গায় রেখে আগে এসে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন তাঁদের পরমারাধ্য দেবতাকে। এই অগণিত জনসমুদ্রের মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুর কাউকে কুশল জিজ্ঞাসা করছেন, কাউকে বলছেন, 'কখন আলি' (এলি), যারা এইটুকু বচন-আশীর্ব্বাদ পাচ্ছে, তারা নিজেদের সহস্রগুণে ধন্য ও ভাগ্যবান মনে করছে। আনন্দের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে তারা প্রণাম ক'রে সরে যাচ্ছে অন্যদের প্রণাম করতে দেওয়ার জন্য।

বড় দালানের হলঘরে বসে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশান্তমনে ভক্তবৃন্দের সাথে কথা বলছেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—গুরুগ্রহণ মানে আচার্য্য বা ইষ্ট-গ্রহণ। ঐ আচার্য্য হলেন living teacher (জীবন্ত দিশারী)। তিনি হচ্ছেন materialised (মূর্ত্ত) নিষ্ঠা। তাঁর উপর যদি নিষ্ঠা না থাকে, আনুগত্য না থাকে, তাহ'লে তুমি কোন intelligence

(বুদ্ধি) দিয়েই জীবনে all-round success-এ (সর্ব্বতোমুখী সাফল্যে) পৌঁছাতে পারবে না। ধর, তুমি teacher (শিক্ষক) আছ। তোমার ছাত্ররা তোমাকে ভালবাসে। ভালবাসে মানেই তাদের allegiance (আনুগত্য) আছে তোমার উপর। আর, allegiance-এর (আনুগত্যের) গোড়ায় থাকে নিষ্ঠা। নিষ্ঠা ছাড়া কিছুই হয় না।

একটু পরে সৎসঙ্গ প্রেসের কর্ম্মাধ্যক্ষ অমূল্যদা (ঘোষ) নতুন-ছাপা অর্ঘ্য-প্রস্বস্তি এবং দীক্ষাপত্র নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বীয় চশমাটি চেয়ে নিয়ে চোখে দিলেন। তারপর ঐ ছাপা জিনিসগুলি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ভাল ক'রে দেখে পরে সুশীলদাকে (বসু) দেখতে দিলেন।

যত বেলা হচ্ছে, লোকের ভিড় ক্রমশই বাড়ছে। উদ্যোক্তাগণের কর্ম্মব্যস্ততায় আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত। বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মিগণ মাঝে মাঝে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশাদি নিয়ে যাচ্ছেন।

কথায়-কথায় বেলা এগারোটা বেজে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার স্নানে উঠবেন। চৌকিতে বসে শ্রীচরণ দুখানি ঝুলিয়ে দিয়ে চটি পরতে পরতে বলছেন—আমার এখানে যত সৎসঙ্গী আসে, সব এক জায়গায় বসলে একটা বড় টাউন হয় না?

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) বললেন—তা' হয়। একটু নীরবতার পর দয়াল ঠাকুর আবার বলছেন—আজ যদি সৎসঙ্গীর সংখ্যা আট-দশ কোটি হয়ে পড়ত, আর অন্ততঃ সাড়ে ছয়শ লোক থাকত, যারা ভাল ক'রে কাজ-কাম করবে, তাহলে অনেক কাজ এগিয়ে যেত।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে বাথরুমে গেলেন।

আজ বিকালে পূজনীয় কাজলদা তাঁর জননীদেবীকে নিয়ে কলকাতা থেকে এসেছেন। সন্ধ্যার পর ওঁরা এসে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে। কাজলদা এখন কলকাতায় ডাক্তারী পড়ছেন। ঐ প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কাজলদাকে বললেন—এখন থেকেই সব ঠিক ক'রে রাখা লাগে যাতে ocean-এর (সমুদ্রের) মধ্যে যেয়ে না পড়। কখন কী করতে হবে সব নোটবুকে নোট ক'রে রাখতে হয়। ও কিছু না। শুধু exercise (অনুশীলন)। Exercise (অনুশীলন) করলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। তোর নোটবুক আছে?

কাজলদা—হ্যাঁ, তুমি যে বারোটো নোটবই দিয়েছিলে।

শ্রীশ্রীঠাকুল—ছোটবেলায় যেমন ছোরা খেলতিস, কত তাড়াতাড়ি করতিস, অথচ গায়ে লাগত না, ঠিক ঐভাবে practice (অভ্যাস) করা লাগে সব কিছু। আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হয় যাতে affected (সংক্রামিত) হয়ে না পড়।

শ্রীশ্রীঠাকুর হলঘরের মধ্যে উত্তরাস্য হয়ে বসে আছেন। উত্তরদিকে দুটি দরজা। পশ্চিমের দরজায় দাদাদের ভিড়। সেখানে আছেন অনিলদা (গাঙ্গুলী)। আর পূবদিকে দরজায় মায়েরা এসে প্রণাম করছেন। সেখানে তাঁদের সুবিধা ক'রে দিচ্ছেন জিতেন মিত্রদা। এত লোক আসছেন, প্রণাম করছেন। কিন্তু তার জন্য কোন ঠেলাঠেলি বা হৈ-হট্টগোল নেই। সব শান্তভাবে হয়ে চলেছে। প্রতিপ্রত্যেকেরই লক্ষ্য—ঠাকুরের যেন কোন উদ্বেগ বা অস্বস্তির কারণ না ঘটে। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলি মায়ের কোলে চড়ে আসছে, তারপর দরজার সামনের রেলিংটা ধরে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছে আলোকিত হলঘরে প্রশস্ত শুভ্র শয্যায় সমাসীন দয়াল ঠাকুরকে। তাদের মুখেও টুঁ-শব্দটি নেই।

সন্ধ্যা সাতটা। এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর জিতেনদাকে (মিত্র) কাছে ডেকে কিছু গোপনীয় নির্দ্দেশ দিলেন। নির্দ্দেশ গ্রহণ ক'রে জিতেনদা আবার স্বস্থানে যেয়ে দাঁড়ালেন। এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকগুলি ছড়া দিলেন।

১০ই বৈশাখ, ১৩৬৭, শনিবার (ইং ২৩।৪।১৯৬০)

নববর্ষ-উৎসব সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত হয়েছে। ঐ উপলক্ষে যাঁরা এসেছিলেন, উৎসব সেরে সবাই যার যার জায়গায় ফিরে গেছেন। জাস্টিস জে. এন. মজুমদার শারীরিক অসুস্থতার জন্য উৎসবের ভিড়ের মধ্যে আসতে পারেন নি। কয়েকদিন পর আজ সকালে এসেছেন। সামনে রাখা একখানা চেয়ারে বসেছেন। উনি শীঘ্রই কলকাতায় ফিরে যাবেন।

সেকথা উল্লেখ ক'রে মিঃ মজুমদার বললেন—যাওয়ার সময় আমার কিন্তু পাবনাই রসকদম দুই সের চাই।

আশ্রমের সুধীরদা (দাস) ভাল রসকদম তৈরী করেন। তাঁর উদ্দেশ্যে হাঁক দিলেন ঠাকুর—এই ডাক দে রে!

শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখে মিঃ মজুমদার বললেন—আমি ২৯ তারিখে যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—২৯ তারিখ কবে?

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)—আজ ২৩ তারিখ।

মিঃ মজুমদার—আর একটু মধু চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(বিশুদা) মধুর কথাও মনে রাখিস।

কিছু পরে মিঃ মজুমদার বিদায় গ্রহণ করলেন। বেলা দশটা। ভক্তগণ অনেকে উপস্থিত। তাঁদের সাথে কথাপ্রসঙ্গে পরম দয়াল বলছেন—দুনিয়ার আসল ডিপ্লোমা

হল ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব দিয়েই মানুষ বড় বড় কাজ করে। ভগবান মানে ভজমান—ঐ লোকপালী ব্যক্তিত্ব। আবার, ভজ্-ধাতুর অর্থ হল অনুরাগের সহিত সেবা করা। এমনতর ইষ্টার্থী সেবাপরায়ণ যে, সে জীবনবৃদ্ধির সহায়ক যেগুলি সেইগুলি ফুটন্ত ক'রে তোলে, আর এর নাশক যা' তাকে ধ্বংস করে। অমনতর হয়ে ওঠার জন্য তিনটা জিনিস ঠিক রাখতে হয়—নিষ্ঠা, আনুগত্য আর কৃতিচলন। নিষ্ঠা যেখানে থাকে সেখানে আনুগত্য থাকবেই, আর আনুগত্য থাকলে ঐ serving mentality (সেবকের মনোবৃত্তি) থাকবেই। এইগুলি যখন সবই হয় আমার জন্য তখন মানুষ আমি যা' ভালবাসি, আমি যাতে খুশী থাকি, তাই করে। তার আর অন্যদিকে লক্ষ্য থাকে না। সে এক অসম্ভব কাণ্ড হয়! ঐ যে শ্রীকৃষ্ণের সহপাঠী ছিল সুদামা। সে একদিন শ্রীকৃষ্ণের সাথে দেখা করতে গেল। দরজা থেকেই তাকে বলে দিল দেখা হবে না। কিন্তু ও-ও শ্রীকৃষ্ণের সাথে দেখা না ক'রে যাবে না। সুদামার এই রোখ দেখে ওখানকার ওরা সুদামাকে কী মারটা মারল! তারপর শ্রীকৃষ্ণ খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি এসে সুদামাকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন আর ওর দুঃখ নেই। অত যে মার মারল, সে কথা আর কয়ই না। সখারে পেয়ে সব ভুলে গেল।

শেষের দিকের কথাগুলি বলতে বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। সুদামার ইষ্টনিষ্ঠানন্দিত তর্পণী চলনের কথা স্মরণ ক'রে তাঁর ক্ষেমভিক্ষু অন্তর-সমুদ্র বুঝি উদ্বেল হয়ে ওঠে। আয়ত নয়নযুগলে নেমে আসে শ্রাবণের ধারা। আকুল হয়ে কাঁদছেন পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর। জনৈক সেবক গামছা দিয়ে মাঝে-মাঝে মুছিয়ে দিচ্ছেন জলে ভেজা ঐ আঁখিপল্লবদ্বয়।

এর পরে আর বিশেষ কোন কথা হয় না। স্নানের বেলা হতে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠলেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় উত্তরাস্য হয়ে সমাসীন। সারাদিন আজ খুব 'লু' চলেছে। এখনও হাওয়া গরম। এর মধ্যেই অনেকে এসে বসেছেন।

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর সত্য শর্মাদার কাছে চার হাজার টাকা ভিক্ষা চেয়েছেন। সত্যদা এখন টাকা নিয়ে এসে বললেন—এই যে চার হাজার টাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকলেন—এই বিশু। (বিশুদাকে একজন ডাকতে গেলেন)। তারপর সত্যদার দিকে ফিরে হেসে বলছেন প্রভু—একটা লাং দক্ষিণা দিয়ে টাকা দিচ্ছে।

কিছুদিন আগে সত্যদার লাং অপারেশন হয়েছে। সেই কথা উল্লেখ করে সত্যদা বললেন—একটা লাং কি? বাঁচারই তো কোন সম্ভাবনা ছিল না। কলকাতার ডাক্তাররা বলেছিল, আপনি কোন তীর্থস্থানে যান এবং আত্মীয়স্বজনকে খবর দেন। আপনি বাঁচবেন না। তারপর আপনার দয়াতেই তো প্রাণ ফিরে পেলাম।

এই সময় বিশুদা এলেন। সত্যদা তাঁর হাতে টাকা দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বিশুদাকে বললেন—ঘরে যা, গুণে নে। তারপর ভাল ক'রে রেখে দে।

সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর হলঘরের মধ্যে এসে বসেছেন। বঙ্কিমদা (দাস) এসে বললেন—হাবড়ায় কো-অপারেটিভ রকমে একটা ছাত্রাবাস ক'রে সেখানে একজন responsible teacher (দায়িত্ববান শিক্ষক) রেখে—

এই পর্য্যন্ত বলতেই বাধা দিয়ে বললেন দয়াল ঠাকুর—Co-operative basis-এ (সমবায়ী ভিত্তিতে) আমি মুগ্ধ না। বেগারে মুগ্ধ আমি। ধর, একজনের কাজ ক'রে তুমি তাকে দাঁড় করায়ে দিলে। আবার সে-ও তোমার কাজ ক'রে দিল। এইরকমটা আমার ভাল লাগে।

১১ই বৈশাখ, ১৩৬৭, রবিবার (ইং ২৪।৪।১৯৬০)

আজ সকাল থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বহু ছড়া দিয়েছেন বিভিন্ন বিষয়ে। তারপর হলঘরে এসে বসেছেন। বেলা ৮-৪৫ মিঃ। জাস্টিস্ জে. এন. মজুমদার এলেন। প্রণাম নিবেদন ক'রে চেয়ারে বসতে বসতে বললেন—বিরক্ত করলাম নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিরক্ত ক্যা?

মিঃ মজুমদার—বিরক্ত করতেই তো এসেছি। আমার স্ত্রীর বাত। সে তো আসতেই পারল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় বৌ-এরও বাত।

মিঃ মজুমদার—তা' সারায়ে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা দেখি। প্যারী কোথায়?

প্যারীদা (নন্দী) এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলেন, তারপর বললেন—নিশিন্দার তো বাতের উপর reaction (ক্রিয়া) আছে। নিশিন্দার তেল দিয়ে একটা ঠিকমত বানাতে পারলে হয়।

'দেখি' বলে প্যারীদা চ'লে গেলেন। এর পর অসীম দরদের সাথে শ্রীশ্রীঠাকুর মিঃ মজুমদারকে বললেন—শরীরটা ঠিক রাখবেন। ছেলেপেলে রসগোল্লা যেমন আনন্দের সাথে খায়, ঐরকম রসগোল্লার মত মিষ্টি আপনি।

মিঃ মজুমদার—আমার বড় ইচ্ছা, রাজেন্দ্রপ্রসাদের (ভারতের রাষ্ট্রপতি) সাথে একবার আলাপ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আপনি জানেন। পরমপিতার দয়ায় আপনি বেঁচে থাকুন দীর্ঘজীবী হয়ে। তারপর আমার জন্য যা' করণীয় করবেন।

মিঃ মজুমদার—আপনার ভৃগুকোষ্ঠী আনিয়ে দেখেছি। তাতে একেবারে ভগবান বলে বর্ণিত আছে। আর বলা আছে ডায়াবেটিস্ হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডায়াবেটিস না, আমার প্যারালিসিস হল। সে একেবারে খামাকা। এরা সব গাদা গাদা প্যারালিসিসের রোগী আমার কাছে আনতে আরম্ভ করল। সে দশ-পনের জন, কুড়ি-পঁচিশ জন ক'রে ক'রে আনত। একজন তো বলেই বসল—বাবা, আমি আর এ রোগ সহ্য করতে পারছি না। আমার এ রোগ তুমি নাও। তুমি পারবা সহ্য করতে। তুমি দেওয়ার কর্ত্তা, নেওয়ারও কর্ত্তা। আমি তাকে বললাম, আমি নিতেও পারি না, দিতেও পারি না। যাই হোক, এর থেকেই আমার প্যারালিসিস্ ধরে গেল।

পূর্ব্ব সূত্র ধরে মিঃ মজুমদার আবার বলছেন—আপনার রূপ ধরে তিনি এবার এসেছেন।

একথার উপর গুরুত্ব না দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে বলতে থাকেন—পাবনায় গোপাল লাহিড়ী মশাই শিক্ষক এলেন। গলার জোরও ছিল খুব। আমি তখন ফিফ্‌থ্ কি সিক্স্‌থ্ ক্লাসে পড়তাম। তখন একদিন ক্লাসে পড়াতে পড়াতে বললেন— Do unto other as you wish to be done by (অপরের প্রতি কর সেই আচরণ, নিজে যাহা পেতে তুমি কর আকিঞ্চন)। তখন থেকেই আমি কোন্‌টা করব কোন্‌টা করব না, সব ঠিক হয়ে গেল। এর আগে বুঝতে পারতাম না কোন্ জায়গায় কেমন করব।

মিঃ মজুমদার এই সময় নিজের কলকাতায় ফেরার কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—আমি কি তাহলে দিনকতক থাকব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তাই ইচ্ছা করে।

মিঃ মজুমদার—তাহলে এখন আসি!

বলে হাত জোড় ক'রে নমস্কার ক'রে উঠলেন। উনি দেওঘরের ক্যাস্টরস টাউনে একটা বাড়ীতে উঠেছেন। এখন সেখানে যাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ইঙ্গিত করতে সরোজিনী-মা এগিয়ে এসে পিকদানী ধরলেন। মুখ থেকে পানের চিবানো অংশ ফেলতে ফেলতে দয়াল ঠাকুর গান গেয়ে উঠলেন—'ঢালো ঢালো ঢালো অবিরল...

গেয়ে সরোজিনীমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। সরোজিনীমাও হাসলেন একটু।

জগদীশদা (রায়) এসে প্রণাম ক'রে কর্ম্মক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাচ্ছ? আস। যেয়ে যেমন বলেছি সেইভাবে কাজ শুরু ক'রে দাও। মানুষের কাছ থেকে কিছু চেয়ে নিও না, খুশী হয়ে যদি কেউ কিছু দেয় তা' নিও।

জগদীশদা প্রণাম ক'রে চলে গেলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে বলছেন—ছড়াগুলি ঠিক ক'রে নিস।

বললাম, হ্যাঁ করব।

তারপর সোহাগভরে তিনি বললেন—তোর অনেক ঠিক হয়ে গেছে। ঠিক টুক ক'রে লাগায়ে দিস। এতে আমার বেশ সুবিধা হইছে। একে বলে acumen (বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা)। তুই এখন একাই সব ঠিক করতে পারিস। কিন্তু এত কওয়াতে যেন তোর অহঙ্কার না আসে। তাহলে আর হবিনানে।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর আরো কয়েকটি ছড়া দিলেন।

বিকালে—বড় দালানের বারান্দায়। পূর্ণিয়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে সাথে নিয়ে দেওঘরের ইনকাম্-ট্যাক্স অফিসার শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে ওঁরা আসন গ্রহণ করলেন। কুশল-বিনিময়াদির পর ঈশ্বর ও ঈশত্ব নিয়ে কথা উঠল।

ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঈশ্বর আমাদের ধারণপালন করেন। ধারণপালনের মধ্যে কিন্তু পোষণও আছে। এই ধারণ, পালন ও পোষণের শক্তি যার যত বেশী, তার ভিতর ঈশত্ব তত জাগ্রত।

এর পর ঐ ম্যাজিস্ট্রেট ভদ্রলোক বললেন—মাতাপিতা অনেকদিন আগে চ'লে গেলেও তাঁদের কথা কিছুতেই ভোলা যায় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ভাবি, আমার প্রিয় যদি কেউ চলে যায়, তাকে আমি ভুলতে চাই না। ভুলতে চাই না কেন? কারণ, আমাদের উৎস তাঁরা। তাঁদের সাথে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁদের ভুললে আমরা ungrateful (অকৃতজ্ঞ) হয়ে উঠি, আমাদের ব্যক্তিত্বও অনেকখানি down হয়ে (মিইয়ে) যায়। সেইজন্য আমি কই, শোক থাক্, শোক ঐ তাঁর রূপ নিয়ে থাক্। আর, এমন কাজ যেন আমরা করি যাতে এই মহৎ শোক যেন আমাদের অন্য সবরকম শোক, দুঃখ, জরা, ব্যাধি থেকে নিষ্কৃতি দেয়।

এর পর ওঁরা বিদায় গ্রহণ করলেন।

১২ই বৈশাখ, ১৩৬৭, সোমবার (ইং ২৫।৪।১৯৬০)

স্থানীয় কাহারপাড়া ও গোয়ালপাড়ার সাত জনকে শ্রীশ্রীঠাকুর সাতটি ট্রানজিস্টার সেট রেডিও দিয়েছেন। এই সাতজন হল ডেকলাল, শিবু, প্যারীরাম, চৌধুরী, বদ্রী দোবে, টেটুয়া ও শম্ভু। তারা রেডিওগুলি নিয়ে এসেছে ঠাকুরকে দেখাবার জন্য। এদের মধ্যে শিবু ও প্যারীরাম অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য আসতে পারে নি। তাদের রেডিও দুটি এরাই হাতে ক'রে নিয়ে এসেছে। সবগুলি ওরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে নামিয়ে রেখে প্রণাম করল।

রেডিওগুলির উপর চোখ বুলিয়ে দয়াল ঠাকুর বললেন—ভাল ক'রে রেখো। সাবধানে না রাখলে ছেলেপেলে হাত দিলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কত জায়গার কত কথা শোনা যাবে। হয়তো আমেরিকা থেকে কথা আসবে। (রেডিওগুলি সবই অল্-ওয়েভ)। ঘরে একটা ব্র্যাকেট মত ক'রে তার উপর এগুলি তুলে রাখতে হয়।

এই ভাইদের চোখেমুখে একটা সমীহপূর্ণ কৃতজ্ঞতার ছায়া। সবাই চুপচাপ বসে আছে। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ওদের বললেন—যা, নিয়ে যা।

নির্দ্দেশ পেয়ে ওরা রেডিওগুলি সাবধানে হাতে তুলে নিল এবং প্রণাম ক'রে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

আজকাল সন্ধ্যার পর মশার উৎপাত খুব বেড়েছে। সেইজন্য সন্ধ্যাবেলায় হলঘরের মধ্যে ধুনোর ধোঁয়া দিয়ে কিছুক্ষণ দরজা বন্ধ ক'রে রাখা হয়। তারপর ফ্যান চালিয়ে দিতে ধোঁয়াগুলি আস্তে আস্তে বের হয়ে যায়। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে এসে বসেন। আজও তেমনটি করা হল। সাতটার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে এসে বসলেন।

রেণুমার দাঁতের ব্যথা হয়েছিল। সেই কথা জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর দাঁতের ব্যথা সারিছে রে?

রেণুমা—না, এখনও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তো যা, দেখায়ে নে। (তারপর একটু ক্ষোভের সুরে বলছেন) আমার সব একেবারে রাসের পুতুল। যেমন ডান, তেমনি বাম।

১৪ই বৈশাখ, ১৩৬৭, বুধবার (ইং ২৭। ৪। ১৯৬০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর হলঘরেই আছেন। বেলা প্রায় ৯টার সময় জাস্টিস জে. এন. মজুমদার এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁকে ভাল একখানা 'কার'-এর খোঁজ রাখতে বলেছিলেন। মিঃ মজুমদার জানালেন যে তিনি একখানা গাড়ির খোঁজ পেয়েছেন।

এই সময় পূজ্যপাদ বড়দা এলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম ক'রে মিঃ মজুমদারকে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে মিঃ মজুমদার বড়দাকে ঐ গাড়ি সম্বন্ধে সমস্ত প্রয়োজনীয় খবর জানালেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ প্রসঙ্গে বললেন—আমার কথা কিন্তু ঐ যা' বলেছি, ১০/১২ জন বসতে পারে এমন গাড়ি চাই।

এরপর মিঃ মজুমদার বললেন—আমাকে কিন্তু কয়েকটা পৈতা গ্রন্থি দিয়ে দিতে হবে। আমার যজুর্ব্বেদ, কাশ্যপগোত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে অনিলদাকে (গাঙ্গুলী) ডেকে বললেন—অনিল! কয়টা পৈতে গ্রন্থি দিয়ে দিবি লক্ষ্মি!

অনিলদা—এক্ষুণি দিচ্ছি।

মিঃ মজুমদার—আমি শুক্রবারে যাব। (চেয়ার থেকে উঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে বলছেন) আমার আর একটা কথা। চটবেন না তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হেসে) সে কী কথা! চটব ক্যা।

মিঃ মজুমদার—আমার জন্য যে রসকদম তৈরি হচ্ছে, ভাল ক'রেই তো হবে, আমার ইচ্ছা তার থেকে একটা তুলে আপনি মুখে দেন।

প্রবল আপত্তি জানিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধুত্তোরি! সে কেন? না, না, সে হয় না। এখন না। আপনি যখন আনবেন, আমি জানব না, তখন দেখা যাবে।

এরপর বিদায় নেবার ভঙ্গিতে হাত জোড় ক'রে মিঃ মজুমদার বললেন—আচ্ছা, তাহলে আমি—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীর সাবধানে রাখবেন। বেশি overtaxed (অতিপরিশ্রান্ত) করবেন না নিজেকে।

মিঃ মজুমদার—আপনার ঐ কথায় তো ভয় ধরে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনভাবে থাকবেন যাতে একটু ফস্টি-নস্টি করা যায়।

মিঃ মজুমদার—যাওয়ার কথা মনে হয়ে কষ্ট হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও খুব কষ্ট। যত থাকেন ততই ভাল লাগে।

এরপর প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ও পরে উপস্থিত সকলকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন জাস্টিস মজুমদার।

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার সাব-এডিটর জ্ঞান চৌধুরীদা সামনে বসে আছেন। তিনি ইংরেজীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী লিখেছেন একখানা। ঐ প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে দয়াল ঠাকুর বললেন—জ্ঞান একখানা biography (জীবনী) লিখছে। আমেরিকা থেকে biography (জীবনী) চেয়ে পাঠিয়েছে। ওটা ঠিক ক'রে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলে হয়। কিন্তু ছোট হলে হবে নানে, বেশ exhaustive (পূর্ণাঙ্গ) হওয়া চাই।

জ্ঞানদা—আমার লেখা হয়েই গেছে। এবার কলকাতায় যেয়ে আরো ভাল ক'রে সবটা দেখব। দেখে এখানে পাঠিয়ে দেব।

কালীষষ্ঠীমাকে শ্রীশ্রীঠাকুর একটা কাজ ক'রে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু কালীষষ্ঠীমা তা' তো করেনই নি, উল্টে না করার সমর্থনে তর্ক করেছেন। এজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যথা পেয়েছেন। তা' জানতে পেরে কালীষষ্ঠীমার আবার মন খারাপ হয়ে পড়ে। তিনি একটু আগে এসে সসঙ্কোচে একপাশে বসেছেন। এখন ধীরে ধীরে বললেন—আমি যে আপনাকে ব্যথা দিলাম, আপনি কষ্ট পেলেন, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী?

পরম-সোহাগভরে বললেন দয়াল ঠাকুর—আমি আর কিছু চাই না। আমি চাই, আমার মুখখানা যেন তোর সব সময় মনে পড়ে। 'সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে গো, পড়ে মনে।' দ্যাখ্, আমি হলেম গরিবের ছাওয়াল। আর তুই হলি বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ। পাতি-পাতি করে দ্যাখ্, আমার টাকা বলে কিছু নেই। আমার টাকা শুধু কয়েকটা মানুষ। টাকার যখন দরকার হয়, একজনকে ডেকে কই, 'এই আমারে কয়টা টাকা দিবি?' আর, তোর আছে প্রচুর, ঝেড়ে দিলেই হ'ল।

কালীষষ্ঠীমা— (ক্ষোভের সুরে) একথাও আমার শুনতে হল! যাক, এখন আমার প্রায়শ্চিত্ত কী?

কণ্ঠস্বরে রঙ্গরসের সঞ্চার ক'রে বললেন প্রভু—ভাল ডালিম খাবের (খেতে) পারিস?

কালীষষ্ঠীমা—ডালিম যখন হয় তখন খাব। এখন কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(পূর্ব্বোক্ত ভঙ্গিমায়) এখনকার ডালিম যদি ভেঙে শিয়ালের গোয়ায় দেওয়া যায়, তাহলে দৌড়ায়, দৌড়ায়।

কালীষষ্ঠীমা—আমি কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাগড়ার ঝোল খেলে হয়।

আরো কিছুক্ষণ এইরকম কথাবার্ত্তার পর কালীষষ্ঠীমার মন হাল্কা হল। তিনি স্বাভাবিকভাবে কথা কইতে লাগলেন। অদ্ভুত তথা অনবদ্য এই চিকিৎসা!

রাতেও শ্রীশ্রীঠাকুর হলঘরেই আছেন। কালিদাসদা (মজুমদার) আসামের প্রতাপ মজুমদারদাকে নিয়ে এসে বললেন—চাকরির নানা গোলমালে ওঁর বড় depression-এ (অবসাদে) কাটছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর। Depression (অবসাদ) যখন জোর ক'রে চেপে ধরে তখন পরিবেশের সঙ্গে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ব্যবহার করতে হয়।

কালিদাসদা—সামান্য গোলমালে ওঁর চাকরিতে প্রমোশনটা stopped হয়ে (থমকে) আছে।

এক ঝটকায় যেন ঐ সমস্যার কথা উড়িয়ে দিয়ে পরম দয়াল বললেন—বয়েই গেল। 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাখবে?' পরিবেশের সেবা কর। তাদের যাতে ভাল হয় তাই কর। ধর, কর। তুমি যে কাজ কর তার চাইতে এই কাজ ঢের বেশি লাভজনক। মনে রেখো—

"ভৌতিক শকতি নহে নিয়ন্তৃ বিশ্বের,
রহি অন্তরালে তার শক্তি আধ্যাত্মিকী
সৃজন পালন বিশ্ব করেন নিয়ত;
পাপাচারে কদাচারে সন্ধুক্ষিত যেথা
বিধিরোষ নিঃসন্দেহে জানিও সেথায়,
নিষ্ফল পুরুষকার, দৈব বলবান।"

আমি কই, তোমার অত সব দিয়ে কাম কী? আমার যা' বলা আছে সেইভাবে চল। যা' হয় তাই হবে। যত ঘাবড়াবে ততই মুশকিলে পড়ে যাবে। ওরকম হলে তোমার মন কমে যাবে। মন কমে গেলে বিভা কমে যাবে। বিভা কমে গেলে বিভূতিও কমে যাবে। আর, বিভূতি মানে হওয়া। সেজন্য বিভূতি কমে যাওয়া মানে তোমার বেড়ে-ওঠার পথ মিইয়ে যাবে।

প্রতাপদা—কিন্তু মাঝে মাঝে depression-এ (অবসাদে) মনটা যেন ভেঙেচুরে যায়।

আবার কণ্ঠস্বরে এক ঝটকা মেরে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ধ্যেৎ শালা! ভেঙে পড়ে! ভেঙে পড়লে তো ভেঙেই গেল। আমিও ভেঙে পড়েছিলাম আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ার পর থেকে। তারপর ঐ একটা ওষুধ দিল। তাতেই ভাল হয়ে গেল। আমি কই, চল, থেমে থেকো না, এগিয়ে চল তোমার পরিবার-পরিবেশ সব যা'-কিছু নিয়ে। চাই কৃতি-নিষ্পাদন, লোকচর্য্যা। Out and out (সম্পূর্ণরূপে) এগুলি যত ভাল ক'রে করতে পারব, তত আমার লাভ। সাহেব-সুবো যেই আসুক সবার সাথেই ইষ্টানুগ দরদী ব্যবহার করবে। আর, কাজ করার সময় বিবেচনা ক'রে বেছে ঠিক ক'রে নিতে হয় কোন্‌টা কী ধরনের কাজ। এক জাতীয় কাজ যেগুলি সেগুলিকে অন্য জাতীয় থেকে আলাদা ক'রে নেবে। এইরকম করতে করতেই তুমি বেড়ে উঠবে। তোমাকে যদি মেথরদের সর্দারও ক'রে দেয়, সেখানেও তুমি honestly (সততার সঙ্গে) চলবে যাতে কৃতী হয়ে উঠতে পার। একটা গল্প আছে। একজন ইটালিয়ান ছিল। তাকে ঐরকম মেথরদের সর্দার ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু সে এমনভাবে চলত, এমনভাবে লোকসেবা করত যে শেষ পর্য্যন্ত গভর্নমেন্ট তাকে State-এর (রাষ্ট্রের) একটা বড় post (পদ) দিতে চায়। তোমার প্রস্বস্তি চাই, প্রসাদ চাই না। প্রস্বস্তি মানে তুমি ভাল থাক তোমার পরিবার-পরিজন-পরিবেশ সব নিয়ে। আজ যদি নেহেরু বা চৌ (এন লাই) তোমার কাছে আসে, তুমি তাদের সাথে sweetly (মিষ্টভাবে) কথা ক'বে বটে, কিন্তু তা' যেন তাদের পক্ষে propitious (শুভবাহী) হয়। তোমার কথা শুনে তারা হয়তো তোমাকে thanks (ধন্যবাদ) দিল। তুমি বলবে, thanks (ধন্যবাদ) আমি চাই না। I am servant of your welfare (আমি তোমাদের

মঙ্গলাকাঙক্ষী সেবক)। এমনভাবে কথা কইতে পারবা না? কথা কইতে গেলে ভাবাবেশ চাই। ভাব মানে হওয়া। তুমি যেমন হয়ে উঠবে, সেইভাবে আবিষ্ট হবে, তোমার কথাবার্ত্তাও তেমনি হয়ে বেরোবে। আবার, কথার মধ্যে valour-ও (শৌর্য্যও) থাকা চাই। Valour (শৌর্য্য) সেখানেই, যাতে মানুষের হৃদয়টাকে তুমি এমনভাবে 'ম্যাসাজ' করে দিলে যে, সে তুমি ছাড়া আর কিছু বুঝতেই না পারে।

প্রতাপদা—অফিসে আমার কাছে একটা কাগজ এনে সই করতে বলেছিল। আমি কাগজটা না দেখেই সই ক'রে দিয়েছিলাম। সেটাই ভুল হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে না দেখে সই করে দিলে, ওটাও dishonesty (অসাধুতা)। ধর তুমি মালিক আছ। তোমার কর্ম্মচারীদের তুমি বিশ্বাস কর। কিন্তু তাদের কাছ থেকে যদি কিছু নিতে হয়, সেটা খতিয়ে দেখে নেবে না? আমার হাতে পাঁচটা আঙ্গুল আছে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু কোন আঙ্গুল দিয়ে কিছু করতে গেলে খতিয়ে দেখব না কোন্ আঙ্গুলে কী করছি? এই আর কি!

এরপর আর কথাবার্ত্তা এগোয় না। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে প্রতাপদাকে নিয়ে কালিদাসদা উঠে গেলেন।

১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৭, বৃহস্পতিবার (ইং ২৮। ৪। ১৯৬০)

প্রাতে—হল ঘরে। আজকাল রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে-পায়ে সেঁক-মালিশ করা হয়। আজও করা হয়েছে।

এখন বেলা দশটা। জাস্টিস জে. এন. মজুমদার এলেন। ঘরে ঢোকার আগেই ওঁকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওঁকে কয়েকটা ছড়া প'ড়ে শোনাস্।

মিঃ মজুমদার এসে বসলেন। কুশল বিনিময়াদি হল। মিঃ মজুমদারের যাওয়ার দিন এগিয়ে আসছে সে-সব কথাও হ'ল। তারপর আমি বললাম—ঠাকুর কয়টা ছড়া দিয়েছেন, আপনি শুনবেন?

মিঃ মজুমদার 'হ্যাঁ', বলতে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নতুন দেওয়া কয়েকটি ছড়া পর পর পড়ে শোনালাম। পড়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর মিঃ মজুমদারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—বোঝা যায় তো?

মিঃ মজুমদার—আমি বুঝলে যদি হয়, তাহলে বোঝা যায়। (একটু পরে বললেন) এখানে যাদেরই দেখলাম, তারাই খুব ভাল। মিষ্টি আলাপ। সবাই ভাল হবার চেষ্টা করছেন।

আরো কিছু কথার পরে মিঃ মজুমদার বিদায় গ্রহণ করলেন। এই দীন লেখকের পিতৃদেব শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে ডেকে দয়াল ঠাকুর

বললেন—হেমচন্দ্র! দুখানা রুটি খাওয়াবা তিত্তিরিকে? রুটি খেলে মোটা হয়, চুল বড় হয়। আমি এত খাওয়ালাম। কিন্তু ও মোটাও হল না, ওর চুলও আর বাড়ল না। তুমি এনে দেবা দু'খানা?

বাবা রওনা হবার উপক্রম করতেই দয়াল বাধা দিয়ে বললেন—এখন না। বিকালে দিলেই হবে।

বহিরাগত জনৈক দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ কথা শুনেই বেরিয়ে যান এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বাজার থেকে দু'খানা বড় পাউরুটি নিয়ে ফিরে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সরোজিনীমাকে বললেন রুটি দুখানা নিয়ে ভাল ক'রে দেখতে। সরোজিনীমা জানালেন—ভাল রুটি।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর তিত্তিরিদিকে ডাকতে বললেন। তিত্তিরিদি এলে তাকে রুটি দু'খানা দেওয়া হল।

বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে (হালদার) ডাকতে বললেন। শরৎদা এলে প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন—কী করছিলেন?

শরৎদা—চিঠিপত্র লিখছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্যাখেন, একটা কথা ক'য়ে রাখি। চলন-পথে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হয়, সেখানে কতটা ভাল আছে, খারাপ দিকটাই বা কতখানি আছে। আবার, খারাপ দিক যা' তাকে আমি কতটা নিরোধ করতে পারি বা আমার favourable (অনুকূল) ক'রে তুলতে পারি। অবশ্য ভাল দিকের তো কথাই নেই। তাও দেখতে হবে, ভাল দিকটা কিভাবে আমার জীবনের favourable (অনুকূল) ক'রে তুলতে পারি। যেমন ধরেন, দালানটা খুবই ভাল। বাস করতেও আরাম। কিন্তু যদি ভূমিকম্প হয়, দালানের দাম তখন কম। তখন কিন্তু ঐ খড়ের ঘর বা টিনের ঘরের দাম বেশী। তাহলে, কোন ভালই ভাল নয় যদি তা' জীবনপোষণী না হয়। আবার দ্যাখেন, আপনি যদি কাউকে attack (আক্রমণ) করতে চান তাহলে retreat-এর (পশ্চাদনুসরণের) পথটা এমনভাবে ঠিক রাখা লাগে যাতে বিপদে না পড়েন। এমনি ক'রে চলবেন। আর, যা-ই achieve (অর্জ্জন) করতে চান না কেন, তার মধ্যে থাকা চাই valourous go with conscientious consideration and sentimentalism (সুবিবেকী বিচক্ষণতাসমন্বিত পরাক্রমী চলন এবং ভাবাবেগ)। আপনার ইষ্টনিষ্ঠা যত ঠিক থাকবে, তত এগুলি correctly (ঠিকমত) করা হবে। লঙ্কায় রামচন্দ্র যুদ্ধের সময় বলছিলেন, 'এত লোকক্ষয় আমি চাই না।' হনূমান তার কোন উত্তর দেয় নি। অন্ততঃ দিতে শুনিনি। সে যা' করার তা' করত। তার গুরু রামচন্দ্রের বউ অন্যে নিয়ে যাবে, এটা তার পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব ছিল না। তবে দেখত, রামচন্দ্রকে যতখানি যুদ্ধে engaged (প্রবৃত্ত) না করায়ে পারে। তার ইষ্টের ব্যাপারে হনূমান কাউকে

খাতির করত না। রামচন্দ্রের স্বার্থকে ঠিক ঠিক বজায় রাখতে কে চায় আর কে চায় না সেদিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। রামচন্দ্রই ছিলেন তার জীবনের মণিকাঁটা। সেইজন্য সে মানুষকে কম সন্দেহের চোখে দেখেনি। বিভীষণকেও সন্দেহ করেছিল কয়েকবার।

এই পর্য্যন্ত একটানা কথা বলে শ্রীশ্রীঠাকুর চুপ ক'রে বসলেন। তাঁর প্রসারিত দক্ষিণকরতলে সরোজিনীমা এনে দিলেন সুপারিখণ্ড ও লবঙ্গ-কুচি। সেটুকু মুখে ফেলে দিয়ে দয়াল ঠাকুর আবার বললেন—এসব কথা আমার বোধ হয় কওয়া আছে। আসল কথা হ'ল, মানুষ কাজে কিছু না ক'রে যদি শুধু কথাসর্ব্বস্ব হয়, তাতে তার কোন লাভ নেই। Example is better than precept (উপদেশের চাইতে উদাহরণ হওয়া ভাল)।

বহিরাগত একটি ভাই বললেন এই সময়—আমি জীবনে অনেক ভুল পথে চলেছি; সেজন্য আজ খুব অনুতপ্ত। আমাকে যদি কেউ অভিশাপও দেয়, তার কাছ থেকেও আমি ক্ষমা ভিক্ষা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই, তোমার ইষ্টনিষ্ঠা যেন অটুট থাকে। নিষ্ঠা, আনুগত্য আর কৃতিসম্বেগ, এই তিনটি যদি ঠিক থাকে, তুমি অনেক আপদ থেকে উদ্ধার পাবে। তাই, তোমার সব কাজই যাতে ইষ্টনিষ্ঠার সাথে মেলে, বুদ্ধি ক'রে তাই করো। মনে রেখো, ইষ্টনিষ্ঠাই জীবনের মণিকাঁটা। দোকানে ওজন করার সময় দেখ নি দাঁড়িপাল্লায় দুটি কাঁটা থাকে—একটি নীচে আর একটি উপরে, যার নাম মণিকাঁটা। নীচের কাঁটাটি যখন উপরের কাঁটাটির সঙ্গে মুখোমুখি মিলে যায়, তখনই ওজন ঠিক হয়েছে বলা যায়। ঐরকম জীবনটাও মেলাতে হবে ইষ্টনিষ্ঠার সঙ্গে। ইষ্টনিষ্ঠার সাথে সঙ্গতিশীল যে জীবন তা' আর উল্টোপাল্টা বিকৃতির চলনে পড়ে ধ্বস্তনস্ত হয় না।

উক্ত ভাই—আমি অনেক ভাবি, কিন্তু—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু চিন্তা নয়। চিন্তার সাথে যদি তদনুগ কর্ম্ম থাকে তবেই ফল পাওয়া যায়। নয়তো কি হয়?

এই সময়ে শরৎদা তাঁর সাথে আলোচনার সূত্র ধরে বললেন—দীক্ষার কথাটা তন্ত্র ছাড়া অন্য কোথাও যেন পরিষ্কার ক'রে নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দক্ষ হওয়ার তুক হল দীক্ষা। আর, দক্ষ হতে গেলেই নিষ্ঠা লাগে, আনুগত্য লাগে আর কৃতিচলন লাগে। দীক্ষার ভিতর দিয়ে পাওয়া যায় মন্ত্র। মন্ত্র হ'ল সেই formula (সূত্র) বা clue (তুক), যার বিহিত চর্চা ও প্রয়োগের ভিতর দিয়ে দক্ষতা আসে। এই যে দীক্ষা নিলে নাম করতে হয়, নামের মধ্যে আছে নম্, মানে নতি। যার নাম করছি তার উপর যদি আনতি না থাকে তাহলে আর নাম করা হয় না।

শরৎদা—সাবিত্রীদীক্ষার কথা অবশ্য অন্যত্র আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা বৈদিক।

এখন ১১-৮ মিনিট হওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার উঠে স্নান করতে গেলেন।

সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এলেন হাওড়া জি-আর-পি-র অফিসার-ইনচার্জ সিদ্ধেশ্বর রায়। তাঁর সাথে আরো একজন ভদ্রলোক আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম ক'রে ওঁরা এগিয়ে-দেওয়া চেয়ার দুটিতে বসলেন।

সিদ্ধেশ্বরবাবু বলছিলেন তাঁর পুলিশের চাকরি করতে যেয়ে কতরকম অসুবিধায় পড়তে হয়। শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনার যে পথ, খুব ভাল। এর মধ্যে লোকসেবা করার সুযোগ পাওয়া যায়। আর লোকসেবা মানেই নারায়ণের সেবা।

সিদ্ধেশ্বরবাবু—কিন্তু সবসময়েই তো চোর-ছ্যাঁচোড় নিয়ে কারবার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, চোর চুরি করে। চুরি ক'রে অপরের অসুবিধা করে। তাকে বুঝানো লাগবে যে, তার জিনিস যদি কেউ চুরি করে সেটা সে পছন্দ করে না। আবার, এই বুঝতে গেলে মানুষের উপর compassion (অনুকম্পা) থাকা চাই। Compassion (অনুকম্পা) যদি না থাকে তাহলে কারো ভিতর কিছু impart (সঞ্চারিত) করা যায় না।

আরো দু'চার কথার পরে ভদ্রলোকদ্বয় বিদায় গ্রহণ করলেন।

রাত সাড়ে আটটা হ'ল। শৈলেনদা (ভট্টচার্য্য), প্যারীদা (নন্দী), ধীরেনদা (বিশ্বাস) প্রমুখ আছেন। অজিতদা (গাঙ্গুলী) বললেন—আমাকে পরখ-পাঞ্জা দেওয়া হ'ল। এই পরখ দেওয়ার কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ইচ্ছা ছিল, ঋত্বিকের পাঞ্জা যারা নেবে তাদের আগে পরখ-পাঞ্জা দিয়ে test (পরীক্ষা) করা। তারা কিভাবে কী করে, সামাজিক সাত্বত পদ্ধতিগুলি কিভাবে ঠিক রাখে, সেটা observe (পর্য্যবেক্ষণ) করা। অনেকে অনেক সামাজিক অন্যায় করে। যেমন, একজন হয়তো নিকৃষ্ট বর্ণের লোক তোমাকে জোর করে ভাত খাওয়াতে চায়। ঋত্বিক যারা হবে তারা এই অবৈধ চলনগুলি কিভাবে manipulate (সুকৌশলে চালিত) ক'রে তার মোড় ফেরাতে পারে তা' লক্ষ্য করতে হলে ঐভাবে এগোনো ছাড়া তো পথ নেই। কারণ, সমাজকে নষ্ট করার জন্য তো ঋত্বিক না; ঋত্বিকের কাজ হ'ল সমাজকে make up করা। আমি আগে যে পাঞ্জা দিয়েছিলাম, সেটা uplifting final step (উন্নতি-বিধায়ক চরম স্তর)। এরা ঐগুলি সব ফেরত নিয়ে যদি পরখ দিয়ে test (করা) আরম্ভ করত, তাহলে ভাল হত।

অজিতদা—কিন্তু আমি যে প্রতিঋত্বিকের পাঞ্জা পেলাম, আমার করণীয় কী তা' তো বলে দেওয়া হবে। তারপর বাইরের থেকে ঘুরে এলে আমি কী ক'রে এলাম, তার খতিয়ানও নেওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এসব আমার ঢের কওয়া আছে।

এরপর ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—সারিপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন, এদের নাম যত শোনা যায়, এরা not a man of that caliber (সেই পর্য্যায়ের লোক নয়)। ওদের নাম ঐ বুদ্ধদেবের প্রভাবে।

আমি—কিন্তু ওদের জীবন কেমন হয়ে গেল। দুজনেই নাকি মহাকাশ্যপের চক্রান্তে নিহত হয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহাকাশ্যপ ছিল মহাপণ্ডিত।

আমি—তার কাছেই তো বুদ্ধদেব সবাইকে পাঠাতেন। বলতেন, মহাজ্ঞানী মহাকাশ্যপ যা' বলেন শোন গে'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও কই।

আমি—মহাকাশ্যপ যে পরে ক্ষতি করবেন তা' জেনেও বুদ্ধদেব অমন বলতেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলতেন, কারণ তার জ্ঞানের অহঙ্কার ছিল। দারুণ অভিমানী। ঐ অবস্থাকে manipulate (বিনায়িত) করতেন। আবার, শিষ্যদের মধ্যেও অনেকে মহাকাশ্যপের অনুগামী হয়ে পড়েছিল। সেইজন্য বুদ্ধদেবের মৃত্যুর সময়টা দেখ। শেষ পর্য্যন্ত অল্প কয়েকজন ছাড়া তাঁকে কেউ চাইল না। তারপর আবার দেখ, রামকৃষ্ণ ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, তাঁর জন্যই ওখানে কত পয়সা আসত। ওখানকার ওদের অত কিছু শ্রীবৃদ্ধি সব তাঁরই জন্যে। কিন্তু তাঁর যখন ক্যানসার হ'ল, তিনি চ'লে গেলেন কাশীপুরের বাড়ীতে। তাঁকে ওদের ওখানে রাখাই উচিত ছিল।

আমি—রামকৃষ্ণদেবের ক্যান্‌সার হওয়ার জন্যই কি তাঁকে ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অথবা এমন অবস্থা হয়েছিল যে তিনি নিজেই স'রে গেলেন। পরে বিবেকানন্দের খুব নাম হল। তারও যা'-কিছু সব ঐ রামকৃষ্ণ ঠাকুরেরই জন্য।

১৬ই বৈশাখ, ১৩৬৭, শুক্রবার (ইং ২৯। ৪। ১৯৬০)

ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণে খড়ের ঘরের উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা বড় তাসু ছিল। উৎসবাদির সময় শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে ওখানে যেয়ে বসতেন। কখনও কখনও

রাত্রিবাসও করতেন। তাসুটির ভেতরে অনেক জায়গা থাকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকির চারপাশে বহু লোক বসতে পারত।

কিছুকাল আগে শ্রীশ্রীঠাকুর তাসুটি তুলে দিয়ে ওখানে বেশ প্রশস্ত একটা ঘর ক'রে দিতে বলেছেন। বলেছেন, "ঘরখানা দরবার-গৃহের মত হওয়া চাই।" ঘরটির আয়তন সেইমতই করা হয়েছে। উপরে টিনের চাল। আর, চারদিকের দেওয়াল এলুমিনিয়মের পাত দিয়ে মোড়া। বেশ ঝক্‌ঝক্ করছে। সূর্য্যকিরণ যখন ঐ এলুমিনিয়মের পাতের উপর ঠিকরে পড়ে, সেদিকে তাকালে চোখ ঝল্‌সে যায়।

আজ এই ঘরে গৃহপ্রবেশ হবে। দিন দেখা হয়েছে। প্রবেশদ্বার দুটি কলাগাছ ও মঙ্গলঘট দিয়ে সাজানো হয়েছে। সকাল ৬টার পরে শুভক্ষণ। সময় হলে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীবড়মা ও পরমপূজ্যপাদ বড়দা-সহ এলুমিনিয়মের ঘরটিতে প্রবেশ করলেন। চৌকিতে বসলেন। একে একে ভক্তবৃন্দ অনেকে এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। সবাই ঘরের ভিতর চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর দু'টি ছড়া দিলেন। কথাবার্ত্তা বলতে বলতে একবার তামাক খেলেন। তারপর বেলা সাড়ে আটটায় উঠে চ'লে এলেন বড় দালানের হলঘরে।

কিছু বাদে জাস্টিস মজুমদার এসে বসলেন। জানালেন যে আজ উনি কলকাতায় রওনা হয়ে যাবেন। পরে বললেন—যাওয়ার কথা মনে হ'য়ে কান্না পাচ্ছে। বেশীক্ষণ থাকব না। শেষকালে বুড়ো বয়সে ভ্যাঁৎ ক'রে কেঁদে ফেলব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(করুণ স্বরে) আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে।

এরপর মিঃ মজুমদার শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানা ফটো চাইলেন। বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) এনে দিলেন। মিঃ মজুমদার ফটোটি হাতে নিয়ে দেখছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে দরদভরা কণ্ঠে বললেন—শরীর ঠিক রাখবেন। কী কয়? শরীরমাদ্যং—?

মিঃ মজুমদার—খলু ধর্ম্মসাধনম্।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমেরিকার কোন ভাল ডাক্তার বা সার্জেনকে দিয়ে যদি দেখান মাঝে-মাঝে, তাহলে ভাল হয়।

মিঃ মজুমদার—আচ্ছা।

মিঃ মজুমদার রসকদম চেয়েছিলেন কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে এখন সেই রসকদম এক হাঁড়ি এনে দেওয়া হল।

এইসময় পরমপূজ্যপাদ বড়দা এলেন। মিঃ মজুমদার ওঁর কাছেও বিদায় গ্রহণ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আল্‌তোভাবে বসে আছেন হাত দু'খানি দু'পাশে রেখে। সেইদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মিঃ মজুমদার বললেন—ঐরকমভাবে বসা ফটো একখানা আমার চাই।

বিশুদা—আচ্ছা, ওরকম ফটো একখানা ব্যবস্থা ক'রে পরে আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

এবার মিঃ মজুমদার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আচ্ছা, আর থাকব না।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন মিঃ মজুমদার। তাঁর দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর তাকিয়ে আছেন বড় মিষ্টি স্নেহভরা চোখে। দরদমাখানো সুরে বললেন—শরীর-টরীর ঠিক রাখবেন।

এই পরম আপন-করা ভাবের মধুর স্পর্শে মিঃ মজুমদার রুদ্ধবাক্, চোখ তাঁর ছল্‌ছল্ করছে। কথা আর বলতে পারলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করতে করতে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

মানুষ আসে যায়। পরমপিতার দরবার কখনও শূন্য থাকে না। কতরকম লোকের আনাগোনা নিত্যই লেগে আছে। কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, এখানে বঞ্চিত বোধ করে না কেউই, বরং প্রত্যেকেই মনে করে 'ঠাকুর আমাকে সব চাইতে বেশী ভালবাসেন।' এ দিব্য লীলা চিরন্তন চলেছে। বোঝে-প্রাণ বোঝে যার।

রামেশ্বরপ্রসাদ জালান অনেকদিন পর আশ্রমে এসেছেন। উনি জামালপুরে থাকেন। সঙ্গে ওঁর ছোট ভাইও আছেন। দুজনে প্রণাম ক'রে বসলেন।

নিজের পরিচয় দিয়ে জালান বলছেন—পঁচিশ বছর আগে দেখেছি। কতদিন ভাবি আসব। আসাই হয় না। কলকাতায় আমার কাঠের business (ব্যবসা) ছিল। বহু কাঠ supply (সরবরাহ) করেছি পাবনা-আশ্রমে। তখনই দীক্ষা নিয়েছি।

প্রফুল্লদা (দাস)—আপনাকে কে দীক্ষা দিয়েছিলেন?

জালান—ঠাকুর নিজে।

প্রফুল্লদা—আপনি যখন আশ্রমে যান তখন ঠাকুর কোথায় বসতেন?

জালান—আমার কাছ থেকে কাঠ নিয়ে ঘর বানিয়ে সেই কাঠের ঘরে বসতেন।

প্রফুল্লদা—তখন কি মহারাজ বেঁচেছিলেন?

জালান—স্মরণ নেই। ঠাকুর তখন পদ্মার ধারে বসতেন। চমৎকার পরিবেশ ছিল আশ্রমের। আমার সৌভাগ্য যে বহুদিন পর আবার ভগবানের দর্শন পেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও খুব আনন্দ। পুরানো মানুষ দেখলে পরে আমারও মনে হয় আমার বয়স অনেক কমে গেছে।

আরো কিছু কথাবার্ত্তার পর জালান বিদায় গ্রহণ করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হরিনন্দনদাকে (প্রসাদ) ডেকে বললেন—হরিনন্দন! তুমি ওঁর ঠিকানা রেখে দাও। চিঠিপত্রে যোগাযোগ করতে পারবা।

এরপর জালানরা দুই ভাই প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন। হরিনন্দনদাও ওঁদের সাথে গেলেন। ওঁরা চলে যাওয়ার পর নিখিলদা (ঘোষ) জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার নিজের দীক্ষা দেওয়া সৎসঙ্গীর সংখ্যা কত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব কম।

নিখিলদা—তিন চার জন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব কম। কত মনে নেই।

সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় আছেন। সুশীলদার (বসু) সঙ্গে জাস্টিস মজুমদারের কথা বলছেন। মজুমদার আজ সকালেই কলকাতায় রওনা হয়ে গেছেন।

ঐসব কথাবার্ত্তার পরে সুশীলদা জানতে চাইলেন চোখের রোগের পক্ষে কী ওষুধ ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পদ্মমধু বলে সর্ব্ব চক্ষুরোগের মহৌষধ। বঙ্কিমই (রায়) এটা বের করেছিল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর শৈলেনদাকে (ভট্টাচার্য্য) জিজ্ঞাসা করলেন—ছড়াগুলি দেখছিস?

শৈলেনদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এই লেখাগুলি কিন্তু একটাও মনগড়া বা বাজে কথা না। সব আমার experience-এর (অভিজ্ঞতার) কথা।

শৈলেনদা—আমাদের দীক্ষাদানের সময় যে চক্রফটো ধ্যান করার কথা বলতে হয়—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা আমি আগে করিনি। পরে হয়েছে। পি সি সরকার যখন আশ্রমে (পাবনায়) গেল, তখন তার সাথে কথায়-কথায় light reflection-এর (আলোর প্রতিফলনের) কথা উঠল। সে বলল, শাস্ত্রে এরকম যন্ত্রের কথা আছে। ঐরকম গোলাকার একটা যন্ত্রের মধ্যে যদি মনঃসংযোগ করা যায় তাতে একটা mechanical push (যান্ত্রিক প্রযোজনা) মতন হয়, আর তাতে brain power (মস্তিষ্কের শক্তি) বাড়ে। তখন আমি সাদা-কালো ক'রে এই ষোড়শদল চক্রের idea (পরিকল্পনা) দিই। পরে কেষ্টদা তন্ত্র থেকে খুঁজে বের করল, এরকম একটা যন্ত্রের কথা সেখানে আছে, তার নাম মহালক্ষ্মীযন্ত্র। ঐ সময় থেকে এ'টা চলে আসছে।

এরপর শৈলেনদা শবাসন করা নিয়ে কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে বললেন পরম দয়াল—শবাসন আমিও করতেম। ওতে শরীরটা soothed (ঠান্ডা) করে। শবাসন নিয়মিত করলে সহজে হার্টফেল হতে দেয় না।

কথায়-কথায় রাত হয়ে এলো। শ্রীশ্রীঠাকুরের ওঠার সময় হল। এখন উঠছেন। খাট থেকে শ্রীচরণ দু'খানি ঝুলিয়ে চটিজোড়া পরছেন। চটি পরে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন—আমি যা' কই তা' একটুখানি করলেই মানুষ বুঝতে পারবে ঠেলাটা কী!

তারপর প্যারীদা (নন্দী) ও বঙ্কিমদাকে (রায়) দুইপাশে ধ'রে হাঁটতে হাঁটতে বাথরুমে গেলেন।

১৭ই বৈশাখ, ১৩৬৭, শনিবার (ইং ৩০। ৪। ১৯৬০)

প্রাতে—হল্‌ঘরে। শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), সুধীরদা (বসু), প্রফুল্লদা (দাস), বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে প্রফুল্লদা বলছিলেন—কাজ ক'রে যাচ্ছি। কিন্তু মাঝে-মাঝে মন-টন হাঁফায়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরকম হয়ই। সেইজন্য valour (পরাক্রম) থাকা চাই। Valour (পরাক্রম) যত বাড়বে, তত তুমি ওগুলিকে কাটিয়ে উঠতে পারবে।

প্রফুল্লদা—একজনের সাথে কথা বলতে যেয়ে হয়তো যে balance-টা (মানসিক সমতাটা) বজায় রাখার দরকার তা' রাখতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে ঐ উর্জ্জনা নেই। সেইজন্য তুমি environment-এর (পরিবেশের) দ্বারা moulded (প্রভাবিত) হয়ে পড়। আবার তুমি environment-কে (পরিবেশকে) যতখানি mould (নিয়ন্ত্রিত) করতে পারবে, তোমার valour-ও (পরাক্রমও) ততখানি বেড়ে যাবে।

প্রফুল্লদা—আমাদের এই পরিবেশের বাইরে কথা বলতে যেয়ে কিন্তু balance (মানসিক সমতা) হারাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার কারণ, সেখানে conscious (সচেতন) থাক। এখন, এখানে যদি একটু বেশী ক'রে conscious (সচেতন) হ'য়ে চল, তাহলে বাইরে সেটা ক'মে যেয়েও যা' থাকবে, তার ঠেলায় অস্থির হ'য়ে যাবে। Great man (মহামানব) হওয়ার একটা বড় বাধা কিন্তু ঐ balance (মানসিক সমতা) না-থাকা।

প্রফুল্লদা—অনেক সময় মনে হয়, সব বাদ দিয়ে একেবারে নিরিবিলিতে যেয়ে থাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'তে তোমার লাভ? ওরকম যেই করবে, আর নিজেকে ধরতে পারলে না, চিনতে পারলে না।

প্রফুল্লদা—অনেক সাধক নির্জ্জনে তপস্যা করেছেন, শোনা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে একরকম, আর আমার এটা আর একরকম। ওরকম ক'রে দেখতে পার কেমন হ'য়ে যাও।

প্রফুল্লদা—সংঘাতে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' উঠতে পারে। দেখ, রামকৃষ্ণ ঠাকুর নিজে কিন্তু নির্জ্জনতপা ছিলেন না। তিনি মানুষ নিয়ে চলতেন, রাণী রাসমণিকে সচেতন ক'রে দেবার জন্য তাকে চড় মারলেন, আরো কত কী করেছেন। তিনি কিন্তু একটা পাহাড়ের ধারে কোন নির্জ্জন জায়গায় যেয়ে ব'সে থাকেন নি। রামকৃষ্ণ ঠাকুর আজ নেই, কিন্তু শুধু তাঁর নামেরই আজ কত দাম! সাধনা মানে হ'ল তাই—আমি যা' আয়ত্ত করতে চাই তা'তে actively engaged (সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত) হওয়া।

প্রফুল্লদা—আমাদের নিজেদের মধ্যে যখন একটা অবিশ্বাস, ক্রূর সমালোচনার ভাব দেখি, তখনই অশান্তি লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অশান্তি লাগলে তো কাজ হবে নানে। সেটাকে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেওয়া লাগে। তাতে তোমারও আত্মপ্রসাদ, অশান্তি যে করে তারও আত্মপ্রসাদ।

শৈলেনদা—সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে ব'লে আমরা অনেক সময় অন্যায়ের প্রতিবাদ করি না, neutral (নিরপেক্ষ) থাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Neutral (নিরপেক্ষ) থাকি মানে তাকে সংশোধন করার জন্য nurture (পোষণ) দিতে পারলাম না। তোমার ভিতরে যে মালমশলা আছে তা'কে কাজে লাগালে না।

শৈলেনদা স্বামী বিবেকানন্দের valour-এর (পরাক্রমের) কথা তুললেন। তা'তে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্বামীজী কও আর যারই কথা কও, রামকৃষ্ণ ঠাকুরের মত কেউ না। তিনি হ'লেন, ঐ যে কী কয়, মূর্ত্ত বেদ!

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাশি এল। জল চাইলেন। জল খেয়ে আবার পূর্ব্বপ্রসঙ্গ ধ'রে বলছেন—তবে কথা আছে। কখন কা'কে কী ক'ব সেটা ঠিক ক'রে নেওয়া লাগে। কথাটা কখন বলা সুবিধাজনক, মানে কখন বললে তোমার ভাল হয় দেশ-কাল-পাত্র ভেদে, সেটা ঠিক ক'রে নিতে হয়। তাতে তোমারও আত্মপ্রসাদ, যা'কে বলছ তারও আত্মপ্রসাদ।

এরপর পাশে সেবকবৃন্দের দিকে তাকিয়ে বললেন—এই তামুক খাওয়াস্ ভাল ক'রে।

বিশুদা তাড়াতাড়ি তামাক সেজে এনে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ধূমপান করছেন।

প্রফুল্লদা—নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা বরং সম্ভব। কিন্তু অপরকে—।

বাধা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Adjust (নিয়ন্ত্রণ) করব মনে করলে করা যায় না। আসল কথা হ'ল ইষ্টনিষ্ঠা। ওটা তোমার জীবনের মণিকাঁটা। ঐ ইষ্টনিষ্ঠা ঠিক থাকলে সব পারা যায়। কারণ, নিষ্ঠার মধ্যেই থাকে valour (পরাক্রম) যা'কে আমি কই উর্জ্জনা।

প্রফুল্লদা—অনেক জ্ঞানপাপী আছে, তারা জেগে ঘুমায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জেগে ঘুমায় ঘুমাক। তুমি তার ঘুমের আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রো না। সে যা'তে জেগে ওঠে তাই কর। দেখ, ভুল মানুষেই করে, আবার তার সংশোধনও হয়। কিন্তু সেজন্য হাতেকলমে করা চাই। তোমার নিষ্ঠানন্দিত চলনের ভিতর দিয়ে সত্য ব'লে যা' জেনেছ তা' তা'কে হাতেকলমে করাও। যত পড়াশুনাই কর, নিজের হাতে না লিখলে কি কখনও ভুল সারে? তেমনি বাস্তব করার মধ্য দিয়ে না গেলে কি কখনও কারো সংশোধন হয়? (তারপর হাসতে হাসতে বলছেন) ঐ যে একটা কথা আছে—'লেখাপড়া করে যেই, গাড়ীঘোড়া চড়ে সেই।' এখন আর বোধ হয় সেসব নেই।

শৈলেনদা—এখন অনেক নতুন নতুন কথা হয়েছে।

প্রফুল্লদা—আপনার চরণাশ্রিত যারা এখানে আছে, এদের মধ্যে তো সৎপ্রকৃতিই বেশী। তাই যদি হয়, তাহলে এদের পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটা বান্ধবতার বন্ধন থাকা উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার দত্তকপুত্র হয়, অন্যের মা-বাবাকে মা-বাবা ব'লে ডাকে, তাদের নিজেদের মা-বাবার 'পরে টান ক'মে যায়। আমরা যদি সেই দত্তকপুত্রের মত হই, তাহ'লে নিজের যা'রা তাদের উপর টান ক'মে যাবেই।

প্রফুল্লদা—ওটা তো distortion-এর (বিকৃতির) ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐভাবে চলতে চলতে স্বভাবই ঐরকম হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাকারিণীদের মধ্যে একজন বয়স্কা বিধবা ছিলেন ননীমা। তাঁর প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে নানাভাবে শুভপথে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ননীমা নিয়ন্ত্রিত তো হলেনই না, বরং কিছুদিন আগে ঠাকুরবাড়ী ছেড়ে চ'লে যান।

ঐ প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ননীর জন্য যতখানি পারা দরকার ছিল তা' আমি করতে পারলাম না। আমি এইরকমই ভাবি। অন্যে কী করল বা তার কী করা উচিত ছিল তা' আমি দেখি না, আমি আমার দিকটাই দেখি। আমি

ভাবি, মানুষ যেমনই হোক, তার জন্য চেষ্টা করতে দোষ কী! ফলে যদি মিলে যায়, অঙ্ক যদি মেলে!

আমি—সমাজে তো এরকম চরিত্র ঢের আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি একটা-দুটোও মিলে যেত, তাহলে সব মানুষগুলোকেই একে একে ধরতাম।

প্রফুল্লদা—মনে হয়, এই জাতীয় মানুষের উপর আপনার বিশেষ লক্ষ্য আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লক্ষ্য ঐ দলের 'পরেও আছে, ভাল দলের 'পরেও আছে। তবে তোমাদের জন্য আমার অমন করা লাগে না।

শৈলেনদা—মানুষ যখন আপনার কাছ থেকে ফন্দিফিকির ক'রে টাকা নেয়, সোনাদানা নেয়, তখন মনটা বড় খচ্‌খচ্‌ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো করে। কিন্তু আমার টাকার চাইতে মানুষের উপর নজর বেশী।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বভাব-সুন্দর জীবনের অনেক কথা বললেন। চোখে তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা। প্রত্যয়ব্যঞ্জক দীপ্তভঙ্গিমায় ব'লে চলেছেন—ঐ রকম করবা। যেটুকু মাংস আছে, যেটুকু রক্ত আছে, যেটুকু নার্ভ আছে, যেটুকু মেধা আছে, সব দিয়ে ঐ রকম করবা, কৃতি-উর্জ্জনা থাকা চাই। এ সম্পর্কে আমার লেখাও আছে। কারো কাছে হয়তো আমার নিন্দা শুনলে, তখন আমাকে defend (সমর্থন) করছ। কী দিয়ে করছ? করছ তোমার experience (অভিজ্ঞতা) দিয়ে, rationality (যুক্তি) দিয়ে। এইভাবে ক'রে দেখ। চলা অনেকখানি সোজা হ'য়ে উঠবে। এখন তো তুমি ভিক্ষু—না কী কয়! তোমার তো আর কোন দায় নেই।

দরদভরা চোখে প্রফুল্লদার দিকে তাকিয়ে ব'লে চলেছেন দয়াল ঠাকুর—তোমাদের উপর এসে যদি কেউ অত্যাচার করে, তোমাদের মধ্যে আর কেউ তার protest (প্রতিবাদ) কর না। আর সেইজন্যেই, আমার নিন্দাও যখন কেউ করে, তোমরা তার protest (প্রতিবাদ) করতে পার না।

এই ব'লে একটি ছড়া দিলেন—

ইষ্ট-নিন্দা অপমানকে
নিরোধ যদি না-ই করিস্‌,
প্রবৃত্তি তোর উঠবে বেড়ে
করবেই নষ্ট তোরে জানিস্‌।

এরপর আরো অনেকগুলি ছড়া দিলেন। ধীরে ধীরে স্নানের বেলা হয়ে এল।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায়। অজিতদা (গাঙ্গুলী) জলপাইগুড়ির ব্যবসায়ী রাইমোহন সাহাদাকে নিয়ে এসে প্রণাম করলেন।

রাইমোহনদা—গরমে বেশ কষ্ট হ'চ্ছে। চ'লে যেতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা, যা, সেখানে যেয়ে ভাল থাকিস্ সেখানে যা। যদি যেতে পারতাম তো আমিও চ'লে যেতাম। তা' তুই যদি আমারে খান পাঁচেক গাড়ী দিস্, তাহ'লে গাড়ীতে ক'রেই ঘুরে বেড়ালাম।

তারপর কণ্ঠস্বরে সোহাগ ঢেলে দিয়ে বললেন—দেও বাবা, দেও যোগাড় ক'রে পাঁচখানা গাড়ী—টাটা মার্সিডিজ্।

রাইমোহনদা—আপনার আশীর্ব্বাদ থাকলে নিশ্চয়ই পারব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লেগে যাও। মনে রেখো, হনূমানের মতন না হ'লে কাম হয় না।

অজিতদা—রাইমোহনদা ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, চেষ্টা করলেই পারে। ওদের ওখানে তো যাতায়াতের সুবিধাও হচ্ছে। আমার আর যাওয়া হয় কিনা ঠিক নেই। পা-খানা যদি ভাল থাকে, তাহলে দেখা যায়।

অজিতদা—রাইমোহনদার মনে আপসোস ছিল, ঠাকুর আমার কাছে কোনদিন কিছু চান না। এবার পাঁচখানা গাড়ীর দায়িত্ব পেয়ে খুব খুশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এবার এমন চাপা চেপেছি, একেবারে গন্ধমাদনের মতন। (হাসছেন)

পূজ্যপাদ বড়দা সামনের দিকে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ডাকলেন—এই খোকা।

'আজ্ঞে' ব'লে বড়দা কাছে এগিয়ে এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দ্যাখ্, ও আমাকে পাঁচখানা গাড়ী দেবে।

পরমপূজ্যপাদ বড়দার সাথে ওঁরা উঠে গেলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে রাইমোহনদা পরে কোন গাড়ী শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেন নি।

ব্রজগোপালদা (দত্তরায়) এসে বসেছেন। তাঁকে বলছেন দয়াল ঠাকুর—Biography (জীবনী) যদি লিখতেই হয়, ইংরাজীতে লেখা ভাল। তারপর ইংরাজী থেকে বাংলা অনুবাদ হয় সেই ভাল। বার্ক-এর মত হওয়া চাই। বার্ক-এর সেই ইম্পীচ্‌মেন্ট না কি?

সুধীরদা (বসু)—হ্যাঁ, ইম্পীচ্‌মেন্ট অফ্ ওয়ারেন হেস্টিংস্।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর, শরীর ঠিক রাখবেন। ইনফ্লুয়েঞ্জা আমাকেও কম কাবু করে নি। ক্ষিতীশ (সেনগুপ্ত) কোথায়?

ক্ষিতীশদা কাছেই ছিলেন। ডাক শুনে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, ব্রজগোপালদাকে তাড়াতাড়ি তাজা ক'রে দাও লক্ষ্মি!

ক্ষিতীশদা—আজ্ঞে।

এই সময়, অফিস থেকে টাকার একটা হিসাব ঠিকমত পান নি ব'লে প্রভাতদা (দে) এসে অফিস-কর্ম্মীদের নামে অভিযোগ করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর চুনীদাকে (রায়চৌধুরী) ডেকে সব কথা শুনতে বললেন।

তারপর বললেন—ভুল যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখো। ভুল হ'লে ব'লো, 'ভাই, ভুল হ'য়ে গেছে। To err is human (ভুল মানুষের হয়)। ভুল হওয়ার লাইসেন্স নেওয়া ভাল না। প্রত্যেক লোকের প্রয়োজন ও সময় আলাদা, কার কখন কী লাগতে পারে, ঠিক নেই। আমি হাগতে বসেছি, তখন তুমি হয়তো খাবারের প্লেট এনে ধরলে। সেটা ভাল হ'ল না। আমি হাগতে ব'সে হয়তো খেলাম, তা' কি ভাল?

চুনীদা কিছু বলার উদ্যোগ করছিলেন। বাধা দিয়ে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—কৈফিয়ত চাই না। কে কী করল তা' দিয়ে দরকার নেই। কাজ চাই তোমার কাছে। আজ প্রভাতের এইসব কথা হয়তো কেউ শুনল। তারপর পঁচিশ জায়গায় ঘুরে ঘুরে আরো পঁচিশ রকম সংগ্রহ করল। ক'রে ক'রে বাস্তব যা' তা'কে অবাস্তব ক'রে তুলল। তোমাদের সম্বন্ধে যা' নয় তেমন একটা ধারণা নিজের মনে গড়ে তুলল। তা'তে loser (ক্ষতিগ্রস্ত) হলে তুমি। আর একটা কথা। নিজেকে যত ক্ষমা না কর ততই ভাল। নিজের ত্রুটিকে ক্ষমা করলে dullness (ভোঁতা বোধ) এসে যায়। তখন ভালমন্দ, ঠিক-বেঠিক সম্বন্ধে বোধও মানুষ হারিয়ে ফেলে। তার সাথে এসে পড়ে go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি), যা' চরিত্রকে কুরে-কুরে খেতে থাকে। তখন আর right time observe (ঠিক সময়টি রক্ষা) করা যায় না। কোন কাজের দায়িত্ব এলে মনে হয়, থাক্ এখন না ক'রে পরে করব নে। হয়তো পরে আর তা' করা হয়েই উঠল না।

চুনীদা—সবটা পারা খুব মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুশকিল তো আছেই। একি একেবারে জল-দেওয়া ভাত লেবু দিয়ে খাওয়া? আবার, এইসব লোকের মধ্যে হয়তো চোর, জুয়াচোর, ধাপ্পাবাজ আছে। তাদের উপরেও তুমি interested (অন্তরাসী) হবে। কেউ যাতে অন্যায় না করে তা' দেখবে। আর, সেটাই তোমার আত্মপ্রসাদ।

অজিতদা—কোন ঋত্বিক যদি একটাকা ঋত্বিকী করে, সে কি ঋত্বিকী-আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কি লেখা আছে?

অজিতদা—আপনার কথার মধ্যে তো নেই। অবশ্য, আমার একটা যজমান তিনটাকা ঋত্বিকী করুক, সেটা আমার interest (স্বার্থ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার interest (স্বার্থ) যেই ক'লে, সেটা হ'ল half-way (অর্দ্ধপথের) কাজ। তাতে তোমার interest (স্বার্থের ব্যাপারটা) তুমি হয়তো পেতে থাকবে। সাথে সাথে তার ability (সামর্থ্য) যদি বাড়াবার চেষ্টা না কর তাহ'লে তোমার ঐ interest (স্বার্থ) বজায় থাকবে না। আর, আমার এই ঋত্বিকী করানোর বুদ্ধি হ'ল এ্যালাউন্সটা তুলে দেবার জন্য। এ্যালাউন্স থাকলে মানুষ ধাপ্পাবাজী করে, কতরকম করে। তার valour (পরাক্রম) থাকে না। উর্জ্জী পরাক্রম নিয়ে আর সে উঠতেই পারে না।

রাত এগারোটা বাজে। কাছে লোকজন বিশেষ নেই। পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য) ও মিঃ স্পেন্সার আছেন। মায়েরা অনেক এসে বসেছেন। পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে কথা উঠল।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, আমি কোন একসময় কর্ত্তামার সাথে একটা নদীতে নৌকায় ক'রে ঘুরতাম। সেই নদীতে অনেক কাছিম ছিল, অনেক মাছও ছিল। আর একটা জায়গার কথা মনে পড়ে, পাহাড়িয়া অঞ্চল, সেখানে অনেক টগরগাছ ছিল। অনেক বাঁশগাছ ছিল। সেগুলি এদেশের বাঁশের মত না। সেখানে আমি ছিলাম, আমার wife-ও (স্ত্রীও) ছিল। ঐ জায়গায় একটা পাথর আছে। তার ওপর যেয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে পায়ের দাগও হ'য়ে গেছে। অনেক গাছ ছিল। বহু লতা গাছগুলির উপর দিয়ে জড়াজড়ি ক'রে থাকত। কাছে একটা ঝরণা ছিল, সেখানে বাঘ-টাঘও থাকত।

বর্ণনাগুলি শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে, শ্রীশ্রীঠাকুর চোখে-দেখা ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন। পুলকিত বিস্ময়ে সবাই তাঁর শ্রীমুখে তাকিয়ে প্রাণ ভরে পান করছেন এই দিব্য কথামৃত।

আরো একটা জায়গার কথা মনে হয়, নাম তার মণিপুর। সেখানে একখানা কাঠের ঘর। দূরে ইটের রাস্তা। রাস্তার ইট উঠে উঠে গেছে। রাস্তাটা একটা বাজারের দিকে গেছে। ঐ কাঠের ঘরটায় আমার বৌ থাকে। মনে হয়, এখনও গেলে বৌ-এর সঙ্গে দেখা হবে। আরো কোন্ একটা দেশে গিছিলাম, সেখানে ওড়না-পরা, গাউন-পরা লোক থাকত। লোকদের নানারঙের পোষাক। সেখানে দোকান-টোকান আছে। আর, কিরকম একটা mosque-এর (মসজিদের) মত আছে। কাছে ফলের দোকান আছে। আর দরজি আছে, যারে কয় খলিফা। আমি তার সাথে কথাও কই।

পণ্ডিতদা—এগুলি কি প্রত্যক্ষের মত মনে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরো একটা কথা মনে হয়। একটা পাহাড় ছিল। তার নীচে পাথর ছিল, জল ছিল। তোর কথায় আবার সেই সব জায়গার কথা মনে হ'চ্ছে।

পণ্ডিতদা—ঐসব কথা মনে হ'লে কি আপনার খারাপ লাগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খারাপ লাগে না, আপসোস হয়।

পণ্ডিতদা—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐসব জায়গার কথা মনে হয়, অথচ এখন আর যেতে পারি না। ভাবি, fiction (কল্পনা) না কি! হয়তো ওসব জায়গায় যাই-ই নি কোনদিন।

পণ্ডিতদা—ঘটনাগুলি কি আপনার কাছে স্পষ্ট নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(জোরের সাথে) বিশেষ স্পষ্ট হ'য়ে আছে। যদি একটু help (সাহায্য) পাই তাহলে তাড়াতাড়ি জেগে ওঠে।

পণ্ডিতদা—সাধারণভাবে কিন্তু যা' আমাদের চোখে দেখা নেই তার কল্পনা করতেও কষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি এখানে ব'সেও ওরকম অনেক দেখেছি। একবার চোখ মুছেই দেখি, একটা লোক আমার দিকে তাকায়ে আছে। স্পষ্টই দেখি।

রাত অনেক হওয়ায় সবাই এখন উঠলেন।

১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৭, রবিবার (ইং ১।৫।১৯৬০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দালানের হলঘরে আছেন। 'হরিনন্দনদা (প্রসাদ) একটি দাদাকে সাথে নিয়ে এসে প্রণাম করলেন। বললেন—ওঁরা সাথে আলাপ-আলোচনা হ'ল। আমাদের লোকসেবার রকম শুনে ওঁর খুব ভাল লেগেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, প্রতিটি মানুষের হওয়া উচিত source of pious progress (ধর্ম্মানুগ উন্নতির উৎস)। এখন আমরা যেন চাকরি না থাকলে helpless (অসহায়) হয়ে পড়ি। কিরকম slave mentality (দাসসুলভ মনোভাব)! Male (পুরুষ)-গুলি ঐরকম হয়ে উঠেছে। আবার, female (স্ত্রীলোক)-গুলিকেও ঘর থেকে টেনে বের করছে। এর ফল কী হচ্ছে? তুমি যদি চাকরি কর, invariably (নিশ্চিতভাবে) দেখবে, ঐদিকে একটু পোষণ পেলে পরে তোমার ছাওয়ালেরও চাকরি করার বুদ্ধি এসে যাবে। আবার, ছাওয়ালের যেই ঐ বুদ্ধি আসল, তোমার নাতিরও ঐ বুদ্ধি আসবে। কেমন একটা slavish nourishment (দাসভাবের পরিপোষণ) চলতেই থাকে। আমার এসব ভাল লাগে না। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, যেখানেই আমরা চাকরির খোরাক পাই সেখানেই আত্মসমর্পণ করি। আবার দেখ, আজকাল divorce accepted (বিবাহ-বিচ্ছেদ পরিগৃহীত) হয়েছে। এর ফলে, যেসব মেয়ে স্বামীর সাথে tussle (বিবাদ) ক'রে ক'রে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'ত, হয়তো ভাল হয়ে উঠত একদিন, তারা আর তা' হবে না। স্বামীর সাথে না বনলেই আলাদা

হয়ে যাবে। আবার, অনেক মেয়ে তাদের home and hearth (ঘরবাড়ি) ছেড়ে গেছে। চাকরির প্রভাবে এখন হোটেলই তাদের home and hearth (ঘরবাড়ি)। আগে existential proficiency-র tricks (সত্তানুগ দক্ষ চলনের কৌশলগুলি) যারা জানত, সেই jewel (রত্ন) মানুষগুলি থাকত গবর্নমেন্টে। আর, এখন আমরা সেই সব কথা জানি যাতে তোমার সাথে ওর difference (বিভেদ) হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর economy শব্দের অর্থ জানতে চাইলেন। আমি বললাম—Economy-র root-meaning (ধাতুগত অর্থ) হ'ল house, household affairs (গৃহ, গৃহস্থালীর ব্যাপার)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, বর্ত্তমানকার ব্যবস্থা সেই household affairs (গৃহস্থালী-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি)-এর ভিত নড়িয়ে দিয়েছে। আমার household affairs (গৃহস্থালী ব্যাপারগুলি) যদি adjusted (সুনিয়ন্ত্রিত) হয়, তখন economy-ও (অর্থনীতিও) আপনা থেকেই ঠিক হয়ে আসে। Home, hearth and farm (ঘর, গৃহস্থালী ও জমিজমা) এগুলি যদি compact (দৃঢ়সংবদ্ধ) থাকে তাহলে আর ভাবনা কী! তখন আমার এই সবগুলি দিয়ে people-কে (মানুষকে) serve (সেবা) করতে পারি। যাই হোক, কখনও ঘাবড়ানো ভাল না। কেন ঘাবড়াবে? 'আমি কি ডরাই সখি, লম্পট রাবণে?'

হরিনন্দনদা—ইনি কুলীন ব্রাহ্মণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উল্লসিত হয়ে)—তবে দেখ তো দেখি কুলীন বামুন! খবরদার ঘাবড়ায়ো না। শক্ত হয়ে দাঁড়াও। People-কে (মানুষকে) সেবা কর। দেখবে — 'কুটিরদ্বারে লাখ লাখ সাজায়ে রেখেছে অর্ঘ্য।' আমাদের first and foremost (প্রথম এবং প্রধান) লক্ষ্যই হবে মানুষ। আগে বলত, ব্রাহ্মণের আছে বাগ্‌ব্রহ্ম। কারণ, ব্রাহ্মণ ভিক্ষা ক'রে বেড়ায় না, চাকরিও করে না, কিন্তু কথাই এমন ক'রে কয় যে তার অভাবও কিছু হয় না। মানুষের শ্রদ্ধার অবদানই ছিল তার সম্বল।

হরিনন্দনদা—উনি আজ দুপুরে যেতে চাইছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা, কিন্তু ঘাবড়ায়ো-টাবড়ায়ো না। বামুনের ছেলে বামুনই হও। আর, বামুন সব সময়েই servant of the people (মানুষের সেবক)।

এর পরে ওঁরা প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন।

রাতে দেওঘর শহরের বিশিষ্ট উকিল তারুবাবু (তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়) শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে এসেছেন। ওঁর বয়স প্রায় ৭৫ বছর। প্রণাম ক'রে বসার পরে কুশল বিনিময়াদি হল।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আচ্ছা, আমি যদি রাস্তার দুধারে চেরীগাছ লাগাই, একটা চেরী-ফরেস্ট করতে চাই, তাহলে আপনারা অনুমতি দেবেন না?

তারুবাবু—মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে একটু জিজ্ঞাসা করতে হবে। আর একটা কথা, তটিনী কুটিরে যেখানে আমাদের স্কুল হয় (সৎসঙ্গ তপোবন বিদ্যালয়), সেখানে দুটি বাড়ি বিক্রি হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ভাল। কিন্তু আমি বুড়ো হয়ে গেছি। যদি কাছাকাছি এই হোসেনী লজে এনে দিতে পারেন স্কুলটা, তাহলে নজর রাখার সুবিধা হয়। আর, এসব ব্যাপার ঐ জ্ঞানের (গোস্বামী) সঙ্গে কথা কইলে হয়।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর পার্শ্ববর্তী ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন—চেরীগাছে ফুল আছে না?

ধীরেনদা (ভুক্ত)—আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন যদি আনতিস্, ওঁকে দেখাতাম।

ধীরেনদা তাড়াতাড়ি যেয়ে নিয়ে এলেন এক থোকা চেরী ফুল। তারুবাবু হাত বাড়িয়ে নিলেন, বললেন—এটা আমি রাখি। চেয়ারম্যানকে দেখাব।

এর পর তারুবাবু বিদায় গ্রহণ ক'রে উঠলেন। সুশীলদা (বসু) তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে বাইরে গেলেন।

ইদানীং শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ছড়া দিয়েছেন, যার বিষয় হ'ল—কারো শরীরের কোথাও কোন জন্মগত বিকৃতি থাকলে, ধরে নিতে হবে, তার মনের মধ্যেও ঐ বিকৃত রকম আছে।

প্রশ্ন করা হ'ল, এটা কিভাবে হয়।

উত্তরে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, কারো আঙ্গুলটা একটা চাপা। তার মনের মধ্যেও একরকম চাপা ভাব থাকে। কারো আঙ্গুলটা হয়তো কাটা, তার মনের মধ্যেও থাকে এক জাতীয় unbalanced (সমতাহারা) রকম। লক্ষ্য ক'রে দেখো—ঠিক লেগে যাবে। সেইজন্যে আগেকার দিনে মেয়ে দেখতে গেলে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত দেখত। চুল কতখানি লম্বা, নাকটা কেমন, মুখটা কেমন, আঙ্গুলগুলি কেমন, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত। সবটার সঙ্গে সবটা consistent (সমসঙ্গত) কিনা!

২০শে বৈশাখ, ১৩৬৭, মঙ্গলবার (ইং ৩।৫।১৯৬০)

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর নবনির্ম্মিত এলুমিনিয়মের ঘরে থাকছেন। কিন্তু দুপুরে ঘরটির মধ্যে তাপ বেশি হওয়ায় দুপুরে থাকতে পারছেন না। তাই, গতকাল অজয়দাকে (গাঙ্গুলী) বলছিলেন—দুপুরে এই ঘরটা যদি ঠাণ্ডা ক'রে দিতে পারিস্ তাহলে দুপুরে থাকা যায়।

অজয়দা—নীচের ফাঁকগুলি বন্ধ হলে আমি চেষ্টা ক'রে দেখব।

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেকক্ষণ ধরে খুব কাশি হল। তারপর শান্ত হয়ে বসেছেন। জলপাইগুড়ির রাইমোহনদা (সাহা) কিছুকাল যাবৎ এখানে আছেন। এখন সামনে এসে বসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁকে একখানা লাঠি দিয়েছেন। এখন রাইমোহনদার হাতে লাঠি না দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—লাঠি কোথায়?

রাইমোহনদা—আছে—বাড়িতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর্। ও সব সময় পৈতার মত সঙ্গে রাখতে হয়।

অজয় গাঙ্গুলীদা—(রাইমোহনদার মেয়েকে) এই, তোর বাবার লাঠিখানা নিয়ে আয় তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাক্ থাক্। ও যখন যাবে নে, তখন আনবে নে।

এরপরে দয়াল ঠাকুর হলঘরে এসে বসলেন। অজিতদা নেতি-নেতি করে ব্রহ্ম-অনুসন্ধানের কথা তুললেন। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নেতিবাদ আছে। নেতি মানে ন ইতি, ইহা নয়। কিন্তু তাতে ভুল হয়ে যায়। একটা জিনিস ধরলাম, বললাম—ইহা ব্রহ্ম নয়। তার মানে ব্রহ্মকে ওর থেকে বাদ দিলাম। আর একটা ধরলাম; তারপর আবার তার থেকে বাদ দিলাম। এইভাবে বাদ দিতে দিতে এগোলাম। তাতে আস্তে আস্তে অনেক কিছুই বাদ পড়ে যায়।

এই বলে ছড়া দিলেন—

বেড়ে বেড়ে বাড়ার চলায়
ইতির খতম যেইখানে,
ব্রহ্ম-সত্তা সংবর্ধনী
ধৃতিমগ্ন সেইখানে।

এইসময় প্রফুল্লদা (দাস) এলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে ছড়াটি দেখতে বললেন। দেখে প্রফুল্লদা বললেন—পরিষ্কারই আছে।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর অস্তিত্ববাদ নিয়ে আরো কয়েকটি ছড়া দিলেন। শেষের দুটি হল—

শেষ হওয়াটাই নিশ্চিত ধ'রে
জীবন ক'রে আয়বাদ,
বিশেষ থাকায় সাধ্‌বি না তুই
মৃত্যু ক'রে বরবাদ?
থাকার ভিত্তি আছেই যে রে
শিষ্ট-পুষ্ট তাকেই কর্,
অমর চলায় জীবনটাকে
পরিচর্য্যায় আগলে ধর্।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথাপ্রসঙ্গে প্রফুল্লদা বললেন—থাকার ভিত্তি যেমন আছে, তেমনি আমি যাতে না থাকি তারও তো অস্তিত্ব আছে প্রচুর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আছে। কিন্তু সেগুলিকে combat (প্রতিরোধ) করা লাগবে।

প্রফুল্লদা—ওগুলো এত strong (শক্তিশালী) যে ওদের সাথে পারা কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক, খ, কঠিন বলে শিখবে না তা' তো হয় না। অস্তিত্বের সম্পদ যা' তাই নিয়ে অস্তিত্ব-বিরোধী যা' সেগুলোকে ভেঙ্গে দেওয়াই আমার তপস্যা। অনেকদিন থেকেই আমরা মরে যাওয়া, ধ্ব'সে যাওয়ার চিন্তা করেছি। ট্র্যাজেডি উপভোগ করার যে tendency (ঝোঁক) মানুষের মধ্যে থাকে, তার থেকেই ঐরকম চিন্তা আসে। থাকা-বাড়ার চিন্তা তো করি নি। তাই, ওগুলিকে কঠিন মনে হয়।

প্রফুল্লদা—থেকে আমার লাভ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেয়ে আমার লাভ কী সেটা বুঝায়ে দাও। মানুষের বহুদিন বেঁচে থাকার ঘটনা আছে। তার থেকে অনুমান করা যায়, আমরাও থাকতে পারি অমনতর। থাকার ইতিবৃত্ত আমাদের কম নেই। কিন্তু এখন বুদ্ধি এমনই হয়েছে যে মরার চিন্তা করতে করতে থাকার ইতিবৃত্ত আমাদের ভেবে দেখার অবকাশ নেই। ঔপাদানিক সঙ্গতির সচল সন্দীপনা যেটা সেটাই প্রাণ। এই প্রাণ নিয়ে থাকাটা যদি অসম্ভব না হয় তাহলে অমরত্ব লাভ করাও অসম্ভব নয়।

প্রফুল্লদা—মানুষ খুব বাঁচলে হয়তো ২০০/২৫০ বছর বাঁচে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ৫০০ বছরও শুনেছি। এই যে গাছ-পাথর, এরা অল্পায়ু হলেও এখনও এদের মানুষের চেয়ে বেশি আয়ু আছে।

কিছুদিন আগে যুগান্তর পত্রিকায় (১৩ই মার্চ) একটা খবর বেরিয়েছিল যে ৫০,০০০ বছরের পুরানো পদ্মবীজকে অঙ্কুরিত করানো সম্ভব হয়েছে। খবরটি শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর তখনই খাতায় লিখে রাখতে বলেন। খবরটি এই :

"সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক মহলে পদ্মবীজের আয়ুষ্কাল নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। প্রায় ২৫ বৎসর আগে কয়েকজন জাপানী বৈজ্ঞানিক বলেন যে, ১০/২০ হাজার বৎসরের পদ্মবীজ অঙ্কুরিত হয়। সেদিন কেহ সে বিষয়ে কর্ণপাত করে নাই। সম্প্রতি মাঞ্চুরিয়া হ্রদের তলা থেকে ৪০/৫০ হাজার বছরের পুরানো কয়েকটি পদ্ম-বীজ পাওয়া গেছে। বীজের কোষগুলি একেবারে ফসিলে পরিণত হয়েছিল। এই ফসিলের বৈশিষ্ট্য ও মাটির তলায় অবস্থানের খুঁটিনাটি পরীক্ষা ক'রে বিশেষজ্ঞরা এদের প্রাক্-ঐতিহাসিক বয়স সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। তারপর কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের তত্ত্বাবধানে ঐ বীজগুলি ওয়াশিংটন ন্যাশনাল পার্কে ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেনে অঙ্কুরিত করা হয়। ৪০/৫০ হাজার বৎসরের দীর্ঘ নিদ্রাভঙ্গের পর অবশেষে পদ্মের ভ্রূণ আবার বীজ থেকে বেরিয়ে বিকশিত কিশলয়ে সূর্য্যের আলো পান করেছে।"

এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐ যে ৫০০০০ বছরের পদ্ম-বীজ, ভেতরে ঠিকই ছিল। উপরের coating-টা (আবরণটা) যেই সরে গেল, অমনি তা' fertilised (উর্ব্বরতা-প্রাপ্ত) হয়ে গাছ হ'ল।

প্রফুল্লদা—ঐ উদাহরণ মানুষের বেলায় কিভাবে প্রযোজ্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পদ্মবীজ যদি এমনটা পারে, তাহলে মানুষও পারে।

প্রফুল্লদা—৫০০০০ বছর যদি একটা মানুষ বেঁচে থাকে তাতে লাভ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না-ই যদি থাকে তো আমি থাকার চেষ্টা ক'রে দেখি না কেন! ওটাও যদি পাগলামি হয়, এ পাগলামিও ক'রে দেখি না কেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়প্রত্যয়ী ব্যঞ্জনা। মহাপ্রেরণার সঞ্চারক আয়ত লোচনদ্বয় দিব্যদ্যুতিতে উদ্ভাসিত।

কিছুক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হয়। তারপর প্রফুল্লদা আবার বললেন—জীবনে দেখা যায়, আনন্দের থেকে নিরানন্দই বেশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিরানন্দের উপাসনা করি কেন? করি, তাই তা' পাই।

প্রফুল্লদা—মানুষ যদি আনন্দ পায় তো নিরানন্দের দিকে যেতে চাইবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে সেই আনন্দেরই উপাসনা কর না কেন! কতরকম তো কও, এটা কও, ওটা কও, একথা কও না কেন যে, আনন্দই ব্রহ্ম।

বেলা প্রায় ১১টা বাজে। আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে (নন্দী) দু'খানা মোহর জোগাড় করে আনতে বলেছিলেন। মোহর দুখানা নিয়ে প্যারীদা এখন এলেন। দয়াল ঠাকুর সস্নেহ নয়নে দেখলেন। তারপর তা' শ্রীশ্রীবড়মার কাছে দিয়ে আসতে বললেন। প্যারীদা মোহর দিতে গেলেন, এই সময় বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) এসে জানালেন—এই ঘরের তাপ সাড়ে ৯৪ ডিগ্রী, আর এলুমিনিয়মের ঘরের তাপ ৯৯ ডিগ্রী। দিনের বিভিন্ন সময়ে এই ঘর দু'খানির তাপমাত্রা শ্রীশ্রীঠাকুরই জেনে রাখতে বলেছিলেন।

ইতিমধ্যে অনেকে এসে বসেছেন। শ্রীশদা (রায়চৌধুরী) তাঁর ছেলে মন্টুনকে সাথে নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মন্টুনকে বললেন—তোর বাবা যাওয়ার সময় সাথে যাস্। আর, ছাতি-লাঠি নিয়ে বেরোনো ভাল। রাতে বেরোবার সময় আলো আর লাঠি কাছে রাখতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয়, ওগুলি যেন হারায় না। তা' করতে গেলে তোমার attention (মনোযোগ)-ও ঠিক রাখতে হবে। আমার একথা শুনে হয়তো ভাবতে পার—ওরা old fool (নির্ব্বোধ বৃদ্ধ), ঘরের মধ্যে থাকা অভ্যাস, তাই ওরকম কথা কয়। আমরা ওসব পারি নে। কিন্তু ঐ-সব কাছে থাকলে নিজেও অনেক আপদ থেকে বেঁচে যায়, অপরকেও বাঁচানো যায়। তোর ছাতি আছে তো?

মন্টুন—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলো নেই?

মন্টুন—হ্যাঁ, আছে।

মন্টুনরা আসার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—শ্রীশদার ছাওয়াল মণ্টুনকে কইছি—দেবী আছে, রেবতী আছে। ওদের সাথে সাথে থাকবি, assist (কাজে সহায়তা) করবি। এই করতে করতে ও শিখেও ফেলবে নে অনেক।

বেলা অনেক হওয়ায় সবাই প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও স্নানে উঠবেন। সকালে দেওয়া ছড়াগুলির উল্লেখ ক'রে বললেন—ওগুলি ঠিক হবে নে তো?

'হ্যাঁ' বলার পর আবার বলছেন মধুর হেসে—প্রফুল্লর সাথে ইয়ার্কি দিতে দিতেই এতগুলি হয়ে গেল। ৫/৭টা হয় নি?

বললাম—১২টা। শুনে দয়াল ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—দ্যাখ্, ১২টা হয়ে গেল।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। শান্ত পরিবেশ। নানারকম কথাবার্ত্তা চলছে। এই সময় কাহারপাড়ার ভোলাদা (রমানী) এসে জানান যে তার ৬০০ টাকার দরকার।

উপস্থিত অনেকের কাছেই একটা ভাবাবস্থার সূত্র যেন কেটে গেল। সময়-সুবিধা বিচার না ক'রে এইভাবে এসে টাকা চাওয়ার জন্য সবাই ভোলাদাকে বকাবকি করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অমূল্যদা (ঘোষ), রাজেনদা (মজুমদার), প্রমুখ কয়েকজনকে ১২৫ টাকা ক'রে ভিক্ষা ক'রে আনতে বললেন। ওঁরা অর্থসংগ্রহে বেরিয়ে পড়লে শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিলেন—

ভজন তোমার নাইকো, শুধু
অলস গবেষণা,
একেও কি রে বলতে চাস্ তুই
বিভূর আরাধনা?
আরাধনা যেমনতর
পাচ্ছ তেমন ফল,
ধাপ্পাবাজী পদে পদে
পায় যেমন কুফল।

ঐ দাদারা টাকা সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলে শ্রীশ্রীঠাকুর খাতায় লিখিয়ে ভোলাদাকে ৬০০ টাকা দিয়ে দিতে বললেন। তারপর আবার যথারীতি আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল।

ঠাকুরভোগের সময় হওয়াতে সবাই উঠে পড়লেন। যথোপযুক্ত ব্যবস্থায় রাতের ঠাকুরভোগ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রভু শয়ন করবেন। এখন তামাকু সেবন করছেন। ঘরের বড় আলোগুলি একে একে নিভিয়ে দেওয়া হল। সেবকগণও আহারাদি সমাপন ক'রে স্ব স্ব গৃহে যেয়ে সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত শরীরগুলি বিছানায় এলিয়ে দিলেন। সমগ্র আশ্রমই এখন সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিশ্রামরত।

এই দীন সংকলক অশ্বত্থতলায় তার জন্য নির্দিষ্ট ছোট কুটীরটিতে নিদ্রামগ্ন। হঠাৎ জনৈক আশ্রমকর্ম্মীর ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কী ব্যাপার! কর্ম্মীটি বলল—আসুন, আপনাকে ঠাকুর ডাকছেন।

তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে ঘড়ি দেখলাম, প্রায় একটা বাজে। ত্রস্তব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলাম ঠাকুরঘরে। প্রভু শয্যার উপরে উপবিষ্ট। তাঁকে দেখে মনে হল, এখনও শয়ন করেন নি। কাছে সেবকদের দু'তিনজন আছেন।

কী এক গভীর চিন্তার মাঝে যেন মগ্ন হয়ে আছেন বিশ্বেশ্বর। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন—একটা কথা ভাবছিলাম। অন্যান্য শাস্ত্রে কোথায় কোথায় আছে তিনি অজ্ঞ, তিনি বিজ্ঞ, এই ধাঁচের কথা, আমাকে দেখাস্ তো! কালই দেখাস্।

তারপর আমার মুখের দিকে লক্ষ্য ক'রে বলছেন—তুই কি ঘুমের থেকে উঠে আসলি?

আমি—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(স্নেহক্ষরা স্বরে) দ্যাখ্ তো দেখি। তো যা, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড় গে ঘুমের ঝুল থাকতে থাকতে।

এই বলে শ্রীশ্রীঠাকুর শয়ন করতে উদ্যোগী হলেন। আমিও প্রণাম ক'রে চলে এলাম।

২১শে বৈশাখ, ১৩৬৭, বুধবার (ইং ৪।৫।১৯৬০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের হলঘরে সমাসীন। আসামের রবীনদা (রায়) বলছেন—বৈদ্য এবং কায়স্থ, এদের মধ্যে বিয়ে কি চলতে পারে? সিলেটে এরকম বিয়ে অনেক হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও করা ভাল না। ওতে বিশেষ বিশেষ ধারার বৈশিষ্ট্যগুলি নষ্ট হয়ে যায়। ঐ যে খবর বেরিয়েছে। চীনে একটা পদ্মবীজ পাওয়া গেছে। তা' নাকি ৫০০০০ বছরের পুরানো। ক্যালিফোর্নিয়াতে সেটাকে research (গবেষণা) ক'রে sprout (উদ্‌গত) করিয়েছে। বীজ নষ্ট তো হয়ই নি, বরং ঐ গাছে ফুলও ফুটেছে। তোমাদেরও—মনে হয়—বীজবৈশিষ্ট্য যদি ঠিক রেখে চলতে পার তাহলে কী যে

হতে পারে তা' কওয়া যায় না। কিন্তু cross (বিপরীত সংমিশ্রণ) হলে আর সে কাম হবি নানে।

তারপর ভিন্নপ্রসঙ্গে বলছেন—আগে এরকম সব কথা ছিল যে অমূক পাপ করলে এত লক্ষ বছর নরকভোগ, না কি! তার মানে হল, বিধিমাফিক না চলার জন্য যে ফলভোগ করতে হয় তাই আর কি!

বেলা ১০টা। অনেকদিন অসুখে ভোগার পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আজ প্রথম এলেন ঠাকুরবাড়ীতে। প্রণাম ক'রে বসলেন। ধীরে ধীরে জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে আলোচনা উঠল।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Knowledge (জ্ঞান) হল, to act, to see, to discern and to realise (কাজ করা, দেখা, বিবেচনা করা এবং উপলব্ধি করা)। এইভাবে এগিয়ে যাওয়া লাগে অনন্তের দিকে। সেইজন্য, আমাদের পূর্ব্বপুরুষের উপরে নিষ্ঠা থাকা চাই। আর, যার কাছ থেকে শিখব তার উপরে আনুগত্য থাকা চাই। তিনি যেমন চান তেমনতর চলা ও করা চাই। নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ, এই তিনটি জিনিস থাকলেই হয়। আলাই-বালাই কথার দরকার নেই। কী শিখবে, কী করতে চাও, সেই উদ্দেশ্যটা ঠিক ক'রে নিতে হয়। ক'রে সেইভাবে চল। উদ্দেশ্য থেকে যেন deviate করতে (বিচ্যুত হতে) না হয়। তা' করলেই কিন্তু তুমি মারা পড়বে।

কেষ্টদা—মহাভারতে পড়ছিলাম, ব্রহ্মচর্য্যের ৪টি পাদ—(১) গুরুর প্রতি নিষ্ঠা, গুরুপত্নী-গুরুপুত্রাদির পর নিষ্ঠা; (২) গুরুর নির্দ্দেশ-গ্রহণ; (৩) গুরুদক্ষিণা দেওয়া এবং (৪) গুরুর ঋণ শোধ হ'ল একথা কখনও না বলা।

শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিত হয়ে বললেন—একথা আছে নাকি শাস্ত্রে? তাহলে দেখেন, বাঘ বলে ডাকে না? বুঝে-বুঝে সব করতে হয়। আমার desire (চাহিদা) যা'-কিছু আছে, সবই ইষ্টসেবায় লাগা চাই। এটাই অব্যভিচারী নিষ্ঠা। তোমার ছাওয়াল, বৌ, মা, বাবা, সবই হয়তো আছে। সবাইকেই দেখতে হবে। কিন্তু তা' হওয়া চাই ইষ্টানুগ। এ না হলে ধর্ম্ম হয় না।

কেষ্টদা এই সময় ধর্ম্মব্যাধের গল্পটা বললেন। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধর্ম্ম কিন্তু ঐ ধৃতিপূজা অর্থাৎ ধারণ-পোষণ-রক্ষণের সক্রিয় আবেগের মধ্যেই নিহিত। ধর, বাপ-মা যদি বেঁচে থাকেন তাহলে তাঁরা যাতে সুস্থ থাকেন, শান্তিতে থাকেন, তা' করতে হলে কতখানি ভেবে তাঁদের সেবাযত্ন করতে হয় ও সেইভাবে চলতে হয়। ঐ হল ধর্ম্ম।

কেষ্টদা—আজকাল গুরুপুত্র ও গুরুপরিবারের প্রতি মানুষের একটা সহজ শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি—

বাধা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমিও দেখেছি, ৮ বছরের গুরুপুত্রকে ৬৫ বছরের বুড়ো প্রণাম করছে। ও-ও বামুন, এও বামুন।

এরপর সেবা নিয়ে কথা উঠল। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার কাছে ভজন কথাটা খুব apt (উপযুক্ত) মনে হয়। ভজনের মধ্যে সেবা, অনুরাগ, অনুশীলন, সব attribute (গুণলক্ষণ)-গুলিই আছে।

কেষ্টদা—আপনি বলেন, ভগবান মানে ভজমান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবত্তার দিকে যে যত এগোয়, সে তত মূর্খের মত হয়। তার অজ্ঞতা, বিজ্ঞতা, কিছুই থাকে না। সে যেন সব কিছুর পার।

গত রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে ডেকে এই আইডিয়াটা শাস্ত্রের কোথায় আছে বের করতে বেলছিলেন। বের ক'রে রেখেছি। এখন প্রসঙ্গ আসতে বললাম—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আপনার এই কথার সমর্থন আছে। সেখানে আছে 'জ্ঞাজ্ঞৌ' (১/৯) শব্দটি, অর্থাৎ তিনি একাধারে বিজ্ঞ এবং অজ্ঞ।

উৎফুল্লচিত্তে দয়াল বলে উঠলেন—তাই নাকি? পাওয়া গেছে? ঠিক রাখিস্।

কেষ্টদা—আপনি বলেন, 'আমার জানার কোন value (মূল্য) আছে বলে আমার মনে হয় না'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাজীকরের মত বললে তো চলবে না। আবার, এর মধ্যে thought-reading-এর (চিন্তাপঠনের) মত কোন ব্যাপারও নেই। কার্য্যকারণ-জ্ঞানটা সবসময়েই থাকে।

কেষ্টদা—কার্য্যকারণটা ঠিক থাকার জন্যই আপনার কাছে আসল জিনিসগুলি ধরা পড়ে। যেমন সেই মুসলমানটির হাতে বোয়াল মাছ দেখেই আপনার ওষুধের নামটা মনে এলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সমর্থন করে বললেন—হ্যাঁ। ঐরকম। পরে বিশুদাকে (মুখোপাধ্যায়) দেখিয়ে বললেন—ওর মধ্যে কিন্তু ঐগুলি অনেক আছে। ঠিক বুঝে ক'রে ফেলতে পারে। আমার হয়তো জলপিপাসা লেগেছে, ঠিক সময়মত জল এনে হাজির করে।

২২শে বৈশাখ, ১৩৬৭, বৃহস্পতিবার (ইং ৫।৫।১৯৬০)

প্রাতে—এলুমিনিয়ামের ঘরে। আজ সকাল থেকেই বেশ গরম লাগছে। ৬টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে এসে বসেছেন। বসেই সামনে যজ্ঞেশ্বরদাকে (সামন্ত) দেখে ডাক দিলেন—এই যজ্ঞেশ্বর।

যজ্ঞেশ্বরদা সামনে এগিয়ে এলে দয়াল ঠাকুর বললেন—তিত্তিরিকে পরীর ডানার মত দু'খানা কাপড় এনে দিবি? (দুই হাত দু-দিকে ছড়িয়ে ওড়ার ভঙ্গি ক'রে বলছেন) একেবারে উড়ে যাবে। সে কাপড় প'রে রাঁধতেও পারবে, নাচতেও পারবে।

যজ্ঞেশ্বরদা—এখানকার বাজার থেকে আনব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে আর তোমাকে কচ্ছি কেন?

যজ্ঞেশ্বরদা—তাহলে কলকাতা থেকে—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

তারপর খগেনদাকে (তপাদার) ডেকে বললেন—অনিল (গাঙ্গুলী) যেন দুপুরে এখানে থাকতে পারে, এরকম একটা থাকার জায়গা ঠিক ক'রে দিস্।

সুধীরদাকে (দাস) শ্রীশ্রীঠাকুর একটা পাখীর খাঁচা তৈরি করতে বলেছিলেন। সুধীরদা এখন তৈরী ক'রে দেখাতে নিয়ে এসেছেন। দেখেই দয়াল বলে উঠলেন—বাঃ, খুব সুন্দর হয়েছে। এদিকে আন্। এদিকে আন্ তো দেখি।

মণিদা (চট্টোপাধ্যায়) খাঁচাটা ভেতরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিয়ে এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, এ খুব ভাল হয়েছে। কিন্তু ও সুধীর! এই যে একদিকে শলা বেরোয়ে আছে।

সুধীরদা খাঁচাটা নিয়ে গেলেন ঐটুকু ঠিক ক'রে দেবার জন্য। একটু বেলা হতে শ্রীশ্রীঠাকুর হলঘরে এসে বসলেন। সকাল ৮-৪৫ মিঃ। একটু আগে তাঁর হাতে-পায়ে সেঁক ও মালিশ করা হয়েছে। আমি কাছে আসতেই মন্টুনকে (আতপেন্দ্র রায়চৌধুরী) দেখিয়ে আমাকে বললেন পরম দয়াল—ঐ নাও। এখন থেকে ও তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকল। ভাল ক'রে train (শিক্ষিত) ক'রে নেবা। এম-এ যাতে পাস করতে পারে তা' করবা। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা দুইই চাই। অধ্যয়ন হ'ল আয়ত্তের পথে চলা, আর, অধ্যাপনা আয়ত্তের পথে চালানো। আজ ভাল সময়। ওকে কিছু কপি-টপি করতে দিও।

শ্রীশ্রীঠাকুর মন্টুনকে একটা খাতা ও একটা উইল্‌সন্ কলম দিয়েছেন। সেই কলম দিয়ে ঐ খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় স্বহস্তে ইংরাজীতে লিখে দিলেন—'রাধাস্বামী দয়াল কী দয়া'। তাঁর আদেশ অনুযায়ী আমি মন্টুনকে অন্য জায়গায় ডেকে নিয়ে দুটি ছড়া কপি করতে বললাম। করা হয়ে গেলে তারপর এসে বসলাম সবাই। শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—এখন থেকে ও তোমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকল।

আমি—আমরাই তো এখনও অ্যাসিস্ট্যান্ট হবার যোগ্য হয়ে উঠতে পারি নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা করবা। তোমাদের আবার ও করবে।

৯টা বেজে গেছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। তাঁকে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে অন্যদিনের থেকে ঠাণ্ডা লাগছে না? খসখস দিয়েছে বাইরে?

কেষ্টদা—হ্যাঁ, এ ঘরটা ঠাণ্ডা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে গাইছেন—

'আমি দেখি নাই কভু
শুনি নাই কভু
এমন তরণী বাওয়া।'

তারপর বলছেন—মনে পড়ে পদ্মার কথা। সেই পাল তুলে নৌকাগুলি যেত। স্রোত চলত নদী দিয়ে। মানুষের যেদিকে interest (অন্তরাস), সেকথা তার মনেই থাকে।

প্রভাতদা (দে) এসে প্রণাম করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—এই, আমাকে ৫টা ভাল কলম এনে দিবি?

প্রভাতদা—আজ্ঞে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় খোকা চ'লে গেছে?

কেষ্টদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় খোকা থাকলে বলতাম একটা বাংলা আর একটা ইংরাজী টাইপ মেশিন কিনে দেবার জন্য। এই কাজে থাকতে থাকতে ও (মন্টুন) টাইপটা শিখে নেবে। (একটু পরে আবার বলছেন) বড় খোকাকে কইতে ভুলে যাব নে। বড় খোকাকে না কইলে কিছু হয়ও না।

রেবতী (বিশ্বাস)—বড়দা এলে আপনাকে মনে করিয়ে দেব।

এরপর ছড়া সম্বন্ধে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—দেবী কয়, ছড়াগুলি আর ঠিক হবে নানে। নানা জনের নানা মত।

কেষ্টদা—নানা জনের নানা মত কেন? ঠাকুর কী বলতে চান তা' জেনে নিয়ে চলা লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও আপনি না দেখলে হবে নানে। এত কাজের মধ্যে থাকেন, তাহলেও আপনাকে ঘুরেফিরে এর মধ্যে পাওয়া লাগবে। রোজ ১ ঘণ্টা, ২ ঘণ্টা করে sitting (বৈঠক) দেওয়া লাগে। ......আমার এখানে যেসব আলোচনা হয় সেগুলির কোড ঠিক ক'রে রাখতে হয়। কোন্‌টা টক, কোন্‌টা মিষ্টি, কোন্‌টা কোথায় রাখবে, ঠিক রাখতে হয়। ঠিক রেখে বুঝে-বুঝে জায়গামত আবার সেগুলি যোগান দেওয়া লাগে।

তিত্তিরিদি এসে সামনে দাঁড়াল। তাকে দয়াল রহস্যভরে বলছেন—তুই এখন নাচতে পারস্?

তিত্তিরিদি—কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর নাচবিই বা কী! চুলই হল না।

তিত্তিরিদি—সাড়ে ৯টা বাজে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজকাল ১০টা ৮ মিনিটে স্নান করতে উঠছেন। তিত্তিরিদি সেই ইঙ্গিত করছে। কিন্তু সেদিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ না ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তা' তো দেখছি।

তারপর ইংরাজী awe কথাটির মানে দেখতে বললেন স্কীট্ সাহেবের ছোট ডিক্শনারিতে। দেখা হলে বলছেন—ছোট স্কীট্টাও কিন্তু অনেকদিনের। ওর উপর আমার দরদ আছে, allegiance-ও (আনুগত্যও) আছে।

আমি—ওটা কি জ্ঞানদাসের অভিধানের সময়েই আনা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

বেশ গরম পড়েছে। বাইরে খসখস টাঙ্গানো। অনবরত জল দিয়ে ভেজানো চলছে। ভেতরে ফুল স্পীডে পাখা চলছে। তবুও গরম লাগছে—গরমের আলোচনাই হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পাবনাতে একবার বিশ্ববিজ্ঞানের কাছে বাগানে শুয়েছিলাম। গরমে মাথাটা যেন কেমন ক'রে উঠল।

এরপরে কেষ্টদা মহাভারতের অনেক গল্প করতে লাগলেন। শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর মহাভারত সম্বন্ধে বললেন—Wonderfully normal (বিস্ময়করভাবে স্বাভাবিক)। ওখানে দুর্য্যোধনের ছিল egoistic conception (দম্ভপূর্ণ বোধ), egoistic conception (দম্ভপূর্ণ বোধ) থাকার জন্য সে ঈর্ষ্যাপরায়ণ। আবার, ঈর্ষ্যাপরায়ণ যারা, তারা কখনও tactful (কৌশলী) হয় না।

আজ দুপুরে গরমের তাপ আরও বাড়ল। বাইরে ১১২ ডিগ্রি, এলুমিনিয়ামের ঘরের মধ্যেকার তাপ ১০৬ ডিগ্রি। বিকালেও বেশ গরম হাওয়া বইছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় এসে বসেছেন। ভক্তবৃন্দ অনেকে আছেন। কথায়-কথায় শরৎদা (হালদার) জানতে চাইলেন, আমাদের সৎসঙ্গটা কি একটা সঙ্ঘ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে একটা সংগঠন হয়, পরে সেটা সঙ্ঘ হয়ে দাঁড়ায়। আমি এর নাম দিয়েছিলাম সৎসঙ্গ, সৎসঙ্ঘ নয় কিন্তু। নামটা আমার দেওয়া।

শরৎদা—আগ্রাতেও তো সৎসঙ্গ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে হ'ল আগ্রা সৎসঙ্গ, রাধাস্বামী সৎসঙ্গ। আমার এটা সৎসঙ্গ।

২৩শে বৈশাখ, ১৩৬৭, শুক্রবার (ইং ৬। ৫। ১৯৬০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর হলঘরটিতেই আছেন। বেলা ৯টা। হায়দরাবাদ থেকে অনেক মানুষ এসেছেন। হরিনন্দনদা (প্রসাদ) এখন তাঁদের নিয়ে এসে বসলেন। পুরুষোত্তমকে কিভাবে জানা যায়, এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা উঠল।

কথাপ্রসঙ্গে বলছেন দয়াল ঠাকুর—পুরুষোত্তম যেখানেই আসেন, তাঁদের থাকে একই ভাব, একই কথা। (রহস্যভরে বলছেন) তাঁরা এক তাড়িই খান। আর, সে তাড়ি হল elixir of life (জীবনীয় অমৃত)। তিনি গোবর্দ্ধনধারী, অর্থাৎ জীবজগতের পালক ও বর্দ্ধক। তিনি হয়তো সাধারণ মানুষের মত তোমার কাছে এসে বসবেন, বলবেন—কলাইয়ের ডাল খেও না, মুগের ডাল খেও। এই ধরণের সহজ কথা বলতে বলতে তিনি তোমাকে খাড়া ক'রে তোলেন, তোমাকে আবিলতামুক্ত ক'রে তোলেন। ঐ খাড়া ক'রে না তোলা পর্য্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই। সকলের জীবনের উপরেই যেন তাঁর জীবন নির্ভর করছে। তিনি বলেন, 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।' বৃন্দ মানে হল সমূহ, আর বন্ মানে বিস্তার।

তাই তাঁর কথা, 'এই সমূহের বিস্তার ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।' তিনি আরো বলেন—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥" গায়ন্তি মানে গান করে। কিসের গান? বাঁচাবাড়ার গান, অর্থাৎ upholdment of life and growth বা existential propitiousness-এর (জীবন-বর্দ্ধন যাতে পরিপোষিত হয় বা সাত্বত মঙ্গলের) কথা। যেখানে আমার ভক্তেরা সবাই মিলে এই গান করে, আমি সেখানেই থাকি। এই তিনি বলেন। আর, তাঁর লক্ষণ এই আমারই মত। এই যেমন মানুষের ভাল করা ছাড়া আমি থাকতেই পারি না। এইরকমই তিনি। মানুষের উন্নতিই তাঁর elixir of life (জীবনীয় সুধা)। তাঁতে যাদের প্রীতি আটকে যায় তারা হয়তো খেতে পায় না ঠিকমত, কিন্তু তারাই হয়ে ওঠে রাখাল—শ্রীকৃষ্ণের রাখাল, সব-কিছু ঠিক রাখে। (তারপর কালিদাসীমার দিকে তাকিয়ে আদরভরা সুরে বলছেন) তামাক একটু ভাল ক'রে খাওয়াবি? তামুকে দমই দিতে পারলাম না, কিছু না।

কালিদাসীমা উঠে তামাক সাজতে গেলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃন্দাবন মানে কী?

কেষ্টদা—উত্তর ভারতের একটা জায়গা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(স্মিতহাস্যে) না, আমি কই, বৃন্দ মানে সমূহ, তার বিস্তার হল বৃন্দাবন। (জন-) সমূহ যেখানে বিস্তৃত হয়ে আছে, অর্থাৎ এই বিস্তৃত জনমণ্ডলী। ঐ যে আছে 'বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং না গচ্ছামি', তার মানে, লোকবর্দ্ধনী

যে যজ্ঞ তা' ছেড়ে আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। তাঁর একমাত্র কামনা, সবাই দীপ্ত হোক, বর্দ্ধিত হোক। ঐ যে তাড়িখানায় দেখেন না কেন ঢোলক বাজায় (দুলে দুলে দুহাতে ঢোলক বাজানোর ভঙ্গী এবং মাতাল হলে চোখে যেমন ঢুলু-ঢুলু ভাব আসে সেইরকম চোখ ক'রে দেখাচ্ছেন)—এই বাজাচ্ছে, বাজাচ্ছে, আবার ফাঁকে ফাঁকে খাচ্ছে (গেলাসে মদ খাওয়ার ভঙ্গিমা ক'রে)। এরই মধ্যে বুঁদ হয়ে পড়ে আছে। তাঁর তাড়িখানা হল লোকবর্দ্ধনা। ঐ কর্ম্মেই তিনি নিত্য বিভোর হয়ে থাকেন। মানুষের সম্পদ হল adherence, allegiance and active enthusiasm (নিষ্ঠা, আনুগত্য ও সক্রিয় সম্বেগ)। এর একটা থাকলেই আর দুটি থাকে। পুরুষোত্তম মানুষের ঐ সম্পদগুলি জাগিয়ে তোলেন।

কেষ্টদা—এর একটাও কারো হাতে নেই। সব জন্মগত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা হয়তো তাই। কিন্তু জন্মগত কইতে আমার ইচ্ছে করে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। শ্রীশ্রীঠাকুর কী যেন চিন্তায় নিমগ্ন। তারপর একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন—ফুলের গুচ্ছের ইংরাজী যেন কী?

কেষ্টদা—বাঞ্চ, বুকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুরুষোত্তম বলেন, তোমরা বাঁচ, বেড়ে ওঠ, আর পরস্পর গুচ্ছিত হয়ে ওঠ। তোমার deficiency-তে (কমে যাওয়াতে) যেন ও কষ্ট বোধ করে, আবার ওর deficiency-তে (কমে যাওয়াতে) যেন তুমি কষ্ট বোধ কর। এইভাবে চল।

এরপর মহাভারত প্রসঙ্গে কথা উঠল। কেষ্টদা গল্প করছেন মহাভারতের সময়ের আচার-আচরণ, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র, কৌশলী ব্যবহার, ইত্যাদি বিষয়ে। বলছিলেন, কৌরবসভায় দূত হয়ে যাওয়ার আগে শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে ব্রাহ্মণদের প্রদক্ষিণ ক'রে গিয়েছিলেন।

শুনতে শুনতে দয়াল ঠাকুর বলে উঠলেন—এসব কথায় আমি এত exalted (উদ্দীপিত) হই যে তা' আর বলার নয়। অনেক কথা unveil (প্রকাশ) করতে ইচ্ছা করে। ঐ যে প্রদক্ষিণের কথা বললেন, হাজারবার প্রদক্ষিণ করলেও কিছু হবে না, যদি—

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার সুর ধরে কেষ্টদা বললেন—প্রকৃষ্টরূপে দক্ষতা না আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। সেইজন্য নিজে exalted (উদ্দীপিত) হতে হবে, আর ঐ ভাব অপরের মধ্যে impart (সঞ্চারিত) করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ এমন ক'রে কথা কইতেন, যা' এদিকেও লাগবে, ওদিকেও লাগবে।

কেষ্টদা—হ্যাঁ, একেবারে দাবার চালের মত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহাভারত তখনকার যুগের ইতিহাস।

কেষ্টদা—ওখানে আছে, মার্কণ্ডেয় ঋষি নাকি দশ হাজার বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু দেখতে ছিলেন পঁচিশ বছরের মত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে দেখেন ঐ একটা source (উৎস)। যে-সময় কেষ্ট ঠাকুর ৮২/৮৪ বছর বেঁচে ছিলেন, তখন উনি বেঁচে ছিলেন দশ হাজার বছর। এ বিশ্বাস করায় আমার লাভ ছাড়া লোকসান নেই। লাভ এই, মার্কণ্ডেয় ঋষি কিভাবে অতদিন বেঁচেছিলেন তার কারণটিকে আমরা আবিষ্কার করার প্রেরণা পাই। মানুষের নিষ্ঠাবান হওয়ার ব্যাপারটা নির্ভর করে তার previous life-এর (পূর্ব্ব জীবনের) কর্ম্মের উপর। নিষ্ঠা যদি কারো থাকে, তার সাথে যদি তার পুরুষকার যুক্ত হয়, তখন সে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে।

কেষ্টদা—মহাভারতে আছে, গুরুদক্ষিণা হ'ল ব্রহ্মচর্য্যের চতুর্থ পাদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য আমার দক্ষতা থেকে অর্জ্জিত যা' তাই দক্ষিণা দিতে হয়। ওটা হ'ল ব্রহ্মচর্য্যের last duty (সর্ব্বশেষ করণীয়)।

কেষ্টদা—আগেকার দিনে এরকম নিয়ম ছিল, কোন ব্রহ্মচারী যদি ৮০,০০০ টাকা দক্ষিণা দিত, গুরু তার থেকে তাঁর দরকারমত ৫০০ টাকা নিয়ে বাকী ৭৯৫০০ টাকা ফেরত দিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্যাখেন, ততখানি considerate (বিবেচক) ছিল তারা।

কেষ্টদা—আবার স্নাতক যখন রাস্তা দিয়ে যেত, তার পথ ছেড়ে দিতে হত। আগে সে যাবে, তারপর রাজা যাবেন।

আবেগভরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কতখানি পুণ্য সম্মান!

কেষ্টদা—কিন্তু ঐসব কথা আজ স্বপ্ন মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের কাছে এগুলি স্বপ্ন, ভরদুনিয়ার কাছে এগুলি রূপকথা। কিন্তু ঐরকম নিষ্ঠা, ঐরকম প্রেরণাসম্ভূত দক্ষিণা, যে-দক্ষিণার ভিতর দিয়ে মানুষ achieve (অর্জ্জন) করত imparting enthusiam (সঞ্চারণী উৎসাহ), সে-সমাজ, সে-দেশের কথা ভাবতে আমার গৌরব বোধ হয়। আর একটা কথা মনে হয়। এটা যে ফিরিয়ে আনা যায় না তা' নয়। এখনও যদি আমাদের ঐ জাতীয় সঙ্গতি থাকে, ঐরকম মানুষ থাকে, তাহলে সবই সম্ভব হ'য়ে উঠতে পারে।

কেষ্টদা—আপনার কাছে একদিন ভ্যাটিক্যান সিটির গল্প করেছিলাম।

উৎসাহভরা সুরে ব'লে উঠলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইন্ডিয়াও (ভারতবর্ষও) অমনি ভ্যাটিক্যানের মত একটা নিউক্লিয়াস্ (কেন্দ্রস্থল) হ'য়ে উঠতে পারে। দ্যাখেন হিসাব ক'রে, আপনারা কম পড়েন নি, কম দ্যাখেননি। সেগুলি যদি character-এ materialise (চরিত্রে মূর্ত্ত) ক'রে তুলতে পারেন, অন্ততঃ সিকিভাগ, সিকি কেন,

এক পয়সার মতনও, তাহলে তা' দিয়ে কত ইন্ডিয়া ঠিক ক'রে ফেলা যায় তার ইয়ত্তা নেই।

তারপর কাছে-বসা সরোজিনীমার দিকে ফিরে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—দে, ভাল করে তামুক-টামুক খাওয়া।

সরোজিনীমা প্রভুর প্রসারিত দক্ষিণ করপল্লবে একটি পান ও একটুকরো সুপারি দিয়ে তামাক সেজে এনে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে কেষ্টদা উঠে গেলেন। বেলা ১১-টা বেজে গেছে। দিল্লীর হেমেনদার (বরাট) মেয়ে অশোকা ও তার স্বামীকে নিয়ে এসে সুশীলদা (বসু) বললেন—ওরা বিকালে তুফানে দিল্লী যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন—আচ্ছা।

অশোকার স্বামী পাঞ্জাবী। সে এইসময় সুশীলদাকে হিন্দিতে কিছু বলল। সুশীলদা দয়ালকে বললেন—ও জিজ্ঞাসা করছে, কিভাবে জীবনে successful (কৃতকার্য্য) হ'তে পারবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনিই সব ক'য়ে দেবেন। (ছেলেটিকে) সুশীলদার কাছ থেকে সব শুনে নিও।

ছেলেটি সম্মতি জানিয়ে অশোকা-সহ প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেল। স্নানের বেলা হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর রাতুল চরণ দু'খানি চৌকি থেকে নামিয়ে কালো চটি জোড়া পরেছেন, এইবার উঠবেন।

উঠতে উঠতে আসামের রবীনদার (রায়) দিকে তাকিয়ে বলছেন—একটা বীজ ৫০,০০০ বছরেও নষ্ট হয় না। মাটির মধ্যে লাগালে ঠিক sprout করে (গজায়)। তোমাদের বীজও ঐরকম। In tact (অবিকৃত) রাখতে পারলে বহু বছর পরেও আবার ঠিক sprout করবে (গজায়)। তাই আমার মনে হয়, বিয়ে-থাওয়া যদি করই, খুব ভাল ক'রে দেখেশুনে ক'রো। বুঝলে তো?

রবীনদা—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর এখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর একপাশে বঙ্কিমদা (রায়) এবং আর একপাশে হরিপদদা (সাহা)। বাথরুমের দিকে যেতে যেতে মন্টুনকে (রায়চৌধুরী) বললেন—ছাতা আনিছিস্?

মন্টুন—হ্যাঁ।

বাইরের উত্তাপ ক্রমশঃ বাড়ছে। বারান্দায় পরদা ফেলে তার উপর খস্‌খস্ টাঙ্গানো আছে এবং অনবরত জল দিয়ে ভেজানো হচ্ছে যাতে ঘরের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়।

রাতে—হলঘরে। হায়দরাবাদ থেকে যে দাদারা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অদীক্ষিত ছিলেন। আজ ওঁরা দীক্ষা নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে হরিনন্দনদা (প্রসাদ) ওঁদের দীক্ষা দিয়েছেন। এখন হরিনন্দনদা সবাইকে নিয়ে এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। বললেন—এঁদের দীক্ষা হয়ে গেছে।

প্রসন্নতা-মাখানো নয়নে উপস্থিত সকলকে অভিষিক্ত করতে করতে বললেন পরম দয়াল—তিনটি জিনিস আমাদের primary (প্রধান) রাখতে হবে—নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ। এর উপরেই সব-কিছু দাঁড়িয়ে আছে। এই সম্পদগুলিতে মানুষ যত বেড়ে উঠবে, তত সে অন্যান্য দিকেও বাড়তে থাকবে। কতকগুলি miracle (অলৌকিক ব্যাপার) কিন্তু ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্ম মানেই to uphold our existence (আমাদের অস্তিত্বকে ধারণ করা), to make our existence propitious (আমাদের সত্তা শুভবাহী ক'রে তোলা)। এইগুলি দেখে-শুনে-বুঝে যে যত impart (সঞ্চারিত) করতে পারে পরিবেশের ভিতর, সে তত বড় ধার্ম্মিক। শুধু বুজরুকি করে বেড়ালে ধার্ম্মিক হয় না। (হরিনন্দনদাকে) তুমি সব কথা ওঁদের বুঝিয়ে দাও।

ঐ দাদারা বাংলা জানেন না। তাই, হরিনন্দনদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি হিন্দি ও ইংরাজীতে অনুবাদ ক'রে ওদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলছেন—নিষ্ঠা, আনুগত্য আর কৃতিসম্বেগ থাকলে হনুমানের মত পরাক্রমও থাকে। নিষ্ঠা থাকলেই আনুগত্য থাকে, আবার আনুগত্য থাকলেই আসে urge (সম্বেগ), তার থেকে জন্মায় valour (পরাক্রম)। আবার, আমাদের successful (কৃতকার্য্য) হওয়ার মাপকাঠি হ'ল আমরা যে-কাজ ধরি তা' complete (সমাপ্ত) ক'রে উঠতে পারি কিনা!

উপস্থিত জনৈক দাদাকে দেখিয়ে হরিনন্দনদা বললেন—এই নীলকণ্ঠবাবু পায়ে ব্যথা হওয়ায় বেশী হাঁটতে পারেন না। একটা গাড়ী হলে কিছু জায়গা ঘুরে দেখতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা, কাল মনে করিয়ে দিও আমাকে।

আগামী কাল ভোরে পূজনীয় ছোড়দা মেদিনীপুর এবং আরো কয়েকটি জায়গা পরিভ্রমণে যাচ্ছেন। তাঁর সাথে যাচ্ছেন ননীদা (চক্রবর্ত্তী), রাজেনদা (মজুমদার), বিভূতিদা (মিশ্র)। সবাই এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাবধান হয়ে যাবে, থাকবে।

ননীদা—ওখানে আমাদের দু-একটা মিটিং-ও করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগের থেকে জানায়ে মিটিং করা ভাল না। তাতে অনেক রকম লোক অনেক উদ্দেশ্যে আসতে পারে। কোথাও গেলে, আলোচনা করতে করতে একটা মিটিং-এর মত হল, সে আলাদা কথা।

ননীদা—ওখানকার গুরুভাইরা আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছে নাড়াজোলের রাজবাড়ীতে।

মেদিনীপুর শহরে উকিল আছেন গগন শিকদার। ইনি দীক্ষিত এবং মাঝে-মাঝে ঠাকুরবাড়ীতে আসেন। তাঁর নাম উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি হলে ঐ গগন-টগনের বাড়ী উঠতাম।

২৪শে বৈশাখ, ১৩৬৭, শনিবার (ইং ৭।৫।১৯৬০)

সকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন ক'রে পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর হলঘরের শুভ্র শয্যাটিতে এসে বসেছেন। সূর্য্যোদয়ের থেকেই বাইরের আবহাওয়ায় তাপের সৃষ্টি হয়েছে। দালানে হলঘরের ভিতরটা বেশ মনোরম। পুরু বাজুর ঘর। তা'ছাড়া ঘরের ভিতরে এয়ার সারকুলেটর ও ফ্যান চলছে।

কয়েক চামচ ছানা-মুড়ি গ্রহণ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর জল খেলেন। এখন প্রশান্তবয়ানে তামাকু সেবন করছেন। ভক্তবৃন্দ একে একে এসে প্রণাম ক'রে বসছেন। এলেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বীরেনদা (মিত্র), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), বঙ্কিমদা (দাস) প্রমুখ। তাঁর সেবায় নিরত রয়েছেন প্যারীদা (নন্দী) ও বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)।

নিষ্ঠা নিয়ে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিষ্ঠা মানে আমার বলতে ইচ্ছা করে আবেগ-উচ্ছল adherence (লেগে থাকা)। নিষ্ঠা থাকলে পরেই অনুগতি থাকে, আর অনুগতি থাকলেই কৃতিসম্বেগ থাকবে। নিষ্ঠা-আনুগত্যের volition (তেজ) যেমনতর, কৃতিসম্বেগও তেমনতর হয়। আবার, এদের সম্মিলিত সম্বেগ যেমনতর, থাকার অর্থাৎ রাগস্থিতির সম্বেগও তেমনি। গোটা system-ই (শারীর বিধানই) সেইমাফিক conscious (সজাগ) হয়ে ওঠে, চলনের মধ্যেও ঘটতে থাকে তদনুপাতিক rhythmic flow (সেই তালমাফিক গতি)। যেমন ধরেন, আপনি বিয়ে করেছেন। বৌকে ভালবাসেন। সে-ও আপনাকে ভালবাসে। পরস্পরের মধ্যে এই আকর্ষণ থাকার দরুন একটা সঙ্গতিশীল সম্বেদনা হয়। হয়তো তাকে আদর করলেন, একটু চুমো খেলেন। সমস্ত নার্ভগুলিই ঐভাবে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

কেষ্টদা—নিষ্ঠা কথাটার ঠিক মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি লেগে থাকা, আগ্রহ-অনুরাগ নিয়ে নিয়মিত লেগে থাকা। বৈষ্ণবরা একে কয় অনুরাগ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই কথা আছে কিনা দেখবেন তো! আবার, এই নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ কতখানি আছে তা' ঠিক পাওয়া যায় পরাক্রমের জোর দেখে।

কেষ্টদা—মনে যে-কোন ভাবই আসুক, শরীরে তার motor action (কর্ম্মোদ্দীপনা) হবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাব-আনুপাতিক motor action (কর্ম্মোদ্দীপনা) হয়। Emotional flow of the nerve (স্নায়ুতন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রবহমান ভাবানুকম্পিতা) যেমন, সেইভাবেই তা' হয়ে থাকে। এই যেমন, আপনার হয়তো এখন এক গ্লাস জল খেয়ে আসতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু কথায় এমন মজে আছেন, ভাবছেন, 'যাবো নে একটু পরে, যাবো নে একটু পরে'। এই করতে করতে হয়তো জলপিপাসাই চ'লে গেল। হয়তো প্রস্রাব চেপেছে খুব। টন্‌টন্ করছে। কিন্তু তখন গল্পে টান ধরেছে। ৩/৪ ঘণ্টা ধরে গল্প ক'রে যাচ্ছেন। তখন ও-সম্বন্ধে বোধই নেই। যেই গল্প শেষ হয়ে গেল, অমনি একেবারে প্রস্রাবের ভীষণ চাপ।

কেষ্টদা—আগে আমার চুলকানি ছিল। যতক্ষণ আপনার কাছে বসে গল্প করতাম ততক্ষণ চুলকানি টের পেতাম না। এখান থেকে বাইরে গেলেই চুলকানির চোটে অস্থির হয়ে পড়তাম। (ক্ষণেক বিরতির পর) গীতায় আছে, হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, উদ্বেগ থেকে যে মুক্ত, সে আমার প্রিয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওগুলি কিন্তু যায় না, সবই থাকে। Concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়ে উঠলে ওগুলি adjusted (বিনায়িত) হয়। তখন মানুষ আর ওগুলির দ্বারা চালিত হয় না। তখন কোন কাজ যদি করার কথা মনে হয়, সেটা পরে করব বলে ফেলে রাখে না।

কেষ্টদা—এসব রকম ছেলেপেলেদেরও থাকে, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে কী আছে, 'চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী' (দ্রুতভাবে এই পংক্তি বার বার আবৃত্তি করছেন)—এই rhyme-এ (তালে) ঐ পদ যদি বার বার ভাবতে ও বলতে থাকি, ধীরে-ধীরে ঐ ভাবটা আমাদের ভেতরে ঘনীভূত হয়ে ওঠে, আমরা concentric (কেন্দ্রায়িত) হয়ে উঠি ঐ ভাবে। আবার—কী কয়! (মনে করার চেষ্টা করছেন) ঐ যে—তাঁর মহিমা ভাবার চেষ্টা করছি, স্তবের কথা। কন্ তো একটা।

কেষ্টদা—যেমন, দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং, আবার ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, (ঐ পদগুলি পুনরাবৃত্তি ক'রে) তাঁর দ্বন্দ্ব নেই, তিনি গুণের অতীত, এমন যে সদ্‌গুরু তাঁকে প্রণাম করি। তাঁর গুণের কথা বলছি। বলতে বলতে আমার চোখমুখের ভাবও অমনতর হচ্ছে, ঐ গুণাবলীর দ্যোতনা আমার মধ্যে ফুটে উঠছে।

কেষ্টদা—Idea (ভাব) ভাল হলে motor action-ও (কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ুর ক্রিয়াও) তেমনি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তাই হয়।

তারপর দক্ষিণ হস্তখানি ঊর্দ্ধ্বে উত্তোলিত ক'রে চোখে ভক্তির ব্যঞ্জনা এনে উদাস ভঙ্গীতে গাইছেন—'সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে গো পড়ে মনে—'।

গাওয়া শেষ হলে বলছেন দয়াল—এই যে আমি গান গাচ্ছি, সাথে সাথে এইরকম ভাব-টাব করছি, এই সবগুলিই হল invoking attitude (ঐ ভাবের আবাহনকারী লক্ষণসমূহ)। (তারপর আস্তে আস্তে বলছেন) এখন ভুলে গেছি সব গান-টান। আবার দ্যাখেন, শ্রীকৃষ্ণ মা-র কাছে যেয়ে বলছে—মা, ননী দে। তার feeling-এর (ভাবের) সাথে-সাথে তদনুযায়ী activity-ও (ক্রিয়মাণতাও) ফুটে উঠছে। ঐ ঘটনা বইতেও লেখা আছে। তা' যদি শুধু পড়ে যান তখন কিন্তু আর ঐরকমভাবে হবে না। ঐ যে আপনি আমার কাছে নীলদর্পণ নাটকের গল্প করেছিলেন। নাটকে ভাব-অনুপাতিক (অভিনয়) কর্ম্ম এতই জীবন্ত হয়ে উঠেছিল যে নাটক দেখতে দেখতে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর মশাই জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন। অভিনেতা তখন সেই জুতো মাথায় ক'রে নিয়ে কয়—এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর আমার নেই। এইরকম সব ক্ষেত্রে। (একটু পরে, আনমনে) এখন বিয়ে-থাওয়ার যা' রকম হয়েছে, এগুলি insult to our tradition (আমাদের ঐতিহ্যের প্রতি অবমাননা)।

কেষ্টদা—উনি সধবার একাদশী নামে আর একখানা নাটক লিখেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তাও আপনার কাছে শুনেছি। কে যেন ওঁকে বলেছিল—আমরা মদ্যনিবারণী সভা ক'রে যা' করতে পারি নি, আপনার একখানা নাটকে তা' হয়েছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর সোডা-ওয়াটার খেলেন। তারপর কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, গীতা-মাহাত্ম্য কি আগেও ছিল?

কেষ্টদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, এগুলি যদি কেউ লোভের মোহেও ধরে এবং অকপটভাবে ক'রে চলে, তাহলেও অমন হয়ে ওঠে। আসল মাহাত্ম্য কিন্তু ওখানেই। আমার বইগুলি ভালভাবে পড়লে, কি আপনার কাছে বসে মন দিয়ে কথা শুনলে মানুষের ঐরকম হয়ে ওঠার tendency (প্রবণতা) গজাবেই।

তারপর যেন এক ঝট্‌কায় সমস্ত প্রতিকূলতা উড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন দয়াল ঠাকুর—কিছু না। নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ আর পরাক্রম, এইগুলি ঠিক রেখে যদি কেউ চলতে পারে, দেখবেন সে কেমন হয়। অবশ্য পরাক্রমটা হয় নিষ্ঠার depth (গভীরতা)-মাফিক।

কেষ্টদা—আপনি যে কয়টা বললেন, সবগুলির মূল কিন্তু নিষ্ঠা। নিষ্ঠাটা ঠিক রাখলেই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' কই, করলে হবেই। না করলে কিন্তু হবে না। সেইজন্য আমার কথা, পাঁচটা ক'রো না, একটা কর।

কেষ্টদা—কিন্তু ঠিকমত করলাম কিনা তা' তো দেখি না।

কেষ্টদার এ কথাকে যেন আমল না দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্ব সূত্র ধ'রে বলে চললেন—কিরকম হয়? ঐ যেমন আছে—কী যেন? (একটু স্মরণ ক'রেই বলতে লাগলেন)—

"কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিন-
সঙ্গীত-করবো
মুদাভীরীনারী বদনকমলাস্বাদ-
মধুপ ...."

প্রিয়ার মুখে একটা চুমু খাওয়ার লালসা কেমন দেখেছেন? ঐরকম আর কি! যে ও-কাম করে, সে কি আর হিসেব ক'রে কিছু করে যে এই চার আঙুল হল কি দুই আঙুল হল? জুত পেলেই কাম সেরে নেয়। দ্যাখেন না কেন, কই সেটা?

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝে 'জগন্নাথস্তোত্রম্' বের ক'রে পড়া হল। শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। পড়া শেষ হলে আনন্দের ঐ অভিব্যঞ্জনাতেই বলে উঠলেন—একবার পেচ্ছাপ ক'রে নেব নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে সবাই বাইরে চলে এলেন। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। প্যারীদা (নন্দী) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রস্রাব করালেন। তারপর ঘরের দরজা খোলা হল। আবার সকলে এসে বসলেন।

কেষ্টদা মহাভারতের নানা কাহিনী গল্প করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মুগ্ধ শ্রোতার মত সব শুনছেন। গান্ধারীর প্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর বাবাকে মেরে গান্ধারীকে লুঠ ক'রে নিয়ে আসল। পরে ভাইদেরও মারল! ওর সাথে বিয়ের কথা হতেই চোখ বাঁধল গান্ধারী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, যে-মেয়েকে ঐভাবে নিয়ে আস্‌ল, সে তার স্বামীর প্রতি কতখানি সাধ্বী হতে পারে! এটা বোঝা যায়। গান্ধারী আমার মতও না, আপনার মতও না। সে super-politician (তীক্ষ্ণ-কূটবুদ্ধিসম্পন্না) ছিল। বুঝেছিল, বাপ-ভাইকে মেরেছে, আমাকে যখন খুশি নিকেশ ক'রে দিতে পারে। তাতে তো লাভ নেই। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের কোন-কিছুতেই যে ওর সায় ছিল না তা' ওর কথা শুনে বোঝা যায়। যুদ্ধের সময় দুর্য্যোধনকে কখনও কয় না 'তোমার জয় হোক', সবসময় কয় 'ধর্ম্মের জয় হোক'। কী groaning pain (গভীর ব্যথা-ভরা হাহাকার)! এতদিন ধরে কী নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছে! এমনতর মায়ের ছেলে আর কেমন হবে! ওদের নামগুলির মধ্যেও দেখেন ঐ লক্ষণ—দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দুঃশলা, এই সব।

কেষ্টদা—কৌরবসভায় ওরা যখন কৃষ্ণকে বাঁধতে যায় তখন দেখে চারিদিকে সব জায়গায় কৃষ্ণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে ওরা তখন কৃষ্ণের ভাবে obsessed (অভিভূত) হয়ে গেছে।

কথায়-কথায় বেলা অনেক হয়েছে। ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়তে দেখা গেল শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের সময় আগতপ্রায়। তাই, সবাই এবার উঠে পড়লেন।

বিকালে—বড় দালানের বারান্দায়। হল্‌ঘরের দু'পাশের দরজার মাঝখানটিতে চৌকির উপরে বিছানো প্রশস্ত শয্যায় দয়াল ঠাকুর সমাসীন। বিকাল ৫টা।

পূজ্যপাদ ছোড়দার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুত শৈলেশ সান্যাল শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে চিঠি লিখেছেন। চিঠিটি পড়ে শোনাবার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর বলে গেলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে লিখে নিলাম, উত্তরটি নিম্নরূপ ঃ—

দাদু!

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলাম—খুব খুশি হলাম। কিন্তু আমার এই খুশি হওয়ার প্রতিদানে তুমি কি কিছু দেবে? আমি কি পাব? চাই—অস্খলিত নিষ্ঠা, আনুগত্য আর কৃতিসম্বেগ—যা' মানুষকে পরাক্রম-প্রবুদ্ধ ঊর্জ্জনায় সমাধানসম্বেগী নিষ্পন্নকল্পী ক'রে তোলে, নাছোড়বান্দা উৎসর্জ্জন-সম্বেগী ক'রে তোলে—সন্দীপ্ত অনুধায়না নিয়ে।

যা' করণীয় বলে ধরবে, সেটা কিছুতেই নিষ্পাদন না ক'রে ছেড়ো না। এটা মনে রেখো দাদু। যাই কর না, যেমন ক'রেই চল, সবসময় সাবধান হয়ে চ'লো।

আর, এগুলি যত বিলিয়ে দেবে পরস্পর প্রত্যেক মানুষের ভিতর, মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে যতই—ধৃতিচর্য্যার নন্দনা নিয়ে, ততই তুমি সবারই স্বার্থ হয়ে উঠবে, সম্পদ হয়ে উঠবে।

এই আমার প্রার্থনা। এই আমার আজীবন অভিজ্ঞতা—যদি আমি ভ্রান্ত না হই, ব্যাহত হয়ে না থাকি। ইতি

আঃ তোমার দাদু

লেখা শেষ হবার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বড়বৌকে শোনা, কেমন হল?

পাশে পূবের দিকে একখানা বড় চেয়ারে শ্রীশ্রীবড়মা উপবিষ্টা। তাঁর কাছে যেয়ে চিঠিখানি পড়লাম। শুনে তিনি বললেন—ভাল হয়েছে। তারপর একটু গলা চড়িয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—ও তো আমার কাছেও লিখেছে। আমি কি লিখব?

একথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু হেসে নিম্নোক্তভাবে শ্রীশ্রীবড়মার জবানীতে বললেন—

দাদু!

আমিও তোমার চিঠি পেয়েছি, আমিও খুব খুশি হয়েছি। ঠাকুর যা' বলেছেন, আমি অত কথা বলতে জানি না। কিন্তু আমারও তোমাকে অমনতরই দেখবার ইচ্ছা। আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি

আঃ তোমার ঠাকুমা

সন্ধ্যার পর থেকেই ভক্তগণ এসে বসছেন তাঁর কাছে। পরমপুরুষের নিত্য সান্নিধ্যলাভ ও আলাপ-আলোচনা শ্রবণের মধ্য দিয়ে জীবনরস সংগ্রহ-কামনায় মধুলোভী অলিকুলের মত মানুষ ভীড় করে তাঁর কাছে। পার্থিব যেসব সমস্যায় মানুষ নিরন্তর বিব্রত হয়ে চলেছে, তার সমাধান পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কত সহজ ও সুন্দরভাবেই না পাওয়া যায়! তাইতো তাঁর কাছে নিত্য লেগে আছে মানুষের আনাগোনা।

রাত প্রায় ৯টা বাজে। ঘরের ভিতরে আছেন শরৎদা (হালদার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), মহাদেবদা (পোদ্দার), শ্রীকণ্ঠদা (মাইতি), অমূল্যদা (ঘোষ), সুধীরদা (চৌধুরী) প্রমুখ। প্রফুল্লদা (দাস) আলোচনাপ্রসঙ্গের কিছুটা অংশ নিয়ে এসে পড়িয়ে শোনালেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে বললেন—ছড়াগুলি ভাল করে দেখবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইদানীং প্রদত্ত ছড়াগুলি শরৎদা আবার পড়ে দেখছেন। এরপর শৈলেনদা বললেন—আপনি তো চাকরী করা পছন্দ করেন না। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জন তো চাইই কোন-না-কোন রকমে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এমনতর করতে ইচ্ছে করে যাতে চাকরী করার প্রয়োজনই না থাকে। ধর, তোমাকে কি শরৎদাকে গবর্নমেন্ট নিল, নিয়ে কিছু দায়িত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে রাখল। তোমরা কাজ করবে, কিন্তু টাকা-পয়সা কেউই ছোঁবে না।

শৈলেনদা—নিলাম না। কিন্তু আমার পরিবার-পরিজন আছে, খাওয়া-পরার একটা ব্যাপার আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাণক্যের সবই ছিল। কিন্তু সে নেয় নি। সে নিত না। কিন্তু মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে দিত। তুমি কাজ করবে, কিন্তু তার বিনিময়ে কিছু নেবে না। তোমাকে যারা ভালবাসে, তারা যা' দিয়ে যায়, তাই খাবে। যা' বলছি তা' ক'রেই দেখ না কী হয়! আর কিছু না। তোমার acumen (বিচক্ষণতা) যেটুকু আছে তাকে তাজা করে নাও। দেখ কী হয়!

শৈলেনদা—আমি সবারটা কচ্ছি সামগ্রিকভাবে—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও কচ্ছি সামগ্রিকভাবে, দরকার অ-চাকরী জীবন। অ-চাকরী জীবন যাদের তারাই ঠিকমত গবর্ন্মেন্ট শাসন করতে পারে।

শৈলেনদা—কিন্তু এখন যারা ফিলান্থ্রপী অফিসে কাজ করছে, এদের তো কিছু দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ আমি চাই নি। ভুল হয়েছে। আমি চেয়েছিলাম, সেই আগেকার আনন্দবাজারে যেমন খাওয়া-দাওয়া হত, ডাল জুটল তো জুটল, নতুবা পদ্মার জল, তাই খেল আর কাজ করল। (গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ রইলেন, তারপর আবার বলছেন) দেখ, দুটি জিনিস খুব চালানো লাগে—agriculture (কৃষি) আর domestic industry (কুটিরশিল্প)। এই দুটিই হ'ল wealth of the country (দেশের সম্পদ)। সাথে সাথে education-এরও (শিক্ষারও) দরকার। কিজন্য দরকার? নিজের ব্যক্তিত্বকে গঠন করার জন্য, সেই সাথে অপরকেও ঠিক রাখার জন্য। Education (শিক্ষা) এমন হবে যাতে প্রতিটি মানুষ ধরতে পারে কিভাবে বাঁচতে ও বাড়তে হয়, কী eugenic process (সুপ্রজনন-বিধি) apply (প্রয়োগ) করলে পরে দেশে ব্যতিক্রমের সৃষ্টি হয় না। আর, সবার উপরে হল ধর্ম্ম।

সবার দিকে একবার তাকিয়ে আবার বলতে থাকেন শ্রীশ্রীঠাকুর—Problem (সমস্যা) বেশি নাই। আমরাই অনেক problem (সমস্যা) সৃষ্টি ক'রে ফেলেছি। এখন আর undo (নস্যাৎ) করতে পারি না। এইভাবে চলতে থাকলে দেখ না মানুষের কী হয়!

প্রফুল্লদা—আপনি নিঃস্বার্থভাবে সেবা দেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিতে গেলে—

প্রফুল্লদার কথা শেষ করতে না দিয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ব্যঞ্জক ধ্বনিতে বললেন দয়াল ঠাকুর—হাগা না থাকলে কি খাওয়া আসে? নিঃস্বার্থ সেবা যারা যেমন দেবে, প্রকৃতিই আবার তাদের automatic (আপনা থেকেই) দেবে। মনে রেখো, তোমার এই আশেপাশে যারা আছে তারা ছাড়া তোমার পাওয়ার source (উৎস) কিন্তু আর কেউ নয়। তোমার duty (কর্ত্তব্য) হ'ল তাদের জন্য করা। তোমার বাঁচার element (উপাদান) তোমার পরিবেশ-পরিস্থিতি। সেগুলিকে সুসমৃদ্ধ ক'রে রাখতে যা' যেমন দরকার তাই করবা।

প্রফুল্লদা—এই পাকিস্তান হয়ে বড় গোলমাল হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন হয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি এইগুলি সব আগের থেকে করতে তাহলে পাকিস্তান হ'তই না।

মহাদেবদা—কিন্তু এমন লোকও দেখা যায় যারা মানুষকে কিছুই দেয় না অথচ প্রচুর পায়।

একথার এক রহস্যভরা উত্তর দিলেন প্রভু। বললেন—একদিন তার এমন পাতলা বাহ্যি হবে যে পেট নিয়েই মুশকিলে পড়ে যাবে।

প্রফুল্লদা—আপনি যা' বলছেন তাতে বোঝা যায়, এই সবটাই Brahminical profession (ব্রাহ্মণের কর্ম্ম)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Brahminical (ব্রাহ্মণের) কও কেন? কও existential profession (সত্তাহিতী কর্ম্ম)। এই যে শিক্ষক শিক্ষকতা করে, আমার ইচ্ছা, সে কখনও কারো চাকর হবে না। মানুষের স্বতঃস্বেচ্ছ অবদানই হবে তার উপজীবিকা। সতীশ সান্যাল বলে একজন মাস্টার ছিলেন। তাঁকে সবাই ভালবাসত। তিনি যদি শুধু একবার গ্রাম ঘুরে আসতেন তাহলেই ৫০ টাকা প্রণামী পেতেন। তাঁর একটা কথা ছিল, To sit in a manner that a photo may be drawn (এমন রকমে বসতে হবে যা' দেখে একটা ছবি আঁকা যায়)।

শরৎদা—আপনি তো সেই অবস্থাটা ফিরিয়ে আনতে চাইছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কেন, আপনারা সবাই চাচ্ছেন। কারণ, আমরা freedom (স্বাধীনতা) যাকে কয় তা' enjoy (উপভোগ) করতে চাই। আর, freedom মানেই হল প্রিয়র বাড়ী।

শৈলেনদা—সে যুগে তো এত টাকাকড়ির ব্যাপার ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে, আমার বেশী টাকাকড়ির কাম কী! পেটটা চললে হল, ছাওয়াল-পাওয়াল ভাল থাকলেই হল! (শ্রীকণ্ঠদাকে দেখিয়ে) ও যে ঐ ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ের জন্য ৫০০ টাকা নিয়ে এল, কেন? সে কী করেছে ওর জন্যে? (শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে একজনের মেয়ের বিয়ের জন্য ৫০০ টাকা এনে দিয়েছেন শ্রীকণ্ঠদা)। আন্‌ল তো out of compassion (সহানুভূতিপ্রবণ হয়ে)? তাই কই, টাকার দিকে নজর না দিয়ে মানুষের দিকে নজর দাও।

শৈলেনদা—গভর্ণমেন্টের এখন বহু ডিপার্টমেন্ট। সে-সব জায়গায় কাজের জন্য লোকও বহু দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, যত দিন যাবে তত এইরকম হবে, তত ডিপার্টমেন্ট পালটাবে, কাজের ভোলও পালটাবে।

শ্রীকণ্ঠদা—আপনি যেমনটা বলেন তেমন এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন কি কোনদিন ভারতে ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় ছিল।

পরিমলদা (নৈহাটি)—কিন্তু বর্ত্তমান সমাজে কি এইভাবে চলা সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতটুকু পারিস ততটুকু করে যা না। ঐ যে কয় 'তেরা বনত বনত বন যায়' না কি?

মনু (কুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য)—এখন তো আমাদের এখানে থাকতে হচ্ছে বাড়ী ভাড়া দিয়ে, স্কুলের মাইনেও দিতে হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাড়ী ভাড়া দেওয়া লাগবে না? যার কাছ থেকে নাও তাকে সবসময় profitable (প্রবর্দ্ধনী) ক'রে রাখার চেষ্টা করবে। সে যেন শুকিয়ে না যায়। তোমরা ফিলানথ্রপী থেকে নিচ্ছ, কিন্তু তাকে profitable (লাভমুখী) করার চেষ্টা যদি করতে তাহলে আজ এই দুরবস্থা হত না।

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭, রবিবার (ইং ৮।৫।১৯৬০)

আজ দুদিন যাবৎ ভোরের দিকে একটু ঠাণ্ডা ভাব থাকছে। সকাল সাড়ে ৭টার পরেই এলুমিনিয়মের ঘর থেকে চ'লে এসে হলঘরে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। এখানে আসার পরে তাঁর হাতে ও পায়ে সেঁক ও মালিশ দেওয়া হল। এটা আজকাল রোজই হচ্ছে। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি সোডা-ওয়াটার খেলেন। তাঁর পেটের অবস্থা ভাল না থাকায় দিনে ৪/৫টি ক'রে সোডা-ওয়াটার আজকাল খাচ্ছেন। তাতে একটু ভাল বোধ করেন।

সকাল সাড়ে ৮টা। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। বাইরের প্রকৃতি এখনই বেশ তাপ বিকিরণ করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—মুসলমানরা যে কোরান পাঠ করে, তার সুর, রকমসকম আপনাদের বেদপাঠের মত।

এই বলে শ্রীশ্রীঠাকুর কোরানের কিছুটা অংশ সুর ক'রে আবৃত্তি করলেন। ক'রে যেন দেখিয়ে দিলেন যে, বেদমন্ত্রের সেই উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত ভেদে উচ্চারণের সঙ্গে এই উচ্চারণের কত সাদৃশ্য!

গতকাল বিকালে কলকাতা থেকে দু'খানা জীপ রওনা হয়েছে। আজ সকালে আশ্রমে এসে পৌঁছাবার কথা। এখনও পৌঁছাল না দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর উৎকণ্ঠার সুরে জিজ্ঞাসা করছেন—কই, ওরা তো এখনও এল না?

কেষ্টদা—প্রায় আসার সময় হ'ল।

বেলা ৯টার সময় জীপ এসে গেল। ভূপেশদা (দত্ত) গাড়িতে ছিলেন। নেমে এসে প্রণাম ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে সব কথা নিবেদন করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খস্‌খস্ এনেছিস?

ভূপেশদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিরকম?

ভূপেশদা—ভালই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা এনে কেষ্টদাকে দেখালে হয়। একটা এনে দেখা।

ভূপেশদা তাড়াতাড়ি দু'জন লোককে দিয়ে একটা খসখস আনালেন। খসখসটা গোল করে জড়ানো, বেশ পুরু। ওটা সামনে এনে রাখতেই সুন্দর একটা মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দ প্রকাশ ক'রে বললেন—বাঃ, বেশ হয়েছে।

কেষ্টদা খগেনদাকে (তপাদার) ডাকতে বললেন। খগেনদা এলে তাঁকে বললেন—তাড়াতাড়ি ভিজিয়ে টানিয়ে দেন।

খগেনদাও তাড়াতাড়ি লোকজন ডেকে এনে হলঘরের বারান্দার উপরে খসখস টানাবার তোড়জোড় করতে লাগলেন। এই সময় ডেকলাল (ভার্মা) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলল—একখানা জীপ চাই।

কাছে চুনীদা (রায়চৌধুরী) দাঁড়িয়ে ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর চুনীদাকে বললেন ডেকলালের কথা। চুনীদা বললেন—আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করব।

ভূপেশদা কলকাতা থেকে গোটা কয়েক ওষুধের ফাইল নিয়ে এসেছেন। সেগুলি এনে দেখালেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। শ্রীশ্রীঠাকুর ওষুধগুলি ফোটাদার (পণ্ডা) কাছে রাখতে দিলেন।

বাইরে বারান্দায় খসখস টাঙ্গানো হচ্ছে। হলঘরের খোলা দরজা দিয়ে ঐ কাজ দেখা যাচ্ছে। সেদিকে লক্ষ্য করে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওগুলো যে খুলে টাঙ্গাচ্ছে! বড় খোকারে কইছে, জানাইছে?

বীরেনদা (মিত্র) তাড়াতাড়ি জেনে এসে বললেন—বড়দা কালই বলে রেখেছেন ওগুলি টাঙ্গিয়ে দিতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবুও তারে কওয়া ভাল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ভূপেশদাকে বললেন—আমার পাঁচখানা গাড়ীর কী করলি?

পাঁচখানা বিশেষ ধরনের মোটরকার আনার কথা শ্রীশ্রীঠাকুর ভূপেশদাকে বলেছিলেন। ভূপেশদা যতটা যা' খোঁজখবর নিয়ে এসেছেন সব বললেন, শেষে জানালেন—লাখ খানেক টাকা লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে জমা দিতে হবে কত?

ভূপেশদা—দশ হাজার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখা যাক কী হয়! গাড়ীতে যেন কিছু না হয়, উল্‌টে না পড়ে, নষ্ট না হ'য়ে যায় টক ক'রে, সেসব খোঁজ নিয়েছিলি?

ভূপেশদা 'হুঁ' বলে বললেন—জীপের মালগুলি নামিয়ে রেখে বড়দার কাছে একটু যাব?

নিশ্চয়াত্মক ভঙ্গীতে জোরের সাথে শ্রীশ্রীঠাকুর 'হ্যাঁ' বলতে ভূপেশদা বেরিয়ে যাচ্ছেন। এই সময় কলকাতার বাড়ীর সকলের কথা উল্লেখ ক'রে দয়াল ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করলেন—ওরা ভাল আছে তো?

ভূপেশদা যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভাল আছে।' তারপর চ'লে গেলেন। ভূপেশদা চ'লে যেতে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—ও, টাইপ মেশিন এনেছে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম না তো!

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা ক'রে আসছি। (বেরিয়ে শুনে এসে বললেন) ভূপেশদা ঠিক জানে না এ-ব্যাপারে।

বাইরে বারান্দায় খসখস টাঙ্গিয়ে জল দিয়ে ভেজানো হচ্ছে। তার মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। ঐ কাজ দেখতে দেখতে শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিলেন—

নিষ্ঠা যাতে অটল তোমার
আনুগত্যও কৃতিপ্রধান,
পাওয়াও তোমার তেমনি ক'রে
রচনা ক'রে রাখবে স্থান।

বেলা ১০টা বাজে। হরিনন্দনদা (প্রসাদ) জন পাঁচেক ভদ্রলোককে সাথে নিয়ে এলেন। ঐ ভদ্রলোকেরা দেওঘরে একটি কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজনের নাম বৈদ্যনাথ ঝাঁ। ইনি আগেও একবার এসেছেন আশ্রমে। সবাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বসলেন।

ঐ কনফারেন্স সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে দয়াল ঠাকুর বললেন—আমি বলি, সব কনফারেন্সের গোড়ায় হল, আমি তোমার, তুমি আমার। এইই তো wealth (সম্পদ)। সবাই সবার property (সম্পত্তি)। আর, ওখানে যদি গড়বড় করি তাহলে সবই গড়বড় হয়ে যাবে। Conference মানে কী?

হরিনন্দনদা আলমারি থেকে ডিক্‌শনারি নিয়ে এসে দেখে বললেন—Confer মানে to bestow (দান করা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে bestow your heart (তোমার হৃদয় দান করা)। তোমার যাতে ভাল হয়, উদ্বর্দ্ধন যাতে হয় তোমার, তাই হোক আমার interest

(স্বার্থ)। সব কাজে, সব কথার মধ্যে existential propitiousness (সাত্বত শুভ) থাকা চাই। এইরকম যদি প্রত্যেকে করে, তাহলে সব ঠিক হয়ে যায় এক ঠেলায়। এইতো আমি কই। আমি ওর জন্য করব, ও আমার জন্য করবে, এই পারস্পরিকতার ভিতর দিয়ে নেমে আসে স্বর্গ। স্বর্গ এসেছে সু-ঋজ্ ধাতু থেকে, মানে শুভ বা উত্তম যেখানে অর্জ্জিত হয়। স্বর্গ হ'ল সেখানেই। স্বর্গের bluff (ধাপ্পা) দিলে কিন্তু চলবে না। স্বর্গকে বাস্তবে বোধ করা চাই। আমরা ক্ষুধার জন্য খাই। আর, এ ক্ষুধা হ'ল বাঁচার ডাক। সেই ক্ষুধা যদি আমাদের কাছে সুধা না হ'য়ে ওঠে তাহলে বাঁচা হয় না। তাই আমি কই, আমি তো বাঁচতে চাই, ভাল থাকতে চাই, সুখে থাকতে চাই; কিন্তু আমার পরিবেশে যদি কেউ অসুখী থাকে তাহলে আমিও অসুখী হয়ে পড়ব। তাই, আমার সুস্থ থাকার জন্য আমার পরিবেশকেও সুস্থ রাখা লাগবে। আমাদের কনফারেন্সের mission (উদ্দেশ্য) যদি এই না হয় তাহলে সে কনফারেন্সের কোন মানে নেই। মাটি খেয়ে তো আমরা বাঁচি না। মাটি থেকে যা' জন্মে, তাকে বিহিতভাবে till (চাষ) ক'রে নিয়ে তাই খেয়ে বাঁচি। আমার বাঁচার রসদ পাওয়ার জন্যও আমাকে তথা আমার পরিবেশের সবাইকেই উপযুক্তভাবে till (কর্ষণ) করা লাগবে। আমাদের দরিদ্রতা কোথায়, অভাব কোথায়, কিভাবে আমরা বাঁচতে পারি, বাড়তে পারি, তা' জেনে নিয়ে বৈধী নিয়মে চলতে হবে। আর, যার যেমন দরকার, তাকে তা' দিতে হবে। কাউকে হয়তো এমন দিলে যে খেয়ে তার পেট ফুলে উঠল, অসুস্থ হয়ে পড়ল, তা' না। ততটুকু দিতে হবে যাতে সে আরো energetic (উদ্যমী) হয়ে উঠতে পারে। আমি তো invalid (অক্ষম) হ'য়ে পড়ে আছি। আমার প্রার্থনা, ওঁরা কি এই mission (আদর্শ) নেবেন না—যাতে আমরা বাঁচতে পারি, বাড়তে পারি? এঁরা সব মহাপ্রাণ। আর, মহাপ্রাণ মানে সব প্রাণেরই প্রাণ, Servant of all lives (প্রতিটি জীবনের সেবক)।

হরিনন্দনদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি হিন্দিতে অনুবাদ ক'রে ঐ দাদাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক চাইলেন। কালিদাসীমা তামাক সেজে এনে দিলেন।

তামাক খেতে খেতে শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহ নয়নে হরিনন্দনদার কথা শুনছেন এবং সবার অঙ্গে মাঝে-মাঝে স্নেহদৃষ্টি বুলিয়ে দিচ্ছেন।

তামাক খাওয়া হয়ে গেলে গামছায় হাতমুখ মুছে জিজ্ঞাসা করলেন পরম দয়াল—ওঁরা কোথায় খাবেন?

হরিনন্দনদা—টাউনে যেখানে উঠেছেন, সেখানেই খাবেন।

আবেগ-মাখানো অনুনয়ের সুরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওঁরা আবার আসবেন, যদি তোমাদের এখানে এসে ওঠেন—। অবশ্য এখানে থাকারও সুবিধা নেই, খাওয়ারও সুবিধা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বচনটুকুতে সত্তার এমনই স্পর্শ ছিল যে সবার অন্তর যেন দুলে উঠল। বৈদ্যনাথ ঝাঁ তাড়াতাড়ি দুইহাত জোড় ক'রে উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—হ্যাঁ, জরুর। সুবিধাকে লিয়ে we don't bother (আমরা ভাবি না)। যব্ উনকী কৃপা হো, তব্ আয়েঙ্গে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও ঐরকম দমের উপরে থাকতে ভাল লাগে। সুখেই থাকি আর দুঃখেই থাকি, এক জায়গায় থাকতেই ভাল লাগে।

হরিনন্দনদা—বাঁচতে-বাড়তে আমার কী কী করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঁচতে-বাড়তে হলে আমার সাত্বত চলনে চলা লাগবে। আবার, শুধু আমি বাঁচলেই চলবে না। আমার পরিবেশকেও ঐ চলনে চলার জন্য nurture (পোষণ) দেওয়া লাগবে। সংস্কৃতে একটা কথা আছে, 'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ'। কতকগুলি গরু খেলাম, মুরগী খেলাম, এতে কিন্তু আচার-পালন হল না। আহারটা compatible (সুসঙ্গত) হওয়া চাই—যা' আমার সত্তাপোষণী হবে।

হরিনন্দনদা—আমরা ঠিকটা জানলেও তো করি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভাল না। (উপস্থিত ভদ্রলোকদের একজনের মাথায় দীর্ঘ শিখা আছে। সেদিকে নির্দ্দেশ করে) ঐ যে শিখা আছে, ওর মানে existential flame (সাত্বত দীপ্তিশিখা)। শিখা হল emblem of ইষ্ট (ইষ্টের প্রতীকচিহ্ন)। তার থেকে ঐ শিখ। শিখা মানে কী রে?

অভিধান দেখে আমি বললাম—শিখা এসেছে শি-ধাতু থেকে, মানে তীক্ষ্ণীকরণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো! দেখ, তিনটি জিনিস আছে—নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ। নিষ্ঠা যেখানে, সেখানেই আনুগত্য; আর যেখানে আনুগত্য, সেখানেই থাকে কৃতিসম্বেগ। এই তিনটির বিহিত অনুশীলন যার জীবনে থাকে, সে ধীরে ধীরে হ'য়ে ওঠে বোধে-বিবেচনায় তীক্ষ্ণ। তাই হল তীক্ষ্ণীকরণ। ওতে যার distortion (বিকৃতি), তার সবতাতেই distortion (বিকৃতি)।

হরিনন্দনদা—এখন তো আর কেউ শিখা রাখতে চায় না।

রহস্যভরা সুরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা ভুল ক'রে ভালবেসেছি। (তারপর আবার সহজ দীপ্ত ভঙ্গিমায় বলছেন) আমাদের প্রত্যেকেরই duty (কর্ত্তব্য) হল যাতে মানুষের ভুল ভেঙ্গে যায়। আমরা শিখাই রাখি আর চন্দনই মাখি, এমন কিছু করা লাগবে যাতে আমরা সবাইকে নিয়ে সপারিপার্শ্বিক বেড়ে চলতে পারি। সবাইকে নিয়ে না বাড়লে কিন্তু হবে না। এসব কথা যাঁরা জেনেছেন, তাঁরা তো এখন old fool (বৃদ্ধ মূর্খ) হয়ে গেছেন। মরতে আমরা কেউই চাই না, সবাই বাঁচতে চাই। তাই, আমার চাহিদা হওয়া উচিত—ঠাকুর! তুমি থাক, চিরকাল থাক। আমি যেমন ক'রে পারি, তোমার কাছে থাকব, তোমার সেবা করব। এইতো আমার চাহিদা!

মুক্তি তো আমি চাই না। চাই—চিরদিন, অনন্তকাল ধরে তোমার slave (দাস) হয়ে থাকতে। সেইজন্য ধর্ম্ম মানেই হল ধারণ, পালন ও পোষণ করা।

আলোচনা জমে উঠেছে। আশপাশে অনেকে এসে বসেছেন। এইসময় সমাগত ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করতে লাগলেন।

প্রশ্ন—সগুণ ভক্তি ভাল না নির্গুণ ভক্তি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি সগুণ ভক্তিও চাই না, নির্গুণ ভক্তিও চাই না। আমি চাই তোমাকে (ইষ্টকে)। তুমি থাক, আমি চাই তোমার প্রতি ভক্তি, তোমাকে যেন ভজন করতে পারি ঐ হনুমানজীর মত। সেই ভক্তি যদি সগুণ হয়, হবে; যদি নির্গুণ হয়, তাই হোক। কিন্তু তুমি থাক। তুমি সগুণই হও আর নির্গুণই হও, দাঁড়াও আমার আঁখির আগে। চাই তাঁর প্রতি নিষ্ঠা। তার সাথে থাকা চাই পরাক্রম। পরাক্রমী নিষ্ঠা যত বাড়বে, আমরা তত sweet (মধুর) হব। নিষ্ঠাটা হল ইষ্টনিষ্ঠা। নিষ্ঠা হল ইঞ্জিন, আর আমার সমস্ত সত্তাটা যেন ট্রেন। একে চালায় ঐ নিষ্ঠা।

প্রশ্ন—এই cosmos-এর (ব্রহ্মাণ্ডের) purport (উদ্দেশ্য) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লীলা,—আলিঙ্গন আর গ্রহণ,—enjoy (উপভোগ) করা নানাভাবে।

প্রশ্ন—এর মধ্যে মানুষের place (স্থান) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবারই place (স্থান) যা' তাই,—বাঁচা, বাড়া, ভাল থাকা, ভাল রাখা। লীলা মানেই আলিঙ্গন-গ্রহণ। আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরলাম, তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরলে; আমি তোমাকে গ্রহণ করলাম, তুমিও আমাকে গ্রহণ করলে—এমনতরভাবে যাতে তাঁর পূজায় লাগতে পারি। যেমন, আমরা সবাই মিলে যদি একটা ফুলের তোড়া হই, তা' যেন তাঁর পূজায় লাগে। কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়ে কিছু করতে গেলে আর ঐ লীলা হবে না।

প্রশ্ন—পরমপিতা তো absolute (সম্পূর্ণ)। তাঁর তো কোন ইচ্ছা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই সবই তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না।

প্রশ্ন—ইচ্ছা কেন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ, to enjoy (উপভোগ করার জন্য)।

প্রশ্ন—এর behind-এ (পশ্চাতে) কি কোন invisible world (অদৃশ্য জগৎ) আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Behind-এ (পশ্চাতে) যা' আছে তাকে discern (আবিষ্কার) করা লাগবে। আর, যত তা' পারবে, তত আমার প্রতিটি অণু-পরমাণু দিয়ে তাঁকে enjoy (উপভোগ) করতে পারব। অবশ্য পণ্ডিত হবার জন্য এই চেষ্টা করতে গেলে চলবে না।

প্রশ্ন—সেই world-এও (জগতেও) কি আমাদের মত প্রাণী আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের মত বহু কিছু আছে। এই যেমন এখানে গরু আছে, সাপ আছে, গাছ আছে, এগুলির inner mechanism (অন্তঃস্থ গঠনকৌশল) কী তা' discern (বের) করা লাগবে। জানতে হবে, আমি এমন করি কেন? সাপটা অমন হল কেন? ইত্যাদি। আবার, এই সব জানার মধ্যে সঙ্গতি আনতে হবে পরমপিতাকে জানার জন্য। নতুবা, জানাগুলি হয়ে যাবে খাপছাড়া। আর, তাঁকে ভালবাসলে সব জানাই হয়ে ওঠে সার্থক সুসঙ্গত। তখন মানুষের জানার সীমানা বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

এবার ঐ ভদ্রলোকেরা প্রণাম ক'রে উঠলেন, বিদায় চাইলেন। দরদের সাথে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আবার যখন সুবিধা হবে, চলে আসবেন। এখানে কিন্তু কষ্ট আছে।

বৈদ্যনাথ ঝাঁ হাত জোড় ক'রে সবিনয়ে বললেন—জরুর আয়েঙ্গে, জরুর আয়েঙ্গে।

তারপর সবাই ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁদের গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ স্নেহভরা নয়নে তাকিয়ে থেকে স্নানে উঠলেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় সমাসীন। ভক্তবৃন্দ কাছে আছেন। যামিনীদা (রায়চৌধুরী) নিজের বিয়ের কথা তুললেন। বললেন—দুটি মেয়ে দেখেছি, একটি শ্রদ্ধাবান, আর একটি কালচারড্। এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি ভাল হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্, বুঝলে তো? শ্রদ্ধাবানই better (ভাল)।

এই সময় হরিনন্দনদা কয়েকটি দাদাকে সাথে ক'রে নিয়ে এলেন। সবাই প্রণাম ক'রে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জানতে চাইলেন ওঁরা কবে এসেছেন, কোথায় উঠেছেন, কতদিন থাকবেন, ইত্যাদি। হরিনন্দনদা একে একে সব উত্তর দিলেন।

তারপর দয়াল ঠাকুর হরিনন্দনদাকে বললেন—ভাইদের নিয়ে বসবে না? ওঁরা তো আবার চলে যাবেন। Invalid (অসমর্থ) হয়ে বসে আছি। আমার তো সেরকম ক্ষমতা নেই। নিষ্ঠার কথা বলো ওঁদের। বাবা বৈদ্যনাথ আছেন এখানে। বাড়ীতে বাবা-মা থাকলে তাঁদের সেবা-যত্ন করতে হয় তাঁরই প্রতীক-রূপে। শুধু কথায় তো পেট ভরে না। দুনিয়ায় বাঁচতে হলে করতে হবে।

সুধীরদা (চৌধুরী)—শ্রদ্ধাভক্তির কথা তো আমরা বহুকাল থেকে শুনে আসছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু শুনলে তো হবে না, করতে হবে। অনুশীলন চাই। মনে ক'রে দেখ তো, কতবার 'অ' বলা লেগেছে, কতবার 'A' বলতে হয়েছে। হয়তো বুঝতে পার নি, চড় খেয়েছ, কাঁদতে কাঁদতে চ'লে গেছ। আবার ধরে এনে বসিয়েছে। এইভাবে letter (অক্ষর) দিয়েই word (শব্দ) হয়। আর, এখানকার letter (অক্ষর) হচ্ছে ঐ করা—যা' চাই তেমনতরভাবে।

সুধীরদা—শ্রদ্ধাভক্তি জাগাবার কৌশল কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৌশল হ'ল করা, অনুশীলন করা—ঐরকম tendency (ঝোঁক) এবং attitude (মনোভাব) নিয়ে। যাঁরা যেমন করছেন, তাঁরা তেমন হচ্ছেন। আর, এই করার factor (উপাদান) হচ্ছে তিনটি—নিষ্ঠা, আনুগত্য এবং কৃতিসম্বেগ। ওর একটা যদি থাকে, সাথে সাথে আর দুটিও থাকে। নিষ্ঠা আছে, আনুগত্য নাই, তার মানে নিষ্ঠা নাই। আবার, নিষ্ঠা-আনুগত্য আছে, কৃতিসম্বেগ নাই, তার মানে নিষ্ঠা-আনুগত্য নাই।

কথা শেষ হতে সমাগত ভদ্রলোকেরা বিদায় প্রার্থনা করলেন। যুক্তকরে, স্মিতবদনে দয়াল ঠাকুর বললেন—আবার যখন সুবিধা হয়, আসবেন।

এই সময় শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) একটি দাদাকে এনে বললেন—এই দাদা মুঙ্গের থেকে এসেছেন, গেস্ট হাউসে উঠেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি দেখো, বলে দিও গেস্ট হাউসে সাবধানে থাকা লাগে। মাঝে মাঝে চোর-টোরও আসে।

শৈলেনদা দাদাটির সাথে কথা বলতে বলতে চলে গেলেন। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নৈহাটির মহাদেবদার (পোদ্দার) দিকে ফিরে বলছেন—তা' যামিনীর বিয়ে দিয়ে দেও। বিয়ে দিয়ে আমারে দুইখানা গাড়ী কিনে দেও, একখানা 'পিক্-আপ্' আর একখানা 'স্টেশন ওয়াগন', যেন অন্ততঃ ১৬ জন লোক carry (বহন) করতে পারে।

(যামিনীদার দিকে তাকিয়ে রহস্যভরে) বোঝ্‌লা! শুধু বিয়ে করলে হবে নানে, আমারও বিয়ে দেওয়া লাগবে নে। (অনিল গাঙ্গুলীদাকে নির্দ্দেশ করে) ঐ অনিল ৫ খানা স্টেশন ওয়াগন দেবে। সেগুলিতে মালও ধরে, আবার ১৬ জন ক'রে লোকও নেওয়া যায়। ও ছাওয়ালকে পাঠায়ে দেছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি ক'রে টাকা দিতে না পারলে হবে নানে।

অনিলদা—ও যাওয়ার পরে ২০০ টাকা পেয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালই। কিন্তু তুমি আরো লিখে লিখে দাও। কী করতে হবে না হবে সব জানাও।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর খারাপ বোধ করতে থাকেন। উঠে একবার পায়খানায় গেলেন। তারপর হলঘরের ভিতরে এসে বসলেন। আজ বিকালে দেওয়া দুটি ছড়া তাঁকে শোনাবার দরকার ছিল। এইসময় তাই খাতা নিয়ে কাছে গেলাম। তাঁর শ্রীমুখের দিকে তাকাতেই মনে হল শরীরে এখনও অস্বস্তি বোধ করছেন, চোখ দুটিতে ক্লান্তির আবেশ। তাই, খাতা খুলেও আবার বন্ধ ক'রে উঠে আসছিলাম। সেদিকে নজর পড়তেই দয়াল প্রভু বললেন—ক' না ক্যা—কী?

বললাম—শরীরটা ভাল দেখাচ্ছে না, পরে বলব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল না, তাহলেও কাজ সেরে ফেলাই ভাল। ক', এখনই তো জল খাব নে, তামাক খাব নে।

ছড়াগুলি এক এক ক'রে পড়লাম। ভাষার সামান্য অসুবিধা ছিল, তিনি নিজেই সব ঠিক ক'রে দিলেন।

রাত ৮টা। দেওঘরের ডাকুবাবু এলেন। চেয়ার দেওয়া হ'ল, বসলেন। বসে বললেন—আমার ছেলে আর জামাইকে যদি শরৎবাবু বা প্রফুল্লবাবু একটু পড়িয়ে দেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা তো এখানে সব সময় থাকে না!

ডাকুবাবু—কেউ থাকেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কখনও এ থাকে না, কখনও ও থাকে না। কখনও বা দু'জনেই থাকে না। বরং এখানে-থাকা মানুষ আছে হরিনন্দন আর তার ছেলে, ওদের বললে হয়। আর, শরৎদা যখন এখানে থাকে তখন হয়তো পারে। তাহলে তাকে ডাক্, আমি ক'য়ে দিই।

শৈলেনদা—ওয়েস্ট-এন্ডে রবীন্দ্র-জয়ন্তী হচ্ছে, শরৎদা সেখানে সভাপতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে থাক্, সভা ত্যাগ ক'রে আসা ভাল না, পরে হবে। (ডাকুবাবুকে) আপনিও দেখা হলে বলবেন, আমি বলে দেব।

'আচ্ছা' বলে ডাকুবাবু বিদায় নিলেন।

২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৭, সোমবার (ইং ৯। ৫। ১৯৬০)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর জানতে চাইছিলেন উপনয়ন-সংস্কারের যোগ্য নয় কারা। এ সম্বন্ধে কোথায় ঠিকমত পাওয়া যাবে ভাবছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরই বলে দিলেন—মনুসংহিতা দেখলে হয়।

তদনুযায়ী মনুসংহিতা এনে খুঁজতে থাকি। ১০ম অধ্যায়ে কয়েকটি শ্লোক পাওয়া গেল এই সম্বন্ধে। সেগুলির বঙ্গানুবাদ পড়ে শোনালাম শ্রীশ্রীঠাকুরকে।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পারিজাত রায় তাঁর ৪ জন ছাত্র সহ এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে। এঁরা সকলেই সৎনামে দীক্ষিত। সন্ধ্যার পর সবাই এসে বসেছেন প্রভুর পদতলে—হল্‌ঘরে। তা'ছাড়া উপস্থিত আছেন শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্লদা (দাস), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ।

প্রফুল্লদা কথা বলছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে। প্রশ্ন করলেন—মানুষের আত্মোপলব্ধি কী ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মোপলব্ধি মানে কী বুঝিস তো? আত্মার মধ্যে অত্ আছে। অত্-ধাতু মানে নিরন্তর চলন। সেই অত্-উপলব্ধি হলেই আত্মোপলব্ধি হয়।

প্রফুল্লদা—অত্-উপলব্ধি মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যে তুই একটু আগেই ক'লি, সবার সাথেই একটা যোগ আছে মনে হয়! হাত বাড়ায়ে দিছিস্ সবার জন্য। ঐ হল conceptive connotation (ধৃতিশক্তিসঞ্জাত মূল কথা)।

প্রফুল্লদা—সবসময় মনে হয়, যতখানি আনন্দ, জ্ঞান, বোধ হওয়া দরকার তা' হচ্ছে না। একটা আকুলি-বিকুলি সবসময় লেগে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আকুলি-বিকুলির sensation (বোধ) যদি যায় তাহলে তুমি তো থেমেই যাবে। ও থাকাই তো ভাল—আরো, আরো, আরো। থেমে গেলে তুমিও থেমে যাবে নে।

প্রফুল্লদা—কিন্তু একটা কষ্ট চলতেই থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাগল! আমি তো বুঝতে পারি নে যে খিদে লাগলে কষ্ট থাকবে না। খিদে লাগলে কষ্টটা ধরে নিয়েই এগোনো লাগে।

প্রফুল্লদা—Eternally (নিরন্তরভাবে) কি মানুষের এরকম চলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যত eternal (অনন্ত) হতে চায়, তত এই চলে। আবার, শুধু ঐটুকুতে হয় না। সাথে সাথে চাই feeling, knowing and willing (বোধ, জ্ঞান এবং এষণা)। কার সাথে কার কী সম্বন্ধ বা সম্বন্ধ নেই কতটুকু, তাও জানতে হবে। ফল কথা, কী বাদ দেবে, কী ধরবে, কোন্‌টা তোমার কাছে existentially propitious (সাত্বত শুভ), কোন্‌টা তা' নয়, কিভাবে ঐ বোধগুলি বাড়াতে পার তা' করতে হবে। আর, যত করবে, ততই বেড়ে যাবে। ঐ যে রবি ঠাকুরের কী কথা আছে 'ধাও শুধু ধাও—'।

তারপর আর স্মরণ করতে পারছেন না শ্রীশ্রীঠাকুর। নিখিলদা (ঘোষ) তাড়াতাড়ি 'বলাকা' কবিতাটি এনে ঐ অংশটুকু পড়ে শোনালেন। তারপর প্রফুল্লদা আবার জিজ্ঞাসা করছেন—আচ্ছা, সমাধি হলে মানুষের কেমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন কিছুতে absorb (অভিনিবিষ্ট) হয়ে তাকে বোধ করা, তাকে conceive করা (বোধে আনা)। ঐরকম করতে করতে যখন সেই বিষয়ের সাথে একটা একায়িত ভাব হয়, তখন আরো বেড়ে যায়। সমাধি achieve করার (প্রাপ্ত হওয়ার) উদ্দেশ্য নিয়ে চলা ভাল না। ওতে ভাবালুতা আসবে। কিছু বুঝতে পারবে

না। Education-এর (শিক্ষার) fundamental (গোড়ার) কথাই হল পরাক্রমী নিষ্ঠা, আনুগত্য আর কৃতিসম্বেগ। এর একটা থাকলেই আর একটা থাকে। আর, এ যাদের থাকে, সেই সব মানুষের মধ্যে normally (স্বাভাবিকভাবেই) থাকে ক্লেশসুখপ্রিয়তা। করতে পারলেই আরাম। আমাদের প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা লাগবে ঐটা achieve (অর্জ্জন) করার জন্য। ঐটা হল মানুষের existential device (সাত্বত পথ)। সেইজন্য education (শিক্ষা) হল কোন্ জায়গায় কোথা দিয়ে কী করা লাগবে তা' হাতেকলমে জানা। আগে ছিল এগুলি শ্রুতি, মানে শুনে শুনে শিখত, জানত। শ্রুতির থেকে এল স্মৃতি। স্মৃতি মানে memorize (মুখস্থ) করা। ক'রে কেমন ক'রে আরো কী কী করা লাগবে তার বুদ্ধি বের করত। আমার এখানে যেমন হয় আর কি! এই দেখ না, এখানে কত রকমের মানুষ আসে, কত কথা কয়, তুমিই তো উত্তর দাও। কী ক'রে দাও? তুমি কি পড়েছ কোথাও? ঐ হ'ল conceptive (ধৃতিশক্তির) সঙ্গতি। ওটা তোমার আছে, তাই পার।

প্রফুল্লদা—মানুষের একটা স্বাভাবিক চাহিদাই হল সবসময় আনন্দে মগ্ন থাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আনন্দের মধ্যে নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ, তিনটিই আছে। এই তিনটি যখন একমুখী হয়ে চলে, সেতারের বাজনার মতন, তখন মানুষ আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। আবার আনন্দ এসেছে নন্দ্-ধাতু থেকে। নন্দ্-এর মধ্যে আছে কম্পন, to and fro motion (দোলায়মান গতি), একটা ঢেউয়ের মতন। সেই ঢেউ যদি না থাকত, তাহলে তুমি তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে যেতে।

প্রফুল্লদা—ঢেউ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Expansion, Contraction আর Stagnation (প্রসারণ, সঙ্কোচন আর বিরমণ)। (বলেই আপন মনে বলছেন) এসব আমার সেকালের কথা। কেষ্টদা আসা পর্য্যন্ত ঐসব কথা বলতাম। কোন্টাকে কী বলে, জানি নে তো! ভাবতাম, ভাবটা কোনরকমে প্রকাশ করতে পারলে হয়।

প্রফুল্ল—ঐ to and fro motion (দোলায়মান গতি) দিয়ে যে আনন্দের কথা বললেন, তা' কিন্তু ভাল ক'রে বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাকে তুমি ভালবাস, যাকে মনে ক'রে তোমার আনন্দ হয়, তার জন্য তোমার একটা anxiety (উদ্বেগ) থাকে। ধর, তোমার ছাওয়ালকে তুমি জান, ভালই পরীক্ষা দেবে। অথচ ভাবছ তার শরীরটা, মেজাজটা ঠিক থাকে কিনা! একবার ভাবছ কী হয়, আবার পরক্ষণেই নিজেকে ঠিক ক'রে নিচ্ছ, ভাবছ—না, ও সেরকম ছাওয়ালই না, সব ঠিক রাখবে। এইরকম একবার একদিক, একবার ওদিক হতে থাকে।

নিখিলদা—একটু চিন্তা-ভাবনা না থাকলে তো মানুষ পাগল হয়ে যাবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাগল কি! একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাবে। সেইজন্য কারো ভাল করতে হলে তার মন্দ যাতে না হয় তাই ক'রো। তা' না করলে ভালটা affected (ক্ষতিগ্রস্ত) হবে। আমাদের মধ্যে যেমন ভালর চাহিদা আছে, তেমনি মন্দটা যাতে resisted (প্রতিহত) হয় তারও চাহিদা আছে। এই দুটির মধ্যে সাম্য বজায় রেখে চলতে হবে। ঐ যে কী আছে—'সমত্বং যোগ উচ্যতে'।

প্রফুল্লদা—তাহলে দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় এলে কিরকম হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় যেই দাঁড়ায়, তখন মানুষ অজ্ঞানের মত হয়ে যায়। ঐ যে অপারেশন করার সময় গ্যাস দিয়ে অজ্ঞান করে, খানিকটা ঐরকম। কিন্তু সে দ্বন্দ্বাতীতের মত pose (ভঙ্গি) করতে চায় না। Normally (স্বাভাবিকভাবে) যা' আসার আসে। কত কথা আসে। হয়তো লেখার সময় বা কথা কওয়ার সময় কত কী উঁকি দিয়ে যায়। ঐ হ'ল সমাধি-অবস্থা। সেখানে বাহ্যতঃ অচেতনের মতো দেখলেও ভিতরে কিন্তু সে মহাচৈতন্যে সমাসীন। অনেকে সমাধি লাভ করার উদ্দেশ্য নিয়েই সাধনা করতে আরম্ভ করে। তা' ঠিক না। আমি তোমাদের কখনও অমনতর করতে কইনি।

প্রফুল্লদা—মানুষ যে আনন্দমগ্ন থাকে, সমাধি তো তারই অঙ্গ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে যা' বলেছি, ঐরকম করতে করতেই সব-কিছু আসে। সাথে থাকে activity (ক্রিয়াশীলতা)। সাধনা মানে আমি যা' সাধব, সেটাকে নিষ্পাদন করা, তার জন্য চেষ্টা করা। ঐ যে গানের মধ্যে আছে চরণে শরণ নেওয়ার কথা। চরণ মানে আমি বুঝি চলন।

প্রফুল্লদা—যে-আনন্দের সম্ভাব্যতা আমাদের আছে, আমরা যেন তার অনেক lower level-এ (নীচু স্তরে) বিচরণ করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোরা লেখাপড়া জানা মানুষ। Lower-higher (নীচু-উঁচু) বুঝিস। আমি যা' বুঝতাম, তা' ধরতাম এবং করতাম। ধ্যান মানে—এ অর্থটা আমিই বের করি—একটা বস্তুতে নিরন্তর চিন্তাপ্রবাহ। সেই বিষয়ে কখন কী করব তা' ঠিক করা। তোমার ছেলের সম্বন্ধে যদি তুমি পুত্রগতপ্রাণ হও তাহলে এরকমটা বুঝতে পার,—যেমন অনেক মেয়েলোকের মধ্যে থাকে। সেখানেও ঐ নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ তিনটি জিনিস ক্রিয়া করছে। ছাওয়াল বাদ দেও, তোমার বৌয়ের কথাই ধর। সে-তোমাকে ক'ল, 'কর্ত্তা, আজ তিনদিন ধরে কচ্ছি আমাকে তিনখানা পাউরুটি এনে দেবার জন্য; তা' কেউ দিল না।' তখন তুমি ক'চ্ছ, 'এ্যাঁ, দেয় নি? সে কিরকম! দাঁড়াও, আমি এনে দিচ্ছি।' এই অবস্থা normally (স্বাভাবিকভাবে) হয়ে থাকে। (ক্ষণেক নীরবতার পর) একটা গান আছে—'সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে গো,

পড়ে মনে।' সে-মুখ শুধু অলসভাবে মনে পড়লে চলবে না। তার জন্য actively (সক্রিয়ভাবে) ভাবা, বলা ও করা চাই।

শৈলেনদা—ধ্যান বলতে তো আমরা fixation-এর (কেবল ইষ্টমূর্ত্তি চিন্তা করার) কথা বলি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Fixation (আড়ষ্টভাবে শুধু ইষ্টমূর্ত্তি চিন্তা) ধ্যান নয়কো। আমি আগে যখন দীক্ষা দিতাম, বলতাম, তোমার গুরু আছেন, তাঁর জন্য তুমি কতখানি কী করতে পার, ভাব। ঐভাবে ভাবা ও করাই ধ্যান। ধ্যানের কথা আমি বহুরকমে কইছি। ছোট্ট কথা এই। যেমন তুমি হয়তো তোমার বাবার কথা চিন্তা কর। তখন actively think (সক্রিয়ভাবে চিন্তা) কর তাঁর জন্য তুমি কী করতে পার। ঐ হ'ল তাঁর সম্বন্ধে ধ্যান।

শৈলেনদা—ধ্যানের মধ্যে কি চক্রধ্যান থাকবেই না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা আগে ছিল না। ঐ যে ছিল 'ভূতের রাজা'! (যাদুকর পি সি সরকারকে শ্রীশ্রীঠাকুর আদর করে 'ভূতের রাজা' বলেন কারণ, তিনি ভূতের খেলা দেখিয়েছিলেন স্টেজে)। সে আশ্রমে (পাবনায়) এসেছিল। তখন light-reflection (আলোর প্রতিফলন) নিয়ে কথা বলতে বলতে সে বলেছিল, 'তন্ত্রে অনেক রকম যন্ত্রের কথা আছে। ঐরকম যন্ত্রে ধ্যান অভ্যাস করলে মনঃসংযোগের সুবিধা হয়। সেখানে অনেক ছেলেপেলে ছিল, তারাও ধরল।

শৈলেনদা—ছেলেপেলে মানে কারা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ হরেন গাঙ্গুলী, নিবারণ বাগচী, এই সব। ওরা বলল, হ্যাঁ, এইরকম একটা করলে হয়। তাতে ধ্যান ভাল হবে। তখন ঐ একটা-সাদা একটা-কালো ক'রে ষোড়শদল চক্রের idea-টা (পরিকল্পনাটা) দিলাম। তখন থেকেই ওটা শুরু হ'ল। কিন্তু আমি নিজে ওরকম কোন যন্ত্রে ধ্যান করিনি কোনদিন। (কিছু পরে) কিরকম একটা normal conception (স্বাভাবিক ধারণা) হয়ে গেছে যে fixation-ই (আড়ষ্টভাবে ইষ্টমূর্ত্তি চিন্তাই) ধ্যান। Fixation-এ (আড়ষ্ট হয়ে শুধু ইষ্টমূর্ত্তি চিন্তা করতে থাকলে) মানুষ dull (ভোঁতা) হয়ে যায়। আমি যখন তাঁকে চিন্তা করি, মানে তদ্বিষয়ক চিন্তা করি, তখন ভাবতে হবে, আমি কতখানি কী করতে পারি তাঁর জন্য। এতে activity-ও (কর্ম্মসম্বেগও) বাড়ে, আনুগত্যও বাড়ে, নিষ্ঠাও বাড়ে।

এইসময় শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক চাইলেন। সরোজিনীমা তামাক সেজে এনে দিলেন। প্রভু তামাকু সেবন করছেন। গড়গড়ার নলের ভিতর থেকে উত্থিত মৃদুমধুর গুড়গুড় ধ্বনি ছাড়া সারা ঘর নিস্তব্ধ। প্রতিপ্রত্যেকের ভক্তি-আপ্লুত দৃষ্টি ভূতমহেশ্বরের ভূতভাবন তনুতে নিবদ্ধ।

ইতিমধ্যে হরিনন্দনদা (প্রসাদ) হায়দরাবাদের দাদাদের নিয়ে এসে বসেছেন। ঘরের ভিতরে ও বাইরের বারান্দায় প্রচুর মানুষ। সবাই তন্ময় হয়ে পান ক'রে চলেছেন এই অমিয় কথানির্ঝর।

তামাক খাওয়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর গড়গড়ার নলটি রেখে গামছা দিয়ে মুখ মুছে গামছাটি একপাশে রাখলেন। তারপর আবার আলোচনা শুরু হল।

প্রফুল্লদা—ইষ্টের প্রতি টানের জন্য ব্যক্তিগত শান্তি-লাভেরও দরকার আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্ট ও ইষ্টস্বার্থে যখন মানুষ keen (তীক্ষ্ণ) হয়, তখন তার ব্যক্তিত্বটাও active (সক্রিয়) হয়ে ওঠে। তোমার ছাওয়ালের সম্বন্ধেই keenly interested (তীব্র আগ্রহান্বিত) হয়ে দেখো তো কেমন হয়! এই interest (অন্তরাস) যখন আর থাকে না, dull (ভোঁতা) হয়ে যায়, তখনই মানুষ তার থেকে তফাৎ হয়ে পড়ে, শান্তি থাকে না। শান্তি আমরা কাকে কই! আমার অন্তঃকরণে ব্যথা না লাগে এমনতর একটা অবস্থা হলেই তখন শান্তি পাই। তোমরা ছাওয়ালের ভাল খবরটা পেলে ভাল লাগে। যেই সংবাদ পেলে তার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, অমনি মনটা অশান্ত হয়ে উঠল। কি জানি কেমন থাকে। আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধেও অমনি হয়। শান্তি মানে কী?

প্রফুল্লদা—শান্তি শম্-ধাতু থেকে, মানে উপরতি, বিরাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি শান্তি মানে উপরতি বা বিরাম নয়। মনের যখন একটা equilibrium অর্থাৎ সমতা বা সাম্য অবস্থা আসে, তখনই শান্তি আসে।

এর পর আপন মনে দয়াল বলছেন—লেখাপড়া না জেনেই আমার ভাল হয়েছে। তা' না হলে কী জঙ্গলের মধ্যে যে ঢুকে পড়তাম তা' আর কওয়ার না। (একটু থেমে বলছেন) একটা গান আছে—'লোকের কথা নিস্ নে কানে, ফিরিস্ নে আর হাজার টানে' (বলে হাসছেন)।

ইছাপুর (২৪ পরগণা) থেকে কিরণদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) এসেছেন। ভক্তবৃন্দের ভিতরে বসেছিলেন। এখন প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা যোগের মধ্যে চিত্তবৃত্তি-নিরোধের কথা আছে। সেটা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন আমি তোমার কথা ভাবছি। তোমার জন্য কী কী করা যায় ভাবছি। তোমার affair-ই (বিষয়ই) চিন্তা করছি। প্রিয়ের উপর টান হলে যেমন হয় আর কি! ধর, একটা লেমনেড্ খাওয়াব তোমাকে। তখন ভাবছি সেটা ভালভাবে তৈরি কিনা। এরকম হতে থাকে সব ব্যাপারেই।

পারিজাত রায় (অধ্যাপক) আগেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বলেছিলেন তাঁর কিছু প্রশ্ন আছে। এখন শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই পারিজাত! কী জিজ্ঞাসা করবি, এই সময় ক'। ঐ তো প্রফুল্ল আছে।

পারিজাতদার হাতে 'আলোচনা-প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড' বইখানা ছিল। সেই বই খুলে একটি জায়গা বের ক'রে বললেন—আপনি এখানে বলেছেন, গন্ধ-শব্দ এগুলিও culture (অনুশীলন) করলে higher (উচ্চস্তরের) হতে পারে। সেটা কেমন?

পাশের কোলবালিশটা দক্ষিণ চরণের নীচে টেনে নিয়ে একটু আরাম ক'রে বসে, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে দয়াল ঠাকুর বললেন,—ভাল কথা। তুই ক'লি অনেকদিন পরে। এই ধর, শব্দ আছে, তার তরঙ্গ আছে। তুমি লেবরেটরিতে পরীক্ষা কর শব্দের সাথে তার তরঙ্গের কী সম্পর্ক, তারপর বের কর কিভাবে সেটা react (ক্রিয়া) করে জীবনের উপর। ধর, একটা কুকুর মরে গেছে। শব্দতরঙ্গ সঞ্চারিত ক'রে সেটাকে তুমি বাঁচাতে পার কিনা! একটা ইঁদুর নিয়েই না হয় পরীক্ষা কর। আমি যে তেলাপোকার গল্প করি। মরা তেলাপোকা। তার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে gaze (একদৃষ্টিতে তাকিয়ে নামজপ-করণ) করতে করতে ঠিক হেঁটে চলে গেল। শুধু তেলাপোকা না, গুবরে পোকা দিয়েও দেখেছি। সেটাও মরা। সেটার দিকে তাকিয়ে নাম করতে করতে ঘণ্টাতিনেক পরে পা নাড়তে লাগল। কিন্তু কিসে যেন তার body-র (শরীরের) খানিকটা খেয়ে ফেলেছিল। মাথার দিকটা বোধ হয় ঠিক ছিল। তাই সেটুকু work ক'রে (সক্রিয় হয়ে) উঠল। শুধু এইই নয়। পাবনায় যেখানে বড় বৌ-এর বাড়ী হয়েছিল, ঐখানে আমি পায়খানায় যেতাম। ওখানে অনেক আকন্দগাছ ছিল। একদিন পায়খানায় বসে নাম করতে করতে একটা আকন্দগাছে হাত দিতেই গাছটা কেঁপে উঠল। আবার দেখ, আমেরিকার বিজ্ঞানীরা নাকি একটা শব্দ বের করেছে—'হিস', সেই শব্দে ঘরবাড়ী কেঁপে ওঠে, একটা 'বেবী'-ও মরে যেতে পারে। এ সবই কিন্তু vibration-এর (স্পন্দনের) ক্রিয়া, vital wave (জীবনীয় তরঙ্গ)। তুমি এইগুলি নিয়ে কাজ আরম্ভ কর। দেখো, করতে করতে একদিন ঠিক ফকাৎ ক'রে মিলে যাবে, ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

পারিজাতদা—আপনি যে 'ভাইট্যাল্ ওয়েভ্' বললেন—

এইখানেই কথা থামিয়ে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুমি আগেই ও-নাম কও কেন? ওটা আমার বোধ-অনুযায়ী বললাম। তুমি Scientist (বিজ্ঞানী), experiment (পরীক্ষা) ক'রে বের কর কী হতে পারে! ওটাকে instrument (সহায়) ধরে নিয়ে এগোও। তোমার off-time-এই (অবসর সময়েই) তুমি আরম্ভ করতে পার। এই কাজ দেখে দু'একজন হয়তো তোমাকে পাগল বলতে পারে, তাতে ঘাবড়ে যেও না। ......আর গন্ধের ব্যাপারটা কিরকম? আমার আগে যেমন হত। ব্যাহ্যতঃ কারণ কিছু নেই। অথচ কখনও সুগন্ধ, কখনও বা দুর্গন্ধ পাচ্ছি। তার মানে এই mechanism-এর (শরীর-যন্ত্রের) ভিতরেই ওরকম হওয়ার মত একটা কিছু আছে; অর্থাৎ আমার নার্ভগুলি ঐভাবে excited (উত্তেজিত) হচ্ছিল, তাই ঐ জাতীয় গন্ধ

পাচ্ছিলাম। এইরকম শব্দেরও নানারকম তাল আছে, rhyme (ছন্দ) আছে। সেগুলি ধ'রে নিয়ে তুমি এগোতে পার। আশ্রমে গোপাল (মুখোপাধ্যায়) আর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এগুলি আরম্ভ করেছিল। সে মরে যাওয়ার পর কেষ্টদা recede (পশ্চাদপসরণ) করল। আর হ'ল না। এই কাজের জন্য আমি গ্যাল্ভানাইজ্ড মিটার করেছিলাম। অবশ্য তাতে বেশি এগোনো যায় না। একটা push (প্রেরণা) পাওয়া যায় মাত্র।

প্রফুল্লদা—এরকম শোনা যায় যে শুধু একটা বাজনা শুনেই একজনের ব্যারাম সেরে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের life flow (জীবন-প্রবাহ) যেটা, সেটা যখনই affected (ক্ষতিগ্রস্ত) হয় তখনই ব্যারাম হয়। যেমন, আমাদের শ্লেষ্মা হয় কখন! শরীরের মধ্যে যেটা লেগে থাকা দরকার, তা' লেগে না থেকে বাইরে চ'লে গেল, তখনই শ্লেষ্মা হয়। শ্লেষ্মা মানে কী দ্যাখ্ তো!

দেখা হল শ্লেষ্মা শব্দটি এসেছে শ্লিষ্-ধাতু থেকে, মানে আলিঙ্গন, লেগে থাকা।

পারিজাতদা—আমাদের নামের কি একটা definite frequency (নির্দ্দিষ্ট হার) আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছে, যেভাবে করলে পরে নামটা সহজভাবে ভিতরে হতে থাকে।

শরৎদা (হালদার)—আপনি এক জায়গায় বলেছেন, sound vibrating within itself (অন্তঃস্পন্দমান শব্দধ্বনি)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ অনামী নাম, যা' অভ্যাস করতে থাকলে ধীরে-ধীরে আমাকে ঐ তালে নিয়ে যায়। আমাদের ভেতরে যে life flow (জীবনী শক্তির প্রবাহ) আছে, সেটা যদি ধরতে পারা যায়, দেখা যাবে সেখানেও আছে একটা নির্দ্দিষ্ট তাল। এই তাল বা ছন্দ না থাকলে সব ভেঙেচুরে একশা হয়ে যেত। হ্রীং-ক্লীং সবই আছে ওর মধ্যে। ওগুলি দিয়েই 'রা' হয়, 'ধা' হয়, আর হয় to and fro motion (দোলায়মান গতি)। এই হল mechanism (আভ্যন্তরীণ গঠনকৌশল)। আবার আর একটা ধরেন, এই যেমন ওঁ শব্দ আছে। ওটা কিরকম? এই কোয়াড়ে ঘুড়ি দেখেছেন। বিরাট ঘুড়ি। যখন প্রথম ওড়ানো হয় তখন র্-র্-র্-র্ শব্দ হতে থাকে। বাতাসে ভর ক'রে যত উপরে উঠতে থাকে তত ওঁয়া-ওঁয়া শব্দ করে। তারপর দূরে আকাশের মধ্যে যখন উড়তে থাকে, তখন শুধু ওঁ-ওঁ-ওঁ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। নাম অভ্যাস করতে করতেও এইভাবে একটার পর একটা আসতে থাকে, কিন্তু এই সব কিছুর মূলে হল, প্রতি point-এ point-এ (বিন্দুতে বিন্দুতে) থাকা চাই নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ।

শরৎদা—অনেকের ধারণা, ইষ্টভৃতি ঠাকুরের একটা আয়ের পথ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার উপর টান হয়, তার জন্য করা আপনা থেকেই আসে। ধরেন, আপনার ছেলে হয়েছে। বৌ ক'চ্ছে, ছেলের জন্য দুধ যোগাড় করতে হবে। তখন দুপুর রোদে ঘটি হাতে করে বেরোলেন, কোথা থেকে দুধ নিয়েও এলেন, কেন এটা করলেন? আপনি তো বলতে পারতেন, 'মাগী! তুইই তো ছাওয়াল বিয়োইছিস্! আমি দুধ জোগাব ক্যা?' এই কথা ক'য়ে বাপ যদি সরে দাঁড়ায় তাহলে ছাওয়াল তো অক্কা পাবে। আর, আয়ের পন্থা কচ্ছেন! যদি কওয়া যায়, মা মাগী ছাওয়াল বিয়োয়ে একটা আয়ের পথ ক'রে নেছে, তাহলে কেমন হয়?

পারিজাতদা—তাহলে টান এলেই তো সব কিছু হয়ে গেল!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে পাগল! বুঝিস্ নে? ছাওয়াল তোর, কিন্তু হইছে তোর বৌর পেটে। তোর পেটে ব্যথাও হয়নি, রক্তারক্তিও হয়নি। কিন্তু ঘরের মধ্যে থেকে তোর বৌ চেঁচাচ্ছে। ঐ চেঁচানিই তোকে কান ধরে নিয়ে যেয়ে দুধ এনে দেবে নে। আবার হয়তো ছাওয়ালের পেট খারাপ করেছে, তখন ভাবছ, 'কী করব! যাই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ঐ বিশুর কাছে।' তারপর সেখানে যেয়ে ওষুধ এনে দিলে। এত সব কর কেন? মূলে আছে ঐ বৌর উপর টান, ছেলের উপর টান—সেই নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ। আর, তার সাথে আছে volition (উদ্যম)।

পারিজাতদা—এ সবই তো existence (অস্তিত্ব) বজায় রাখার জন্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Existence-এর (অস্তিত্বের) দুটি factor (উপাদান)—একটা বাঁচা, আর একটা সমীচীনভাবে বাড়া। সমীচীন ক'লেম কেন? তার মানে, আমি এমনভাবে বাড়তে চাই নে যাতে আমার বাঁচাটা ব্যাহত হতে পারে। থাকাটাকে বজায় রাখার জন্য পরিবেশকেও সেইভাবে adjust (নিয়ন্ত্রিত) করা দরকার। কারণ, আমরা বাঁচি পরিবেশের compassion-এর (অনুকম্পার) ভিতর দিয়ে। তোমার পরিবেশের মানুষগুলির উপর তুমি যেমন compassionate (অনুকম্পী), এরাও তোমার উপর তেমন। পারস্পরিক এই করা এবং বোধ ছাড়া আমরা বাঁচতেই পারি না। বাপ-মা আমাদের জীবনের prime factor (প্রধান অবলম্বন)। তাঁদের উপর ভক্তি রেখে সবাইকে adjust (নিয়ন্ত্রিত) করব—পশুপক্ষী, পরিবার, পরিজন, সব যা-কিছুকে। আর, সব সময় দেখব, তারা কি ক'রে সুখী থাকে, বেঁচে থাকে! এই যে বনে যাওয়ার একটা কথা আছে। আমি ও বুঝি না। একটা cell-এ (কুঠুরিতে) একা থাকলেই যদি মানুষ পাগল হয়ে যায়, তাহলে বনে গেলেও তা' হয়। বাঁচতে হলে মানুষের পরিবেশ চাই-ই। আমার চাহিদা কী? আমি বেঁচে থাকব, সবাইকে নিয়ে বেঁচে থাকব। এর মধ্য দিয়ে উপভোগ করব আমার পরমপুরুষকে। এমনতর হয়ে উঠলে তুমি scientist (বৈজ্ঞানিক) হওয়ার প্রথম ধাপে আসবে।

পারিজাতদা—এ করলে কি পরমপুরুষ আমাকে shelter (আশ্রয়) দেবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(সস্নেহ ভর্ৎসনার সুরে) পাগল—! পরমপুরুষ মানে the best fulfiller (সর্ব্বোত্তম পরিপূরক)। এই প্রফুল্ল! ইষ্টভৃতি সম্বন্ধে রবি ঠাকুরের কথাগুলি পারিজাতকে শোনালে হয়।

প্রফুল্লদা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শান্তিনিকেতন' বইটা নিয়ে এলেন এবং সেখান থেকে 'ত্যাগের ফল' প্রবন্ধটা পড়ে শোনালেন। শোনার পরে পারিজাতদা প্রশ্ন করলেন—ইষ্টভৃতি করলে আমরা অনেক আপদ থেকে যে রক্ষা পাই, সেটা কি আমাদের ভেতরের intuition (প্রজ্ঞা) জাগ্রত হওয়ার জন্য, না বাইরের কোন factor (ব্যাপার) আছে এর মধ্যে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভেতরে হয় বলে বাইরেও তার ক্রিয়া দেখা যায়। অনুরাগসহ ইষ্টভৃতি করলে energetic volition (উদ্যমী ইচ্ছাশক্তি) জাগে, আসে discerning capacity (নির্ব্বাচনী দক্ষতা)। তখন তুমি একটা বিষয় টক ক'রে ধরে ফেলতে পার, কী দিয়ে কী হতে পারে তার মরকোচটা তোমার বোধের মধ্যে এসে যায়। কিন্তু ঐরকমটা পাওয়ার বুদ্ধি ক'রে ইষ্টভৃতি করতে যেও না। ছেলেকে যেমন ক'রে খাওয়াও, তেমন টান নিয়ে ইষ্টভৃতি করতে হয়।

পারিজাতদা—কিন্তু ঠিকমত ইষ্টভৃতি ক'রে হয়তো কেউ কোথাও কোথাও ভুল ক'রে ফেলছে, এমনও তো হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক জায়গায় পারল, আর এক জায়গায় পারল না কেন, সেটা তুমি বের কর। তুমি তো scientist (বিজ্ঞানী)। তোমার উপরেই ওটা থাক্।

পারিজাতদা—আপনি যদি কারণটা বলে দেন—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ, প্রফুল্ল যদি তোমার সব অঙ্ক কষে দেয়, তুমি কি তাতে কখনও অঙ্ক শিখতে পারবে? আমার কথাও তাই। তুমি অনুসন্ধান ক'রে বের কর। তাতে তোমার জানাটা হবে, তোমার intelligence (বোধ) বাড়বে। Pupil (ছাত্র) মানেই ঐরকম হওয়া। তখনকার দিনের ছাত্ররা গুরুর কাছে থাকত, তাঁর নির্দ্দেশ মেনে চলত। যে education-এর (শিক্ষার) কথাই ধর না কেন, সবার মূলেই আছে পরাক্রমী ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ।

পারিজাতদা—আচ্ছা, resist no evil (অন্যায়ের প্রতিরোধ ক'রো না) মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ তোমার উপর অত্যাচার করলেও তুমি তার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তোমার সাথে যদি কেউ খারাপ ব্যবহার করে, তোমাকে শালা বলে, You do justice to him (তার প্রতি ন্যায়-বিচার কর)। তাকে কও, 'আমার ত্রুটি হয়েছে। আমি ঠিকমত ব্যবহার করতে পারিনি।' এইভাবে তার আগুনে জল

ঢেলে দাও। দেখবে, তার স্বর থেমে গেছে। এইরকম করতে করতে ভালবাসাও ছিটিয়ে যায়। তোমার নিজের বেলায় এইরকম কর। কিন্তু তোমার সামনে হয়তো কেউ কিরণকে বা হরিনন্দনকে মারছে, সেখানে evil-কে resist (অসৎকে প্রতিহত) করব না, এ আমি বুঝি না। Resist no evil (অসৎকে প্রতিরোধ ক'রো না) মানে এ নয় যে, অন্যের উপর অত্যাচার হচ্ছে সেটা resist (প্রতিহত) করব না। প্রফুল্লর উপর যদি কেউ অত্যাচার করে, সেখানে তুমি protest (প্রতিবাদ) কর, বজ্রকঠোর হয়ে দাঁড়াও। এই আমার কথা।

প্রায় দুই ঘণ্টা হল শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলে চলেছেন। আরও বেশি কথা বললে তাঁর কষ্ট হতে পারে মনে ক'রে কেউ কেউ উঠে পড়লেন। সাথে সাথে সবাই উঠলেন।

২৭শে বৈশাখ, ১৩৬৭, মঙ্গলবার (ইং ১০। ৫। ১৯৬০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের হল ঘরে সমাসীন। একটু আগে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন ক'রে এসে বসেছেন। শরীর ভাল বোধ করছেন না। বলছেন—মাথা কিরকম ভার-ভার লাগে, পেটেও হাগা-হাগা ভাব লেগেই আছে।

কলকাতা থেকে মদনদা (দাস) আজ সকালে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য একটি ইলেকট্রিক্ ফ্যান এবং দাড়ি কামাবার অন্যান্য সরঞ্জাম এনেছেন। কিছু পরে তিনি এসে আজ দুপুরে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, যখন ইচ্ছা হয় যেও। তবে গোঁয়ারের মত যেও না। যেমন ক'রে যাওয়া লাগে, সেইভাবে যেও।

বেলা ৮টার পর কেষ্টদা (ভট্টচার্য্য) এসে বসলেন। শব্দ ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Word (শব্দ)-গুলি সৃষ্টি হয়েছে feeling (বোধ) থেকে। আবার, philology (ভাষাতত্ত্ব) শুধু history of words (শব্দের ইতিহাস) নয়, history of nation also (জাতিরও ইতিহাস)।

কেষ্টদা—আজকাল আমাদের রান্নার নামগুলিতেও মোগলাই নাম ছাড়া সংস্কৃত নাম আর খুঁজে পাওয়ার উপায় নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য আমি কইছিলাম না, নলের পাকপ্রণালী দেখে আপনি একটা পাকপ্রণালী লেখেন। লিখে ঐ নামগুলি বের ক'রে দেন।

মুর্শিদাবাদের মহেশপুরের ছোট রাজার ছেলে গত কাল এখানে এসে দীক্ষা নিয়েছেন। ওঁকে নিয়ে এসেছেন জগজ্জোতিদা (চট্টোপাধ্যায়)। একটু পরে ওঁরা দু'জন এসে বসলেন। নানারকম শরিকী গোলমাল ও মামলা-মোকদ্দমায় ঐ ভদ্রলোক বিষয়সম্পত্তি প্রায় সব হারিয়েছেন। এখন খুব কষ্টে চলছেন। সেই সব কথা উনি শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে নিবেদন করছেন।

সব শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর আশাভরা তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন—সম্পত্তি গেছে, তা' ভাবিস ক্যা? তুই প্রস্তুত থাক্ সবাইকে service (সেবা) দিতে—সে ভিক্ষা ক'রেই পারিস আর যেভাবেই পারিস। এর জন্য কিছু নিস্ না। কেউ যদি কিছু দেয় তো নিবি। আর ঐ তিনটে জিনিস ঠিক রাখবি—পরাক্রমী নিষ্ঠা, আনুগত্য আর কৃতিসম্বেগ। 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?' তোর যে বংশে জন্ম, তার instinct-ই (সংস্কারই) আলাদা। এটা করলে দেখিস্ কী হয়।

উক্ত দাদা—ছেলেপেলের কথা চিন্তা হয়। ভাবি কিভাবে মানুষ করব!

শ্রীশ্রীঠাকুর—চিন্তা করিস ক্যা? চিন্তা করাই করার অন্তরায়। কাম ক'রে যা। কী বিরাট field (ক্ষেত্র)!

'বিশ্বের লোক ঘরে ডেকে এনে তুমি পালাইবে নাকি!' তোর land (জমি) নেই। কিন্তু যা' বললাম সেইভাবে যদি করতে পারিস সবাইকে exalt (উদ্দীপ্ত) ক'রে, তাহলে তুই land (জমি) না থেকেও রাজা। যা' বললাম এইভাবে চল্। মানুষের কথা শুনে এদিক-ওদিক যাস নে। সব কিছু তোর ইষ্টের সাথে মিলিয়ে দেখবি। যেটা মেলে সেইটা নিবি। ভাবিস ক্যা? শরীরটা ঠিক রাখবি। তোকে দেখতে শুকনো হলেও তোর মনে strength (জোর) আছে। আচার ঠিক রেখে চলবি। মনে রাখিস 'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ।' (ক্ষণেক নীরবতার পর) তোর খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

উক্ত দাদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কখন খাওয়া-দাওয়া করবি নি? (জগজ্জ্যোতিদাকে) এরপর কখন খাওয়াবিনি? বেলা একটার সময়?

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা বুঝে ওঁরা প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন। ঘরে লোক কম। শরৎদা (হালদার) সামনে বসে আছেন। তাঁকে বলছেন দয়াল ঠাকুর—সমস্ত education-এর (শিক্ষার) মূল point (বিষয়) ঐ তিনটা—পরাক্রমী নিষ্ঠা, আনুগত্য এবং কৃতিসম্বেগ। তিনটা মানেই একটা। নিষ্ঠা থাকলেই আর দুটো আপনা থেকেই আসে। এগুলি খুব বুদ্ধি ক'রে impart (সঞ্চারিত) করবেন। মনে রাখবেন, উদাহরণ কিন্তু উপদেশের চাইতে বড়। এইরকম ক'রে, বেশী ক'রে কচ্ছি ১০০ জনের মধ্যে যদি ৫ জনও বার করতে পারেন, তাহলে কাম বাগায়ে ফেলতে পারেন।

এই সময় অরুণ (গাঙ্গুলী) এসে প্রণাম ক'রে বসল। তার কাছে বেনারস থেকে আগত ভাইদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন প্রভু—পারিজাত ওদের তো দেখলাম না আজ।

অরুণ—আসার কথা ছিল। এখনও তো এলো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(শরৎদাকে) ছড়াগুলি দেখছেন তো?

শরৎদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক ক'রে দিচ্ছেন তো?

শরৎদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কঠিন হয়েছে?

শরৎদা—না, খুব কঠিন হয়নি। তবে ভাবের দিকে জায়গায়-জায়গায় একটু কঠিন হয়েছে। চলা, চেনা আর বোঝা, এরই বিভিন্ন aspect (দিক) নিয়ে লেখা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই ঐ complex-এর (প্রবৃত্তির) গাঁট ছাড়াবার কথা। এগুলির punctuation-ও (যতিচিহ্নও) ঠিক ক'রে দেবেন।

শরৎদা—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাগুলি পড়ে নিজে বোঝেন তো? ঠিক ধরা যাচ্ছে?

শরৎদা—যেটা প্রথমবারে ধরা যায় না, দু'একবার পড়লেই তা' বোঝা যায়। সেও খুব কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Principle (মূল নীতি)-গুলি মাথায় ধরে তো?

শরৎদা—হ্যাঁ। কিন্তু জন্মগত সংস্কার যদি শুভ না হয় তাহলে—

কথার সূত্র ধরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মুশকিল।

শরৎদা—শুনল, বুঝল, কিন্তু করতে পারে না।

এর পরেই শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিলেন—

অবধান নিয়ে চলিস্ ওরে
অবহিত হয়ে চলিস্,
সাবধান হয়ে চল্ ওরে তুই
সাবধান হয়ে চলিস্,
ফাঁকা বোধে কাজ কি রে তোর?
বুঝে-সুঝে পা ফেলিস,
ভালমন্দের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে
যেমন ঠিক তা' করিস।

এইসময় বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পারিজাতদা (রায়) তাঁর ছাত্রদের নিয়ে এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। ওদের সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একরকম মানুষ আছে, অনেক বড় বড় কথা কয়, সক্রেটিসের কথা, অমুকের কথা, তমুকের কথা কয়। অথচ তাকে যদি এক পোয়া মুগের ডাল এনে দিতে বলা হয় তাহলেই সে গেছে।

মানুষের জন্ম ও বৈধ বিবাহের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকে কয়, যে-কোন পুরুষকে যে-কোন মেয়ে বিয়ে করতে পারবে, তাতে দোষ কী! কিন্তু ব্যাপারটা একটু তলায়ে দেখলে হয়। জন্মটা তো আচমকা আকাশ থেকে হয়নি। তুই জন্মেছিস, তার আগে জন্মেছে তোর বাপ, তার আগে তোর ঠাকুর্দ্দা। তারও বাপ ছিল, তারও বাপ ছিল। এইরকম ধারাই চ'লে আসছে। তারপর তোরও আবার মেয়ে আছে। Sperm-এর (শুক্রকীটের) মধ্যে male sperm (পুং শুক্রকীট) আছে, female sperm-ও (স্ত্রী শুক্রকীটও) আছে। একটা static (স্থাস্নু), আর একটা dynamic (চরিষ্ণু)। ঐ female sperm (স্ত্রী শুক্রকীট) থেকে তোর মেয়ে হল। তাই, সে কিন্তু তোরই একটা part (অংশ)। সে ova-র (ডিম্বকোষের) মধ্যে যেয়ে থাকে, বাড়ে। তার মানে, তুই-ই ওর মধ্যে যেয়ে বাড়ছিস। সেখানে cell-division (কোষ-বিভাজন) হতে থাকে। হতে হতে centrosome (প্রাণন-তারকা) মাথায় ক'রে সে বেড়ে চলে। তোর idea (ভাব) যেভাবে imparted (সঞ্চারিত) হল, মেয়েটার জন্মও হল সেই রকম নিয়ে। সেইজন্য মেয়েকে তার পিতৃধারায় cultured (শিক্ষিত) ক'রে দেওয়া দরকার। মনে রেখো, বি-এ, এম-এ পাশ করলেই cultured (শিক্ষিত) হল না। কুলকৃষ্টির অনুশীলন চাই। আগে আমাদের কুলাচার ছিল। তার similar clanship (সদৃশ বংশ) দেখে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিত। তুমি যদি তা' না কর, তাহলে তোমার মেয়ের মধ্যে যে ধারাটা ছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেল। ঐ life (জীবনধারা) আর থাকল না। তোমার seed-এর (বীজের) suicide (আত্মহনন) হ'ল। এমনভাবে মানুষকে বুঝায়ে দিতে পারিস নে? পাগল! ডাকাতে কাণ্ড সব! এমন মানুষ কি কেউ আছে, যে ডান-বাম বোঝে না? তোমাকে যদি কেউ aconite (একপ্রকার তীব্র বিষ) খাওয়াতে আসে, তুমি কি খাবে? সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করবে —'ওরে বাবারে বাবা! আমাকে aconite (একপ্রকার তীব্র বিষ) খাওয়াতে এসেছে। দে, পুলিসে খবর দে।'

পারিজাতদা—জন্মান্তরবাদের উপরেই যদি সব নির্ভর করে, তাহলে আমাদের আর করার কী আছে?

আবেগভরে বললেন দয়াল ঠাকুর—ওরে শালা পাগল! ওরে শালা বেকুব! ওরে শালা অবোধ! একটা জন্ম তার পূর্ব্ব জন্মের beads of intelligence (বোধমালা) নিয়ে আসছে। এক জায়গায় একটা লোক মরল, পরে আর এক জায়গায় জন্মে সে কয়, "আমার নাম হরি সিং। অমুক জায়গায় আমার বাক্সে অত টাকা আছে।" খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, তার কথা ঠিক। এর থেকে বোঝা যায়, জন্মান্তরবাদ আছে। কিন্তু ঐসব কথা ভেবে যদি অলস হয়ে বসে থাকি, ইষ্টকৃষ্টির যথাবিহিত অনুশীলন না করি, তাহলে আমারও সর্ব্বনাশ করলাম, অন্যেরও সর্ব্বনাশ করলাম। আর, তাতে তোমার ভিতর ভাল probability (সম্ভাব্যতা) যা' ছিল তা' আর বাড়তে

পারবে না। সেইজন্য আমি কই, তুমি ঠিক থাক। করণীয় যা' সব ঠিকমত কর। তোমার ব্যক্তিত্ব নিয়ে তুমি জন্মেছ। বিহিত অনুশীলনের ভিতর দিয়ে এমনতর হয়ে ওঠ যাতে সমস্ত world-কে (পৃথিবীকে) তুমি ঐভাবে convince (প্রত্যয়দীপ্ত) করাতে পার।

পারিজাতদা—কিন্তু তা' তো পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ জায়গায় তো তুমি কাবু! কারণ, তুমি নিষ্ঠা, কৃষ্টি মান নি, তোমার tradition (ঐতিহ্য) ঠিক রাখ নি। (সম্প্রতি ব্রিটিশ রাজকুমারী মার্গারেটের বিবাহ হয়েছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঐ বিবাহের ছবি ও বিশদ বিবরণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখানো ও পড়িয়ে শোনানো হয়। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে বলছেন—) এই দেখ না, এই যে মার্গারেটের বিয়ে হল, ওরা কতখানি tradition (ঐতিহ্য) ঠিক রেখে চলে। বিয়েতে তোমাদেরই মত হাত বেঁধেছে, আংটি পরেছে। মনে হয়, ওদের সাথে তোমাদের stock-এ (মূল ধারায়) মিল আছে। আবার একটা কথা শুনে আশ্চর্য্য হলাম। ওদের মধ্যে নাকি vegetarian (নিরামিষাশী) বাড়ছে, আর divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) কমে যাচ্ছে। এটা ডেনমার্কেই প্রথম আরম্ভ হয়েছে।

পারিজাতদা—কিন্তু যারা বিয়েতে ঐরকম গোলমাল ক'রে বসে আছে, তাদের বাঁচাবার কি কোন উপায় নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেরকম পণ্ডিত লোক থাকলে হয়তো back cross (পশ্চাদ-অপসারণী বিবাহ-সংযোগ) ক'রে ক'রে কিছু বাঁচাতে পারে। কিন্তু প্রতিলোম-সংযোগ খুব বেশী হয়ে পড়লে আর তা' সম্ভব হয় না। ধর, তোমার পাঁচটা মেয়ে আছে। একটা ডোমের সাথে দিলে, একটা মেথরের সাথে, একটা মুচির সাথে, এইভাবে বিয়ে দিলে। এখন, তারা যদি minister-ও (মন্ত্রীও) হয় তাহলেও তোমার cuture-tradition-এর (কৃষ্টি-ঐতিহ্যের) কথা শুনবেও না, বুঝতেও চাইবে না। আমাদের traditional traits (ঐতিহ্যগত ধারা) যা' ছিল সেগুলি অশোকের সময় ভেঙ্গে গেল। তখন মুসলমান আসার পথ হ'ল। যত Buddhist (বৌদ্ধ) ছিল, তারাও অনেকে মুসলমান হয়ে গেল। এইভাবে tradition (ঐতিহ্যধারা) ভেঙ্গে দিয়ে আমরা এমন আকাম করেছি যে আমাদের ব্যক্তিত্ব বলে আর কিছু নেই।

পারিজাতদা—আমাদের এই devolution-এর (অধঃপতনের) উপর আমাদের কোন হাত নেই।

গর্জ্জন ক'রে উঠলেন পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর—হাত আছে। আমরাই ওটা ভাঙলাম। ধৃতিকে, ধর্ম্মকে বাদ দিলাম। তাই এই অবস্থা। এখনও যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাই নিয়ে আবার যদি উঠে পড়ে লাগি তাহলে আবার বেড়ে উঠতে পারি। (তারপর সমাগত ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করছেন) তোরা জেনেটিক্স্' পড়িস নি?

জনৈক ছাত্র—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোরা কী পড়িস?

উক্ত ভাই—ফিজিকস, কেমিস্ট্রি, ম্যাথেমেটিকস, জিওলজি এইসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-ও ভাল। ওর থেকেও মাথা খাটায়ে খাটায়ে ঢের জিনিস বের ক'রে নেওয়া যায়।

অরুণ—আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকরা এই তথ্যগুলি স্বীকার করে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা করি না। কিন্তু আমেরিকা, জার্ম্মানী, ইংল্যান্ড এরা মানে। বিয়ে-থাওয়ার গোলমাল করার জন্য তোমাদের zeal (উদ্দীপনা) অনেক কমে গেছে। এখনও উদ্ধারের উপায় আছে। করলে হয়।

পারিজাতদা—এই 'অকাম' কেন হল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ passionate enticement (প্রবৃত্তির প্রলোভন)। Existence-এর (সত্তার) উপর কোন লোভ নেই। আমি এখনই যদি আমার একটা মেয়েকে প্রতিলোমে বিয়ে দিতে পারি, তাহলে হয়তো 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি পেয়ে যাব। যায় যাক, একটা মেয়ে যাবে। আমার তো নাম হবে। এই যেমন, কত পুরুষ ধরে আমার উপাধি চক্রবর্ত্তী চলছে। আজ হয়তো বিশেষ কোন প্রলোভনে পড়ে টক্ ক'রে আমার ঐ উপাধি পালটায়ে দিলাম। তার মানে হ'ল, পূর্ব্বপুরুষের উপর আমার নিষ্ঠা নেই।

পারিজাতদা—এখন mass mind-ই (মানুষের মনই) ঐরকম হয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Mass (মানুষ) এভাবে চলল কখন? যখন মনীষীরা বৈশিষ্ট্যকে লঙ্ঘন ক'রে বিজাতীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে হাতে-কলমে এগুলি করতে আরম্ভ করে দিলেন, বর্ণাশ্রম ভেঙ্গে দিলেন। এই যে casteless society (শ্রেণীহীন সমাজ) করার কথা কয়, caste মানে কী জানিস তো?

পারিজাতদা—Caste মানে তো জাত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Caste এসেছে castus থেকে, মানে pure (বিশুদ্ধ)। Caste বলে, তোমার group-এর (শ্রেণীর) মধ্যে তুমি pure (বিশুদ্ধ) থাক, ক্ষত্রিয় তার group-এ (শ্রেণীতে) pure (বিশুদ্ধ) থাকুক, এইরকম সব। বৈশিষ্ট্যগত গুণপণা যেন কিছুতেই নষ্ট বা দুষ্ট না হয়। Caste-এর মধ্যে যে এতখানি আছে তা' কেউ বুঝতে চায় না, তলিয়েও দেখে না। আমাদের অবস্থা হয়েছে কেমন? সেই যে,

> 'মূর্খ তুমি, মাটি কাটি লভি কোহিনূর
> ফেলিয়া সে রত্ন হায়,
> কে ঘরে ফিরিয়া যায়
> বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর।'

মাটি কেটে সারা গায়ে মাটি মেখে আসল রত্নটি ফেলে দিয়ে ঘরে ফিরে চললাম। (পরে হাসতে হাসতে বলছেন) আমার মুখ্যু হয়েই মুশকিল হয়েছে। একটু যদি লেখাপড়া জানতাম তাহলে অনেক কিছু করতে পারতাম।

পারিজাতদা—স্কুল-কলেজে পড়ে আর কতটুকু জ্ঞান হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ধর, তোমাদের যতটুকু বিদ্যে আছে, আমার যদি তা' থাকত, তাহলে তোমাদের মধ্যে যেয়ে যদি তোমাদের মত কথা বলতে পারতাম, তখন তুমি আমাকে বলতে—(হাত দিয়ে সেলাম দেবার ভঙ্গী করে) সেলাম সাহেব, সেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার ঢং দেখে সবাই খুব হাসছেন। আবার শান্তভাবে বলছেন দয়াল ঠাকুর—আশুতোষ মুখার্জী কইছিল লাটসাহেবেকে, 'বিলাত যাওয়ার কথা ভালই, কিন্তু আমার মা চাইবেন না। আমি যাব না।' তাই শুনে সাহেব আশুতোষকে বিলাত পাঠাবার কথা আর উচ্চারণও করল না।

অরুণ—তাহলে আমাদের এখন কী করা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এতক্ষণ তো সেই পচালই পাড়তিছি।

পারিজাতদা—আমার ছাত্রদের তো বলে বলেও পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি জন্য পারলে না তা' ভাবা লাগে।

পারিজাতদা—আমাদের limitation (সীমিত বোধ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(মৃদু ধমকের সুরে) আবার কয় limitation (সীমিত বোধ)! এতকাল ধরে জানলাম আমরা Unlimited-এর (অসীমের) সন্তান। শোন্, চাই কী জানিস? শ্রম, তপস্যা, সাধনা। সাধনা হল সাধ্-ধাতু, মানে নিষ্পাদন করা। ক'রে চল্। ওরে ঘাবড়াস ক্যা? তোর সাধনায় যদি একটা মানুষও তৈরি ক'রে রেখে যেতে পারিস তাহলেও অনেক—অনেক! ঐ কনফুসিয়াস-এর কথা আমার খুব ভাল লাগে। ঐ যে ওঁর ছবি রেখেছি। (ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো কন্‌ফুসিয়াস-এর ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে দেখালেন) ওঁর ছাত্রদের মধ্যে করনেওয়ালা ছিল অনেক, বলনেওয়ালা কম। কয়েকটা ছাত্র নিয়ে train (শিক্ষিত) করতে করতে এমন যোগ্য ক'রে তুললেন যে তখনকার চীনের ministry-র (মন্ত্রিসভার) নানা responsible post (দায়িত্বশীল পদ) তাদেরই দেওয়া হল।

পারিজাতদা—একজনকে নিয়ে চেষ্টা করতে করতে যখন সে পারে না তখন depression (অবসাদ) এসে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' বললে তো হবে না। পাত্রকে বড় করাই চাই। কারণ, সে তোমার ছাত্র। কেমন ক'রে পারা যায়?—through behaviour, affection, feeling, interest and love (ব্যবহার, দরদ, বোধ, অন্তরাস এবং ভালবাসার ভিতর দিয়ে)।

পারিজাতদা—আমি স্ট্যাটিসটিক্স নিয়ে এম-এস-সি পড়তে চাই। কিন্তু finance permit করে না (টাকায় কুলোয় না)।

উদ্দীপনী প্রেরণা-সঞ্চারী কণ্ঠে বললেন পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই ঘাবড়াস ক্যা? ছাড়বি ক্যা? চাকরি কর্। চাকরি করতে করতে টাকার জোগাড় কর্। তারপর ফাঁকমত পরীক্ষা দিয়ে নিবি।

পারিজাতদা—টাইম-এ যদি না কুলায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে ওরই allied (সদৃশ) একটা subject-এ (বিষয়ে) এম-এ হয়ে নে। তারপর ফাঁকমত এটা দিয়ে দিবি। এইভাবে ডবল এম-এ হয়ে গেলে।

পারিজাতদা—তাতে better chance (ভাল সুযোগ) পাব না। কারণ, আমার age-limit (বয়ঃসীমা) থাকবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরো better (ভাল) পেতে পার।

পারিজাতদা চিন্তান্বিত মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। সাহস দিয়ে তাকে বললেন প্রভু—ভাবিস ক্যা? মনে রাখবি, 'মারি অরি পারি যে কৌশলে।'

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় সমাসীন। সুশীলদা (বসু), প্রফুল্লদা (দাস) প্রমুখ আছেন। এঁদের সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—Cause and effect-সহ (কার্য্যকারণ-সহ) factual description (বাস্তব তথ্যের বিবরণ) যেটা, তাই-ই হল science বা philosophy (বিজ্ঞান বা দর্শন) যাই কও।

বেনারস থেকে আগত ভাইদের সঙ্গে আজ সকালে বর্ণ ও জন্ম নিয়ে যেসব আলোচনা হয়েছিল, তা' শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে বললেন। তারপর ঐ প্রসঙ্গে বলছেন—ফজলি আর ন্যাংড়া আমের গাছ যদি কাছাকাছিও লাগানো যায়, এর pollen (পরাগ) কিন্তু ও নেয় না। হয়তো ব্যতিক্রম হতে পারে। কিন্তু পরস্পরের tendency (প্রবণতা) হ'ল না-নেওয়া। Caste-এর root (ধাতু) হল castus, মানে pure (পবিত্র)। এই purity (পবিত্রতা) যদি যার যার group-এর (শ্রেণীর) মধ্যে না থাকে তাহলে বৈশিষ্ট্যহারা হয়ে নিকেশ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

এরপর শৈলেনদা প্রশ্ন করলেন—রবীন্দ্রনাথ যে লিখলেন 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী', এই যে কিছুই নহ, তার মানে এটা তো mystic (ধোঁয়াটে) রকম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বরং ঐ কয়েই তো mysticism (ধোঁয়াটে রকম) ভেঙে দিলেন। বলছেন, একটা নারী—সে মাতাও নয়, বধূও নয়, কন্যাও নয়, female as a female (নারী সে শুধু নারীই)। উর্ব্বশী মানে কী দ্যাখ্ তো!

শৈলেনদা অভিধান দেখে এসে বললেন—লেখা আছে, যিনি উরু অর্থাৎ মহৎকে রূপ দ্বারা বশীভূত করতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাটা তো উরু-বশী, মহৎকে যিনি বশ করতে পারেন। তার মধ্যে আবার রূপ এল কোথা থেকে? আমার লেখার মধ্যে mystic (অস্পষ্ট) কিছু নাই তো?

শৈলেনদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ক'রে দেখিস্। প্রথম অনুশ্রুতির থেকেই দেখা লাগে। অবশ্য এগুলি দেখ্ আগে, তারপর ওগুলিও দেখিস্।

ইতিমধ্যে পূজ্যপাদ বড়দা এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে বলছেন দয়াল ঠাকুর—আমার কিন্তু হাগা-হাগা ভাব লেগেই আছে। ও বড় খোকা! আজ রাতে চিড়ে খাব নাকি?

বড়দা—চিড়ে খেলে তো পেট কষে যাবে নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাগা-হাগা ভাবটা বন্ধ হবে। কিন্তু পেট কষে গেলে আবার ভাল হয় কিনা!

এরপর, পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতের ভোগ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য শ্রীশ্রীবড়মার কাছে গেলেন।

ধীরে ধীরে বেলা পড়ে এল। আবহাওয়া এখনও বেশ উত্তপ্ত। গোটা প্রাঙ্গণে জল ছিটিয়ে দেওয়া হ'ল। ফলে, প্রাঙ্গণটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। উঠানের সজনে গাছটির উত্তরদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রশস্ত চৌকিতে শয্যা প্রস্তুত করা হয়েছে, আর দক্ষিণদিকে আর একখানা ছোট চৌকিতে শ্রীশ্রীবড়মার শয্যা প্রস্তুত। সন্ধ্যার পরে তিনি সেখানে এসে শয়ন করলেন। পাশে থেকে দু'একজন মশা তাড়াচ্ছেন। শান্ত সমাহিত আশ্রম-প্রাঙ্গণ। পশ্চিমাকাশের গোধূলির আভাটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর প্রস্তুত-করা শয্যায় এসে উপবেশন করলেন। ভক্তবৃন্দও এসে বসছেন তাঁর সন্নিধানে। কিরণদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) বললেন—আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সোহাগভরে ডাক দিলেন—আয়, আয়, এদিকে আয়।

কিরণদা কাছে এগিয়ে এসে বললেন—আমরা যে ভাত খাওয়ার আগে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই পঞ্চদেবতাকে ভাত দিই, এর significance (তাৎপর্য্য) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও ছাড়া পঞ্চবায়ুর ব্যাপারও আছে ওর মধ্যে। তুই আগে ঐ কথাগুলোর মানে দেখে আয়।

নিখিলদা (ঘোষ) কাছে ছিলেন। তিনি কিরণদাকে নিয়ে উঠে গেলেন ডিক্শনারি দেখার জন্য। কলকাতার মদনদার (দাস) আজ দুপুরে যাওয়ার কথা ছিল, যেতে

পারেন নি। এখন এসে বলছেন রাতে যাবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে আরো কিছু জিনিস আনার দায়িত্ব দিয়েছেন। তাই, এখন অনুমতি দিয়ে বলছেন—যা, কিন্তু কালই আসতে চেষ্টা করবি।

মদনদা—যদি পারি তাই-ই চেষ্টা করব, কাজ যদি হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি চাই দেরিও হবে না, কাজও হবে।

মদনদা—আপনার দয়ায় যেখানেই যাই, পরিচয় তো সর্ব্বত্রই।

মদনদার অন্তরে দিব্য উদ্দীপনার সঞ্চার ক'রে, উপস্থিত ভক্তবৃন্দের দিকে তাকিয়ে বললেন দয়াল ঠাকুর—যাকে একবার ও ছুঁয়েছে, সে চেনে, হ্যাঁ—মদনবাবু!

উপস্থিত সকলেই উপভোগ করছেন পরম দয়ালের এই স্নেহমাখা প্রেরণা-সঞ্চারী অভিব্যক্তি। কিছু পরে অধ্যাপক ও গবেষক পারিজাতদা (রায়) এসে বসলেন। সস্নেহে ডাক দিলেন পরম দয়াল—পারিজাত নাকি রে?

পারিজাতদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারিজাত মানে কী জানিস্ তো?

পারিজাতদা—স্বর্গের নন্দনকাননের একরকম ফুল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারিজাত মানে পারগতা থেকে জাত। কোন কাজ successful (কৃতকার্য্য) হলে আনন্দ হয়। আর, সেই আনন্দ-পুষ্প নন্দন-কাননেই থাকে।

এই সময় কিরণদা ডিক্‌শনারি দেখে ফিরে এলেন, বললেন—দেখলাম পঞ্চদেবতা আর পঞ্চবায়ু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই লিখে দিয়ে যা।

কিরণদা—দুটি কপি ক'রে এনেছি। একটি দিয়ে যাব। এইরকম আছে (বলে লিখিত কাগজটি পড়তে লাগলেন)—নাগ উদ্গীরণ-কর বায়ুবিশেষ। ন-অগ। অগ্-ধাতু-বক্রগতি। কূর্ম্ম হল বাহ্যবায়ুবিশেষ। কু-ধাতু মানে শব্দ, আর উর্ম্মি মানে বেগ, কৃকর হজমের সহায়কারী বায়ু। দেবদত্ত জৃম্ভণকর বায়ুবিশেষ। আর, ধনঞ্জয় পোষণকর বায়ু।

আর, পঞ্চপ্রাণের প্রথমে হ'ল প্রাণ, মানে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ। তারপর অপান, মানে গুহ্য বা অধঃ-বায়ু। সমান নাড়ীদেহস্থ বায়ুবিশেষ। উদান হল ঊর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠস্থ উৎক্রমণ-বায়ু। সর্বশেষে হল ব্যান। ব্যান মানে সর্ব্বশরীরগ প্রাণধারণ-সাধন বায়ু।

সবটুকু শোনার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাহলে খেতে বসে আমরা এইগুলি বুঝে ঠিকমত উচ্চারণ করব with their functional attributes (তাদের ক্রিয়াশীল

গুণবৈশিষ্ট্য-সহ)। এইভাবে চিন্তা না ক'রে কেবল উচ্চারণ ক'রে গেলে, তাতে ওগুলি তোমার কাছে সতাৎপর্য্যে ফুটে উঠবে না।

এর পরে ছড়া দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

সদ্-বিভবে এগুতে হলেই
এগিয়ে যাওয়ার বাড়া বল,
সুবিন্যাসে নিরোধ ক'রে
পেছটানের যা' বাধা সকল।

ছড়াটি শুনে পারিজাতদা বলছেন—কিন্তু আমরা অনেক সময় ক'রে উঠতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে অনেকটা impotent (নির্ব্বীর্য্য) হয়ে আছ। কর, সৎ-এর দিকে এগোও। এতদিনকার না-করা জমে আছে, সেইজন্য এখন regular habit (নিয়মিত অভ্যাস) করতে হবে। আর, সেটা খুব forceful (জোরালো) হওয়া চাই। তীব্র সম্বেগ ছাড়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না। ঐ যে তখন তুই আমার কথাগুলো শুনতে শুনতে বললি, 'আমি এ করতে রাজি আছি।' আমার কথা হল—রাজি আছি না, negative (না-সূচক) না। I must do, I must be successful (আমি করবই, আমি কৃতকার্য্য হবই)। তুমি তো ইউনিভার্সিটিতে আছ। তোমার অনেক সুবিধে।

পারিজাতদা—আপনার কাছে বসে কথাগুলি যখন শুনি, ভাল লাগে। বাইরে গেলেই বিরুদ্ধ সংঘাতে প'ড়ে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে পাগল! সে তো বিরোধী আছেই। আরো বিরোধী আছে তোমার ভিতরে। বিরোধের এত জঙ্গল যে তা' আর কওয়ার না। এই বিরোধগুলিকে ঠিকমত জানতে হবে, চিনতে হবে। আর, এগুলিকে overcome (ব্যতিক্রম) ক'রে তোমার favourable (অনুকূল) ক'রে তুলতেই হবে।

পারিজাতদা—মনে হয়, ঐ বিরোধের মধ্যে না গিয়ে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এখানে পড়ে থাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, তোমার energetic volition (উদ্যমী এষণা) অতখানি কম।

পারিজাতদা—কিভাবে কী করব, কোন্ দিক দিয়ে এগোব, ঠাওর পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই মহাভারতটাই ধর না কেন! ওটা আমাদের traditional guide (ঐতিহ্য-সংক্রান্ত পথনির্দ্দেশক)। ঐ যে এক ভদ্রলোক (মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ) বহু বছর পরিশ্রম ক'রে মহাভারতের একটা সংস্করণ বের করেছেন। কেষ্টদার কাছে এক কপি আছে। ওর মধ্যে কল্পনা, প্রবাদ, অনেক কিছু আছে। এই

মহাভারতের একটা কপি যদি তোর থাকে, তাহলে ঐসবের এক-একটা ধরে যদি খোসা ছাড়িয়ে আসল তথ্যটাকে বের ক'রে ফেলতে পারিস্, বিরাট কাণ্ড হয়! এই যেমন, তখন মার্কণ্ডেয় ঋষির বয়স নাকি দশ হাজার বছর, অথচ তাঁকে দেখতে নাকি ২৭/২৮ বছরের মত। এ ব্যাপারটা কী বের করতে হয়। আবার তখন শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম—বেঁচেছিলেন ৮০/৮২ বছর। এসব সংক্রান্ত যত query (জিজ্ঞাস্য) হতে পারে, সব ঠিক ক'রে রাখতে হয়, আর কাজ আরম্ভ ক'রে দিতে হয়।

পারিজাতদা—আপনার ইচ্ছামত কাজ করতে কেউ হয়তো পারছে, আবার অনেকেই পেরে উঠছে না—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা heredity-র (বংশানুক্রমিকতার) উপর অনেকখানি নির্ভর করে। Heredity (বংশানুক্রমিকতা) নষ্ট হয়ে গেলে আর পারে না। ঐ যে বললাম, caste (বর্ণ) হল purity (পবিত্রতা)। সেটা ঠিক রাখা লাগে।

পারিজাতদা—যেটা নষ্ট হয়ে গেছে সেটার কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার আরম্ভ করব। দীক্ষা, শিক্ষা এবং বিয়ে, এই তিনটি যাতে ঠিক থাকে তা' দেখব। প্রতিটি বিয়ে যাতে বর্ণ-বংশ-গোত্র-বয়স ইত্যাদি বিচার ক'রে সদৃশ ঘরে হয় তার ব্যবস্থা করব। নিজেদের ঐতিহ্য, কুলাচার ঠিক রাখব।

প্রফুল্লদা (দাস)—ঠাকুর! আপনি সদৃশ ঘরে বিয়ে দেবার কথা আজকাল এত বলছেন যে উচ্চ ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবার কথা যেন একটু পাশে পড়ে থাকছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন একথা বলি কেন? বড় ঘর বলতে যদি তোমরা ব্যতিক্রমদুষ্ট একটা ঘরকে বোঝ! সেইজন্য কই, সদৃশই ভাল। সদৃশ ঘরে পারলেই বিয়ে দেবে। অবশ্য সত্যিকারের বড় ঘর যেটা সেটা আরো ভাল।

প্রফুল্লদা—আপনি আগে বলতেন, বর মানে শ্রেষ্ঠ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনও কই। সেইজন্য ঐভাবে কৈফিয়ত দিলাম।

প্রফুল্লদা—আপনি বলেন, সদ্বংশের নিশানা শ্রদ্ধা। কিন্তু এখন যারা সদ্বংশ বলে খ্যাত, তাদের মাঝে যেন ওটা দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য বংশও ঐরকম হয়ে গেছে।

প্রফুল্লদা—কোন মহাপুরুষের কথা শুনলে তারা নাক সিঁটকায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে বুঝো, সব কেমন হয়ে গেছে। এদের মধ্যে কাউকে কাউকে তোলা যায়, কাউকে আর হয়ই না।

কিরণদা ঘরে যেয়ে পঞ্চভূতের অর্থ দেখছিলেন অভিধানে। এখন এসে জিজ্ঞাসা করলেন—তেজ ও ব্যোম বলতে ঠিক কি বোঝায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেজটা হল আমার exciting agent (উদ্দীপনা-সঞ্চারক)। আর ব্যোম মানে আমি বুঝি শব্দতরঙ্গ।

কথায়-কথায় রাত ৯টা বেজে যায়। সবাই একে একে প্রণাম ক'রে উঠছেন এইবার। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিখিলদাকে (ঘোষ) heaven (স্বর্গ) শব্দটির ধাতুগত অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। নিখিলদা ডিক্‌শনারি দেখে এসে বললেন—Heaven-এর উৎস হল suvan, এটার উৎস আবার সংস্কৃত স্বন্-ধাতু, মানে শব্দ করা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে সুরলোক মানে বলা যায় শব্দলোক! সুরের মধ্যে ধ্বনি আছে নাকি রে?

নিখিলদা আবার দেখে এসে বললেন—সুর-শব্দের উৎসও সংস্কৃত স্বৃ-ধাতু, মানে শব্দ করা।

প্রসন্নচিত্তে দয়াল ঠাকুর বললেন—ঠিক হয়েছে। (আমাকে বললেন) সব ঠিক ক'রে লিখে রাখিস্।

রাত ১০টা বাজে। কাছে এখন লোকজন বিশেষ নেই। বালিশটা টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে কাত হয়ে শুলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। চারিদিক শান্ত। আগামীকাল বুদ্ধ পূর্ণিমা। আকাশে শুক্লা চতুর্দ্দশীর স্নিগ্ধ চন্দ্র। তার কিরণচ্ছটায় সমস্ত প্রকৃতি পরিপ্লাবিত। ধ্যানমৌন বিশ্বচরাচর যেন আগ্রহাকূল স্থির নয়নে প্রত্যক্ষ করছে বিশ্বপিতার অমিয় প্রশান্ত মুখচ্ছবি। এ রূপ দেখে দেখে কারোই বুঝি আশ মেটে না।

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) জিজ্ঞাসা করলেন—এখানে ভাল লাগছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইচ্ছা হয়, এখানেই শুয়ে থাকি। (উপরের ছোট ছাউনিটা দেখিয়ে বলছেন) এটা যদি একটু বাড়ায়ে দিস্ তাহলে এখানেই রাত কাটানো যায়।

২৮শে বৈশাখ, ১৩৬৭, বুধবার (ইং ১১।৫।১৯৬০)

প্রাতে—হল্‌ঘরে। ছাত্রদের সাথে নিয়ে এসে বসলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পারিজাত রায়। ঐ ছাত্ররা কে কী পড়েন জানতে চাইলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সবাই বিজ্ঞানের ছাত্র। ওঁরা জানালেন সেকথা একে একে।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে যেদিক দিয়ে পারে করলেই হয়। আমি একদম মুখ্যু বলে বোধহয় আমার ঐ সায়েন্সের দিকে লোভ বেশী। আগেকার দিনে আর্টস ও সায়েন্সের combination (পাঠ্যবিষয়) একসাথে ছিল। এখন আর তা' নেই। এখনকার বিদ্যা সব একপেশে হয়ে যায়। Mathematical train-টা (গাণিতিক ধারাটা) ঠিক থাকলে আর্টস ও সায়েন্সওয়ালা সবারই সুবিধা হয়। তখন কতখানি কী করছ, কোন্‌টা কিভাবে করা লাগবে, সব ঠিক করতে পারবে। যদিও আমি mathematics

-এর (গণিতের) কিছুই জানি না, তবুও মনে হয় mathematics (গণিত) মানে এই। আর, এইজন্যেই সায়েন্সের উপর আমার ঝোঁকও আছে। বার্ক্, ফক্স্-এর গল্প শুনেছি। তাদের কথা শুনতে শুনতে মানুষ নাকি অজ্ঞান হয়ে যেত। যেমন বেহালা, সেতার বেঁধে নিয়ে বাজালে ঝন্-ন্-ন্ করে ওঠে, ঐরকম তাদের বক্তৃতাও মানুষের অন্তরে resonate করত (ঝঙ্কৃত হত)। তার মানে, তাদের ঐ উপস্থাপনার মধ্যে mathematics (গাণিতিক হিসাব) ছিল।

এই সময় অরুণ (গাঙ্গুলী) জনৈক ছাত্রকে দেখিয়ে বলল—এই ভল্টু এবার আই-এ-এস পরীক্ষা দিচ্ছে। তারপর আপনার ইচ্ছা-অনুযায়ী কাজ করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ইচ্ছা fulfil (পূর্ণ) করার ইচ্ছা যদি হয় আর তার সাথে যদি energetic volition (উদ্যমী ইচ্ছাশক্তি) থাকে তাহলে তা' করতে পারবেই। এজন্য ওর খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেক সতর্ক থাকতে হবে। এই করতে করতেই মানুষ বেড়ে ওঠে। কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৎপর হলে আর এতখানি হয় না। এ সম্বন্ধে আমার একটা ইংরাজী dictation (বাণী) ছিল না? (প্রফুল্ল দাসদাকে) আছে নাকি তোর কাছে?

'হ্যাঁ আছে' বলে প্রফুল্লদা খাতা খুলে বাণীটি পড়ে শোনালেন। বাণীপাঠের পর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলতে লাগলেন—এই যেমন history-তে (ইতিহাসে) পড় হলদিঘাটের যুদ্ধের কথা, যেখানে রানা প্রতাপ হেরে গেল। ঐ সমস্ত affair-টাই (বিষয়টাই) মনে picture ক'রে (এঁকে) নিয়ে মাথায় 'টকি' দেখতে হয়। এর ফলে মাথায় ওটা একেবারে গেঁথে যায়। যেখানে যেটা দরকার, সেখানে সেটা লাগাতে পার। এ টকি কিন্তু হলে যেয়ে টকি দেখার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

কথা বলতে বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বেশ কাশি এল। এক ঢোক জল খেলেন। তারপর অরুণ প্রশ্ন করল—আপনি বলেন, কেউ খারাপ ব্যবহার করলে তার সাথে ভাল ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু দু'এক জায়গায় কি খারাপ ব্যবহার করার দরকার হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি না ক'রে পারি তাই ভাল। তাতে ঐ লোক যদি excited (উত্তেজিত) হয়ে থাকে, সে শান্ত হবে, তোমার কথা শুনবে। তোমাকে হয়তো একজন ঠাঁ ক'রে এক চড় লাগায়ে দিল। তখন তুমি যদি সে যা' expect (আশা) করে নি এমনতর মিষ্টি ব্যবহার কর, তাতে তার ঐ রাগের ভাব দূর হয়ে যেতে পারে। আর যদি, blow (আঘাত) দাও তাহলে সেই blow-এর (আঘাতের) কথাই তার মনে পড়বে। নিজের খারাপ কেউ চায় না। ছোটবেলায় শুনেছিলাম, Do unto others as you wish to be done by (নিজে যেমন ব্যবহার পেতে ইচ্ছা কর, অপরের প্রতিও তেমন কর)। তাই বলি, খবরদার! যেটুকু দরকার তার বেশী খরচ করতে যেও না।

অরুণ—আমার শ্রদ্ধার্হ কোন ব্যক্তির নামে যদি কেউ বার-বার নিন্দা করতে থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি তাকে খুব politely (নম্রভাবে) বলবে।

অরুণ—তাতেও যদি সে না শোনে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Resist (প্রতিরোধ) কর এমনভাবে যাতে তার existence-এর (সত্তার) কাছে appeal (আবেদন) করে। নিজের সম্বন্ধে নিন্দামন্দ কেউ চায় না, মানুষের এই ভাবটির কাছে যদি তুমি তোমার আবেদনী সুর পৌঁছে দিতে পার, তাহলে সে যদি intelligent (বোধবান) হয়, তাতে তার মন গলে যাবে।

অরুণ—পরাক্রমী নিষ্ঠার রকমটা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরেছি কি সেরেছি। মার দিয়ে না। মার দিয়ে down করা (দমিয়ে দেওয়া) যায়, achieve (উপায়) করা যায় না। আর একরকম আছে। রাদারফোর্ডের যারা ছাত্র ছিল তারা কোন্ ইউনিভারসিটিতে পড়েছে তা' বলত না। বলে, আমি রাদারফোর্ডের ছাত্র। এদের কয়েকজনের মুখের pose (ভঙ্গী) আমি দেখেছি, তাদের কথার রকমও ঠিক ঐ একরকম। ঐগুলি রাদারফোর্ড থেকে imbibe (আত্মীকৃত) করেছে কিনা ভগবান জানেন। আমার কিন্তু তাই সন্দেহ হয়! এও ঐ নিষ্ঠারই লক্ষণ। (কিরণ মুখোপাধ্যায়দাকে) তোদের আমলে কি আর্টস এবং সায়েন্স combined (একত্র) ছিল?

কিরণদা (মুখোপাধ্যায়)—না, আলাদা হয়ে গিয়েছিল।

হরিদাস (চক্রবর্ত্তী)—মানুষের দুর্ব্ব্যবহারের কোন উত্তর হয়ত আমি দিলাম না। তাতে সে ভাবল, আমি দুর্ব্বল। তার থেকে কি কিছু উত্তর দেওয়া ভাল না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি কথার উত্তর দাও। কিন্তু সে উত্তরটা যেন তাকে insult (অপমানিত) না করে, বরং যেন তার কাছে appeal করে (মনোজ্ঞ হয়)। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, তাকে কখনও অস্বীকার করতে নেই, আবার পরিস্থিতির দ্বারা coloured (রঞ্জিত)-ও হতে নেই।

কৃষ্ণ (লাহিড়ী)—আমি মানুষের মুখের উপর তার ভালমন্দ বলে দিই, তাতে আমার কোন কষ্ট হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওগুলি echo-র (প্রতিধ্বনির) মত কাজ করে। তুমি এই যে বলে দাও, তোমাকে যদি কেউ ওরকমভাবে বলে তখন বুঝতে পারবে তার মনে কেমন হয়। সত্য কথা তুমি বলতে পার, কিন্তু কেষ্ট ঠাকুরের ঐ কথা মনে রেখো—'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্।' যে সত্য danger (বিপদ) আনে তা' বলো না।

কৃষ্ণ—অনেকে উপদেশ দেয়, কিন্তু নিজে তা' পালন করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাকে বলতে হয় ভাই! কথা খুব ভাল। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না। যদি practically (বাস্তবে) কিছু দেখতাম তাহলে শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠত।

সুরজিৎ চক্রবর্তী—এমন দেখা যায় যে একজন এক লাইনে উন্নতি করতে পারল না, কিন্তু অন্য লাইনে যেতেই সে খুলে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে আগের ঐ লাইনে তার ভাল conception (বোধ) নেই। আর আমার মনে হয়, যে ভাল লিখতে পারে, সে কবিতাও লিখতে পারে।

প্রফুল্লদা—কিন্তু প্রত্যেকেরই তো একটা জন্মগত aptitude (যোগ্যতা) থাকে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই বলে সে যে অন্য জিনিস achieve (অধিগত) করতে পারবে না তা' নয়—যদি ব্যতিক্রমদুষ্ট না হয়।

পারিজাতদা—Physical appearance (বাহ্যিক চেহারা) দেখে কি মানুষকে judge (বিচার) করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক ক্ষেত্রে যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে নিগ্রো টাইপ আছে, হয়তো saint (সাধু)।

পারিজাতদা—কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমি fail করেছি (ব্যর্থ হয়েছি)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, তোমার অন্তরে তার সম্বন্ধে একটা biased conception (মনগড়া ধারণা) আছে। সেইটা তার উপরে apply (প্রয়োগ) করেছ।

পারিজাতদা—যা' ভাবি তা' কিছুতেই করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও অভ্যাস করতে করতেই ঠিক হয়ে আসে।

পারিজাতদা—তাহলে ব্যাপারটা mechanical (যান্ত্রিক)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Mechanically (যান্ত্রিকভাবে) ভাল করতে করতেই সেই করাটার উপর admiration (অনুরাগ) আসে। বাবা-মাকে ভালবাসতে হলেও ঐভাবে করতে হয়।

পারিজাতদা—অনেকে তার বেশী জানার জোরে আমাকে বুঝিয়ে দেয়। আমি হয়তো অতটা জানিই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেখানে ক'বে, আপনি যদি jump (ধাপ অতিক্রম) ক'রে এগিয়ে যান তাহলে আমি ধরতে পারব না। আমার এম-এস-সি-র অঙ্ক শেখার ইচ্ছা আছে। আমাকে ধাপে ধাপে সেখানে টেনে নিয়ে যান।

পারিজাতদা—অনেকে ডিগ্রীর জোর দেখিয়ে বুঝাতে চায়। হারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডিগ্রী এক জিনিস আর শেখানো আর এক জিনিস। আর সে না হারে, তুমি হ'টো না, মানে তার সাথে খারাপ ব্যবহার ক'রো না।

পারিজাতদা—কাজ করতে গেলে আমার negative (না-বোধক) ভাবটা বেশী আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Positive (হ্যাঁ-বোধক) যাতে বেশী আসে তার চেষ্টা কর, আর সেইভাবেই এগোও। কেষ্টদা বলত, scientist-দের (বৈজ্ঞানিকদের) কাজ করতে গেলে প্রথমে কোন কিছু disbelieve (অবিশ্বাস) ক'রে আরম্ভ করতে হয়। আমি কই, না, believe (বিশ্বাস) ক'রে সেটাকে ধরে নিয়ে আরম্ভ কর।

পারিজাতদা—কেউ আমাকে আশা দিয়ে কোথাও নিয়ে গিয়ে deceive করল (ঠকিয়ে দিল)। সেখানে কী করা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধোঁকা খেয়ে এলে, বলবে, আপনার সাথে গেলাম। কিন্তু যা' ভেবেছিলাম তা' আর পেলাম না।

প্রশ্ন—আর কিছু বলব না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাকে চড় মেরে তো লাভ নেই।

প্রশ্ন—সে যদি আবার আমাদের মধ্যে এসে বসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার আজগবী কথা নেবে না।

প্রশ্ন—তাকে আলোচনার মধ্যেও নেব না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা কথা বলছ। তাতে সে কথা কয়, ক'ল, জবাব দেয়, দিল।

প্রশ্ন—সে যদি আবার ঐরকম নিয়ে যেতে চায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধোঁকা বুঝলে যাবে কেন? তুমি তাকে দেখে নেবে তো সে কেমন চলে, কেমন জানে!

প্রশ্ন—আমার মনে হয়, তাকে আর বিশ্বাস করা উচিত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এখানে তো অমন লোক ঢের আছে। কারো কিছু হবে না, এ আমার মনে হয় না। আমি তাদের সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করি।

বহিরাগত কয়েকটি ভাই এই সময় বিদায় প্রার্থনা করলেন। অনুমতি দিয়ে দয়াল ঠাকুর বললেন—আবার সুবিধা পেলেই চলে এসো।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ) নিয়ে এলেন এক ভদ্রলোককে। তিনি মজঃফরপুর কলেজের পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক। প্রণাম ক'রে বসলেন। কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে গেলেন ওঁরা।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বানান প্রসঙ্গে বললেন—Spell (বানান) করতে হ'লে কোন্‌টা spell (বানান) করছি তা' দেখেশুনে বিবেচনা ক'রে করতে হয়। আর, লেখার ভিতর দিয়ে spell (বানান) করতে অভ্যাস করলে সব right (ঠিক) হয়ে আসে। আবার শুধু পাঠ্যবিষয় নয়, affair (বিষয়)-টাও spell (বানান) করা লাগে। সবটা যখন পারম্পর্য্য নিয়ে একটা picture (চিত্র) হয়ে যায়, সেটা হ'ল ঠিক ঠিক spelling (বানান)।

একটি ছাত্রকে দেখিয়ে পারিজাতদা বললেন—ও কিছুতেই ঠিকমত জোর পায় না।

দৃঢ়প্রত্যয়ী স্বরে উত্তর দিলেন পরম দয়াল—জোর পায় না, জোর পায় না করিস ক্যা? যেটা ধরব সেটা করবই, এমনতর সঙ্কল্প রাখতে হয়।

উক্ত ছাত্র—আমার ভেতরে urge (আকূতি) আছে, বাইরে প্রকাশ করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Urge (আকূতিটা) active (ক্রিয়াশীল) না হ'লে weak (দুর্ব্বল) হয়ে যায়। অত কথা দিয়ে কাম কী! কোন্‌টা করবি ঠিক ক'রে এগিয়ে যা। অত ভাবতে গেলে to to or not to do (করব কি করব না) এসে যায়।

উক্ত ছাত্র—কিন্তু আমি যে কিছুতেই পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতবার পারছি না কচ্ছ, ততবার না-পারাটাকে dote দিয়ে (ভালবেসে) যাচ্ছ।

উক্ত ছাত্র—আবার আমার ego-ও (অহং-ও) আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার বুদ্ধি কেমন? যেমন তোমার family-তে (পরিবারে) অনেক মানুষ আছে। এদের মধ্যে তোমার ego (অহং)-টাকে ছড়িয়ে দেওয়া লাগে। প্রতিটি ছেলেমেয়েকে এমনভাবে educate (শিক্ষিত) ক'রে তোল যাতে তারা glaring (ঝকমকে) হয়ে ওঠে, fictitious (কল্পনাপ্রবণ) না হয়। এভাবে তোমার ego (অহং) -টাকে ছড়িয়ে দাও। Ego (অহং) তো আছেই, নাই ক'লেই যে যায় তা' যায় না। তাকে ছড়িয়ে দিতে হয়। আর, সেটা family (পরিবার) থেকেই আরম্ভ কর। জেনে রেখো, অপরের interest-কে (স্বার্থকে) exalt (উদ্দীপ্ত) ক'রে তোলার ভিতর দিয়ে ego (অহং) ছড়িয়ে যায়। কোন কাজ করতে গেলে তার ফল ভাল না খারাপ হবে বিবেচনা করবে। খারাপ হ'লে তা' তুমি তোমার নিজের জন্য চাও কিনা analysis (বিশ্লেষণ) ক'রে ঠিক করো। আর, ভাল হ'লে সেটা ধরবে।

কথা বলতে বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের বেলা হয়ে এল। সবাই প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণে একখানা চৌকিতে সমাসীন। ৮টা বাজে। পারিজাতদা তাঁর ছাত্রদের নিয়ে এসে বসলেন। তা ছাড়া উপস্থিত আছেন শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), অনিলদা (গঙ্গোপাধ্যায়), সুধীরদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর পারিজাতদাকে বললেন—ম্যাকডুগাল আর উইলিয়ম জেমস-এর কথার সাথে আমার কথা খুব মেলে। বইগুলি যোগাড় ক'রে যদি পড়তে পারিস, ওদের পড়াতে পারিস, তাহলে খুব ভাল হয়।

ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণ লাহিড়ীকে উদ্দেশ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি লাহিড়ী?

কৃষ্ণ—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার বংশের। তোর শাণ্ডিল্য গোত্র?

কৃষ্ণ—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই তো কাম সারিছিস। (প্রীতিপূর্ণ সুরে)।

তাঁর বলার ভঙ্গীতে সবাই হেসে উঠলেন। এই সময় মতি কবিরাজদা এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে একটা ওষুধ তৈরি করতে বলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সেই প্রসঙ্গে জানতে চাইলেন—এই, ওষুধ তৈরি করেছিস?

মতিদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো! ক' বড়ি হবে নে?

মতিদা—আধ তোলায় ৪০০ বড়ি হবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বাল্যবয়সের স্মৃতি রোমন্থন ক'রে বলতে লাগলেন—ছোটকালে আমার লেখাপড়ায় interest (আগ্রহ) আনাতে পারল না কোন মাস্টার। পাড়াপড়শী সবাই আমার গার্জিয়ান ছিল। খামাকা এসে কান ডলে দিত। নব চৌধুরী নামে একজন ছিল, একদিন তার গাছ থেকে একটা শশা নিয়েছিলাম। তারপর থেকে গাঁয়ে যত শশা চুরি যেত, সব আমার নাম হয়ে যেত। খামাকা ওরকম করত। ভাবতাম, আমার জন্ম বোধ হয় এরকম। না কি আমার চলনায় কোন দোষ আছে। ঐ তালে পড়ে আমার লেখাপড়াও হল না। এইভাবে চলতে থাকে। আমাদের ক্লাসে পড়াতেন গোপাল লাহিড়ী মশাই। হয়তো আধঘণ্টা কি একঘণ্টা পড়াতেন, তারমধ্যে কত গল্প করতেন, স্ফূর্তি করতেন। একদিন ক্লাসে বললেন, do unto others as you wish to be done by (অপরের প্রতি তেমন ব্যবহার কর যেমনটি তুমি নিজে পেতে চাও)। ওটা কেমন মাথায় ধরে গেল। একবছরের মধ্যেই আমার ঠিক হয়ে গেল কোথায় কী করা লাগবে, কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা লাগবে।

আজ বুদ্ধপূর্ণিমা। ভরা চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণে পৃথিবী যেন ভেসে যাচ্ছে। প্রশস্ত প্রাঙ্গণে দয়াল পিতার চরণোপান্তে উপবিষ্ট ভক্তসন্তানগণ। তাঁকে নিয়ে সমগ্র ঠাকুর-আঙ্গিনায় সৃষ্টি হয়েছে এক অপার্থিব মায়াময় পরিবেশ। প্রভু আজ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন—রাত কাটাবেন এই খোলা প্রাঙ্গণে। তাই, তাঁর চৌকির উপরে বড় করে চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে। চাঁদোয়ার ছায়াটুকুর বাইরে জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি।

ওয়েস্ট-এন্ড-হাউসের মাঠে সৎসঙ্গের ভারতী সাহিত্য সংসদ আজ ভগবান বুদ্ধের জন্মতিথি পালন করছেন। সেখানকার গান-আবৃত্তি-বক্তৃতার ধ্বনি মাইকে ভেসে আসছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে ভক্তবৃন্দ তাঁকে নিয়ে তন্ময় হয়ে আছেন। অবিরলগতিতে চলেছে আলোচনার স্রোতধারা। পারিজাতদা বললেন—Tackle (সামঞ্জস্য-সহকারে সমাধান) করার কথাটা আমার কাছে appeal করে না (মনে লাগে না)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Tackle (সমাধান) মানে আমি বুঝি deal (ঠিকমত ব্যবহার) করা। যেখানে যেমন করা উচিত, যা' করলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেইভাবে deal (ব্যবহার) করাই হ'ল tackle (সামঞ্জস্য ও সমাধান) করা। অন্যায় ক'রে সেটা support (সমর্থন) করার জন্য অন্যকে tackle (স্বমতে অনুভাবিত) করা ভাল না। যদি তা' করি, সেটা হ'ল bluff (ধোঁকা) দেওয়া। কিন্তু কারো ভালর জন্য যদি তাকে tackle (নিয়ন্ত্রণ) করি যাতে সে সুস্থ, স্বস্থ, সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তা' করা খারাপ হবে কেন? যেমন, আমাকে যে তখন সবাই অত মারত, না মেরে যদি আমাকে একটু tackle (সুব্যবহারে নিয়ন্ত্রিত) করার চেষ্টা করত তাহলে বোধ হয় আমি একটু লেখাপড়া শিখতে পারতাম। ক্লাসে একদিন আমি বলেছিলাম, এক আর একে দুই হয় কি ক'রে! দুইটা এক হতে পারে। কিন্তু ঠিক একটার মত আর একটা এক হয় কি করে? তখন সেই খ্রীষ্টান মাস্টার, সে-ই আমাদের mathematics (অঙ্ক) পড়াত, আমাকে এমন মার মারল যে আমার অঙ্ক শেখার ওখানেই ইতি হয়ে গেল। আর, এক আর একে কিভাবে দুই হয়, আজও তা' বুঝি নি।

পারিজাতদা—হনুমান যে রাবণের মৃত্যুবান চুরি ক'রে আনল, সেটা তো bluff (ধাপ্পা) দিয়েই করল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামচন্দ্র আমার কাছে primary (প্রধান), তাঁকে কিছুতেই হত হতে দেওয়া যাবে না। তাহলে সব মিস্মার হয়ে যাবে—এই ছিল হনূমানের বুদ্ধি। রাবণের উপর তার আক্রোশের কারণ কী? ঐ যে সীতা হরণ ক'রে আনল। তারপর তো যুদ্ধ আরম্ভ হল। রাবণ চর লাগিয়ে হনূমানকে down করার (দমাবার) খুব চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হনূমানের বুদ্ধি হল রামচন্দ্র যাতে successful (সফল) হন। তাঁর

স্বার্থরক্ষার জন্য কোন কাজ করতেই সে পিছপা নয়। তাই, বামুনের বেশ ধরে যেয়ে রাবণের মৃত্যুবাণ নিয়ে আসল। রামচন্দ্র repeatedly (বারবার) বলেছেন, আমি যুদ্ধ করব না, লোকক্ষয় করার দরকার নেই। হনূমান ওকথা শুনত, কিন্তু চুপ ক'রে বসে থাকত না, যা' করার ক'রে যেত। কিন্তু যা' কিছু সে করেছে সবই for the good of his Love (তার প্রিয়পরমের ভালর জন্য)।

জনৈক ভাই—কেউ হয়ত মদ খায়। তাকে মদ ছাড়াবার জন্য যদি আমি তার সঙ্গে মদ খাই, সেটা কেমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন? তুমি তার সঙ্গে এমন ব্যবহার কর না কেন যাতে তুমি মদ না খেলেও তোমাকে সে ভালবাসতে পারে, ভালবেসে মদ ছেড়ে দিতে পারে। ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি বেশ্যাবাড়ী যাব, আফিং খাব? সে কেমন কথা? এরকমভাবে আমি তো একে একে সবরকম অবগুণেই আসক্ত হয়ে পড়তে পারি।

পারিজাতদা—রামচন্দ্র ভক্ত, কিন্তু রাবণও তো ভক্ত ছিল!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্ত হয়ে অকাম করবে? ভক্ত না। ভক্ত মানে প্রবৃত্তিপরায়ণতার ভক্ত। সত্যিকারের দেবীর ভক্ত হলে তো তখনই যুদ্ধ থেমে যায়। দেবী যদি তার কথা না শোনে তো তাকে বেঁধে রাখবে, যেমন শিবকে বেঁধে রেখেছিল। এই কি ভক্তের লক্ষণ?

পারিজাতদা—আমি কারো ভাল করলে যদি সে তা' appreciate (উপলব্ধি) না করে তো খারাপ লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না করুক। তুমি তার ভাল করেছ কিনা। বার বার চিন্তা ক'রে দেখ, তুমি ভাল করেছ কিনা! তাহলেই হল।

পারিজাতদা—আগে বিনতি-প্রার্থনা করতাম। এখন আর তা' ভাল লাগে না। ইচ্ছা হয় শুধু নামধ্যান করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন ইচ্ছা হয় ক'রো। ধ্যান মানে মনন, চিন্তন, সংখ্যান and thus to achieve the goal (এবং এইভাবে লক্ষ্যে পৌঁছানো)। ধ্যান যখন করে তখন তো আর বিনতি-প্রার্থনা করে না।

পারিজাতদা—ধ্যান করার সময় বিভিন্ন আসনে বসা, নিঃশ্বাস নেবার নিয়ম আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কোনদিন ওসব করি নি। (সহজ আসনে বসে আছেন) এইভাবেই তো বসি। আর, শুয়ে শুয়ে এখানে (মাথার পিছন দিকে হাত দিয়ে) ধ্যান করার কথা আছে।

পারিজাতদা—জীবনীতে আছে, আপনাকে নাম দেবার সময় আপনি বলেন, এ নাম আমার জানা। সেটা কিভাবে সম্ভব?

প্রচ্ছন্নভাবে উত্তর দিলেন দয়াল ঠাকুর—ঐ যে মা প্রণাম করত হুজুর মহারাজকে। মার দেখাদেখি আমি নিজেই অমন করতাম।

আর কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর পারিজাতদা আবার প্রশ্ন করলেন—নরেন্দ্রনাথকে যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অতখানি ক'রে তুলেছিলেন, তার পিছনে কী আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকৃষ্ণ ঠাকুর নরেন্দ্রকে ভালবাসতেন, না দেখলে খোঁজ নিতেন। দু'একদিন না এলে, পরে দেখতে পেলেই আনন্দ ক'রে উঠতেন। ওরও রামকৃষ্ণ ঠাকুরের উপর নেশা ছিল। তাতে যা' হবার তা' হয়েছে।

পারিজাতদা—'তোকে যেমন দেখছি তেমনভাবেই ভগবানকে দেখেছি' একথার মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ কথার মধ্যেই উত্তর আছে। ভগবান মানেই ভজমান। অর্থাৎ সেবা-অনুরাগ-অনুশীলন-দান-প্রাপ্তি-উপভোগ যার মধ্যে আছে, সেই ভগবান।

পারিজাতদা—একজনকে influence (প্রভাবিত) করতে কী লাগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Influence (প্রভাবিত) করা মানে তোমার উপর তাকে interested (অন্তরাসী) ক'রে তোলা। তাতে লাগে তোমার lovely look, lovely tone, wisely adjusted behaviour (প্রেমমাখানো দৃষ্টি, প্রেমপূর্ণ কণ্ঠস্বর, বিজ্ঞ সুবিনায়িত ব্যবহার)।

পারিজাতদা—যদি আমার তা' না থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি মানুষ হয়ে জন্মেছ তো! যে সম্পদটুকু তোমার আছে, তাই নিয়েই আরম্ভ কর না। আর, খারাপ চিন্তার আমল দিস নে। ওসব যদি কিছু আসে তা' উড়ে যাক। ভাল energy (উদ্যম), ভাল thought (চিন্তা), এইগুলিকেই ধরে রাখ।

সুরজিৎ—আমি সহ্য করতে পারি না যে আমার সামনে আমার চাইতে বড় কেউ থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে ওটা আবার rebound করবে (ঠিকরে আসবে)। অন্যেও তোমার সম্বন্ধে ঐরকম ভাববে। তুমি ওরকম না ভেবে যদি নিজে চেষ্টা কর তবে তার থেকেও বড় হতে পার। কিন্তু ঈর্ষ্যা করলে পরে ঐ ঈর্ষ্যা তোমাকে আর বাড়তে দেবে না। ঈর্ষ্যার বুদ্ধিই ঐরকম। খামাকা তুমি বেকুবী বুদ্ধিটাকে invite (আমন্ত্রণ) কর ক্যা?

২৯শে বৈশাখ, ১৩৬৭, বৃহস্পতিবার (ইং ১২। ৫। ১৯৬০)

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), সুধীরদা (রায়চৌধুরী), নিখিলদা (ঘোষ), দীনদা (শর্মা), বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের হলঘরে সমাসীন। বেনারসের পারিজাতদাও (রায়) তাঁর ছাত্রদের নিয়ে এসে বসেছেন।

নানা বিষয়ে কথা চলছে। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অধ্যয়ন হ'ল conceive (বোধ) করার পথে চলা, আর অধ্যাপনা মানে conceive (বোধ) করাবার পথে চালানো।

তারপর পারিজাতদা জিজ্ঞাসা করলেন—জ্যোতিষশাস্ত্রটাকে কি আপনি perfect (খাঁটি) বলে মনে করেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার সেইরকম মনে হয়।

পারিজাতদা—গুরুকৃপায় তো অনেক কিছুই হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরুকৃপা মানেটা কী বুঝিস?

পারিজাতদা—তাঁর ইচ্ছায় অনেক কিছুই হয়ে যায়, এই আমাদের বোধ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তা' বুঝি না। আমি বুঝি কৃপার মধ্যে কৃ (করা) আছে; কৃপা মানে ক'রে পাওয়া। এই যে তুমি আজ অধ্যাপক হয়েছ, তাও তো ক'রে ক'রেই হয়েছ। অধ্যাপকের মধ্যে 'অধি' আছে। অধি-র মধ্যে আছে ধা—ধারণপোষণ করা। আমি যে বিষয়ের অধ্যাপক আমাকে সেই বিষয়টিকে ধারণ করতে হয়েছে। হয়ত কেমিস্ট্রি পড়ছি। হাতেকলমে কেমিস্ট্রিকে আয়ত্ত করতে করতে তারপর সে সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা জন্মেছে। এখন, অধি মানে যদি কও ন ধা, তার মানে, যে ধারণ করেন না, তাহলে কি কোশলাধিপতি মানে যিনি কোশলকে ধারণপালন করেন না? তা' কি হয়। মানে উলটে যায় না? Word (শব্দ)-গুলিকে ঠিকমত realise (বাস্তবভাবে বোধ) করা চাই। তাহলেই ওর মধ্যে যে অর্থটা আছে তা' ধরা যায়। ছেলে হয়ত জিজ্ঞাসা করছে, 'ওটাকে কেন আমগাছ কয়?' বাবা উত্তর দিচ্ছে, 'ওটা আমগাছ কিনা, তাই আমগাছ কয়। বাবা! তুমি বড় হয়ে বুঝবে।' যাদের বুদ্ধি আছে তারা ঐরকম কয়। আর, যারা ওরকম না, তারা চড়-টড় মেরে দেয়, তা' ভাল না। ছেলে যাতে বুঝতে পারে সেইভাবে তাকে বুঝিয়ে দিতে হয় ওটাকে কাঁঠাল না ক'য়ে আম ক'ল কেন! কেন বেতের ঝোপ কয় না।

এরপর দৈবানুগ্রহ, ধরনা দেওয়া ইত্যাদি নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যেমন বৈদ্যনাথধাম। বহুলোকের বিশ্বাস আছে যে এখানে ধরনা দিলে অনেকের রোগ সারে। বৈদ্যনাথ মানে বৈদ্যদের প্রভু, তা' কিন্তু তোমারই ভিতরের curative urge (আরোগ্যলাভ করার সম্বেগ)। ঐ urge-ই (সম্বেগই) roused

(জাগরিত) হয়ে হয়ত বিশেষ কারো নির্দ্দেশরূপে দেখা দিয়ে ক'ল, 'রোজ তিনটে ক'রে কলা খেলে তোর অমুক রোগ সেরে যাবে।' মহাদেব এসে কিন্তু সবসময় কয় না। হয়ত একটা কুকুর এসে একটা হাড় দিয়ে বলতে পারে, 'এই, এটা খা।' আর, তাই খেয়ে তার সে রোগ সেরেও গেল। এটা কী? তার মানে তোমার ভেতরের যে deficiency (খাঁকতি) আছে, যার জন্য তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ, ঐ খাওয়ার ভিতর দিয়ে সেটা make up (পরিপূরণ) হয়ে গেল, ওটা তোমাকে গ'ড়ে দিয়ে গেল। আমি এইভাবে বুঝি। (তারপর বিশুদার দিকে তাকিয়ে বললেন) বড় জলপিপাসা লাগিছে রে!

বিশুদা তাড়াতাড়ি শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য একটা লেমনেড আনতে গেলেন।

পারিজাতদা—অনেক সময় মাদুলি ধারণ ক'রেও রোগ ভাল হতে দেখা যায়। তা' কেন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাদুলি ধারণ ক'রে রোগ ভাল হয়, এটা তুমি বিশ্বাস কর। তোমার সেই বিশ্বাসের বলেও কাজ হয়। অথবা মাদুলিটা হয়ত লোহার বা তামার বা অষ্টধাতুর তৈরি। তার একটা action (ক্রিয়া) আছে। তোমার শরীরের সংস্পর্শে থেকে সেগুলি হয়তো এমন ফল দেয় যাতে রোগ ভাল হয়। এরকম দেখা যায়। আবার কোন ফল হয় না, সব ফক্কিকা, এমনও হয়ে থাকে।

এই সময় ধীরেনদা (ভুক্ত) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে একটা লেমনেড খাইয়ে গেলেন। আবার আলোচনা চলল, পারিজাতদা বললেন—অনেক সময় মাদুলির মধ্যে একটা ফুল বা পাতা ভরে দেওয়া হয়। আমার মনে হয়, এর মধ্যে কোন scientific truth (বৈজ্ঞানিক সত্য) নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে কাশীতে কী দেবতা আছে, যার কাছে জানালে সমস্ত রোগ সেরে যায়? মেয়ে দেবতা। (স্মরণ করার চেষ্টা করছেন)—আমি কইছিলাম, আবার আমিই ভুলে গেলাম। ফল কথা, সেই দেবতার সামনে যেয়ে পূজা-টুজা করার ভিতর দিয়ে মানসিক প্রস্তুতি এমন ক'রে নেওয়া হয় যার ফলে বিপদ-আপদ কাটিয়ে ওঠার শক্তি ভেতরে জেগে ওঠে।

পারিজাতদা—সঙ্কটা?

উৎফুল্ল হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলে উঠলেন—ঐ, সঙ্কটা। সঙ্কটমোচন কয়। তাঁর কাছে যেয়ে তুমি প্রার্থনা কর, আমার এই হোক, এই হোক। এই প্রার্থনা করার সাথে সাথে তুমি তাঁকে ভাবছ, ভাবছ তাঁর attribute-গুলি (গুণাবলী)। ভাবতে ভাবতে তোমার মধ্যে সঙ্কট মোচনের তুকগুলি জেগে উঠবে। আর, তখন তা' প্রয়োগ ক'রে তুমিও সঙ্কট থেকে মুক্ত হতে পার।

পারিজাতদা—কোষ্ঠীতে অনেকের লেখা থাকে, সোনা দান করলে বিপদ কেটে যাবে, এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দান করারই একটা action (ক্রিয়া) আছে। দান করলে যে বিপদ কাটে, এটা তুমি বিশ্বাস কর। ঐ বিশ্বাস ক'রে দান করলে তদনুযায়ী একটা mental manipulation (মানসিক বিনায়ন) হয়। তাতে যা' হবার তাই হয়। দান করার মধ্যে একটা will (সক্রিয় ইচ্ছা) থাকে তো! আবার faith (বিশ্বাস)-টাও তো psychic (মনোজগতের)! (একটু মিষ্টি হেসে বললেন) সবটাই psychological factor (মানসিক ব্যাপার)।

অরুণ (গাঙ্গুলী)—কাশীতে অনেক বুড়ি আছেন। তাঁরা এ মন্দিরে যান, ও মন্দিরে যান, বহু দানধ্যান করেন। এঁদেরও তো নিষ্ঠা আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘাটে ঘাটে যায় যারা, তাদের নিষ্ঠা নেই। নিষ্ঠা যেখানে থাকে, তা' কোন একজনের উপরেই থাকে। নিষ্ঠা হ'ল নি-স্থা, নিবিষ্টভাবে থাকা। নিষ্ঠা থাকলেই থাকবে আনুগত্য, আর, আনুগত্য থাকলে কৃতিসম্বেগ সেখানে থাকবেই। যেমন হনূমানের নিষ্ঠা ছিল রামচন্দ্রের উপর। তার কী? তার বৌ-ও ছিল না, ছেলেও ছিল না। সে যা' কিছু করেছে সবই তার প্রভু রামচন্দ্রের জন্য। লঙ্কায় রামচন্দ্র কত বললেন, 'যুদ্ধ করো না। এত লোকক্ষয় আমার ভাল লাগছে না।' কিন্তু হনূমান সে কথা শুনল না ঐ নিষ্ঠা থাকার জন্য। সীতা উদ্ধার ক'রে রামচন্দ্রের স্বস্তিবিধান করাই ছিল তার লক্ষ্য।

অরুণ—ঐ বুড়িদের লক্ষ্যই হল 'মৃত্যুকালে যেন মোক্ষলাভ করি।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ উদ্দেশ্যেই তারা হয়ত নিষ্ঠার সাথে কত কী করে। কিন্তু লোভ থাকে বলে ওতে ফল হয় কিনা কি জানি!

পারিজাতদা—আপনি অনেকের কাছে কিছু চান। তা' দিয়ে তারা বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। এর মধ্যে science (বিজ্ঞান)-টা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি কাউকে দেখি সে কোন knot-এর (গ্রন্থির) দরুন জীবনে চলার পথে ঠেকে গেছে তখন তাকে ডেকে কই, 'এই, তুই আমাকে অমুক জিনিসটা দিতে পারিস?' হয়তো একটা আজগুবি জিনিস ক'য়ে ফেললাম। আর, তার কাছেই চাই যে দিয়ে আনন্দ পায়। তখন দেওয়াতেও সুখ, চেয়েও আনন্দ। মানুষ ক'রে ক'রেই ঐরকম knot-এর (গ্রন্থির) মধ্যে পড়ে। তখন যদি তাকে ঐরকম করতে বারণ করি, সে শুনতেও পারে, নাও শুনতে পারে। কিন্তু ঠাকুর-বামুনকে দেওয়ার ভিতর দিয়ে অনেকের ভাল হয় শুনেছি। সেইজন্য কায়দা ক'রে ঐভাবে চাই। অবৈধ চলনে চলতে চলতে শেষ পর্য্যন্ত মানুষের একটা অবসাদ আসে। সেই অবসাদ থেকে আসে বিষাদ।

কিন্তু যদি ঐভাবে আমি যা' চাই তা' দেওয়ার জন্য মানুষ তৎপর হয় তাহলে ওর হাত থেকে সে বেঁচে যাবে। এখন আমি যদি দশমণ সোনা চাই, সেটা absurd (অসঙ্গত) হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কই, 'ভাঙে না এমন সত্তরখানা থালা দিবি আমাকে?' তখন যতদিন ও ওটা জোগাড় করবে, ততদিন আর কুপথে যাবে না। (একটু থেমে বলছেন) একথা কওয়া আমার ভাল হ'ল না। আর, তোমরা যে নষ্ট হয়ে গেছ তাও ভেবো না।

পারিজাতদা—কিন্তু আমাদের ভুল হয়ে যায় যে—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভুল তো হয়ই। কিন্তু ভুলের উপর অনুরাগ থাকা ভাল না। ভুলটা যেই ধরতে পারলে, খেয়াল রাখ আর যেন ভুল না হয়। এরকম করতে করতেই সিদ্ধিলাভ হয়ে যায়। তোরা সবাই science-এর student (বিজ্ঞানের ছাত্র)। তোরাই এগুলি ধরে ধরে ঠিক করতে পারিস। (ক্ষণেক নীরবতার পর) Physical manipulation (স্থূল দৈহিক বিনায়ন) যেমন আছে, সাথে-সাথে psychological manipulation-ও (মনোগত নিয়ন্ত্রণও) লাগে। ম্যাজিসিয়ানদের দেখিস নি! এসে কয় ৫টার সময় আমরা খেলা দেখাব। এখন পৌনে ৫টা বাজে।' এদিকে ঘড়িতে তখন ৭টা। মানুষ 'শালা' বলে গালাগালি দিচ্ছে, আরো কত কী ক'চ্ছে। কিন্তু ম্যাজিসিয়ান আবার ঘড়ি দেখে কয়, 'এখন ঠিক পৌনে ৫টা।' আমি right time-এই (ঠিক সময়েই) এসেছি।' ঐ পৌনে ৫টা সে সবার মধ্যে এমন ক'রে impress (মুদ্রিত) ক'রে দিল যে প্রত্যেকেই তার ঘড়িতে দেখে পৌনে ৫টা। তোমাদের একাজের মধ্যেও ম্যাজিক আছে। করলেই টের পাবে। তবে ম্যাজিক দেখবার উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু করতে যেও না। ম্যাজিক আপ্‌সেই হবে। দু'একবার কার্য্যসিদ্ধি না হ'লে থেমে যেও না। কিভাবে কী করলে হয় লক্ষ্য রেখো, আর oposition (বিরোধিতা) দেখলে ঘাবড়ে যেও না।

অরুণ—একজন অসুস্থ রোগীকে কি এভাবে ভাল করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Rightly (ঠিকমত) যদি impart (সঞ্চারণা) করতে পার তাহলে কী হয় কওয়া যায় না। একদিন দুপুরের কাছাকাছি রামকৃষ্ণ ঠাকুরের কাছে একজন লোক গিছিল। ঝানু শয়তান। তারে দেখেই উনি ডাকলেন। 'কি ভাই! আস, আস, গা ঘেমে গেছে। ব'সো, তামুক খাও।' তামুক খাওয়ায়ে কচ্ছেন, 'ভাই, গা ঘেমে গেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ী যাও। বিশ্রাম নাও।' মানে, ওরে তাড়াতাড়ি সরায়ে দেবার জন্য ঐরকম করলেন।

পারিজাতদা—কিন্তু ও বুঝতে পারল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও বুঝতে পারবে কি! (তাচ্ছিল্যের সুরে)।

অরুণ—আমাদের এই ছেলেদের অনেকের মাঝে-মাঝে খুব মাছ-মাংস খেতে ইচ্ছে করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইচ্ছা করে, বয়ে গেল। খেলাম না।

হিপ্‌নোটিজমের মধ্যে magnetic power (চুম্বকশক্তি) আছে কিনা প্রশ্ন করা হ'ল। উত্তরে বললেন দয়াল ঠাকুর—কোথায় কী magnetic (চুম্বক) আছে আমি জানি না। আমি বুঝি, জীবনে থাকা চাই loving magnet (ভালবাসার চুম্বক)। তাকে service (সেবা) দেওয়া লাগে, তার কাজ করতে হয়। আর এর ভিতর দিয়েই magnetic power (চুম্বকশক্তি) বাড়ে।

পারিজাতদা—Loving tendency (ভালবাসার প্রবণতা) তো ভেতরের সম্পদ। এটা cultivate (অনুশীলন) ক'রে বাড়ানো যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাড়ানোর process-ই (রীতিই) ঐ তোমরা যা' কর, ঐ meditating activity (ধ্যানময় কর্ম্মতৎপরতা)। ধর্ম্ম হল ধৃতিবিদ্যা। এসব কিছুই অলস চিন্তা না, আবার মেকী ক্রিয়াও না। কারো হয়ত থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখার লোভ আছে। ঐ লোভটা ধৃতিপথে বাড়ায়ে নেওয়া লাগে। তখন সে এর ভিতর দিয়ে যে কতগুণে achieve করবে (পাবে) তার ঠিক নেই।

কিছু পরে ভিন্ন প্রসঙ্গে বলছেন—অনেক পরীক্ষার্থী আছে যারা উত্তর এমনভাবে লেখে যে সেই উত্তরের মধ্যে প্রশ্নে যা' চাওয়া হয়েছে তা' তো থাকেই, তা' ছাড়া তার narration (বর্ণনার রকম)-টাই এমনতর যে পরীক্ষক সেটা দ্যাখে আর ভাবে, 'আমি একে পরীক্ষা করব, না এ আমাকে পরীক্ষা করবে।' ঐ উত্তর হয়ত প্রফেসরকে gallop করে (টপকে) যাচ্ছে। সত্যেন বোস নাকি এইরকম অসম্ভব ছাত্র ছিল। তার খাতায় নাকি হাতই দেওয়া যেত না।

কৃষ্ণ লাহিড়ী—আচ্ছা, এতদিন তো আপনার কাছে আছি। আমার উপর আপনার কিরকম ধারণা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেকথা জিজ্ঞাসা করিস ক্যা?—ভাল। তবে knot (প্রবৃত্তির গিঁট) থাকেই। সেটুকু কেটে গেলেই তুমি কিরকম complete (পূর্ণ) হয়ে যাও দেখো নে। হয়তো একখানা বই পড়ছ। তোমার guardian (অভিভাবক) এসে বলল, 'ওঠ, হারামজাদা! নাওয়া নেই, খাওয়া নেই।' ঐ যে ক'ল, তাতে তোমাকে সরিয়ে নিতে পারল না। তুমি বইয়ের মধ্যে আরো absorbed হয়ে (ডুবে) গেলে। শেষ ক'রে তবে উঠলে। ঐরকম হওয়া চাই। চলার পথে negative (না-বোধক) কিছু আসতে দিও না। (দুঃখের সুরে) কিন্তু আমি মানুষ পেলাম না।

অরুণ—কিরকম মানুষ আপনি চান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে শুনলে এতকাল বসে। এমন মানুষ চাই যার নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ একটাকেও ভাঙা যায় না। কনফুসিয়াস বলে ৮০ জন মানুষ পেয়েছিল। তারাই whole China capture (সমস্ত চীন দখল) করেছিল।

পারিজাতদা—তিনি পেয়েছিলেন না তৈরী ক'রে নিয়েছিলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তৈরী ক'রে নেবার মত মানুষই পেয়েছিলেন। যারা ধ'রে এগিয়ে আসে, তাদেরই তৈরী করা যায়। আর, ধরেও না, করেও না, তাতে কি হয়?

পারিজাতদা—আমরা কি অপরের ভিতর power impart (শক্তি সঞ্চার) করতে পারি না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Power-এর (শক্তির) সাথে যদি process (নীতি) না থাকে তাহলে হয় না। স্টীমকে যদি process (নীতি)-মাফিক না চালাও তবে তার থেকে কি power (শক্তি) পাবে? Power impart (শক্তি সঞ্চার) করতে পারে তারা যাদের ভিতর ঐ তিনটি থাকে—নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ।

পারিজাতদা—সামগ্রিকভাবে নিষ্ঠাবান লোক দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে caste-এর মধ্যে pure আছে। সেই purity (পবিত্রতা) যার যত, নিষ্ঠাও তার তত বেশী। নিষ্ঠা হল being as a whole (সমগ্র সত্তা দিয়ে)। নিষ্ঠা থাকলেই আনুগত্য থাকে, আবার আনুগত্য থাকলেই থাকে কৃতিসম্বেগ।

বিকালে বড় দালানের বারান্দায় বসে শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজী ও বাংলায় কয়েকটি বাণী দিলেন। পরে ভক্তবৃন্দ যাঁরা এলেন, প্রত্যেককেই বাণীগুলি শোনাতে বললেন। শোনানো হ'ল।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণে একখানা প্রশস্ত চেয়ারে এসে বসলেন। পশ্চিমাস্য হয়ে বসেছেন। কিছুক্ষণ পরে পূব আকাশে চাঁদ উঠল। কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার প্রায় পূর্ণচন্দ্রের অমল জ্যোতিতে দয়াল ঠাকুরের মস্তকের পশ্চাদভাগ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তার আভা তাঁর শ্রীমুখমণ্ডলেও এসে পড়েছে। প্রাঙ্গণের সব আলোই নেভানো। এক চন্দ্র আলো করছে জগৎ-সংসার। অদূরে বাঁশের মাথায় একটি ছোট বালব জ্বলছে। তাতে খানিকটা জায়গা স্বল্পালোকিত হয়ে আছে। এদিকে-ওদিকে কয়েকজন দাদা ও মা নীরবে বসে দর্শন করছেন প্রাণবল্লভকে। অপূর্ব্ব এক ধ্যানস্তব্ধ মায়াময় পরিবেশ।

রাত প্রয় ৯টা। পারিজাতদা (রায়) তাঁর ছাত্রদের নিয়ে এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে ওঁদেরও এই নতুন-দেওয়া বাণীগুলি শোনানো হল।

তারপর অরুণ (গাঙ্গুলী) প্রশ্ন করল—প্রতিলোম-জাতকরা যে জন্মগতভাবে দুষ্ট, ইষ্টমুখী হয়ে নামধ্যান করার ফলে তো এদের পরিবর্ত্তন হতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা ক'রে দেখতে পার। যদি হয় তো ভালই। হজরত মহম্মদ বলতেন, একটা পাহাড় ৫০ মাইল দূরে সরে গেছে তা' বিশ্বাস ক'রো, কিন্তু একটা মানুষের প্রকৃতি বদলেছে তা বিশ্বাস করো না।

পারিজাতদা—কিন্তু আমাদের সংস্কার বদলাবার জন্যেই তো আপনাকে ধরেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেগুলি বাড়াবার জন্য ধরেছ। আবার, কিছু cure (সংশোধন) করার জন্যও ধরেছ।

পারিজাতদা—অনেকে বলেন, তোমার ঠাকুর যা' বলেছেন তার অন্তত একটারও materialisation (বাস্তবায়ন) যদি দেখতাম তাহলেও হত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাকে ক'লে হয়, মাস্টার মশাই, আপনার যতগুলি ছাত্র আছে তার মধ্যে একজনও কি আপনি যতখানি think (চিন্তা) করেন তা' করতে পেরেছে?

পারিজাতদা—ভারতের মঠ-মন্দিরের ব্যাপারটা বুঝি, কিন্তু আপনার এটার speciality (বিশেষত্ব) ঠিক—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Speciality (বিশেষত্ব) আছে। তাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তোমরা খাট কোথায়? কেউ কি খাটে? ইউনিভার্সিটিগুলির দুর্দ্দশা দেখলে কষ্ট হয়। একটু একটু ক'রে এগোলেও তোমরা এগিয়ে যেতে পার। হয়তো সময় লাগতে পারে, কিন্তু হবে। আর, পিছিয়ে যাওয়াটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হয়।

অরুণ—অনেকে সৎসঙ্গের কথা ভালভাবে জেনে বুঝে আবার ছেড়ে দেয়। কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলেই বোঝ, তারা কতখানি ভালভাবে বুঝেছে!

অরুণ—আমাদের এই সাধনাটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা যা' করছ তা' আধ্যাত্মিক সাধনা। আধ্যাত্মিক হ'ল অধি-আত্মা। অধি-র মধ্যে ধা আছে। তাই, তোমাদের এই সাধনা হ'ল go of upholdment (ধৃতির চলন)। অবশ্য আজকাল 'আধ্যাত্মিক' কথাটার মানে লোকে অন্যরকম বোঝে। তাই, কথাটা ক্রমেই একঘরে হয়ে উঠেছে। যেমন, কম্যুনিস্টরা ধর্ম্ম শব্দটা শুনলেই নাক সিটকায়। কিন্তু যাতে আমি সুস্থ সবল হয়ে বাঁচতে পারি, বাড়তে পারি, তাই হল ধর্ম্ম। এইভাবে বাঁচার কথা ওরা বক্তৃতায়ও কয়, কিন্তু ধর্ম্ম নামটা কয় না।

দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা উঠল। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Division-এর (দেশবিভাগের) আগে আমি যা' বলেছিলাম তা' করলে হিন্দুও সুখে থাকত, মুসলমানও সুখে থাকত। ঐ সময় আমি দেড়-লক্ষ মানুষ বসাতে পারি এমন জমি কিনে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, যদি কেউ এই প্ল্যানটা take-up করে (হাতে নেয়), তাহলে যেন জমির জন্য baffled (ব্যর্থ) না হয়। (কষ্টের সুরে) ওসব কথা আর ভাবতে ইচ্ছা করে না।

একজন জানতে চাইলেন কায়স্থদের মধ্যে গুহরা কুলীন কিনা! উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য কুলীন মানে ভাবত বোধ হয় কোন title (উপাধি)। কিন্তু কুলীন তারাই যারা কুল রক্ষা ক'রে চলেছে। তাই, সে গুহকেও কুলীন ক'রে দিল। বহু indomitable (দুর্জয়) লোক ছিল কায়স্থদের মধ্যে। কিন্তু গুহরা কুলীন হবার পর কুলীনের মেয়ে বিয়ে করতে লাগল। এইভাবে ঢুকে গেল সূক্ষ্ম প্রতিলোম। তার ফলে, এই কায়স্থ জাতটাই একেবারে সঙ্গতিহারা, যোগ্যতাহারা হয়ে পড়ল।

কথায়-কথায় রাত অনেক হয়ে আসে। এইবার সবাই প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন।

৩০শে বৈশাখ, ১৩৬৭, শুক্রবার (ইং ১৩। ৫। ১৯৬০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর হলঘরে সমাসীন। বেলা ৮-৪৫ মিঃ। বাইরে বেশ গরমের হলকা। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। তারপরে এলেন পারিজাতদা (রায়) তাঁর ছাত্রবৃন্দ-সহ।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাকু সেবন করছিলেন। তামাক খাওয়ার পরে নলটি রেখে বলছেন—সাপকে কেমন ক'রে খেলায় বেদেরা! গায়ে-মাথায় জড়িয়ে মাথার উপর দিয়ে ফণা তোলায়। তা' সাপকে এরকম করা যায়, মানুষকে করা যায় না?

কেষ্টদা—সাপকে ট্রেনিং দিয়ে ওরকমই তৈরি করেছে। ট্রেনারের হাতে পড়লে মানুষেরও হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু সকলের হয় না। আবার পশুকে পারা যায়, মানুষকে পারা কঠিন।

কেষ্টদা—Wilful surrender (স্বেচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণ) না হলে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার, wilful surrender (স্বেচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণ) হলে সে না পারে এমন কামই নেই। কুকুরের তো কথাই নেই। কতকগুলি breed (জাতক) পারে, আবার কতকগুলি breed (জাতক) পারে না। পারে না মানে তাদের পারার বুদ্ধিই হয় না। মানুষের মধ্যেও ঐরকম আছে। বাঘ সহজে পোষ মানতে চায় না, কিন্তু মানুষ তাকে পোষ মানিয়েছে।

কেষ্টদা—বাঘের মত অতখানি quick (দ্রুত) হওয়া চাই, তবে trainer (শিক্ষক) তাকে ঠিক রাখতে পারে। মানুষের মধ্যে যেমন দুর্য্যোধনকে কিছুতেই ঠিক করা গেল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর breed-ই (জন্মই) খারাপ।

কেষ্টদা—আমার মনে হয়, allegiance (আনুগত্য) জিনিসটা God-given (ঈশ্বর-প্রদত্ত) এবং ভাল বংশের উপর নির্ভর করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, বংশটা pure (বিশুদ্ধ) হওয়া চাই।

এই সময় কালীষষ্ঠীমা এসে বললেন—আমার একটা জরুরী 'প্রাইভেট' আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্যভরে একটু টেনে বললেন—আচ্ছা—।

সবাই উঠে একটু তফাতে গেলেন। প্রাইভেট শেষ হলে আবার এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জানতে চাইলেন—অক্সিজেন মানে কী?

পারিজাতদা—অম্লজান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর নাইট্রোজেনের বাংলা কী?

আমি ডিকশনারি দেখে বললাম—যবক্ষার জান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যবের শীষ পোড়ায়ে তাই দিয়ে ঐ যবক্ষার জান তৈরী হয়। মেয়েরা নাকি acid-prominent (অম্লশক্তি-প্রধান)। ওরা আবার টক খেতেও ভালবাসে। ফকফক খেয়ে ফেলায়। (হাসি)। পুরুষ আবার alkaline-prominent (ক্ষারধর্মী)।

পারিজাতদা—মিষ্টি খেতে ভালবাসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ না, আমি তো একেবারে মিষ্টিখোর। ঐজন্য আবার নুনও ভাল লাগে।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খোলা প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন। বেনারস-এর ভাইরা সব আছেন। আজ কয়েকদিন যাবৎ আলোচনায়, ভাবের স্ফূর্তিতে শ্রীশ্রীঠাকুর এদের মাতিয়ে রেখেছেন। এরাও সকাল ও সন্ধ্যা হতে হতেই নেশার ঝোঁকে আসার মত ছুটে আসে ঠাকুরের কাছে।

আজও যথারীতি কথাবার্ত্তা চলছে, কথাপ্রসঙ্গে বলছেন দয়াল ঠাকুর—তোমরা এই যে কত জয়ন্তী কর, কৈ, ঋষি-জয়ন্তী তো করতে দেখি না। আর, জয়ন্তী করা মানে হৈ-হুল্লোড় করা নয়, যাঁর জয়ন্তী করছি তাঁর মহিমা কীর্ত্তন, গুণকীর্ত্তন করা। তাঁর attribute (গুণাবলী)-গুলি স্মরণ ক'রে তোমার চরিত্রের মধ্যে ফুটিয়ে তোল। আর, ভজনও তাই—অনুরাগ, সেবা ও অনুশীলন। ভজনের ভজ্-এর মধ্যে আবার ভাগ করাও আছে। ভাগ ক'রে ক'রে ঠিক করতে হয় কোন্ গুণটা কোন্ মহাপুরুষের ভিতর কিভাবে flare up করেছে (জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে)। এই ভজন বা কীর্ত্তন বাংলা ও সংস্কৃতে একই।

পারিজাতদা—অনেকে কীর্ত্তন মানে খোল-করতাল দিয়ে কীর্ত্তন করাটাই বোঝেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মধ্য দিয়েই আবার অনেকে আসলটাকে pick-up করার (তুলে নেবার) চেষ্টা করে।

পারিজাতদা—ঐরকমভাবে কীর্ত্তন করাটা আমার repel করে (পছন্দ হয় না)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Repel করে (পছন্দ হয় না) কারণ কীর্ত্তনের মানে ঐভাবে বুঝে এসেছ বলে।

পারিজাতদা—ঋষিরা যতদিন থাকেন ততদিন তাঁর উপদেশ পাওয়া যায়। তিনি চ'লে যাওয়ার পর তো আবার ঋষিবাদেরই সৃষ্টি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই ঋষির সঙ্গে যারা থাকে, যারা তাঁর direct (প্রত্যক্ষ) সঙ্গ করেছে, তাদের মধ্যে তাঁর infusion (সঞ্চারণ) থাকে। তারা যখন কয়, ঐ ঋষির কথাই কয়। আমি যখন তা' শুনব, তখন কথাগুলি বোঝার চেষ্টা করব। শালা একলব্য যদি একটা মাটির মূর্ত্তি গড়ে ঐ কাম করতে পেরে থাকে, তুমি পারবে না?

পারিজাতদা—কিন্তু ঋষির absence-এ (অবর্ত্তমানে) তাঁর direct touch (প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ) তো কেউ পাচ্ছে না। আমার যদি ঠিক পথে চলতে হয়, তা' তো শুধু ঐ বাদ দিয়ে হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যে তোমরা আছ। তোমরা মানুষের কাছে যাবে পরাক্রমী নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ নিয়ে। তাদের ঐ পথে impetus (প্রেরণা) দেবে। মানুষের ভিতরের existential urge (সাত্বত সম্বেগ) উস্‌কে দেবে। তার ভিতরে যে ভাব আছে সেটাকে ভাঙ্গবে না। ভাব মানে হওয়ার সম্বেগ। রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলতেন, 'ভাব ভাঙ্গিস্ নে।' ঐ ভাবটা ভেঙ্গে দিলে তার হওয়ার রকমটাই ভেঙ্গে যাবে।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—মানুষ ধর্ম্ম মানে নি। বুঝতেও পারে নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুঝতে পারে নি বলেই মানে নি।

এই সময় তিনটি দাদা এসে হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানালেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও হাত তুলে প্রতিনমস্কার জানালেন। বসাবনদা (সিং) বেঞ্চি এগিয়ে দিলেন দাদাদের বসতে। বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন—ভাইরা কোথা থেকে এলেন?

বসাবনদা—আমার গ্রাম থেকে। ওঁর মধ্যে এক দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—Degeneration (অধঃপতন) আসে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখনকার যিনি prophet (প্রেরিত পুরুষ), তাঁকে না মেনে যখন অন্যকে prophet (প্রেরিত) ধরা হয়, তখন ঐরকম হয়।

প্রশ্ন—কিন্তু ওটা আসে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে false prophet-কে prophet (ভ্রান্ত ব্যক্তিত্বকে প্রেরিতপুরুষ) বলে ধরার থেকেই এটা সুরু হয়। কেন? বাইবেলে আছে না—Beware of the false prophets! (প্রেরিতের ভণ্ডামি যারা করে তাদের থেকে সাবধান!)। False prophet-দের (ভণ্ড প্রেরিতদের) চলা তোমাদের traditional trail-এর (ঐতিহ্যধারার)

সাথে মেলে না। তাদের কতকগুলি শয়তানী প্রবৃত্তি থাকে; যেমন তারা হয়তো বোনকে বিয়ে করার কথা কয়। আর, prophet (প্রেরিত)-দের ধৃতি-উন্মাদনা সহজ সম্বেগে থাকে। তারা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরমাণ। আর, false prophet-দের (ভণ্ড প্রেরিতদের) মধ্যে থাকে স্বার্থ-উন্মাদনা। (একটু থেমে) এসব কথা আমার দেওয়া আছে অনেক, না?

বলা হ'ল, পাবনা থেকেই বহুভাবে দেওয়া আছে।

পারিজাতদা—আপনার প্রধান উদ্দেশ্য man-making (মানুষ তৈরী করা)। হাসপাতাল-স্কুল এসব করার দিকে আপনি বিশেষ নজর দিচ্ছেন না। কিন্তু দুটিই কি এক সাথে চলতে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওসব বুদ্ধি আমার যে নেই তা' না। তবে জীবনে কুলায়ে উঠতে পারছি না। একা তো পারি না। যেমন, ইউনিভার্সিটি করার ইচ্ছা আমার আছে। সেগুলির নাম হবে ঋষিদের নামে। একথা ঢের বলা আছে।

পারিজাতদা—আমার মনে হয়, আপনার ইচ্ছা নেই। ইচ্ছা থাকলে ঠিক হয়ে যেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ইচ্ছার সাথে তোমরা ইচ্ছুক হয়ে ওঠ নি। হজরতের ক'জন ছিল? তার ঠেলাতেই সে emperor (সম্রাট) হয়ে গেল। একটা গান আছে 'সকল কাজের পাই হে সময়, তোমারে ডাকিতে পাই না।' আমি ভাবতেম, আমার সকল কাজই তোমাকে ডাকুক না। রজনী সেনের গানের একটা লাইন আছে 'পাব জীবনে না হয় মরণে'। আমি তা' কই না। আমি কই 'পাব জীবনে, এই জীবনে।'

পূব আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। একবার একটু জোর বাতাস উঠেছিল, আবার পড়ে গেল। মেঘের পিছনে চাঁদের আভাস টের পাওয়া যাচ্ছে। এখন রাত ১০টা। এই জায়গাটা বিকালে জল দিয়ে ভেজানো হয়েছে। তবুও এখনও ঠাণ্ডা হয়নি। বাতাসও গরম।

পরীক্ষায় প্রশ্ন করা নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই যে আজকাল সব প্রশ্ন হয়, কেমন রকমের যেন হয়। প্রশ্ন করতে হয়—What are the characteristics of oxygen? Is there any affinity between Hydrozen and Oxygen? How does it occur?– এইরকম general (সাধারণ)-ভাবে করতে হয়। প্রশ্ন করতে গেলেই ছাত্রদের common sense (সাধারণ বোধ) কতখানি তার test (পরীক্ষা) ক'রে প্রশ্ন করতে হয়। আবার, একজন প্রফেসর যদি মিনিস্টারের থেকেও বেশী respectable (সম্মানীয়) না হয় তাহলে হয় না। অতখানি শ্রদ্ধা তাদের

উপর থাকা চাই। আগেকার দিনে একজন স্নাতক যখন পথ দিয়ে যেত, রাজা তার পথ ছেড়ে দিত।

এ্যালুমিনিয়ম সালফেট নিয়ে কিভাবে প্রশ্ন করা যায় পারিজাতদার একথার উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Can you advise me how shall I obtain Alluminium sulphet তোমার এই জিজ্ঞাসার মধ্যে একটু modesty (দীনতা) আছে। তুমি প্রকৃতিটা জানতে চাইছ। এর ভিতর দিয়ে যে উত্তর দিচ্ছ তার প্রকৃতিটাও তুমি ঐ answer-এর (উত্তরের) মধ্যেই পেতে পারছ। (ক্ষণেক নীরবতার পর) এই যেমন mathematics (গণিত) নিয়ে পড়াশুনা করছ। একটা অঙ্কই কত short-এ (সংক্ষেপে), কত রকমে, কত step-এ (ধাপে) করতে পার, এগুলি বের করতে পারলে একটা mathematical game-এর (অঙ্কের খেলার) মত হয়। ঐ যে কাগজে ক্রস্ ওয়ার্ড বেরোয়, ঐরকমের হয়।

পারিজাতদা—অনেক সময় একটা অঙ্ক হয়তো পারছি না। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যেই তার সমাধানটা পেয়ে গেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান ঘুম দেছেন। ঘুমের মধ্যেও একটা conscious stage (চেতন অবস্থা) থাকে। Con মানে with (সহ), আর science হল sense (বোধ)। তোমার ভিতরে যে intent (অভিনিবিষ্টতা) থাকে, সেটাই active (সক্রিয়) হয়ে উঠে ঐসব কাণ্ড করায়। ছোটকালে এইসব দেখে দেখে বলতাম, intelligent মানে in telling agent. Intuition মানে আমি কই in tuition. Habit-কেও বলতাম have it. কিন্তু প্রতিলোম marriage (বিবাহ)-টাকে আমার সব সময় ভয় করে। যত এগুলো দেখি, তত কাবু হয়ে যাই, hopeless (নিরাশ) হয়ে যাই।

পারিজাতদা—প্রতিলোমের effect (পরিণাম) যে খারাপ এটা আপনার মনে প্রথম কিভাবে এল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ওখানে বহু মুসলমান ছিল, তাদের দেখতাম। তার মধ্যে হিন্দু মেয়ের পেটে যেগুলির জন্ম, তারা হিন্দুর শত্রু বেশী হত। আওরঙ্গজেব ওদের দেখ, সব ঐরকম। আবার পশুর মধ্যেও লক্ষ্য করেছি। অবশ্য কুকুরেরই বেশী দেখা যায়।

মদনদা (দাস)—হিন্দুর মধ্যেই যে প্রতিলোমগুলি হয়, তারা কেমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব ঐরকম। হয়তো তুমি তার উপকার করেছ। সে তা' মনেই রাখে না। ফাঁক পেলেই তোমাকে মেরে দেয়। তুই বিশেষ খেয়াল রাখবি, তোর বংশে যেন সদৃশ ঘরে ছাড়া বিয়ে-টিয়ে না হয়।

ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজল। এখন সবাই প্রণাম ক'রে উঠছেন।

৩১শে বৈশাখ, ১৩৬৭, শনিবার (ইং ১৪। ৫। ১৯৬০)

কাল রাতে অনেকক্ষণ যাবৎ জোর হাওয়া চলেছে। তার ফলে, আজ আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে হলঘরে ব'সে ভক্তগণের সাথে কথাবার্ত্তা বলছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে (ভট্টাচার্য্য) বললেন—দেখবেন, যত বড় ব্যক্তিত্বই হোক, নিষ্ঠা যার নাই, তার আনুগত্যও bastard (জারজ সন্তানের মত), কৃতিসম্বেগও তার quiver করে (স্থির থাকে না)।

হলঘরের ভেন্টিলেটারে দুটি এগ্‌জস্ট ফ্যান আগে লাগানো ছিল। গতকাল আরো দুটি লাগানো হয়েছে। চারটি ফ্যানই একসাথে চলছে। খুব শব্দ হ'চ্ছে। ঐ কথা উল্লেখ ক'রে দয়াল ঠাকুর বললেন—এত শব্দ! এখানে শুধু ঘুমানো যায়, আর কিছু চলে না।

কেষ্টদা—ঘুমও চলে, ধ্যানও চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধ্যান ভাল হয় ফাঁকায়। ঘরের থেকে ভাল হয়। ঐ যে আমি ডিগরিয়া পাহাড়ে বেড়াতে যেতাম, পাহাড়ের এদিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে কয়েক step (পা) হাঁটতাম। আবার, সেখান থেকে খানিকটা নীচে যেয়ে বেশ ফাঁকা। ঐসব জায়গা ভাল।

এই সময় অধ্যাপক পারিজাতদা (রায়) তাঁর ছাত্রদের নিয়ে এসে প্রণাম ক'রে বসলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—গুরুর কাছে passive (নিষ্ক্রিয়) হ'য়ে থাকতে হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Passive (নিষ্ক্রিয়) হওয়া মানে গুরু যা' বলেন তা' work out (বাস্তবায়িত) করা। Passive (নিষ্ক্রিয়) মানে কিন্তু inactive (কর্ম্মহীন) নয়,—otherwise engaged (অন্য কাজে নিযুক্ত) না হ'য়ে তাঁর কাজে লেগে থাকা।

পারিজাতদা—একলব্য তো গুরুর কাছে না যেয়েই বড় হ'ল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু সে গুরুর মূর্ত্তি ক'রে নিয়েছিল কেন? একটা মাটির ঢেলা বা অন্য কারো মূর্ত্তি গড়েও তার পূজা করতে পারত। অথবা কিছুই না ধরলে পারত। তার মানে সে দ্রোণকে জানত, তাঁর attribute (গুণ)-গুলি জানত। তাই তাঁর মূর্ত্তি সামনে রেখে নিজে চেষ্টা ক'রে ঐগুলি achieve (আয়ত্ত) করার চেষ্টা করেছিল। গুরুনিষ্ঠা তার এতখানি যে, গুরুর আদেশে সে নিজের বুড়ো আঙুলটা অক্লেশে দিয়ে দিতে পারল। এরকম যে দিতে পারে তার মহত্ত্ব কতখানি ভেবে দেখ।

এই সময় পারিজাতদা বেশ ভাবের আবেগে ব'লে উঠলেন—আজকাল আমি আপনার কথ বলতে বলতে ভাবাবিষ্ট হ'য়ে পড়ি, অভিভূত হয়ে যাই।

পারিজাতদার দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন দয়াল ঠাকুর—আবিষ্ট হও ভালই, কিন্তু তার মধ্যে activity (কর্ম্ম) থাকা চাই। আর, 'আবিষ্ট'র চেয়ে আমার 'উদ্দীপ্ত' কথাটা বেশি ভাল লাগে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় এসে বসেছেন। সুশীলদা (বসু), অনিলদা (গঙ্গোপাধ্যায়), হরিপদদা (সাহা), উত্তরপাড়ার কেষ্টদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশান্ত নয়নে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছেন। এক সময় আপন মনে বললেন—প্রথম যখন এ বাড়িতে আসলাম তখন এখানকার বেল, আতা আর পেয়ারা গাছে কী ফল। অত ফল আমি একসাথে দেখেনি! যেন একটা শ্রী বিছানো আছে। আবার তেমনি নির্জ্জন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর কেষ্ট রায়চৌধুরীদা বললেন—আপনি কাল আমাকে লোকসম্পদ নিয়ে দাঁড়াবার কথা বলেছিলেন। সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার নিজের experience (অভিজ্ঞতা) থেকে বলছি, মানুষ হ'ল আসল সম্পদ। তাই, সম্পত্তি বাড়ানো লাগে মানুষ-সম্পদ দিয়ে।

কেষ্টদা—মানুষের কিছু ভাল করতে গেলে মানুষ বোকা মনে ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে করল, বয়ে গেল।

কেষ্টদা—টাকা-পয়সা না হলে চলাই মুশকিল। আমার মনে হয়, ব্যবসা করা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ব্যবসা দুই রকমেরই হতে পারে—মানুষের ব্যবসা অথবা দোকানদারীর ব্যবসা। কিন্তু দোকানদারী করতে হ'লেও তা' মানুষ বাদ দিয়ে হয় না। এমন চলনে চলবে, মানুষ যেন তোমাকে তাদের পরম বন্ধু ভাবে। তোমার ব্যবহারের মধ্য দিয়েই ফুটে বেরোবে তুমি কিরকম করনেওয়ালা লোক। তুমি একটু ভাল হ'য়ে নাও, হয়ে যা' কর তাই ভাল। এদিকও ভাল, ওদিকও ভাল।

কেষ্টদা—আপনি সবই তো আমার উপরে ছেড়ে দিলেন।

ভরসা দিয়ে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার উপরে দেব না? করনেওয়ালা যে তুমি, কর্ম্মকর্ত্তা যে তুমি!

এরপর শব্দ ও তার ধাতু নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটা শব্দ ধরলে, সেটা কোন্ ধাতু থেকে এসেছে, তার কী মানে সেগুলি ঠিক

রাখতে হয়। অনেক সময় একটা ধাতু আর একটা ধাতু থেকে বেরিয়েছে এমনও দেখা যায়। Philologically (ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে) যদি বিচার কর তবে দেখতে পাবে সমস্ত ধাতুগুলিরই উৎস সংস্কৃত। সংস্কৃত ধাতুগুলিই কেমন রকমারিভাবে অন্যান্য ভাষার ধাতুতে রূপান্তরিত হয়েছে। কোন্ ভাব থেকে এক একটা ধাতু নেমে এসেছে তার ধারা ঠিক করতে হয়। এসবগুলি দিয়ে একখানা বই লেখা লাগে। ছোটবেলায় যেমন ধারাপাত পড়েছ, এটারও অমনি নাম দিতে হয় 'ধাতুর ধারা'। এরকম বই কিন্তু আর নেই।

সান্ধ্যপ্রণামের পরে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণে বেলগাছটির কাছে এসে বসেছেন। দাদারা ও মায়েরা অনেকে উপস্থিত। মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তা চলছে।

বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে একটি বাণী দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তারপর বললেন—মানুষের মধ্যে অভিমান-আত্মম্ভরিতা যত থাকে, সেখানে বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভাবনাও তত থাকে। আবার, অভিমান-আত্মম্ভরিতা থাকাতে মানুষ স্বার্থান্ধ চলনশীল হ'য়ে ওঠে। অভিমান-আত্মম্ভরিতা অনেক সময় নিষ্ঠাকেও supercede (অতিক্রম) ক'রে যায়।

সন্ধ্যার সময় পারিজাতদা (রায়) ছাত্রবৃন্দ-সহ এসে বিদায় নিয়ে গেছেন। ওঁরা আজ রাতের বেনারস এক্সপ্রেসে যাবেন। এখন শ্রীশ্রীঠাকুর ওদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন—ওরা চ'লে গেছে?

অরুণ (গঙ্গোপাধ্যায়)—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(আপনমনে) ওদের জন্য কষ্ট হয়। কেউ চ'লে গেলেই এরকমটা হয়। আমার মনটাই বোধহয় মানুষ-মাতাল।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। ভক্তগণ যাঁরা প্রণাম করতে এসেছিলেন, প্রায় সকলেই বাড়ি ফিরে গেছেন। এই সময় সৎসঙ্গ প্রেসের কর্ম্মী সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কলকাতায় যেয়ে এম. এ. ও ল'পড়ার অনুমতি চাইল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে অনুমতি দিলেন। এরপর প্রেসের অন্যতম কর্ম্মী কুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এলে তাকে দয়াল জিজ্ঞাসা করলেন—তুইও যাবি নাকি?

কুমারকৃষ্ণ—না ঠাকুর, আমি এখানেই থাকতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হ'য়ে বললেন—তাহলে আমার কাজকামগুলি ভালভাবে দ্যাখ্, আর ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনা কর।

কুমারকৃষ্ণ 'আজ্ঞে' ব'লে প্রণাম ক'রে উঠে গেল। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর শ্রীশ্রীঠাকুর সঞ্জয়দার কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—দ্যাখ্ কিরকম বুদ্ধি! এতকাল

এখানে থেকে মানুষ হ'য়ে, শেষে বাইরে গেল। আমি দেখেছি, এ্যালাউন্স নিলেই মানুষ অন্যরকম হ'য়ে যায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এরকমটা হয় কি এ্যালাউন্স নেবারই জন্য, না চরিত্রের মধ্যেই অন্য কোন কারণ থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চরিত্রের মধ্যেই থাকে। এ্যালাউন্স সেটাকে aggravate করে (বাড়িয়ে দেয়)।

এই সময় খুব জোর বাতাস উঠল। চারিদিকে ধুলো উড়ছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানা ধুলোবালি ও পাতায় ভরে গেল। তিনি বিছানা থেকে নেমে এসে একটা চেয়ারে বসলেন। বিছানাটা ভালভাবে ঝেড়ে দেবার পর বিছানায় উঠে বসলেন। আবার পর পর কয়েকটি জোর দমকা হাওয়া এল। আর এখানে বসা অসম্ভব হ'য়ে ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর চ'লে এলেন বড় দালানের হলঘরে। অনেক রাত অবধি চলল বাতাসের এই দাপাদাপি।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭, রবিবার (ইং ১৫।৫।১৯৬০)

আকাশে ঘন মেঘ থাকায় আজ বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর আর বাইরে যান নি। বড় দালানের বারান্দায় ব'সে শরৎদা (হালদার), সুশীলদা (বসু) প্রমুখের সঙ্গে কথা বলছেন। কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—ইষ্টকেই ভাবতে হয় আমার সর্ব্বস্ব, তিনি আমার wealth (বিত্ত), তিনিই সম্পদ, তিনি ইহকাল, তিনিই পরকাল।

শরৎদা—আপনি লোকচর্য্যা করার কথা বলেন। কিন্তু যারা নানারকম কাজে নিযুক্ত আছে, তাদের লোকচর্য্যা করার সুযোগ কোথায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কয়টা মানুষকে যদি এ্যালাউন্স ছাড়িয়ে আমার কাছে এনে দিতে পারেন তাহ'লে আমি এখনই দেখিয়ে দিতে পারি কী করা যায় আর কী না যায়! এই লোকচর্য্যা ছিল আপনাদের শিক্ষারই অঙ্গ। আগেকার দিনে ছেলেপেলেরা গুরুর আশ্রমে থেকে লেখাপড়া করত। তারা প্রতিদিন ভিক্ষা করতে যেত। ঐ ভিক্ষাটাই ছিল লোকচর্য্যা। যে যা' পেত, নিয়ে আসত। তাই দিয়ে ভোগ হ'ত আচার্য্যের। আর, ওরা তাঁর সেই প্রসাদ পেত।

তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গে শরৎদা বললেন—আপনার একটা ছড়ায় আছে, সংসারটা একটা চাল। তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাল মানে চলন, ব্যবহার। তুমি ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলেই সংসারের ভিতর প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭, সোমবার (ইং ১৬।৫।১৯৬০)

আজ ভোর থেকেই আকাশে কালো মেঘ জমেছে। মাঝে-মাঝে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। টেম্পারেচার অনেক নেমে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর একটা পাতলা জামা গায়ে দিয়েছেন। পার্লার গৃহে আছেন আজ সকালে। লোকজন কাছে কম।

একজন প্রশ্ন করলেন, ক্ষত্রিয় যদি বিপ্রের ঋত্বিক হয় তা'হলে সে ঐ বিপ্রের প্রণাম নিতে পারে কিনা।

উত্তরে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—উপযুক্ত লোক হ'লে তারে সবাই প্রণাম করতে পারে। হজরত মহম্মদকে কি একজন বামুন প্রণাম করবে না? বামুনের করা উচিত। কিন্তু ঐ বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় ঋত্বিকের নেওয়া উচিত না।

এরপরে শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরে চ'লে এলেন। হাউজারম্যানদা এখন আমেরিকায় আছেন। তাঁর সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যোগেশদার (চক্রবর্ত্তী) লেখা জীবনী এক কপি রে'কে পাঠিয়ে দিলে হয়।

আমি বললাম—ওতে নাকি একটু গোলমাল আছে শুনি।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—সেগুলি দাগিয়ে ঠিক ক'রে দিও।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ওরা পারবি নানে। আপনি যদি দেখে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝে কেষ্টদাকে ঐ বই এক কপি দিলাম। তারপর জীবনী লেখা সম্বন্ধে দয়াল বললেন—জীবনীটা যেন জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। প'ড়ে যেন রোমাঞ্চ হয়। জীবিতকালে যা' লেখা তাইই Life (জীবনী), পরে আর Life (জীবনী) হয় না। পরে শুনে শুনে যা' লেখা সেটা নিজের লেখা হয়। সেইজন্য আমরা তাঁদের ঠিকমত পরিবেশন করতে পারি না।

কিছুক্ষণ পরে চুনীদাকে (রায়চৌধুরী) বলছেন—কেষ্টদার কাছে আমার জীবনের naked picture (উন্মুক্ত চিত্র) সব দেওয়া আছে। কিছু বাদ নেই।

কেষ্টদা—যা' জানা আছে সব তো লেখা মুশকিল। কে আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছে তা' আমার দেখা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ একজন লোক আপনিই আছেন।

কেষ্টদা—সুশীলদা (বসু) আমার আগে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার কাছে আমি সব কই নি।

চুনীদা—অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে যা' বইতে লেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বই লেখা অন্য জিনিস।

এরপরে কেষ্টদা বললেন—ভাবছি, আমি কয়েকদিন একটু ঘুরে আসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোথায়?

কেষ্টদা—এই কলকাতা, আশপাশ থেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার যে কথা কওয়ার মানুষ থাকে না। গেলেও কাছেকোলের থেকে ঘুরে আসবেন। তারপর দাঁড়ান, গাড়ী যদি করতে পারি!

কেষ্টদা—গাড়ী হবে কবে, তার জন্য তো আর ব'সে থাকা যায় না।

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭, মঙ্গলবার (ইং ১৭।৫।১৯৬০)

গতকাল শ্রীশ্রীঠাকুর নবনির্ম্মিত এলুমিনিয়মের ঘরে (পরবর্ত্তীকালে নাম পার্লার) রাত্রিবাস করেছেন। ভোরের প্রণাম ওখানেই হয়েছে। সকাল সাড়ে সাতটায় চলে এসেছেন বড় দালানের বারান্দায়।

হায়দ্রাবাদ থেকে আগত দাদাদের নিয়ে এসে হরিনন্দনদা (প্রসাদ) প্রণাম করলেন। পরে কথাপ্রসঙ্গে হরিনন্দনদা জানতে চাইলেন—Better heredity (উন্নত বংশানুক্রমিকতা) পেতে হলে কী করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Heredity (বংশানুক্রমিকতা) ভাল করতে হলে তার process (উপায়) হল সদৃশ কুলে বিয়ে করা। তারপর ছেলেপেলে যা' হবে তাদের শিক্ষা ও culture (কৃষ্টি) যাতে উন্নত ধরনের হয় তার ব্যবস্থা করা। Heredity (বংশানুক্রমিকতা) ব্যতিক্রমদুষ্ট হলে বড় বিশ্রী হয়ে যায়।

হরিনন্দনদা—মেয়ে যদি lower heredity-র (নীচবংশোদ্ভূত) হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো ভাল। তাতে অনুলোম হয়। সেটা অনেক ভাল। এখনকার যে দিনকাল তাতে মনে হয় সমান clan-এ (বংশে) বিয়ে হওয়াই ভাল।

দেবী—সমান clan (বংশ) মানে কি সমান বর্ণ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ছাড়া আর কী?

দেবী—তাহলে এতকাল আমরা যে অনুলোম অসবর্ণের কথা বলেছি তার কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা আমি কচ্ছি এখনকার রকম দেখে, for the time being (কিছুকালের জন্য)। আগেকার দিনে ঋষিরা বংশ দেখে বিচার ক'রে যাতে ভাল result (পরিণতি) হবে তেমনতর বিয়ে দিতেন। এখন বংশগুলির মধ্যে কোন্‌টা কিরকম হয়ে আছে টের পাওয়া মুশকিল। হয়তো একটা বামুনের মেয়ে আর একটা

মেথরের ছেলে একই ক্লাসে পড়ে। একসাথে মিশতে মিশতে তাদের মধ্যে ভাব হয়ে গেল। তারপর মেয়েটা সেই inferior (নীচবংশের) ছেলেটাকে গোপনে বিয়ে করল। Conception-ও (গর্ভসঞ্চারও) হল। প্রথমে লুকালো, পরে আর পারে না। হয়তো তাদের একটা মেয়ে হল। পরে সেই মেয়েটিকে দিল তোমার ছেলের সাথে বিয়ে। দিয়ে দিল তোমার বংশের কাম সেরে। আবার, আর একটা রকমও আরম্ভ হয়েছে। কোষ্ঠীর ছকের মধ্যে অনেকের লেখা থাকে বিপ্রবর্গ। সে নিজে হয়তো বৈশ্য। ঐ লেখা দেখিয়ে বলে, আমি বিপ্র। তারপর বামুনের মেয়ে বিয়ে করে। এইসব হরেক রকম হচ্ছে। একটা spoiling fix-এর (ধ্বংসাত্মক সঙ্কটাবস্থার) মত শুরু হয়েছে। মেয়েদের tendency-ই (প্রবণতাই) হ'ল সংসারটাকে বেঁধে রাখা। তারাই যদি spoiled (নষ্ট) হয়ে যায় তাহলে আর ধরে রাখবে কে!

কথায়-কথায় বেলা প্রায় দশটা বেজে যায়। বহিরাগত ঐ দাদারা প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাকু সেবন করছেন। এই সময় তিত্তিরিদি শ্রীশ্রীবড়মার দেওয়া একখানা নতুন কাপড় পরে আনন্দে প্রায় লাফাতে লাফাতে এসে প্রণাম করল। একগাল হেসে বলল—মা দিছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাহবা দিয়ে বললো—বাঃ বাঃ! একেবারে ডানাকাটা পরীর মত!

তিত্তিরিদি আবার ঐভাবেই লাফাতে লাফাতে চ'লে গেল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ পেয়েথুয়ে খুশি থাকতে চায়। কিন্তু যাকে পেলে সব পাওয়া হয়, তাকে কেউ পেতে চায় না।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় বসে শরৎদা (হালদার), সুশীলদা (বসু) প্রমুখের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা-কিছু সবই ব্যোম-এর মধ্যে অবস্থান করছে। সেইজন্য কয় 'ব্যোম্ বিশ্বনাথ'। ব্যোম হল representation of sound (শব্দের বিন্যাস), যা' ব্যাপ্ত হয়ে আছে সবকিছুর মধ্যে। যা' কিছু সৃষ্টি হয়েছে তাই ব্রহ্ম, আর যিনি সৃষ্টি করলেন তিনি ব্রহ্মা। মহাভারতেও নাকি আছে, ব্রহ্ম মানে বৃদ্ধি। Unit (মূল একক) কিন্তু সেই একই; আর যা' কিছু সব সেই একেরই নানারকম অভিব্যক্তি।

শরৎদা—একেরই যে নানারকম হওয়া, এ তো চলছেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, eternal (শাশ্বত)। (তারপর হাত নেড়ে নেড়ে সুর করে বললেন) 'কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি অবসানা'।

শরৎদা—শঙ্করাচার্য্য জগৎকে মিথ্যা বলেছেন, আপনি বলেছেন নশ্বর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নশ্বর মানে টেকে না, কিন্তু আছে। মিথ্যা বলে কিছু নেই।

শরৎদা—এই জগতে কোন জিনিস কি নাশশীল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Changeable (পরিবর্ত্তনশীল)। নাশ মানে তার element (মৌলিক পদার্থ) সুদ্ধু নষ্ট হয়ে যাওয়া, তা' তো কিছুর হয় না। তার নানারকম change (পরিবর্ত্তন) হতে পারে।

শরৎদা—তাহলে নশ্বর বলতে আপনি বোঝাতে চাইছেন যা changeable (পরিবর্ত্তনশীল)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭, বুধবার (ইং ১৮।৫।১৯৬০)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ সকালে বড় দালানের হলঘরের ভিতরে আছেন, হায়দ্রাবাদের দাদারা কয়েকদিন হ'ল আশ্রমে এসেছেন। আজ রাতে চ'লে যাবেন, এখন এসে সেকথা নিবেদন করলেন দয়ালের কাছে।

শোনার পরে প্রভুর শ্রীমুখমণ্ডল ব্যথাতুর হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন—প্রত্যেকবার মানুষ চ'লে যাওয়ার সময় আমার এইরকম কষ্ট হয়। 'স্মৃতি কাঁদে বক্ষ জুড়ে।' মুখ্যুর অশেষ দোষ। কিছুতেই balance (সমতা) রাখতে পারি না। (তারপর ঐ দাদাদের দিকে তাকিয়ে বললেন) তোমরা আস, বরাবর তো থাকতে পার না আমার কাছে। যাও, যাওয়ার সময় কষ্ট লাগে। সেই কষ্টের মধ্য দিয়ে এই ভেবে আনন্দও আছে যে ওরা ভাল থাকবে, সুস্থ থাকবে, বেড়ে উঠবে।

জনৈক ভাই—'আমাদেরও এখান থেকে যেতে কষ্ট হয়।' আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সব একে একে বেরিয়ে গেলেন। বেলা নয়টার পর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) বোম্বের চন্দ্রকান্ত মেটাদাকে সাথে নিয়ে এসে প্রণাম করলেন। চন্দ্রকান্তদা সপরিবারে এসেছেন।

কেষ্টদা—চন্দ্রকান্তদা কিছুদিন আগে পায়ে চোট পেয়েছিলেন। এখন ব্যথা নেই। তবে সব সময় একটা ভয়, এই বুঝি ব্যথা লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই, মাঝে মাঝে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভাল, তাতে strength (শক্তি) পাবে।

গতকাল যুগান্তর কাগজে সংবাদ বেরিয়েছে যে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা আকাশে শব্দ প্রেরণ করে বাষ্পীয় জলকণাগুলি সংহত করে ককেশাস অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটিয়েছে। আজ সকালে সংবাদটি শ্রীশ্রীঠাকুরকে পড়ে শোনানো হয়েছে।

ঐ কথা উল্লেখ করে প্রভু এখন কেষ্টদাকে বললেন—এই দেখেন, একথা আমি কত আগে আপনাদের কাছে গল্প করেছিলাম। এটা বেরিয়েছে শুনে সুখী হলাম। কিন্তু ভাবি, ভগবান আমাদেরও possibility (সম্ভাব্যতা) দিয়েছিল, আমরা পারলেম না।

বিকাল পাঁচটা। শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় এসে বসলেন। কলকাতার মদনদা (দাস) প্রায় সারা দুপুর ধরে এখানে দু-পাশে ইলেকট্রিক ফ্যান্ লাগাবার চেষ্টা করেছেন। এখন এসে জানালেন—মিস্ত্রিদের দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা ঢিলেমি করতে লাগল, কথাই শোনে না।

মদনদার দিকে একটু ঝুঁকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাল জাত দেখে তুই যদি কয়টা মানুষ জোগাড় করতে পারিস তাহলেই কাম হয়ে যায়। তারা কথা ক'বে মিষ্টি-মধুর, কাজ করবে বিদ্যুৎ। চোখের নিমেষেই সবটা ক'রে ফেলবে। এদের যেন অবাক ক'রে দেয়। তারা এখানে থাকবে, আনন্দবাজারে খাবে, যা' যখন পায় পাবে। কিন্তু কোন bondage (শর্ত) থাকবে না। Bondage (শর্ত) দিলেই আবার কাম খারাপ হয়ে যাবে।

তারপর ছড়া দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

পয়সা নিচ্ছ কাজের নামে
ফয়দা কিছুই দিচ্ছ না,
ফয়দা যদি না দাও তুমি
পাওয়া কিন্তু রইবে না।

রাত আটটা। শ্রীশ্রীঠাকুর হলঘরের ভিতরে এসে বসেছেন। হায়দ্রাবাদের দাদারা ও মায়েরা এখন রওনা হচ্ছেন। হরিনন্দনদা ওঁদের নিয়ে প্রণাম করতে এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হরিনন্দনদাকে) তুমি ওদের সাথে সব গল্প করেছ তো?

হরিনন্দনদা—হ্যাঁ, করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব কিছু কিন্তু না করলে হবে না। করতে হবে। আর, করার প্রথম সোপানই হল নিষ্ঠা। নিষ্ঠা থাকলে যেখানে unsuccessful (অকৃতকার্য্য) হও সেখানে successful (কৃতকার্য্য) হবার সম্বেগ বেড়ে যায়, capacity-ও (দক্ষতাও) বাড়ে। আবার, নিষ্ঠার মধ্যেই থাকে আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ।

দাদারা এবার প্রণাম ক'রে বিদায় নিচ্ছেন। স্নেহময় পিতার মত ব্যাকুল কণ্ঠে বলে দিলেন পরম দয়াল—যেয়েই কিন্তু চিঠি লিখো।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭, বৃহস্পতিবার (ইং ১৯।৫।১৯৬০)

সকাল সাড়ে আটটা। হলঘরে বসে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সাথে নানা কথা বলছেন। কথাপ্রসঙ্গে দয়াল বললেন—ফিজিক্স বলতে যেটুকু বলা হয় তাই-ই কিন্তু ফিজিক্স-এর সব না। বরং বলা যায়, ফিজিক্স evolve করল (আরম্ভ হ'ল) সেখান থেকে।

কেষ্টদা—যা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তা' থেকে অতীন্দ্রিয়ে যাওয়া হ'ল ফিজিক্স-এর কথা।

একটু পরে আনমনাভাবে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—শব্দের ভেতরের vibration-টাকে (স্পন্দনটাকে) যদি manipulate (নিয়মিত) করা যায় তাহ'লে within a few minutes (কয়েক মিনিটের মধ্যেই) এই buildingটাকে dust (দালানটাকে ধুলো) ক'রে দেওয়া যায়।

তারপর বলছেন—আমার মনে হয়, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই অনেক power-ই gifted (শক্তিই দেওয়া) থাকে। সেগুলি culture (অনুশীলন) করলেই জাগানো যায়।

কেষ্টদা—আপনার তো naturally-ই (স্বাভাবিকভাবেই) ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Naturally-ই (প্রকৃতিগতভাবে) সবারই থাকে। ঐ যেমন মানুষ চেনার গল্প করেছিলাম আপনাদের কাছে। সে পদ্মা ছিল ভীষণ পদ্মা। তখন দেখেই ভয় করে। একটা বটগাছ ছাড়া আর সবই ডুবিয়ে দিয়েছিল। তখন স্টীমারঘাটায় কুলিগিরি করতাম। সেই period-এ (সময়ে) দূরে স্টীমারের মধ্যে লোক দেখে চিনতে পারতাম। সে দূরত্বটা বোধ হয় এখান থেকে কাহারপাড়া-টাড়া হবে। ঐ স্টীমারঘাটায় কতদিন মা'র জন্য যেয়ে বসে থাকতাম। দূরের থেকে স্টীমার আসত। আমাদের একটা round table (গোলাকার টেবিল) ছিল, সেটা আপনিও দেখেছেন, সেটা নিয়ে মা স্টীমারে আসছে। দূর থেকে দেখেই আমার সে কী আনন্দ!

কেষ্টদা—মনে হয় ওটা spontaneously (স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে) আসে, কসরত ক'রে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা করে তাদের spontaneous (স্বতঃস্ফূর্ত্ত) হয়ে আসে, শেখানো লাগে না। এই যেমন আমি হুজুর মহারাজের কাছে মা'র নামে নালিশ করতাম। বলতাম, 'দেখ হুজুর মহারাজ, : মা আমাকে মারল।' মনে কষ্ট হলে চ্যাংড়ারা যেমন করে আর কি! এই সমস্ত বুদ্ধি আমার আপনা থেকেই হ'ত। এক একটা কাজ করার জন্য পরিশ্রম করছি বলে বোধই হত না। ঐ যে আছে—

'ভালবাসার নিদানে
পালিয়ে যাওয়ার বিধান বঁধু
লেখা কোন্‌খানে?'

আবার দ্যাখেন, কারো কারো বংশের একটা রকম আছে, তারা নিষ্ঠাটা সহজভাবেই ধরে থাকে। তার জন্য কসরত করতে হয় না। নিষ্ঠাটা কেমন? যেমন মায়ের উপর সহজ টান। আমার যেমন আপনাকে না হলে চলে না। আপনি কলকাতায় যাবেন শুনলেই মনে—(নৈরাশ্যের স্বরে) চলে যাবেন! এটা শিখিয়ে দেওয়া যায় না। সেইজন্য বিয়ের বেলায় আমি baseline-টা (বিশুদ্ধ বংশধারাটা)

ঠিক রাখতে অত ক'রে কই। এর ভিতর দিয়েই নিষ্ঠাটা spontaneous (স্বতঃস্ফূর্ত্ত) হয়ে উঠতে পারে। আর তখন যদি কোন stroke-ও (চোটও) আসে তাকেও manipulate (নিয়ন্ত্রিত) করতে পারবেন।

কেষ্টদা—আমি দেখছি, যাজনে আমার কথা যেন অনেক কমে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা মানুষকে হয়তো 'কর' বললে করে না। দেখবেন তার leaning-টা (ঝোঁকটা) কোন্‌দিকে। তাই বুঝে তাকে deal (ব্যবহার) করতে হয়। যেমন passionate crave-ওয়ালা (প্রবৃত্তির টান-ওয়ালা) মানুষ আছে। তাদের ঐ crave-টাকে (টানটাকে) যদি concentric (ইষ্টকেন্দ্রিক) ক'রে দিতে পারেন তাহলেই হয়। ব্যতিক্রমদুষ্ট হয়ে পড়লে তা' নষ্টের দিকে যাবেই।

কেষ্টদা—আমরা যা' চালাই তা' শুধু কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা চালাবার মধ্যে যদি character ও behaviour (চরিত্র ও ব্যবহার) না থাকে, manipulating tendency (নিয়মনী প্রবণতা) না থাকে, তাহলে তো হবে না। কথা কওয়ার সাথে ওগুলিও দরকার। সেইজন্য আগে এই কাজ ছিল বামুনদের। অন্যজাতিকে করতে দিত না। কেন? কারণ তারা তা' পারবে না, ভেঙ্গে দেবে। আর, সবাই এ কাজ পারেও না। আমাদের ব্যবস্থা যে খারাপ ছিল তা' আমার মনে হয় না। এই India (ভারতভূমি)! কত আঘাতের ভিতর দিয়েও stand ক'রে (দাঁড়িয়ে) আছে। কিন্তু এই কাজে female (স্ত্রীলোক)-দের টানলে পরেই এর মধ্যে infection (দুষ্ট সংক্রমণ) ঢুকে যাবে। আর, সেটা এত dangerous (বিপজ্জনক) হবে যে কওয়ার না। Female (স্ত্রীলোক)-দের আলাদা স্থান আছে। আর, সেটা মোটেই কমা না। এই যেমন পণ্ডিতের মা আছে। আপনার বাবা মরলে তার পূর্ণ অশৌচ। কিন্তু তার নিজের বাবা মরলে শুধু তেরাত্তির পালন আর ভোজ্য-উৎসর্গ। সে তার বাপের বাড়ীর সম্পত্তির ধার ধারে না। আপনার কাছ থেকে যা' পায় তাইই তার সম্বল।

কেষ্টদা—আপনি লোকজন দিয়ে যে সংসার বাড়িয়ে দিয়েছেন, এখন তার ঘুমই হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় বৌ-এরও ঘুম হয় না। আমার থেকে তার দায়িত্ব যেন বেশী। তার ঘুম কুকুরের মত (স্বল্পস্থায়ী)। আপনার কাছে শুনেছিলাম, এরকম ঘুম ভাল। আবার, ঘরের কোথায় কী আছে, সব ঠিকমত রেখে দেছে। যখন যেটা চাই, ফক ক'রে বের করে দেয়। Out of necessity (প্রয়োজনের তাগিদে) ঐরকম হ'য়ে গেছে। আর, চোখ ঠিক সার্চলাইটের মত। সব ধ'রে ফেলতে পারে। আর একটা জিনিস দেখি বড়বৌ-এর মধ্যে। যে যা' পাবে, সে আধ-পয়সাই হোক আর এক পয়সাই হোক, দিয়েই দেবে যত তাড়াতাড়ি পারে। আর, অন্যরা—দিতেই চায় না।

এর পর শব্দ ও তার স্পন্দন নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা যখনই কোন শব্দ শুনি, আমাদের নার্ভগুলিতে তেমনতর physiological change (দৈহিক পরিবর্ত্তন) ঘটে, ঐ inspiration transmitted (প্রেরণা সঞ্চারিত) হয়, তাই শব্দ শুনতে পাই। সব-কিছুরই একটা physiological basis (বাস্তব ভিত্তিভূমি) আছে। ঢং ঢং ক'রে যখন ঘড়ি বাজে, আমার নার্ভের মধ্যে তখন অমন tremor (কম্পন) হ'চ্ছে। তাই, শুনতে পাচ্ছি। আবার, নার্ভ যদি physical (দেহগত) হয় তাহলে আমার tissue, cell (পেশী, কোষ) যা'-কিছু সেগুলিও physical (দেহগত)। সেইজন্য শব্দটা আমি বোধ করি with all my existence (আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে)। আবার, এই বোধটা জাগিয়ে রেখেছে আমার existential thrill (সাত্বত স্পন্দন)। আপনি কইছিলেন, পিঁপড়ের পায়ের sound (শব্দ) শোনা যায় না—super sonorous (অতিশাব্দিক)। কিন্তু এমন instrument (যন্ত্র) তৈরী করা যেতে পারে যার সাহায্যে ঐ শব্দও শোনা যায়।

কেষ্টদা—শব্দব্রহ্মকে তো অবাঙ্-মনসগোচরম্ বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবাঙ্মনসগোচর যদি কই তাহ'লে তা' গোচরে আসে কি ক'রে? বোধের আওতায় যা' নাই তা' আমরা ঠিক পাই না, হয়তো চিন্তা দিয়ে discern (নির্ণয়) করতে চেষ্টা করি।

এগারোটা বেজে গেল। আর আট মিনিট পরে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠবেন। আজকাল এই সময়েই ওঠা চলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক চাইলেন। এনে দেওয়া হ'ল। তামাক খেতে খেতে বলছেন—আবার, টিউনিং ফর্ক্ দিয়েও শব্দ শোনা যায়। আস্তে আস্তে শব্দ ক'মে আসে। তারপর কানের কাছে একটা thrill prominent (স্পন্দন প্রধান) হ'য়ে থাকে। তার মানে, sound-এর (শব্দের) মধ্যে যে কম্পন আছে সেটা prominently (স্পষ্টভাবে) বোঝা যায় ঐ অবস্থায়। Thrill-টা (স্পন্দনটা) চলতে থাকে রোঁয়ায় রোঁয়ায়। প্রথম দিকটা যেন sound-prominent thrill (শব্দপ্রধান কম্পন), আর পরেরটা যেন thrill-prominent sound (কম্পনপ্রধান শব্দ)। ঐ যে কাঁপুনিটা, ওটাই শব্দে evolve করে (উৎসারিত হয়)।

সময় হয়ে গিয়েছিল। এবার সবাই প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন। দয়াল ঠাকুরও গড়গড়ার নল রেখে মুখ মুছলেন গামছা দিয়ে, তারপর উঠে চটি পায়ে দিয়ে বাথরুমে গেলেন।

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭, শুক্রবার (ইং ২০।৫।১৯৬০)

প্রাতে হল্‌ঘরে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সাথে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলছেন। নিষ্ঠা সম্বন্ধে কথা উঠতে বললেন—নিষ্ঠা-আনুগত্যওয়ালা কয়টা মানুষ

হ'লেই হয়। কনফুসিয়াস নাকি ৮০ জন মানুষ পেয়েছিল। পারেন না ওরকম কয়েকটা মানুষ জোগাড় করতে? একটা মানুষ হ'লেই হয়।

এর পর জ্ঞান সম্বন্ধে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে দয়াল ঠাকুর বললেন—দুনিয়ায় যা'-কিছু হয়ে আছে, প্রতিটিই একটি বিশেষ। সেই বিশেষের অভিব্যক্তি কেমন ক'রে হ'ল, সেই এক-ই কেমন ক'রে এত বৈশিষ্ট্যে স্ফুরিত হ'য়ে উঠেছে, উঠে থাকছে; আবার সৃষ্টি যা' হ'ল তার কোন্টার সাথে কোন্টার difference (পার্থক্য) কী এবং কতটা, এগুলি সব study (পর্য্যবেক্ষণ) ক'রে একটা adjustment-এ (সাম্য-নিয়ন্ত্রণে) আনতে পারলেই জানা হ'ল। যদি সব কিছুর গোড়ায় থাকে vibration (স্পন্দন), তাহ'লে সেই vibration (স্পন্দন) থেকে এতগুলি সব হয় কি ক'রে, তাও জানতে হবে। এই যে পরিণতি বা পরিবর্ত্তন, এ ঐ এক vibration-এরই (স্পন্দনেরই) বিভিন্ন measurement (পরিমাপ)। এর আবার ওঠানামা আছে। কিরকম হয়! (বিছানার উপর আঙ্গুল দিয়ে ঢেউয়ের মত আঁকতে আঁকতে)—এই উঠল, এই নামল। এইভাবে চলছে। এটা (ওঠাটা) যেখানে applicable (প্রযোজ্য), ওটা হয়তো সেখানে applicable (প্রযোজ্য) নয়। এটা (ওঠা) যেখানে বেঁচে থাকে ওটা (নামা) সেখানে ম'রে যায়।

কেষ্টদা—দু'য়ে মিলে এক যেখানে, সেখানেই বহুর সৃষ্টি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sperm (শুক্রকীট) আর ovum (ডিম্বকোষ) সহযোগেই সব কিছুর সৃষ্টি। কিন্তু এগুলি এমনভাবে manipulated (নিয়মিত) হয়েছে যে কোথাও যেয়ে সাপ হয়েছে, কোথাও যেয়ে ব্যাং হয়েছে, কোথাও যেয়ে গুবরে পোকা হয়েছে, কোথাও যেয়ে সিংহ হয়েছে। — এইরকম বিভিন্ন manifestation (প্রকাশ)। আপনি একবার গল্প করেছিলেন, একটা লতা তার ওঠার জন্য নানারকম device (পদ্ধতি) নেয়। তাই মনে হয়, লতারও বিবর্ত্তনের একটা নিজস্ব trail (ধারা) আছে। (একটু থেমে বলছেন) আমার কী যেন একটা আছে—আদি বাক্।

কেষ্টদা—'চলার সাথী'তে বোধ হয়। নিয়ে এস তো!

চলার সাথী বইখানা এনে দিতে বইখানা হাতে নিয়ে কেষ্টদা 'সৃজন-প্রগতি'র প্রথম বাণীটি পড়লেন—

'ক্ষুব্ধ সম্বেগে
 অব্যক্তের বুকে
 দ্রুত ব্যঞ্জনায়
বিঘূর্ণিত সত্তার
 উচ্ছৃষ্ট-বিচ্ছুরণ-সংবিদ্ধ
 সংঘাতকম্পিত
 ছন্দে ভাসমান

শক্তি-শরীরী
প্রতিধ্বনিই
আদিবাক্—
সৃষ্টির প্রথম প্রগতি।'

শ্রীশ্রীঠাকুর একমনে শুনছিলেন বাণীটি। পড়া হ'য়ে গেলে স্মিতহাস্যে বললেন—ঐ দেখেন, ঐ language-ই (ভাষাই) কেমন! ক'লেম কি ক'রে ভা'বেই ঠিক পাই নে।

The Message বইতেও এরকম সৃজন-প্রগতি দিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সেকথা উল্লেখ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—বাংলাই আগে কইছিলাম, না ইংরাজী আগে কই?

কেষ্টদা—আগে বাংলা বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওগুলো যে বেরোল, আমরা কিন্তু মনেই হয় না যে (হাত ঝাড়া দিয়ে) ওসব আমি dictate করেছি (বলেছি)।

কেষ্টদা—আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমাদের চলার জন্য কী কী দরকার। তার উপর ভিত্তি ক'রেই এই চলার সাথী। পরে আপনি বললেন, সৃষ্টিতত্ত্বের চলার সাথে না মিললে কি চলা হয়? তারপর এটা (সৃজন-প্রগতি) বললেন। বলার পরে আপনাকে বললাম, পুরাণে প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব থাকে, আপনার এটা ঠিক সেরকম হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই সমস্ত বইগুলি, conversation (কথোপকথন)-গুলি এসব-তার মধ্যে আপনি আছেন। কখনও ভাবতেই পারতেম না যে এসব লেখার দরকার। 'নানাপ্রসঙ্গে' থেকে conversation (কথোপকথন) আরম্ভ হয়েছে। তারপর আপনি বললেন, সব কথাই তো হ'চ্ছে, এগুলি ইংরাজীতে কইলে হয়।

এইসময় বোম্বের চন্দ্রকান্তদা (মেটা) এসে প্রণাম করলেন। তাঁর পায়ে ব্যথা ছিল। তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ সকালে আমি অনেকদূর হাঁটলাম without any support (কোন সাহায্য না নিয়েই)। তোমায় দেখে মনে হয়, তুমিও অনেক improve (উন্নতি) করেছ।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায়। তামাক সেজে এনে দেওয়া হ'ল। গড়গড়ার নলটি ধ'রে দুটি টান দিয়ে কিছু ধোঁয়া ছাড়লেন মুখ দিয়ে। তারপর নলটি রেখে দিয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছলেন। পরে বললেন—আজকাল আমার তামাক খাওয়ার habit (অভ্যাস) পালটে গেছে। ৫/৬ টান দিয়ে ছেড়ে দিই। আগে অন্যরকম ছিল।

এইসময় পাটনা থেকে ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এসে প্রণাম ক'রে বস্‌ল। শ্রীশ্রীঠাকুর তার কাছে তার নিজের এবং তার বাড়ীর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন।

কিছুক্ষণ বসার পর ভাস্কর প্রশ্ন করল—আচ্ছা ঠাকুর! কোন অভ্যাস যদি আয়ত্ত করতে চাই তাহ'লে কী করতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যেটা আয়ত্ত করতে চাইছ, সেটা হয়তো অভ্যাস হ'ল না। আবার ধর, আবার কর। এইভাবে নিরন্তর চেষ্টা নিয়ে লেগে থাকলে ঠিক হ'য়ে যাবে। অভ্যাস মানে জান তো?—অভি-অস্, মানে সেইদিকেই থাকা।

সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরে এসে বসেছেন। হরিনন্দনদা (প্রসাদ), অমৃতদা (দেশাই), ক্ষিতীশদা (রায়), নিখিলদা (ঘোষ), শরৎদা (হালদার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), অরুণ (গঙ্গোপাধ্যায়) ও আরো অনেকে উপস্থিত।

কয়েকদিন আগে শ্রীশ্রীঠাকুর sound (শব্দ)-সম্বন্ধে একটি লেখা দিয়েছেন। এখন তাঁর নির্দ্দেশে নিখিলদা (ঘোষ) লেখাটি প'ড়ে শোনালেন উপস্থিত দাদাদের। বাণীটির মধ্যে আছে, আমি যদি কোন sound wave-কে (শব্দতরঙ্গকে) নিষ্ক্রিয় করতে চাই তাহ'লে তার anti-vibration (বিপরীত অনুরণন) সৃষ্টি ক'রে তা' করা সম্ভব।

বাণীটি শুনে শরৎদা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের একটি পুরাতন ঘটনা উল্লেখ ক'রে বললেন—একবার সেই একজন পাখী মারছিল। আপনি তার বন্দুকের দিকে তাকালেন। তারপর যতবার সে 'ফায়ার' করল, 'ফায়ার' আর হ'ল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, আমি আর কিশোরী যাচ্ছিলাম। একটা জায়গায় অনেকগুলো কাঠ ছিল। সেখানে একটা ঘুঘু ডাকছিল। একজন ঐ ঘুঘুটাকে 'ফায়ার' করবে। আমি এমনভাবে থমকে দাঁড়ালাম, তার দিকে তাকালাম যে তার বন্দুক থেকে 'ফায়ার' হ'ল না। পর পর তিনবার চেষ্টা করল, তিনবারই fail করল (ব্যর্থ হ'ল)। এটা হয়তো অন্য কারণেও হ'তে পারে। কিন্তু পর পর তিনটা কাট্রিজ্ই fail করল (ব্যর্থ হ'ল)।

এর পর পৃথিবীতে যে যুদ্ধাতঙ্ক চলছে সেই প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হ'ল। শরৎদা বললেন—বর্ত্তমানে জগতের যে অবস্থা, এখন India-এর (ভারতের) position (সংস্থিতি) কেমন হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—India-র stand (ভারতের পরিস্থিতি) খুব ভাল ছিল। এরা নিজেরাই নষ্ট করেছে নানারকম কাণ্ড ক'রে। আমার মনে হয়, neutral (নিরপেক্ষ) থাকাই ভাল। তাতে সকলের friend (বান্ধব) হ'য়ে থাকা যায়। আর, neutral (নিরপেক্ষ) থাকলেও অন্যান্য প্রত্যেকটি country (দেশ) থেকে অন্ততঃ ten times preparation (দশগুণ প্রস্তুতি) থাকা চাই। কারণ, আমি যত ভালই হই, শয়তান তার কাজ করবেই। যদি প্রয়োজন হয়, তাকে যেন বাধা দিতে পারি।

শরৎদা—আমাদের কী করা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের খুব strongly adjusted (শক্ত রকমে নিয়মিত) হওয়া উচিত। খুব normal (প্রকৃতিস্থ) হওয়া উচিত। নিজেদের fellow-feeling (পারস্পরিকতা-বোধ) এমন হওয়া উচিত, আমাদের মধ্যে কেউ এলে যেন মনে করে—শান্তির সমুদ্রে এসে পড়েছি।

শরৎদা—কিভাবে চলা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি অনেক আগের থেকেই কচ্ছি, তা' শুনলে হ'ত। আপনারাও আমার কথা কম শোনেন। গভর্নমেন্ট তেমন tactful (কৌশলী) না। আপনারা যদি তাজা হ'তেন, কী যে হ'ত কওয়া যায় না। আজ India-র (ভারতের) নিজের অবস্থা সুবিধেজনক নয়, সব জায়গায় বিরোধ। যদি আজ India-টাকে (ভারতটাকে) ঠিক ক'রে দিতে পারতেন—(কণ্ঠে তাঁর হতাশার সুর)। এই যে divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) ইত্যাদি ক'রে আমাদের অবস্থা আমরা আরো খারাপ করলাম, আমাদের base (ভিত) নষ্ট ক'রে দেওয়া হল, tradition-এর (ঐতিহ্যের) গোড়াই ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল। এখনও আপনারা যে কয়টা লোক আছেন, তাদেরও ভাঙ্গার চেষ্টা করা হ'চ্ছে। Pure line (বিশুদ্ধ বংশধারা)-গুলি ভাঙ্গা যে কত খারাপ তা' আর কওয়ার না। এর ফলে pure breed (পূতচরিত্রের সন্তান-সন্ততি) আর পাওয়া যাবে না। আমাদের বুদ্ধি হ'ল সবাইকে চাকর করার বুদ্ধি, independent (স্বাবলম্বী) করার বুদ্ধি না, freedom (স্বাধীনতা)-টাকে enjoy (উপভোগ) করার বুদ্ধি না। আবার কতকগুলি মানুষ আছে যারা চাকর থাকতেই ভালবাসে। এ সব পুরানো কথা! বারে বারে ব'লে কী হবে! (একটু থেমে) যত বড় বড় লোক দেখেন, অনেকে গরু খায়। আমাদের আবার এতই slave mentality (দাস-মনোবৃত্তি) যে তারা যখন খায়, তাদের দেখাদেখি আমরাও খাই। আজ ছেলেপেলেরাও খাওয়া আরম্ভ করেছে। ঐ যে এক ডাক্তার এসেছিল এখানে, খেয়েদেয়ে হাত না ধুয়ে রুমালে হাতমুখ মুছল। Tradition, culture (ঐতিহ্য, কৃষ্টি) সব ওখানেই মিস্‌মার ক'রে দিল। এসব লোকের আর অপরের slave (চাকর) হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমি যে-ভক্তির কথা আপনাদের বলেছি তা' কাউকে balance (সাম্য)-হারা করবে না, খোঁড়া করবে না। যদি আপনারা idleness (অলসতা) বাদ দিয়ে তার অনুশীলন করতেন, যদি ১০/১৫ কোটি সৎসঙ্গী ক'রে ফেলতে পারতেন, তাহ'লে আপনাদের বিরাট hold (শক্তি) হ'য়ে যেত। আজ যত লোক দীক্ষিত হয়েছে তার মধ্যে active (সক্রিয়) নিষ্ঠাওয়ালা সৎসঙ্গী কম আছে। তবুও এদের মধ্যে যা' আছে তা' অনেকের মধ্যে দেখা যায় না। পারস্পরিকতা এদের মধ্যে এত আছে যে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আর একটু nurture (পোষণ) দিলেই দেখা যেত কী হ'তে পারে, বাবারে বাবা! (সেই পরম সম্ভাব্যতার চিত্র মানসনয়নে দর্শন ক'রেই যেন ঠাকুর চমকিত ও পুলকিত হ'য়ে উঠলেন)।

একমনে সবাই শুনছেন দয়াল ঠাকুরের অমিয় কথানির্ঝর। এক ঘর লোক, সবাই নিস্তব্ধ। শুধু পাখাগুলির একটানা শব্দ শোনা যাচ্ছে। কথার শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর বালিশটি টেনে নিয়ে একটু কাত হ'লেন বিছানায়।

কুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সামনে ব'সে আছে। তার দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওর বাবার রোখ ছিল খুব।

রাত প্রায় ৯টা বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে ঘুম-ঘুম ভাব। বালিশে মাথা রাখলেন তিনি। সবাই প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন। ঘরের আলোগুলি নিভিয়ে দেওয়া হ'ল। রাত ১১টা পর্য্যন্ত ঘুমালেন। তারপর ১১-৮ মিনিটে উঠে বাথরুমে গেলেন।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭, শনিবার (ইং ২১।৫।১৯৬০)

গত রাতে বেশ খানিকটা ঝড়বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। আকাশও মেঘলা। শ্রীশ্রীঠাকুর পার্লার থেকে হল্‌ঘরে এসে বসলেন। জ্ঞানদা (গোস্বামী) এলেন। হাতে নবপ্রকাশিত হিন্দী 'সাত্বত' পত্রিকার কয়েকটা কপি।

জ্ঞানদাকে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর উৎফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে! কী খবর ক'বি?

জ্ঞানদা—আজ্ঞে, এই পত্রিকা।

ব'লে প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরের কপিখানা দিলেন আমার হাতে। পরে অন্যান্যদের নাম কপিগুলিতে লিখে নিয়ে উঠে গেলেন। তিত্তিরিদি এসে সামনে দাঁড়াল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকালে কী খাইছস্?

তিত্তিরিদি—রুটি আর চা।

ইতিমধ্যে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে প্রণাম ক'রে বসেছেন। এখন বললেন—যা' হয় না এমন কথা বা গল্প বিশ্বাস করার খুব ক্ষমতা আছে ছেলেপেলের। এটা কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বাস হ'ল মানে সেটাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তাই তার নাম বিশ্বাস। সেইজন্য ছেলেপেলেদের কাছে rationally adjusted (যুক্তিপূর্ণভাবে বিনায়িত) গল্প-টল্পগুলি ক'লে ভাল হয়।

কেষ্টদা—আপনি বলেন, কোন কাজে বিশ্বাস ক'রে এগোনো ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা কই এইজন্য যে তাহ'লে যেটা পেতে চাই সেটা পেতে পারি।

কেষ্টদা—কেউ এসে আমার কাছে বলল, সবুজ দাড়িওয়ালা একটা ভালুক আকাশ থেকে নামল। সেটা বিশ্বাস করি কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও কথাটা সে কী দেখে বলল তা' দেখবেন। হয়তো বড় ইঁদুরের মত কোন জানোয়ার গাছ থেকে নেমেছে। তাই দেখে ওরকম একটা ভেবেছে। বিশ্বাস বলতে আমরা সাধারণতঃ যা' বুঝি তা' কিন্তু না। বিশ্বাসের মধ্যে আছে প্রশ্নশূন্য হওয়া, আর তার জন্য চাই বাস্তবের সাথে সংযোগ।

কেষ্টদা—আপ্তবাক্য তো বিশ্বাস করতেই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপ্তবাক্য মানে তাঁর কথা যিনি দেখেছেন, যিনি জানেন, achieve (অধিগত) করেছেন।

এই সময় হরিনন্দনদা (প্রসাদ) দুইজন ভদ্রলোককে নিয়ে এসে প্রণাম করলেন, পরিচয় দিলেন, এঁরা শিক্ষক, আসানসোলে থাকেন।

সবাই বসার পরে দয়াল ঠাকুর সস্নেহে বললেন—মাস্টার মশাইরা এলেন, আমার খুব ভাগ্যি, থাকবেন এখানে?

ওঁরা বললেন—কাল সকালে যাব।

শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে জানতে চাইলেন হরিনন্দনদা। উত্তরে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—মাস্টার মশাইরা তাঁদের স্কুলে ছেলেদের ideal (আদর্শ) হবেন। তাঁদের উপর ছাত্রদের থাকা চাই নিষ্ঠা, আনুগত্য এবং কৃতিসম্বেগ।

একজন শিক্ষক—আমাদের স্বামী দয়ানন্দ-প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজের স্কুল। সেখানে এই আদর্শই চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসল শিক্ষাই তো ধর্ম্মকে জানা। ধর্ম্ম মানে যা' আমাদের ধ'রে রেখেছে—কোন্‌টা কোথায় কিভাবে করতে হয়, কিভাবে চলতে হয়! সব জানাটা যেন existence-কে (অস্তিত্বকে) fulfil (পরিপূরণ) করে। Existence (সত্তা) বাদ দিয়ে যে জানা তাতে আত্মনিয়ন্ত্রণ হয় না।

উক্ত শিক্ষক—আমাদের education (শিক্ষা) তো এখন শুধু literation (আক্ষরিক জ্ঞান)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য আমরা এগোতে পারি না। আমাদের character adjusted (চরিত্র নিয়ন্ত্রিত) হয় না। অনেক কিছুই আমরা বুঝতে পারি না। বলা আছে, 'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ'। সেই আচার শেখাবেন মাস্টার মশাইরা। এই যে বলে প্রধান শিক্ষক। প্রধান মানে প্র-ধা-ন, অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে প্রকৃষ্টকে ধারণ করার শিক্ষা যিনি দেন তিনিই প্রধান শিক্ষক। ছেলেপেলেকে এমনভাবে handle (চালনা) করতে হয় যেন তারা মাস্টার মশাই ছাড়া আর কিছু না বোঝে। যত এমন ক'রে তুলতে পারবেন, তত ছাত্রদের হাতে পাবেন।

উক্ত শিক্ষক—আজকালকার কথা হ'চ্ছে, শিক্ষক যা' বলেন তাই কর, শিক্ষকের অনুসরণ না করলে শিক্ষাও হবে না।

ভদ্রলোকেরা আরো কিছুক্ষণ বসার পরে বিদায় প্রার্থনা করলেন। বললেন—এখন যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার সুবিধা হ'লে আসবেন।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর হলঘরে আছেন। আজ আমেরিকা থেকে হাউজারম্যানদার চিঠি এসেছে। তিনি জানিয়েছেন, আমেরিকায় দুইটি মত আছে—Christ is a practical man (খ্রীষ্ট একজন বাস্তববাদী পুরুষ) এবং Christ is a divine personality (খ্রীষ্ট একটি ভাগবত ব্যক্তিত্ব)। হাউজারম্যানদা জানতে চেয়েছেন এই দুই মতের মধ্যে connecting link (সংযোগসূত্র) কী!

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে একথা নিবেদন করার পরে তিনি বললেন—সব Advent-রাই (আগত প্রেরিতগণই) human being (মানুষ) এবং divine personality (ভাগবত ব্যক্তিত্ব)।

প্রফুল্লদা (দাস)—তিনি যখন আসেন, তখন ভগবানকে যাঁরা খোঁজেন তাঁরা অনেকেই তাঁর কাছে আসেন না, accept (গ্রহণ) করেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবাই কি তেমন হয়? যার নেশা আছে, সে আসে। তাড়ির দোকানে কি সবাই যায়? যে তাড়ি খায় সে যায়। তাড়ি বানান কী?

প্রফুল্লদা—ত-এ আকার ড়-এ ইকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই তাড়ি হ'ল তারী অর্থাৎ অবতারী। অবতারী মানে রক্ষার তারী।

সুধীরদা (রায়চৌধুরী)—ভগবানের বোধই অনেকের থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বোধ আসে তো করার ভিতর দিয়ে।

প্রফুল্লদা—ঠাকুর! আমার মনে হয় আপনার কথাগুলি যদি কাগজে নিয়মিত প্রকাশিত হয়, আপনার বইগুলি বিভিন্ন লাইব্রেরীতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়, তাহ'লে এই ভাবধারা দেশে তাড়াতাড়ি প্রচারিত হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করনেওয়ালা তো তোমরা! কতবার কইছি, আর ক'বের (কইতে) ইচ্ছে করে না। ঠিকমত না ধরলে হবে না। আমি ঠিক জানি, এই centre-এ (কেন্দ্রে) যদি পয়সার মানুষ থাকে তাহ'লে সে কখনই এসব কাজ পারবে না, শুধু idle talk-ই (নিষ্কর্ম্মার বকবকই) করবে। কারণ, তখন সে interested (অন্তরাসী) হ'য়ে পড়ে ঐ পয়সায়। যখন allurement (অর্থের প্রলোভন) প্রথম শুরু হ'ল তখনই আমি একথা বলেছি।

পূজ্যপাদ বড়দার শরীর আজ ভাল না থাকায় তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে আসতে পারেন নি। ডাঃ প্যারীদা (নন্দী) এখন তাঁর স্বাস্থ্যের খবর আনতে গেলেন।

দেওঘর শহরের গৌরী ঠাকুর শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এলেন। কিছুক্ষণ বসে কুশলাদি জিজ্ঞাসা ক'রে বিদায় নিলেন। নন্দন পাহাড়ের কাছেই ইউনিভার্সিটির জন্য কিছু জমি নেবার কথা বলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। জমি দেখা হয়েছে, কথাবার্ত্তাও কিছুটা এগিয়েছে। সেই প্রসঙ্গে গৌরীবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ জমিটা পাওয়া যাবে তো?

গৌরীবাবু—চেষ্টা তো করছি, দেখা যাক।

বলে বেরিয়ে গেলেন খগেনদার (তপাদার) সাথে। রাত ৯টা বাজে। কাছে বিশেষ কেউ নেই। একটি মা এসে বললেন—আমার ছেলেটা বড় দুষ্টু। তপোবন স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে গেলাম। আপনি একটু নজর রাখবেন, ও যেন মানুষ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তাই চাই। ওখানে মাস্টার মশাইরা আছে, তাদেরও ব'লে যেও।

মা-টি প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেলেন। তারপর দয়াল প্রভু বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ নিদ্রা গেলেন। রাত ১১টায় উঠলেন। তখন ভোগের ব্যবস্থা করা হ'ল।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭, রবিবার (ইং ২২।৫।১৯৬০)

আজ ভোর থেকেই আকাশ মেঘে ঢাকা আছে। আবহাওয়ায় টেম্পারেচার বেশ নেমে গেছে। এখন সকাল আটটা। শয্যাত্যাগের পর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে শ্রীশ্রীঠাকুর পার্লার থেকে চ'লে এসেছেন দালানের হলঘরে। তাঁর শরীর আজ ভাল নেই। পাল্স্ রেট ৮০, প্রেসারও বেড়েছে। চুপচাপ শুয়ে আছেন।

আজ শ্রীশ্রীবড়মারও শরীর খারাপ। গায়ে ব্যথা। আজ আর রান্নাঘরে যেতে পারেন নি। ঘরেই শুয়ে আছেন।

একটু পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও চুনীদা (রায়চৌধুরী) এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর চুনীদাকে বললেন—আমার একটা গান ছিল 'পুঞ্জে পুঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে' না কী! সে অনেকখানি! মনে রাখিস তো! Old song (পুরাতন গান)-গুলি collect (সংগ্রহ) করতে ইচ্ছা ক'রে। জানতে ইচ্ছা করে, ওগুলি কেমন ক'রে evolve করল (সৃষ্টি হ'ল), তখনকার পরিবেশ কেমন ছিল। Old (পুরাতন) মানে তোমাদের ছোটকালে না, আমাদের ছোটকালে। তখন কান্ত কবির গান ছিল ঘরে ঘরে।

কেষ্টদা—গানগুলি সহজ ছিল এবং তার মধ্যে একটা ভক্তির ভাব ছিল। এখন তো টকির গান পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারও আগে ছিল নিধুবাবুর টপ্পা। ঐ 'কুঞ্জে কুঞ্জে'রও আগে।

কেষ্টদা—নিধুবাবুর love-songs (ভালবাসার গান) বেশী। আবার, রামপ্রসাদের গান তখন থেকে continue ক'রে (সুরু ক'রে) এখনও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কালজয়ী হয়ে আছে। (ক্ষণেক নীরবতার পর) মধ্যে মধ্যে এইসব ভাবতে ইচ্ছা করে। মনে হয়, সম্ভব হলে ঐগুলি সংগ্রহ করতাম। তার মধ্য দিয়ে দেখতাম, সমাজের অবস্থা তখন কেমন ছিল।

কেষ্টদা—আজকাল সমাজের অবস্থা তো কোন দিক দিয়েই ভাল দেখা যায় না। সব জায়গায় টকির গান। বাবার সামনেও মেয়ে love-song (প্রেমের গান) গায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুই-চারজন স্ফূর্তিবাজ মানুষ, যারা ভাল impart (সঞ্চারণা) করতে পারে, এনে ভাল করে train up (শিক্ষিত) ক'রে ছিটিয়ে দেন সব জায়গায়। এই যে (বালগঙ্গাধর) তিলক, ভগবান দাস, এরা কী অসাধারণ মানুষ ছিল!

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পর পর অনেকগুলি ছড়া দিলেন। ছড়ার শেষে বিশুদা (মুখোপাধ্যায়) তামাক সেজে এনে দিলেন। তামাক খেতে খেতে বাইরের আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রভু বললেন—আমি ভাবতিছিলাম, আজ চান করব। যদি এক ঘটি জল মাথায় দিই তাহলে কি খারাপ হবি নি? আবার, ও (ডাঃ প্যারী নন্দী) হয়তো এসে ক'বে নে, আমার কাছে না জিজ্ঞাসা ক'রে—

বিশুদা এইটুকু শুনেই দৌড়ে চ'লে গেলেন প্যারীদার কাছে। ফিরে এসে বললেন—প্যারীদা বললেন, সর্দি নেই, কিছু নেই, শাওয়ারে চান ক'রে ফেলাই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে জলের ঠাণ্ডাটা একটু ভেঙ্গে দিলে হয়।

বাথরুমে জল গরম করার ব্যবস্থা হতে থাকল শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী। একটু আগে কলকাতা থেকে তিনটি ভাই এসেছিলেন। প্রণাম ক'রে চ'লে যাওয়ার পরই শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ওরা খাবি নি কনে? দ্যাখ্ তো খাওয়ায়ে দেওয়া যায় কিনা!

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) ও অনিলদা (গঙ্গোপাধ্যায়) তখনই উঠে গেলেন। ওঁরা ঘুরে আসার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ওদের খাওয়ায়ে দিছ?

অনিলদা—হ্যাঁ, ওরা আনন্দবাজারে খেয়েদেয়ে চ'লে গেল। বলে গেল, পরে একদিন এসে সারাদিন থাকবে, গল্প করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরিতৃপ্তির সুরে বললেন—বেশ করেছ।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশুদাকে শ্রীশ্রীবড়মার কাছে পাঠিয়েছিলেন—চান করবেন কিনা জানতে। বিশুদা ঘুরে আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎকণ্ঠ জিজ্ঞাসা—বড় বৌ কী ক'ল?

বিশুদা—বড়মাও বললেন আজ চান করাই ভাল।

তারপর, কিছুক্ষণ আগে যে ছড়াগুলি দিয়েছেন সে-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর শৈলেনদাকে বললেন—ওগুলি দেখিস ভাল করে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় প্রশস্ত চৌকিখানিতে সমাসীন। পূজ্যপাদ বড়দা অসুস্থ। প্যারীদা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। এখন এসে জানালেন—বড়দার টেম্পারেচার ৯৮$\frac{১}{২}$ । মাথা ভার। গায়েও ব্যথা আছে।

অনিলদা (গঙ্গোপাধ্যায়) একটি মাকে সাথে নিয়ে এসে বললেন—ইনি কলকাতায় থাকেন, শিক্ষকতা করেন। একজনের কাছে বিশ্বাস ক'রে টাকা রেখেছিলেন। সে সব টাকা মেরে দিয়ে চলে গেছে। ওঁর মন খুব খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন খারাপ ক'রে কী হবি? গেছে, গেছে। আবার কর্, খাট্। আবার কত হবের পারে। (একটু থেমে আবার বলছেন) শ্রদ্ধানুকম্পা থাকা ভাল, কিন্তু মাখামাখি ভাল না। ভালবাসা দেখিয়ে মাখামাখি ক'রে ওরকম যে কত লোক করে তার ঠিক নেই! শুধু মেয়েলোকের না, অনেক পুরুষেরও এরকম ক্ষতি করে।

অনিলদা—উনি তো দীক্ষা নিতে চান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিতে চায় দিয়ে দিতে পার। কিন্তু দীক্ষা নিলেই কিছু হবে না। দীক্ষা নিয়ে কাজ করতে হবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া বললেন—

পারস্পরিক অনুনয়ে
তাৎপর্য্যশীল সঙ্গতি,
জেনেশুনে বুঝে চলা—
এইতো জ্ঞানের পদ্ধতি।
কে কেমনটা নিচ্ছে খুঁটে
দিচ্ছে তাতে কেমন জোর
দেখে বুঝো অন্তরে তার
কী চাহিদার কেমন তোড়!

এরপর অনিলদা মা-টিকে নিয়ে উঠে গেলেন। আজ দুপুরের পর আকাশের মেঘলা ভাবটা কেটেছে। একটু রোদও উঠেছে। আকাশে পাতলা-পাতলা মেঘ ভাসছে।

সন্ধ্যার পর হরিনন্দনদা (প্রসাদ) কয়েকজন ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন। পরিচয় দিলেন এঁরা সবাই স্টেট ট্র্যান্স্পোর্টের কর্ম্মচারী।

সবাই কিছুক্ষণ বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর সমাগত দাদাদের দিকে তাকিয়ে নিজের দৈহিক অবস্থার দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললেন—বুড়ো বয়সে একটু অসুখ হলেই শরীর খারাপ লাগে। (তারপর বলছেন) সত্তাকে ঠিক রাখাই আসল ধর্ম্মচর্য্যা। ওরা young man (যুবক মানুষ) আছে। ওরা যদি এখন থেকে চেষ্টা করে, সদাচারে থাকে, তাহলে বোধ হয় আমার অবস্থা হবে না। ধর্ম্ম মানে ধৃতি—অর্থাৎ কী ক'রে বাঁচতে হয়, বাড়তে হয়, আপদ-বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হয়, কোন্ খাবার আমাদের পক্ষে favourable (অনুকূল), কোন্ খাবার নয়,—এসব দেখে জেনে তদনুপাতিক ঠিকমত চলা।

জনৈক দাদা—আমি mentally (মানসিকভাবে) একটু peaceful (শান্তিময়) হতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হওয়াই তো শ্রেয়। হওয়ার একটা will (সক্রিয় ইচ্ছা) থাকা চাই।

Normally (স্বাভাবিকভাবে) আমরা বাঁচতে চাই, বাড়তে চাই। কিন্তু বেড়ে তালগাছ হতে চাই না। তাহলে যা' চাই, নিজেকেও সেইভাবে চলতে হয় এবং পরিবেশকেও ঐভাবে চালানো লাগে।

উক্ত দাদা—আপনার আশীর্ব্বাদ পেলে তো আমরা ঠিক হতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আশীর্ব্বাদই তো তাই। আমিও তাই চাই, তোমরাও তাই চাও।

এর পর ওঁরা প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন। রাত ৮টা বাজে। কেষ্টদা, চুনীদা, জ্ঞানদা, শৈলেনদা এবং আরো অনেকে আছেন। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলছে। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা যা' কই সব existence-এর (অস্তিত্বের) কথাই কই। এসবের মধ্যে existence (বাঁচার কথা) ছাড়া আর কিছু নেই। এই সব কথার support-এ (সমর্থনে) তোমাদের গীতা ছাড়া আর কী কী আছে! অন্যান্য কোন্ কোন্ গ্রন্থ থেকে তোমরা কী কী support (সমর্থন) আনতে পার তার চেষ্টা কর।

কেষ্টদা একটু হতাশার সুরে বললেন—এসব দিকে কোন লক্ষ্যই নেই। আমরা এখন বেতনভোগী ধর্ম্মপ্রচারক ছাড়া আর কিছু না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে দ্যাখেন, কইলাম বা কী আর হ'লই বা কী। এই যদি হয় তাহলে ঐ বটতলার রকম হয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় নেই।

কেষ্টদা—এখনকার কর্ম্মীরা হয়তো একজায়গায় বক্তৃতা দিতে গেছে। যেয়ে দেখে প্রোগ্রামে তার নামটা বাদ গেছে। তখন তার আর বক্তৃতা দেওয়া হল না। এই অবস্থায় তো আমরা আছি।

কেষ্টদার কথা শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। বলে উঠলেন—কিছু না, কিছু না। কেউ নেই। সব ক্লীবলিঙ্গ! Allurement (অর্থের প্রলোভন) যখন থেকে আরম্ভ হয়েছে তখন থেকেই এই অবস্থা। ওটা যখন ছিল না, তখন অবস্থা ভাল ছিল।

ঘরের আবহাওয়াটা থমথমে হয়ে গেল। একটু পরে ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে কেষ্টদা বললেন—মহাত্মা গান্ধী শ্রীকৃষ্ণের কথা কাল্পনিক বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ কথা বলার সাথে-সাথেই সব bisect (বিখণ্ডিত) হয়ে গেল। ও ideal (আদর্শ) আমরা আর attain করতে (পেতে) পারলাম না। এই সব চালু হতে থাকলে দেখবেন, ছোঁড়ারা রাস্তায় বসে গল্প মারতে থাকবে, 'আরে রাখ্ তোর ধম্ম। ভারি ধম্ম ক'রে আইছে।' (ঝগড়া করার ভঙ্গিতে) 'যা যা তোর বেদব্যাস। কেষ্ট ঠাকুরই ছিল কিনা সন্দেহ। সেদিন মহাত্মা গান্ধী বলে গেছে—কেষ্ট ঠাকুর fictitious (কাল্পনিক)।' এইরকম সব চলতে থাকবে।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ নীরব থেকে ছড়া বলে চললেন—

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
যাতে যেমন রয়,
বোধ-বিবেক আর বুদ্ধি জেনো
তেমনতরই হয়।
হীনে নিষ্ঠা, আনুগত্য,
কৃতিচর্য্যা রয় যেথায়,
হীনত্বেই তার জীবন চলে
রয় হীনতা পায়-পায়।
নীচের সাথে গতি যাদের
নীচতা যাদের লাগে ভাল,
দুর্ম্মতি যাদের এমনতর
ভালই লাগে আঁধার-কালো।
সাধু জানিস তারা—
সৎ-আচার্য্যের নির্দেশমত
প্রজ্ঞাতপা যারা।

ছড়া দিতে দিতে অনেক রাত হয়ে যায়। একবার তামাক খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে বাথরুমে গেলেন। ভোগের আয়োজন হচ্ছে এখন।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭, সোমবার (ইং ২৩। ৫। ১৯৬০)

আজ সকালেও আকাশ পরিষ্কার নয়। মেঘ নেই। তবে ঘন কুয়াশার আস্তরণে আকাশ ঢাকা। বেলা প্রায় ৯টা। শ্রীশ্রীঠাকুর হলঘরে। কালোদা (জোয়ারদার) কলকাতা থেকে একটি বড় ওয়াল-ক্লক নিয়ে এল। শ্রীশ্রীঠাকুরই আনতে বলেছিলেন। এখন দয়াল পণ্ডিতদাকে (ভট্টাচার্য্য) ডাকিয়ে ক্লকটা তাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে বললেন। পণ্ডিতদা নিয়ে চ'লে গেলেন।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসলেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), জ্ঞানদা (গোস্বামী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), প্রভাতদা (দে), অরুণ (গঙ্গোপাধ্যায়), মন্টুন (রায়চৌধুরী) এবং আরো কয়েকজন দাদা ও মা। কথা চলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর একসময় জানতে চাইলেন—Protein (প্রোটিন) মানে কী?

কেষ্টদা ইংরাজীতে বললেন—Nitrogenous compound found in the fluids and tissues of all organisms.

শুনে দয়াল ঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, প্রোটিনের নানারকম complex (মিশ্রণ) দিয়ে এই দুনিয়ার যা'কিছু সৃষ্টি হয়েছে।

কেষ্টদা—গমের প্রোটিন আলাদা, ধানের প্রোটিন আলাদা, ছানার প্রোটিন আলাদা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, লোহার মধ্যেও প্রোটিন আছে নাকি!

কেষ্টদা—হ্যাঁ, প্রোটিন তো লোহাতেও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দ্যাখেন, প্রোটিন বলে কত কী ধরল, কিন্তু তিলকে আর আজকাল আর ধরে না। ভাতের মধ্যে ঘৃতপ্রক্ষেপ দেওয়া-টেওয়া সবই তো ঐ।

পরে ছড়ায় বললেন—

সমীচীনভাবে বাঁচাবাড়ার
যত আয়োজন—
ধর্ম্ম বলে বলে থাকেন
যাঁরা বিচক্ষণ।

সকাল ৯-৪০ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর একবার পায়খানায় গেলেন। তারপর এসে শুয়ে পড়লেন। শরীর ভাল বোধ করছেন না।

গতকালের সংবাদপত্রে একটি প্রতিলোম-বিবাহের সংবাদ বিস্তৃত বিবরণ-সহ প্রকাশিত হয়েছে। সেই সংবাদ শোনার পর থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর অস্বস্তি বোধ করছেন। থেকে থেকে ঐ কথা বলছেন, ডাঃ বনবিহারীদাকে (ঘোষ) পাল্‌স্ দেখতে বললেন। দেখা হল—৯০।

কাতরকণ্ঠে বলছেন—কাল ঐ কথা শোনার পর থেকেই আমার বুকের অস্বস্তি বেড়ে গেছে। কী সব কাণ্ড!

বিকালেও তাঁর এই অবস্থা চলল।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭, মঙ্গলবার (ইং ২৪।৫।১৯৬০)

দিনের আলো ফোটার সঙ্গে-সঙ্গেই সমগ্র আশ্রম কর্ম্মতৎপর হ'য়ে উঠেছে। প্রভাতে ইষ্টদেবের শ্রীচরণে আভূমি প্রণাম নিবেদন ক'রে এবং তাঁর চিরপ্রশান্ত আননখানি ক্ষণকাল সন্দর্শন ক'রে কর্ম্মিগণ নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে যেয়ে স্ব স্ব কর্ম্মে রত হয়ে পড়ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পার্লারগৃহেই অবস্থান করছেন। তাঁর চৌকির চতুষ্পার্শ্বস্থ বেদী ঘিরে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কচি কলাপাতা রং-এর পরদা টানাবার ব্যবস্থা হ'চ্ছে। এ কাজ করছেন মদনদা (দাস), অজয়দা (গঙ্গোপাধ্যায়) ও পীযূষদা (চট্টোপাধ্যায়)। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে ওঁদের কাজ লক্ষ্য করছেন এবং প্রয়োজনমত নির্দ্দেশ দিচ্ছেন। তাঁর কথা বুঝে নিয়ে অজয়দারা আবার সেইভাবে কাজ শুরু করছেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) ও প্রফুল্লদা (দাস) এসে বসেছেন। গতকাল রাতে দেওয়া একটি ছড়ার প্রসঙ্গে কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—পরলোক আছে, একথা বিশ্বাস করাটা কি যুক্তিযুক্ত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরলোক আছে, এ বুদ্ধিটা আমি যে আছি তারই continuation (ক্রমাগতি)। আর, আমার থাকার বোধটা আমি এড়াতে পারি না। এই যে আমরা তর্পণ করি, তখন পিতৃপুরুষের কথা স্মরণ করি, মানে আমার বোধের ভিতরে তিনি আছেন সেটা মনে করি।

কেষ্টদা—ছান্দোগ্য-উপনিষদে আছে 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ', পুত্র আত্মা ছাড়া কিছু নয়।

সমর্থন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কথা ঠিক। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—ক'টা বাজে?

কেষ্টদা—সাড়ে আটটা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চলেন যাই।

তারপর চৌকি থেকে উঠতে উঠতে পূর্ব্ব সূত্র ধ'রে বলছেন—একটা ছোট্ট বটের দানা দ্যাখেন, তার মধ্যে অত বড় বটগাছ লুকায়ে আছে। সেইটিই আবার উপযুক্ত পরিপোষণ পেয়ে বেড়ে ওঠে।

হাঁটতে হাঁটতে প্রভু চ'লে এলেন বড় দালানের হলঘরে। সেখানে শয্যায় উপবেশন করার পরে ভক্তবৃন্দ সামনের মেঝেতে বসলেন।

চুনীদা (রায়চৌধুরী) জিজ্ঞাসা করলেন—তা'হলে আমার কোন ছেলে না থাকলে তো আমার total annihilation (সম্পূর্ণ বিলোপ) হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হ'ল না? এই যে কথায় কয় 'নির্ব্বংশ হ'য়ে যা, বংশলোপ হোক', তার মানে বংশে কেউ না থাক্। বলা আছে 'পুত্রাৎ পিণ্ডপ্রয়োজনম্'। তার মানে আমি বুঝি, পুত্র থেকেই বংশরক্ষার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। সেইজন্য, পিণ্ড মানে এখানে চা'লের দলা বুঝলে হবে নানে, পিণ্ড মানে পিণ্ডীকৃত, দেহধারণের অবস্থা। পুত্রের দ্বারাই বংশধারা বিধৃত হয়।

কেষ্টদা—পুণ্যপুঁথি ও নানাপ্রসঙ্গের মধ্যে এইসব কথা সুন্দরভাবে বলা আছে।

পুণ্যপুঁথির কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর আত্মমগ্নভাবে বললেন—আমি ভাবি, তখন তো সব trance-এর (সমাধি-অবস্থার) মধ্যের কথা। তখন অতখানি accurate (যথাযথ) কথা ক'লেম কি ক'রে! কিরকম peculiar (অদ্ভুত)!

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিলেন—

রেতে থাকে জীবনগতি
সংস্কারের অঙ্কুর নিয়ে,
ব্যতিক্রম-বিয়েয় নষ্ট পায় তা'
ক্রমে ক্রমে যায় মিইয়ে।

কেষ্টদা—পুণ্যপুঁথিতে আছে, বেদমাতা গায়ত্রী এখন শূদ্রের ঘরে জন্ম নিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ঘরে নিষ্ঠা নেই, কিন্তু ছোটদের ঘরে এখনও নিষ্ঠা আছে। তাই দেখে বোধ হয় ঐরকম কইছিলাম। Intention (অভিপ্রায়)-টা বুঝলে ঠিক বলতে পারতাম।

কেষ্টদা—ব্রাহ্মণ যদি রাজার দান গ্রহণ করে, সে তো আর ব্রাহ্মণ থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, রাজার কাছে থেকে বামুন যদি বেতন হিসাবে কিছু গ্রহণ করে, তাহলে তার সাত্বত personality (ব্যক্তিত্ব) ব'লে কিছু আর থাকে না।

কেষ্টদা—দ্রোণ-ভীষ্ম ঐরকম ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক্ষুণি আমার ঐ কথা মনে হচ্ছিল।

এরপর সঙ্ঘের কাজকর্ম্ম নিয়ে কথা উঠল। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন— একটা জায়গায় শুধু support (সমর্থন) আছে যে ব্রাহ্মণেতর ঋত্বিক হ'তে পারে। আপনি আমাকে দেখাইছিলেন।

কেষ্টদা—হ্যাঁ, জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসায় (৩।৭।৩২)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ একটা। Single (একমাত্র)। আর পাইনি।

এরপর পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর বালিশটা টেনে নিয়ে আধশোয়া হ'লেন। শ্রীচরণ দু'খানি লম্বা ক'রে দিয়েছেন। সরোজিনীমার দিকে তাকিয়ে ডাক দিলেন—আয়, আয়, আয়, আয়।

সরোজিনীমা উঠে এসে তাঁর শ্রীচরণদ্বয় মৃদু মৃদু কাঁপিয়ে দিতে থাকলেন। কেষ্টদা গৃহ্যসূত্রাদিতে কথিত আশ্রমের কথা বলছিলেন। বললেন—যাজ্ঞবল্ক্য, শৌনক, এদের সহস্র সহস্র শিষ্য নিয়ে এক একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রকমটা দ্যাখেন, আগেকার আশ্রমগুলি যেন এক একটা institution (সঙ্ঘ)।

কেষ্টদা—আগেকার education-এ (শিক্ষা-ব্যবস্থায়) মাইনে দেবার system-ই (রীতিই) ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার করত কি!—যেমন আমার বাড়ীতে নিয়ে আসে, আপনার ওখানে নেয় কিনা জানি নে, ঐরকমভাবে ছাত্ররা গুরুর বাড়ীতে দ্রব্যসম্ভার নিয়ে আসত। (ক্ষণেক নীরব থেকে আপসোসের সুরে বলছেন) কিছু করবের পারলাম না কেষ্টদা, ঐ টাকার ব্যবস্থা ক'রে! ঐ allowance-এর (ভাতার) ব্যবস্থা ক'রে সব মারা গেল। আরো দরিদ্র র'য়ে গেল।

কেষ্টদা—মানসিক দরিদ্রতা ও শারীরিক দরিদ্রতা দুইই থাকল।

কথায়-কথায় বেলা ১১টা বেজে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানে উঠতে আর ৮ মিনিট বাকী আছে। তাঁকে পান-তামাক দেওয়া হ'ল। তামাক খেতে খেতে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মাথার মধ্যে এখনও ঐসব ঘুরছে।

পার্লারের পূবদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর এমন একটি ঘর তৈরী করার কথা বলেছেন যেখানে তিনি নিরালায় থাকতে পারেন এবং প্রয়োজনমত মানুষের সাথে 'প্রাইভেট' কথাবার্ত্তা বলতে পারেন। সেই ঘরের কথা উল্লেখ ক'রে এখন বললেন—ঐ ঘরটা যদি হ'য়ে যেত, আর ওখানে যদি থাকতে পারতাম, অনেকখানি সুবিধা হ'ত। কথা কইতে কইতে যদি ঘুম আসত, হয়তো ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার বুদ্ধি এমন যে ঐ ঘরে যখন থাকব, আমার থাকাটা যেন কোনভাবে ব্যাহত না হয়। বাইরের থেকে ঘরেই যাই বা ঘর থেকে বাইরেই আসি, কোন ক্ষতি হবে না।

রাতে—হল্‌ঘরে। ভক্তবৃন্দ অনেকে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ছড়া দিলেন—

শাসন-সংস্থা যেমনই হোক
যাতেই মাথা ঘামাও না,
যৌন ব্যাপার শুদ্ধ না হ'লে
দেশের জীবন টিকবে না।

ছড়াটি দেবার পরে প্রভু বললেন—এই কথাটা বলতে বলতে এখনই হঠাৎ মনে হ'ল, মা যেন ওখানে চৌকির উপর ব'সে কার সাথে কথা ক'চ্ছে।

এই সময় কেষ্টদা এসে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে একটি বড় ঘড়ি দিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—ঘড়ি টাঙ্গাইছেন?

কেষ্টদা—সুন্দর, খুব গম্ভীর। ও-ঘরে ও-ঘড়ি মানায় না। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির মত। এইসব ঘরে থাকলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, না। এ ঘরে দেবার কাম নেই।

কেষ্টদা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। এখন ব'সে বললেন—চাকরী ছেড়ে দিয়ে যারা আপনার কাছে আসে, তাদের তো আপনার থেকে একটা ভাতা নেওয়া লাগে। আপনি দয়াপরবশ হ'য়ে দেন।

এই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর যেন চমকে উঠে প্রত্যয়ব্যঞ্জক দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—না, না, ওটা দয়া নয়। পরমপিতার দয়া ও নয়। দয়া হ'ল তাঁকে রক্ষা ক'রে চলা। যে ইষ্টানুগ হ'য়ে সৎপথে চলে, ইষ্টকাম নিয়ে রত থাকে, তার activity-ই (কৰ্ম্মই) তাকে ভাতা দেয়। সেই activity (কৰ্ম্ম) থেকে আসে শুক্ল অর্থ।

আবার পূৰ্ব্বকথিত ঘড়ির প্রসঙ্গ তুলে দয়াল ঠাকুর বললেন—আপনার ঘর কেমন করল ভেবে ঠিক পাচ্ছি নে। ঘরে ঘড়ি মানায় না কিরকম! কত ছোট করল!

কেষ্টদা—ছোট ঘড়ি আনলে ওখানে মানাত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে তো ছোট ঘড়িই কইতাম। যাক্, যা' এনেছি এখন ঐ থাক্। ভবিষ্যতে কী হয় দেখা যাক্।

কালো জোয়ারদারদা কলকাতা থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে ঐ ঘড়ি এনে দেয়। এখন সে এসে সামনে দাঁড়াতেই তাকে বললেন প্রভু—এই, ঘড়ি ব'লে মানায় নি, কেষ্টদা ক'চ্ছে। দেখে আয় তো! মান্তন গেলে হয় ওর সাথে।

মান্তন (কেষ্টদার পুত্র) সামনেই বসেছিল। উঠে কালোদার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। বাইরে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ওদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর চিন্তাক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন—লাঠি নিয়ে, টর্চ নিয়ে চলে না।

(শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, অন্ধকারে যেতে গেলেই হাতে লাঠি ও টর্চ রাখা ভাল।)

এরপর কেষ্টদা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে উল্লিখিত রন্তিদেবের কাহিনী বিবৃত করলেন। বললেন—রন্তিদেব ছিলেন অতিথিবৎসল। অতিথি-সৎকারের সময় তিনি যে পরিমাণ গোহত্যা করতেন তার রক্তে চর্ম্মন্বতী নামে একটি নদীই হ'য়ে গিয়েছিল। কথিত আছে, রন্তিদেব ছিলেন মহাধার্ম্মিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতই মহাধার্ম্মিক হোক, যতই অতিথি-সৎকার করুক, অনুকম্পা আসেনি তখনও।

কেষ্টদা—অনুকম্পা আসলে তো আমাদের মত হ'য়ে যেত।

বিস্মিত হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের মত?

কেষ্টদা—হ্যাঁ, বর্ত্তমান Indian (ভারতীয়)-দের মত। আমরা ভালও করতে পারি না, মন্দও করতে পারি না।

সতেজে উত্তর দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এর নাম অনুকম্পা? একে বলে indolence (কর্ম্মবিমুখতা)।

তারপর প্রসঙ্গান্তরে বললেন—কুৎসিত যৌনাচার, ব্যতিক্রমদুষ্ট ব্যভিচারদুষ্ট যৌনাচার যদি চলতে থাকে তাহ'লে আর কিছুতেই ভাল মানুষ জন্মায় না।

কেষ্টদা—আজকাল অনেকে মুসলমান হ'য়ে beef (গোমাংস) খেতে শুরু করেছে। কয়, অতি সুস্বাদু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুসলমান না হ'য়েই খাচ্ছে কতজন! ঐ যে সেই যাত্রার দলে দেখেছিলেম, ক'চ্ছে, ভূতমূত্র অতি সুস্বাদু। মানে, ভূতে মুতে দেছে, তাই খেয়ে ক'চ্ছে, ভূতমূত্র অতি সুস্বাদু।

কেষ্টদা—ওরা গোরুর মাংস খায়, আমরা গোবরচোনা খাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোবরের মধ্যে একরকম bacteria form করে (জীবাণু জন্মায়), তা' শরীরের খারাপ bacteria (জীবাণু)-গুলিকে খেয়ে ফেলে দেয়।

কেষ্টদা—আচ্ছা, একজন কপট যদি নিরামিষাশী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে নিরামিষাশী হয়েছে, তার কাপট্যটা যাতে আপনি ধরতে না পারেন সেইজন্য।

রাত প্রায় পৌনে এগারোটা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগের সময় হয়েছে। দয়াল ঠাকুর বিছানা থেকে উঠতে উঠতে ছড়ায় বললেন—

উপদেশের চাইতে উদাহরণ হওয়া
জেনো কিন্তু ঢেরই বড়,
উদাহরণ হ'য়ে উপদেশ দিলে
হ'য়ে থাকে তাই বিশেষ দড়।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭, বুধবার (ইং ২৫।৫।১৯৬০)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও প্রফুল্লদা (দাস) আছেন। প্রফুল্লদা বললেন "বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামবীজ কামগায়ত্রী যার উপাসন।"—কথাটার তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কামগায়ত্রী মানে যে গায়ত্রী জপে কামনা বাড়ে। ঐ কামনা হ'ল তাঁর উপর love (প্রীতি)। ওইটা যাতে sprout করে (গজিয়ে ওঠে) সেই গানই হ'ল কামগায়ত্রী। তার বীজই কামবীজ।

প্রফুল্লদা—অপ্রাকৃত কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রাকৃত হ'লে purely sexual (সম্পূর্ণ যৌন ব্যাপার) হ'য়ে যাবে। আর নবীন কেন? সে সবসময় ডগমগ করে। কী যেন আছে—'নব নব—'?

কেষ্টদা—নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার দেখ, রাসলীলা মানে রসলীলা। এই রসের মধ্যে সবই আছে—জ্ঞানের চরম আছে, আবেগ আছে, ঊর্জ্জী পরাক্রম আছে, সব আছে। এটা ল্যাংচা ব্যাপার না। সেখানে নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি আপনা থেকেই ফুটে বেরোয়। একটা কাজ করতে যেয়ে কিসে কী হয়, কোন্‌টায় কী হয়, সে-বুদ্ধি তোমার আসবে। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, সবটাই সুসমঞ্জস সার্থকতায় জেগে উঠবে। শাণ্ডিল্য শুধু ভক্তির কথাই বলেছেন। কিন্তু নারদের কথার মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি, সবটাই আছে।

কেষ্টদা—নারদ ৪৮ রকম শাস্ত্র জানতেন। Military Science-ও (সমরবিজ্ঞানও) জানতেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকগুলি ছড়া বললেন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭, বৃহস্পতিবার (ইং ২৬।৫।১৯৬০)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর হলঘরে সমাসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), জ্ঞানদা (গোস্বামী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), সুধীরদা (রায়চৌধুরী), বাবুরিদা (বাগচী), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য) ও আরো অনেকে উপস্থিত।

কৃষ্টি ও কুলাচার নিয়ে কথা চলছিল। ঐ প্রসঙ্গে ছড়া দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

লাখ করিস না, লাখ ধরিস না,
করার চটক যতই হোক,
ভিত্তি-আচার না হ'লে সাবুদ
র'বে না অটুট সত্তা-ঝোঁক।

কেষ্টদা—ভিত্তি-আচার মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভিত্তি-আচার মানে প্রথমে মা-বাবার প্রতি যা' করণীয়, তারপর আমার বংশের জন্য যা' করণীয় সেই সব আচার। এই সবই কিন্তু কুলাচার। এগুলি ঠিকমত না মানলে মানুষ রাবণের মত হয়ে যায়।

পরে চুনীদার (রায়চৌধুরী) সাথে ভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার এখানে যদি মাইক্রোসকোপ ইত্যাদি থাকত, সবগুলি যদি ঠিকমত observe (পর্য্যবেক্ষণ) ক'রে গড়ে তুলতে পারতাম, তাহ'লে তোমাদের এখানে যা' হত তা' কোন ইউনিভারসিটিতে হত না। এখনকার সব কিছু 'নোট' ক'রে রাখার কথা আমি কইছিলাম, কেষ্টদাকেও কইছিলাম। তোমরা তো কিছু করলে না। দেখ, পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার ভিতর দিয়ে যে জ্ঞান হয় তা' কিন্তু বই পড়ার ভিতর দিয়ে হয় না। আর, সবটা ভাল হ'ত যদি এই টাকা নেওয়া না থাকত। ওতে angle (সঙ্কীর্ণ) হয়ে যায়। আর ঠিকমত কাজ করতে পারে না। আমার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছ বলে তোমরা suffer (কষ্ট) করতে শিখলে না, শিখলে না how to meet and tackle obstacles (কি ক'রে বাধার সম্মুখীন হ'তে হয় ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়)। তাই আমি বলি, সাবুদ হও, existence-এর (সত্তার) দিকে সব angle ক'রে (ঘুরিয়ে) নাও। একটা কইতে যেয়ে ঝগড়া না বাধে সেদিকে লক্ষ্য রাখা লাগবে। আর, এই ভাবধারা অপরের ভিতরেও impart (সঞ্চারিত) করতে হয়। আগে তোমরা শিখলে বাইরেও শেখাতে পারবে। সেইজন্য কওয়া আছে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা।

আজ দুপুরে হঠাৎ মেঘ ক'রে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে সুরু করে। বেশ খানিকটা বর্ষাও হয়ে যায়। প্রাঙ্গণের নীচু জায়গাগুলিতে জল জমে আছে।

গতকাল সকালে একটি হনুমান ইলেকট্রিক তারের উপর পড়ে 'শক' খেয়ে নীচে পড়ে যায়। তক্ষুণি একটা কুকুর এসে তাকে কামড়ে দেয়। হনুমানটা যন্ত্রণাকাতর ও ভয়বিহ্বল হয়ে পড়ে থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এই সংবাদ যেতেই তিনি তৎক্ষণাৎ ডাঃ ননীদাকে (মণ্ডল) ডেকে হনুমানটির বিহিত চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করার আদেশ দেন।

ননীদা লোকজনের সহায়তায় হনুমানটিকে এনে রাখেন ভগীরথদার (সরকার) ডিসপেনসারির একটা ঘরে। দেখা গেল, হনুমানটির একটি হাত ও একটি পা প্যারালিসিস্ মত হয়ে গেছে। ননীদা তাড়াতাড়ি ওষুধ ইনজেকসনের ব্যবস্থা করলেন। একটু একটু দুধ খাওয়াবারও চেষ্টা চলতে লাগল।

সারাদিন শ্রীশ্রীঠাকুর হনুমানটির জন্য খুব উদ্বিগ্ন হয়ে রইলেন। স্নেহময় পিতার মত বার বার হনুমানটির স্বাস্থ্য ও শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিচ্ছেন। বিকালে ননীদা আসতেই দয়াল জিজ্ঞাসা করলেন—ও কেমন আছে?

ননীদা—অনেকটা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ পরমপিতার দয়ায় যদি বাঁচাতে পার। তোমার সেবা সার্থক হোক।

আজ বিকালে আবার ননীদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রশ্ন—তোর হনুমান রোগী কেমন আছে?

ননীদা—এখন একটু একটু চলাফেরা করছে। খাচ্ছে। ওষুধও দেওয়া হয়েছে।

ননীদার উত্তর শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকটা স্বস্তি পেলেন। মুখে তাঁর আত্মপ্রসাদের স্মিত হাসি। ননীদাকে বললেন—যাও, দেখ গিয়ে।

ননীদা ডিস্পেনসারির দিকে গেলেন।

সন্ধ্যার পরে হরিনন্দনদা (প্রসাদ) এক সাধুকে নিয়ে এসে বসলেন। বললেন—ইনি কিছু কথা বলতে চান।

সাধুটি বেশ জাঁকিয়ে বসে ঈশ্বরের জীবভাব ও ঈশ্বরভাব, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি প্রসঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। সাধুর কথাবার্ত্তা সবই তাত্ত্বিক ধরণের। ঐসব বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর যা' বলেন তা' সাধুকে বুঝাবার চেষ্টা করছেন শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) ও শরৎদা (হালদার)। কথাবার্ত্তা সব হিন্দিতেই হচ্ছে। কারণ, সাধু মহারাজ হিন্দি-ভাষাভাষী।

কথাপ্রসঙ্গে শরৎদা বললেন—ভেদ ও অভেদ দুটি তত্ত্বই ঠিক।

সাধুজী সে কথা মানতে রাজী নন। তিনি বলছেন, জগতের প্রতিটি বস্তুই ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন। তাই, একটু উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন ছুঁড়লেন—তাহ'লে কি অন্ধকার আর আলোক এক জায়গায় থাকতে পারে? দুই বিরুদ্ধ ভাব কি এক জায়গায় থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। এখন হরিনন্দনদার দিকে তাকাতেই হরিনন্দনদা সাধুজীর কথাগুলি বাংলায় অনুবাদ ক'রে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাব মানে হওয়া। ব্রহ্মের ভাব হল to uphold and to maintain (ধারণ ও পোষণ)। তিনি আমার মধ্যে আছেন, এই ভাব যদি আমার থাকে তাহ'লে আমার ভিতরেও ঐ upholding and maintaining (ধারণপোষণী সম্বেগ) থাকবে। তবে 'আমি তিনি' না ভেবে আমি তাঁর দাস ভাবলে ভাবটা সার্থক হয়। যে ভাবই আমার থাকুক না কেন, 'আমি তাঁর' এই ভাব নিয়ে চললে ভাবটা সার্থক হয়। আমি তো মুখ্যু মানুষ। এইভাবে বুঝি। ঐ যে সাধু মহারাজের দাড়ি আছে। তুমি দাড়ি রাখ নি। কারণ, তুমি ভাব না যে তুমি দাড়ি। কিন্তু উনি দাড়ির সাথে নিজেকে একাত্ম ভাবেন। ভাবেন দাড়িও ব্রহ্ম। তাই, তিনি দাড়ি রেখেছেন। তুমি যখন তোমার জায়গায় ছিলে, সেখানে তোমার ভাব ছিল হরিনন্দন মাস্টার। এখনও তোমাকে ডাকে মাস্টার ব'লে। পেছনে লাগানো থাকে হরিনন্দন। তাহ'লে তোমার হরিনন্দন ভাবের সাথে মাস্টার ভাব যুক্ত হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা সাধুজী কতটুকু কী বুঝলেন কি জানি! মন্তব্য করলেন—আত্মার উপাসনা ছাড়া তো ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।

সাধুজী প্রশ্ন করছিলেন হিন্দিতে। হরিনন্দনদা তা' বাংলায় অনুবাদ ক'রে দিচ্ছিলেন। কিন্তু এখন থেকে অনুবাদের অপেক্ষা না ক'রে প্রশ্ন শুনেই শ্রীশ্রীঠাকুর হিন্দি-বাংলাতে মিশিয়ে উত্তর দিতে থাকলেন।

বললেন—আত্মা কিসকো কহতে হ্যায় হাম জানতে নেহি, ব্রহ্ম কিসকো কহতে হ্যায় হাম জানতে নেহি, ভগবান কিসকো কহতে হ্যায় হাম জানতে নেহি। হাম জানতে হ্যায়, হামারা জীবন হ্যায়। আর, জীবন নিয়ে আমি come down করেছি (জন্মগ্রহণ করেছি)। আত্মা মানে জীবনগতি। আর ইষ্ট বা গুরুই হলেন সেই জীবনগতির মূর্ত্ত প্রতীক। তাই, গুরুর প্রতি নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ ছাড়া আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া সম্ভব না।

সাধুজী—ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাপ্তির কাছে গুরুবাদী অতি তুচ্ছ।

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই গর্জ্জন ক'রে উঠলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐসব ঠগ্‌বাজী কা আলাপ হ্যায়। We don't know what is ব্রহ্ম (আমরা জানি না ব্রহ্ম কাকে বলে)। We don't know what is ঈশ্বর (আমরা জানি না ঈশ্বর কাকে বলে)। But we claim that we know it (কিন্তু আমরা দাবী করি তা' জানি বলে)।

তারপর আবার শান্ত স্বরে বলতে লাগলেন—ব্রহ্ম এসেছে বৃংহ্-ধাতু থেকে, মানে ব্যাপ্তি। ব্রহ্ম তিনি, যিনি সব কিছুর মধ্যে বিস্তৃত হ'য়ে আছেন। যো কুছ্ হ্যায়, পুঁটিমাছ, সমুদ্রের তিমি মাছ, আকাশ, তারা, পাখি, সব কিছুর মধ্যে যে existence maintained (সত্তা বিধৃত) হয়ে আছে তা' ঐ ব্রহ্ম। তা' হয়তো আমরা

বোধ করতে পারি না, কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে। I may be disintegrated, but he will exist (আমি টুকরো টুকরো হ'য়ে যেতে পারি, কিন্তু তিনি অক্ষয় হ'য়ে থাকবেন)। ব্রহ্মকা এ্যায়সা ভাব। ঐ হল পরভাব। গীতায় আছে 'পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।' মানুষরূপে যখন তিনি নিজেকে ব্যক্ত করেন তখন তাঁর প্রতি অনুরাগ থাকলে আমরা তাঁকে বুঝতে পারি। গীতা হয়তো একটু ভাল লাগে। কিন্তু গীতার কথা মানতে ইচ্ছা হয় না। আর, ভগবান মানে ভজমান হ্যায়। উও ভজন করতা হ্যায় সবকো। What is the meaning of ভজন (ভজন মানে কী)? ভজন মানে অনুরাগ-সে সেবা, অনুরাগ-সে আশ্রয়। তাঁর পূজা করা মানে এই সবটা জেনেই পূজা করা। এইতো আমি বুঝি।

সাধুজী—মোক্ষ কার হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি মোক্ষ খুব পছন্দ করি না। মোক্ষ মানে disintegration of all things (সব কিছুর বিখণ্ডিত হওন)। আমার যদি disintegration হয় (আমি যদি টুকরো হ'য়ে যাই) তাহলে আমি প্রভুর সেবা করতে পারব না। আমি তো মুখ্যু আদমী। আমি যদি না বুঝতে পারি যে তিনি আছেন তাহ'লে আমার পক্ষে মুশকিল। সাধু মহারাজ হয়তো বুঝতে পারেন, তিনি পণ্ডিত আদমী। I love Him. I like to be His servant (আমি আমার প্রভুকে ভালবাসি। আমি তাঁর দাস হতে চাই)। (তারপর সাধুজীর দিকে চেয়ে স্মিতবদনে অথচ গম্ভীর স্বরে বললেন) এই মহারাজ! মোক্ষ শুননে-সে হমে ডর লাগতা হ্যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি হরিনন্দনদা হিন্দিতে অনুবাদ ক'রে দিচ্ছেন। তাতে সাধু যেন সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। তিনি ব্রহ্মত্বের উপাসনা ছাড়তে চাইছেন না। অস্তিবৃদ্ধির কথাকে বলছেন অনেক নীচু স্তরের কথা। হরিনন্দনদার সাথে তাঁর মাঝে-মাঝে বেশ বাগ্‌বিতণ্ডা হচ্ছে।

এবারও কিছুক্ষণ বিতর্কের পর সাধুজী জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে তাঁকে ধারণা করা যাবে কি ক'রে? তিনি তো ব্যাপক!

শ্রীশ্রীঠাকুর—(মৃদু ধমকের সুরে) আরে ব্যাপক! ব্যাপক মানে কী? মানে, তিনি আমার মধ্যে থেকেও সবার মধ্যে আছেন। তাঁকে জানতে গেলে আগে নিজের ভেতরের ব্রহ্মকে জানতে হয়। আগাড়ি হাম যদি হামাকে না জানি তাহলে ক্যায়সা জানব যে তিনি ব্যাপক? নিজেকে দেখ, আর তার সাথে আর সকলকে মেলাও।

প্রশ্ন—একটা টর্চ যদি জানতে চায় সে কিভাবে টর্চ হ'ল, তাহ'লে তার জানার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—টর্চ নিজেকে খুঁজে পেতে দেখুক সে টর্চ হ'ল কেন, কেমন ক'রে?

এরপর আর কথাবার্ত্তা বিশেষ এগোয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিতে থাকলেন। রাত এগারটা পর্য্যন্ত চলল এই ছড়া দেওয়া। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে বাথরুমে গেলেন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭, শুক্রবার (ইং ২৭।৫।১৯৬০)

সকাল থেকেই আজ বর্ষা সুরু হয়েছে। কখনও ঝেঁপে আসছে, কখনও বা ইলশেগুড়ির মত ঝরছে। সাথে আছে ঠাণ্ডা হাওয়া। এই ভর জ্যৈষ্ঠেই একেবারে যেন ধারা শ্রাবণের অবস্থা।

সারাদিন এইভাবে চলল। দুপুরে শ্রীশ্রীঠাকুর বেশীক্ষণ ঘুমাতে পারেন নি আজ। সন্ধ্যার পর থেকে হলঘরে বসে অনেক ছড়া দিচ্ছেন। ক্রমাগত ছড়া লেখা হচ্ছে, লেখার পর তাঁকে শোনানো হ'চ্ছে। প্রয়োজনমত দু-একটি জায়গায় তিনি সংশোধনও ক'রে দিচ্ছেন। বাইরে চলেছে পাগলা হাওয়া, ঝিরঝিরে বর্ষার লুকোচুরি খেলা।

কাছে লোকজন বিশেষ নেই। রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় কালীষষ্ঠী-মা হেলতে -দুলতে এসে হল্‌ঘরে প্রবেশ করলেন। ছড়ার স্রোত তখন পুরামাত্রায় চলেছে। হঠাৎ ঐ গতি থামিয়ে, কালীষষ্ঠীমার দিকে তাকিয়ে, রসিকবিদগ্ধ দয়াল ঠাকুর অভিনয়ের ঢং-এ বলে উঠলেন—মধুমতি! দেখিনি তোমারে দুপুরবেলায়, নিদ্রা তাই হয়নি আমার।

তাঁর বলার রকমে সবাই হেসে কুটিপাটি। কালীষষ্ঠীমাও লজ্জা-লজ্জা ভাব ক'রে মেঝেতে একপাশে যেয়ে বসলেন। আবার পূর্ব্ববৎ ছড়া দেওয়া চলল রাত প্রায় দশটা পর্য্যন্ত। এই সময় আলোর কাছে বেশ বাদলা পোকা উড়তে দেখা গেল। পোকা বেশী হওয়াতে ঘরের আলো নিভিয়ে দিতে হ'ল।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭, শনিবার (ইং ২৮।৫।১৯৬০)

আজও কালকের মতই বাদলা আবহাওয়া। গরমের ভাবটা একেবারে নেই বললেই হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর হল্‌ঘরে। সকালে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) ও প্রফুল্লদা (দাস) এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে ওঁদের কাল রাতে দেওয়া ছড়াগুলি পড়িয়ে শোনানো হ'ল।

এই সময় ডাঃ ননীদা (মণ্ডল) এসে খবর দিলেন—ইলেক্‌ট্রিক শক্-খাওয়া হনূমানের বাচ্চাটি আজ অনেক ভাল। ওকে বাইরে এনে রাখতেই ওর মা এসে ওকে বুকে ক'রে নিয়ে চ'লে গেছে। তারপর দেখলাম, ওর দলের সবাই, আশপাশে ছিল, ওকে বেশ আদর ক'রে গ্রহণ করল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো ভালই। আমার ইচ্ছা ছিল, আরো দু'চারদিন রেখে আর একটু সুস্থ ক'রে তারপর ছেড়ে দিলে হ'ত।

বিকালে বড় দালানের বারান্দায় ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া দিচ্ছেন। মাঝে-মাঝে সেই সব বিষয় নিয়ে কথাবার্ত্তা বলছেন। বারান্দার পূবদিকে ছোট ঘরখানিতে বসে আছেন শ্রীশ্রীবড়মা। তাঁর পায়ে বাতের যন্ত্রণা হয় মাঝে-মাঝে, সেইজন্য হাঁটাচলা করতে আজকাল একটু কষ্ট হয়।

কয়েকটি ছড়া দেবার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক দিলেন—ও বড়-বৌ!

শ্রীশ্রীবড়মা—যাই।

ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় পূবদিকে-রাখা চেয়ারটিতে বসলেন।

কণ্ঠস্বরে আবদার ও সোহাগ ঢেলে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—তোমার পা যদি ভাল হ'ত, আর কুমড়োর বীচি দিয়ে যদি দম তৈরী করতে আর সরোজিনীকে যদি খাওয়াতে! (সবাই হাসছেন)।

একটু পরে আবার দরদভরা কণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—দেখ, তুমি ন্যাংড়া হয়ে হাঁট, আর আমি কেবল তোমার উপর চাপি। কিরকম স্বার্থপর! (আবার আবদারের সুরে) এটা করবে বড়-বৌ? করো তো বড়-বৌ!

শ্রীশ্রীঠাকুরের এমনতর রকম দেখে শ্রীশ্রীবড়মা হাসতে হাসতে বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা, ক'রে দেব নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ দুপুরে কি খিচুড়ি বেশী খাইছিলাম?

শ্রীশ্রীবড়মা—না না। রাতে কী খাবে? খিচুড়ি?

শ্রীশ্রীঠাকুর টেনে-টেনে বললেন, খি-চু-ড়ি? কথার মধ্যে খানিকটা যেন বিস্ময়ভরা অনিচ্ছার সুর ছিল। সেটা বুঝেই শ্রীশ্রীবড়মা বললেন—তাহলে চিড়ে-ভাজা?

সোৎসাহে বললেন প্রভু—হ্যাঁ, সেই ভাল। (কাল রাতের বাদলা পোকার কথা মনে পড়তে) খিচুড়ি খেতে যেয়ে হয়তো পোকাই খেয়ে ফেলব নে।

শ্রীশ্রীবড়মা—ফুলটুনও কচ্ছিল, এবেলায় কিছু ভাজাটাজা করলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও তরুর মেয়ে। বাবা, সোজা কথা না। কোন্ জায়গায় কিরকম দরকার ঠিক ভেবে ভেবে বের করে।

এই সময় খগেনদা (তপাদার) এসে নিবেদন করলেন—এলুমিনিয়মের ঘরে বড়মার চৌকি ঠিক করা হয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর যেন বুঝতে পারেন নি এইরকম ভান ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—এ্যাঁ?

খগেনদা—চৌকি ঠিক করা হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(ঈষৎ উচ্চগ্রামে) কী কও?

খগেনদা—চৌকি ঠিক করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(আরো জোরে) কী কও?

জিজ্ঞাসার মাঝে একটু রহস্যভরা টান। খগেনদাও বুঝতে পারছেন না কী বলতে হবে। থতমত খেয়ে আবার ঐ কথাই মৃদু স্বরে উচ্চারণ করলেন—চৌকি ঠিক ক'রে দিছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভাল ক'রে ক'। আমারে একটা ছবি দিবি তো! না হ'লে কি আমি বুঝতে পারি!

খগেনদা—ঘরের মাঝখানে বড় চৌকি আছে। সেখানে আপনি থাকবেন—আর আপনি যেমন বলেছিলেন সেইমত ঘরের দক্ষিণ দরজার কাছে দক্ষিণ-পূব কোণায় জানালার পাশে বড়মার ছোট চৌকি পেতে দিছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা বড়-বৌরে এখান থেকে নিয়ে যাবি নি কেডা? (শ্রীশ্রীবড়মাকে) যেতে পারবে নে?

বিশুদা (মুখোপাধ্যায়)—আজ এ ঘরের টেম্পারেচারও ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, এ ঘরে আর থাকতে ইচ্ছে করছে না। ঐ ঘরেই চ'লে যাই, যেয়ে এক রাত থাকি গে'।

সন্ধ্যা ৬-৪০ মিনিট। জগজ্জ্যোতিদা (সেন) এসে প্রণাম করলেন। তাঁকে দেখে সোল্লাসে ব'লে উঠলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এ কি রে! তুই আইছিস্?

জগজ্জোতিদা—আজ্ঞে হ্যাঁ। এলাহাবাদ থেকে খরমুজ নিয়ে এলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাকি! ও বড়-বৌ! ঐ দেখ, জগজ্জ্যোতি খরমুজ নিয়ে আইছে।

জগজ্জ্যোতিদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে খরমুজগুলি দেখালেন। তারপর শ্রীশ্রীবড়মার কাছে দেবার জন্য নিয়ে গেলেন। তিত্তিরিদি এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। তাকে ডেকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এই শোন্, বড়-বৌরে নিয়ে থাকবি—আর, আটটার সময় ল'য়ে যাইও (এলুমিনিয়মের ঘরে)। বিছানা করিছাও?

তিত্তিরিদি—আমি করলে কি সবার পছন্দ হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রুটি খাইছস্?

তিত্তিরিদি—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্যা রে?

তিত্তিরিদি—খিদে লাগে নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চ্যাংড়া মানুষের খিদে লাগে না ক্যা? না লাগলে খাস্ নে।

ইতিমধ্যে জগজ্জ্যোতিদা আবার এসে বসেছেন। তাঁকে বলছেন দয়াল ঠাকুর—ভগবান আমাদের কাছেই থাকে। ঘনিষ্ঠতা হ'লে তাঁকে কাছেই দেখি। না কি কও? ঘনিষ্ঠতা হ'লে পরে তিনিও ঘনায়িত হ'য়ে ওঠেন। আবার, ভগবানের মধ্যে আছে ভজমানতা। তিনি স-ব-স-ম-য় কি সেবাই করেন! আমরা অন্ধ আঁখি, তা' বুঝিই না। কী একটা গান আছে না—'প্রেমগগনে তিনি রাজা—'। (স্মরণ করার চেষ্টা করলেন। তারপর বলছেন) আমার মনে নেই। ভাল ভাল কথা সব ভুলে যাই।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর মুখ থেকে সুপারি ফেলবেন। সরোজিনীমার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করতে সরোজিনীমা এগিয়ে এসে পিকদানী ধরলেন—পিকদানীতে সুপারির টুকরো ফেলতে ফেলতে শ্রীশ্রীঠাকুর রঙ্গ ক'রে বললেন—তা' ভগবানকে তো ডাকা লাগে না, সরোজিনীকে ডাকা লাগে। আর, ভগবানকে ঘন ক'রে তোলা লাগে।

সরোজিনীমা—ভগবানকে ডাকা লাগে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাকো না ডাকো, তিনি সব সময় সাথেই আছেন।

তারপর ছড়ায় বললেন—

নিষ্ঠারতি তীব্র যত
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
ভগবানও তেমনি ঘন
সত্তাতে তেমনি র'ন বিনিয়ে।

সাতটার পর বারান্দা থেকে হল্‌ঘরের ভিতরে এসে বসলেন। তামাক সেজে এনে দেওয়া হ'ল। গড়াগড়ার নলটি হাতে ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু স্বরে গাইছেন—

'তা'কে চোখে দেখিনি
শুধু তার বাঁশী শুনেছি।'

এই পদটিই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পর পর দু'-তিনবার মধুর সুরে গাইলেন। অপূর্ব্ব মোহন ভঙ্গিমায় আঙ্গুলের ফাঁকে নলটি ধরা, গড়গড়ায় টান দেবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত। দেখে মনে হয়, এ বুঝি বা দ্বাপরের সেই সুরসঞ্চারিণী বাঁশরীটি ধারণেরই নব-রূপায়ণ।

গান শেষ ক'রে প্রভু তামাকু সেবন করতে লাগলেন। গড়গড়ার গুডুক-গুডুক শব্দে, অম্বুরি তামাকের সুগন্ধে সমস্ত ঘর আমোদিত হ'তে থাকল। সারা ঘর জুড়ে বিরাজ করছে এক অবর্ণনীয় ধ্যানময় কেন্দ্রিকতা।

তামাকু সেবন ক'রে গামছা দিয়ে মুখ মুছে, পূর্ব্বে গীত বংশীধ্বনির কথা উল্লেখ ক'রে বললেন পরম দয়াল—ঐ ধ্বনি হ'ল শব্দের প্রতীক, যে শব্দ আমরা ভজন করার সময় পাই।

তারপর ছড়া দিলেন—

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির
তপে যা'রা স্নাত হয়,
সন্ধিৎসাতে প্রত্যয় লভে
ধৃতিসম্পদ তারাই পায়।

নতুন এলুমিনিয়মের ঘরটি (পরের নাম 'পার্লার') হওয়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে সেখানে যাচ্ছেন, কিছু সময় থাকছেনও; কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে রাত্রিযাপন ঐ ঘরে এখনও হয়নি। রাত্রিবাসের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিতমশাইকে দিন দেখতে বলেছিলেন। দেখা হয়েছে, শুভক্ষণ আজই। তাই, শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী ঐ ঘরে রাত্রিবাসের সব আয়োজন সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

গৃহে প্রবেশের শুভক্ষণ ছিল রাত ৯-৪৫ মিনিট। শ্রীশ্রীঠাকুর যথাসময়ে শ্রীশ্রীবড়মা-সহ ঐ ঘরে প্রবেশ করলেন এবং গৃহের মধ্যভাগে তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রশস্ত শয্যায় উপবেশন করলেন। ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের ছোট চৌকিখানিতে বসলেন শ্রীশ্রীবড়মা।

বাদলা পোকার উৎপাতের জন্য ঘরের জোরালো আলোগুলি সব নিভিয়ে দেওয়া হ'ল। একপাশে একটি অল্প পাওয়ারের বাল্‌ব্ জ্বলছে। ঘরের মধ্যে স্বপ্নাচ্ছন্ন পরিবেশ রচিত হয়েছে। সেবকবৃন্দ চারপাশে রয়েছেন। কেউ বা ঘরের মধ্যে টুকিটাকি জিনিস গুছিয়ে রাখছেন।

শ্রীশ্রীবড়মার দিকে তাকিয়ে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে দূর থেকে, একেবারে ছবির মতন।

রাত দশটা বেজে গেল। অনিলদাকে (গঙ্গোপাধ্যায়) ডেকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ও অনিল, শোন! (বড় দালানের দিকে নির্দ্দেশ ক'রে) ওইখানে তুমি, হরিদাস, এইরকম লোক শোওয়া লাগে। আমরা তো এখানে। ওদিক দিয়ে দরজা ভেঙ্গে জিনিসপত্র নিয়ে যায় না কি!

একটু পরে শ্রীশ্রীবড়মা মাথার বালিশটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তা' লক্ষ্য ক'রে বললেন—ও কোন্‌দিকে মাথা দিয়ে শুলে?

শ্রীশ্রীবড়মা—এইতো এই দিকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পশ্চিমের দিকে?

শ্রীশ্রীবড়মা—হুঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কি কথা! পূবের দিকে মাথা দিয়ে শোও।

শ্রীশ্রীবড়মা—তাহ'লে পশ্চিমের দিকে যে পা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে কী হ'ল?

শ্রীশ্রীবড়মা—পশ্চিমের দিকে যে তুমি আছ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার আবার কিসের মধ্যে কী কথা! আমি তো কোন্‌দিকে আছি। মুকুল কনে শোবে নে?

শ্রীশ্রীবড়মা—এইতো আমার পাশে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কোথায়?

শ্রীশ্রীবড়মা—ঘরে ঘুমাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা, আমি পায়খানায় গেলে ওকে ডেকো।

বাইরে অবিশ্রান্ত বর্ষা পড়েই চলেছে। এখন একটু শীত-শীত ভাব টের পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে ছড়া দিচ্ছেন এবং সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন। রাত প্রায় এগারোটার কাছাকাছি ছড়া দিলেন—

রাগরঙ্গে শোনায় তোমায়
সত্যি মিথ্যা যা হোক তাই,
সুধী-সুন্দর উত্তর দিয়ে
ভেঙ্গেই দিও তার বড়াই।

একটু পরে এগারোটা বাজল। শ্রীশ্রীবড়মার কোঠাঘরে (ভোগের ঘরের পাশে) একটি রেডিও আছে। রাতে যখন রেডিওর ঘড়িতে এগারোটা বাজে, তখন ভল্যুম বেশ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। অনেক দূর থেকে এগারোটা বাজার শব্দ শোনা যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর আজকাল ১১-৮ মিনিটে উঠে বাথরুম থেকে এসে ভোগে বসেন। এগারোটা বাজার শব্দ শুনে সংশ্লিষ্ট সেবকগণ যাতে তৎপর হয়ে ওঠেন, সেজন্যেও এমন ব্যবস্থা।

টং টং করে এগারোটা বাজার শব্দ সুরু হ'তেই শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের মনোযোগ সেইদিকে আকর্ষণ ক'রে বললেন—ঐ দ্যাখ্, কোথায় বাজছে আর এখানে ব'সেই তা' পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। আমেরিকায় যদি বাজে তা'ও এখানে ব'সেই শোনা যায়।

এরপর আর একবার তামাক খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে বাথরুমে গেলেন।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

অ

অঙ্গবিকৃতিতে মনের বিকৃতি ... ২৬০
'অটোমেশন'-এর ক্ষতি ... ৮
অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ... ৩২৪
অনন্ত চলনর রূপ ... ২৯৩
অনুকম্পার প্রয়োজনীয়তা ... ৬৪
অনুভূতির জাগরণ কিভাবে হয় ... ৯৯
অনুলোম-বিবাহ প্রসঙ্গে ... ৭১, ৩৪১
অনুলোমের আগে সদৃশ বিবাহ ... ১৫৮
অনুশীলনের নির্দ্দেশ ... ২৯, ২৯০
অন্ধরা স্বপ্ন দেখে কিভাব ... ১২৩
'অবতার নাহি কহে আমি অবতার,' কেন ... ২২১, ২২২
অবতারী ... ৩৫৪
অবসাদ থেকে ত্রাণের পথ ... ২৪১, ২৪২
অবাস্তব চিন্তার অপনোদন ... ৩৬৯, ৩৭০
অভিনয় প্রসঙ্গে ... ১৮৫, ১৯১, ২৭৮
অভিমান-আত্মম্ভরিতা থাকার ফল ... ৩৩৮
অভ্যাস করার সূত্র ... ৩৪১
অভ্যাসের গুণ ... ৩১৭
অমরত্ব লাভের ইঙ্গিত ... ৯৬, ১১২, ২৬২, ২৬৩
অর্ঘ্য-প্রস্বস্তি ও দীক্ষাপত্রে সংযোজন ... ১৬২
অলৌকিকতার প্রত্যাশা ভাল নয় ... ১১১, ১৪৩
অসৎ-এর উৎপত্তি ... ৩০৭
অসৎ-প্রতিবিধান সম্ভব কিভাবে ... ৩০৬, ৩১২, ৩২২
অসৎ ব্যবহার কেউ চায় না ... ১৭২
অসুখের কারণ সম্পর্কে বই লেখার আদেশ ... ১৯৯

বিষয় পৃষ্ঠা

অসুখের ব্যাপারে সতর্কীকরণ ... ২৬, ৪২, ৫৩
অস্তিত্ববাদ ... ২৬২
অস্তিত্বের উপাদান ... ৩০০
অহং নিয়ন্ত্রণের পথ ... ৩১৯

আ

আত্মহত্যাকারীর জন্য শোক নিষিদ্ধ কেন ... ১৩০
আত্মোপলব্ধির পথ ... ২৯৩
আদর্শ সঞ্চারণার দরকার ... ৭৪
আদর্শের বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ... ৩৩০
আনন্দ ... ২৯৪
আনন্দের উপাসনা কর ... ২৬৩
আপ্তবাক্য ... ৩৫৩
আবিষ্ট ও উদ্দীপ্ত ... ৩৩৭
আর্টসের সঙ্গে সায়েন্সের জ্ঞান চাই ... ২১৮
আশীর্ব্বাণী প্রদান ... ২১৩
আশ্রম কারে বলে ... ৪৯
আশ্রমের কাজের জন্য ইট তৈরী ... ১৭৯

ই

ইউনিভারসিটির কথা ... ১৯৬, ৩৩৪
ইঙ্গিতজ্ঞ হওয়ার তুক ... ১৭১
ইন্দ্রের বজ্র কী ... ১৭০
ইলেকট্রন প্রসঙ্গে আলোচনা ... ১২০
ইষ্ট ... ২০৭, ৩৩৯
ইষ্টটানের স্বরূপ ... ২৯৭
ইষ্টনিন্দার প্রতিবিধান ... ২৫৪
ইষ্টনিষ্ঠা জীবনের মণিকাঁটা ... ২৪৫
ইষ্টভৃতির গুরুত্ব ... ১৫১, ৩০০
ইষ্টভৃতির ফল ... ৩০১
ইষ্টস্বার্থই প্রধান কর্ম্ম ... ৬৯

বিষয় পৃষ্ঠা

ঈ

ঈশত্ব ... ২৩৮
ঈশ্বরকে খোঁজে কারা ... ৩৫৪
ঈশ্বরপ্রাপ্তি মানে ... ২২৬

উ

উচ্চযাজী হওয়ার পদ্ধতি ... ১৪৩
উত্থানের পথ ... ১২৮
উৎপাদন বৃদ্ধির দরকার ... ১২৯
উৎসবের প্রাক্কালে ... ২৩২, ২৩৩, ২৩৪
উদ্দেশ্যে অমোঘ গতি ... ২৯১
উর্ব্বশী ... ৩১০

ঋ

ঋত্বিক অবিপ্রও হ'তে পারে ... ৩৬৩
ঋত্বিকীর গুরুত্ব ... ২৫৭
ঋষি-জয়ন্তী করার কথা ... ৩৩২
ঋষির আশ্রম ... ৩৬৩

এ

একটি চিঠির উত্তর ... ২১৭
একলব্যের সাফল্যের মূলে ... ৩৩৩, ৩৩৬
এ্যাটমের গঠন প্রসঙ্গে ... ১২৪
এ্যালাউন্স নেবার কুফল ... ৩৩৯, ৩৫৪, ৩৫৯, ৩৬৩, ৩৬৭

ও

ওষুধ কাশির ... ৩৮, ৩৯
ওষুধ পায়ে ব্যথার ... ৯৬
ওষুধ বাতের ... ২৩৬
ওষুধ সর্দ্দিজ্বরের ... ৮১

বিষয়		পৃষ্ঠা
ওষুধ সর্দিতে	...	৩৯
ওষুধ নির্ব্বাচন-পদ্ধতি	...	৭৯, ৮০
ক		
কথা বলার রীতি	...	৮০, ২৫২
কথা বেশি বলে যারা	...	১৯৪
কন্‌ফুসিয়াস	...	৩০৮
কমেডি তাঁর প্রিয় কেন	...	১৭৭
কম্যুনিজ্‌ম	...	১৫
‘করাল’ মানে	...	১৭৯
কর্ণের কবচকুণ্ডল	...	১৬০
কর্ম্মক্ষেত্রে গোলমাল হ’লে	...	১৮
কর্ম্মভার দানের তাৎপর্য্য	...	১৬৫
কর্ম্মহীন কথা নিষ্ফল	...	৪৪, ২৪৫
কর্ম্মীচরিত্রের আদর্শ	...	১৫৫, ৩৪৪
কর্ম্মীজীবনে প্রবেশ	...	২৬৪, ২৬৮
কর্ম্মীর দায়িত্ব	...	৩৭, ৫২, ৬৭, ৮১, ৮২, ২৩৭, ২৭৫, ৩১৫
কর্ম্মে অকৃতকার্য্যতার কারণ	...	৩১৩, ৩১৯
কর্ম্মে শিথিলতার পরিণাম	...	৬৩, ১৩৩, ১৫৮
কলেজ ছেলেমেয়েদের আলাদা হবে	...	১১২
কাজে সতর্ক দৃষ্টি চাই	...	২৪৩
কামবীজ কামগায়ত্রী	...	৩৬৬
কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগ মানে কী	...	১৮৮
কায়স্থের অধঃপতনের কারণ	...	৩৩১
কালজয়ী সাহিত্য	...	১৭১
কুজনন হয় কিভাবে	...	১২৬
কুবজার চরিত্র	...	১৮৪
কুমাতা	...	১৬৭
কুলাচার	...	৩৬৭
কো-অপারেটিভে ক্ষতি	...	১২৭, ২৩৬
কো-এডুকেশনে ক্ষতি	...	১৬২

বিষয় পৃষ্ঠা

কোরান ও বেদ পাঠের সাদৃশ্য ... ২৮৪
কৌরবসভা কৃষ্ণময় দেখার কারণ ... ২৮০
ক্রোধের ক্ষেত্র ... ১১৪
ক্ষত্রিয় ঋত্বিক বিপ্রের প্রণম্য কিনা ... ৩৪০
ক্ষত্রিয়-বৈশিষ্ট্য ... ২৮

খ

খসখস টাঙ্গানো হ'ল হল্‌ঘরে ... ২৮৫
খাদ্যের সঙ্গে শরীরের সম্বন্ধ ... ৮৮

গ

গভীর নিশীথের কথা ... ২৬৫
গাড়ির কথা দুইখানা ... ২৯১
গাড়ির কথা পাঁচখানা ... ২৫৫, ২৮৫, ২৯১
গান লেখার নীতি ... ২১৪
গান্ধারী-চরিত্র ... ৪৫, ১৫৭, ১৬১, ১৬৬
১৬৭, ২৭৯
গান্ধারীর শতপুত্রের জন্মরহস্য ... ১৬২
গায়ত্রী শূদ্রঘরে, তার অর্থ ... ৩৬২
গীতা-প্রশস্তি ... ৪৯, ১৩০
গুণী ছাত্র ... ৩২৮
গুরুকৃপা ... ৩২৪
গুরুগ্রহণ মানে ... ২৩২
গুরুজনকে দান নিষ্ফল হয় কখন ... ২২৫
গুরুদক্ষিণা ... ২৭৩
গুরুর কাছে passive হওয়া মানে ... ৩৩৬
গোবরের উপকারিতা ... ৩৬৫

ঘ

ঘটক ... ১৫৭
ঘুমের কাল ... ৩৮
ঘুমের মধ্যে অঙ্কের সমাধান ... ৩৩৫

বিষয়		পৃষ্ঠা
চ		
চক্রফটোর ইতিহাস	...	২৫০, ২৯৬
চরিত্র—ভাল ও মন্দ	...	১৪০
চলার রীতি	...	২৪৪, ২৪৫, ২৬৩
চাওয়া অনুপাতিক কর্ম্ম চাই	...	৩৫৮
চাকরি ছাড়া সংসার প্রতিপালন কিভাবে সম্ভব	...	২৮১, ২৮২
চাকরির কুফল	...	২১৮, ২৫৮
চিকিৎসা ঠিকমতো করার নীতি	...	৮০
চুরি হওয়া ঠাকুরের অনভিপ্রেত	...	৩২
চোরের সংশোধনের কাহিনী	...	১৮৯
চৌকস কাকে বলে	...	১২৪
ছ		
ছড়া-কতিপয়ের ব্যাখ্যা	...	৮৯, ১০২
ছড়া সম্বন্ধে	...	৪৭, ৬৪, ৬৮, ৭০, ৭৮, ১০১, ১৩৩, ১৭২, ১৭৪, ১৮০, ১৮১, ২৫০, ২৬৪, ২৬৯, ৩০৪, ৩১০
ছেলের জীবন-গঠনে মা'র দায়িত্ব	...	৬৪
জ		
জগৎ মিথ্যা নয়, নশ্বর	...	৩৪২
জগতে সব গতিশীল	...	১২১
জগন্নাথস্তোত্র পাঠ	...	২৭৯
জড় ও চেতন	...	৯৯
জন্ম-ব্যাপারে কুলকৃষ্টির স্থান	...	৩০৫
জন্মভূমির উপর টান	...	১৬৮
জন্মান্তরবাদে নির্ভর ক'রে ব'সে থাকা অনুচিত	...	৩০৫
'জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু' মন্ত্রের তাৎপর্য্য	...	৪৩
জানাগুলির সঙ্গতি চাই	...	২৯০
জীবনী লেখার পদ্ধতি	...	২২৪, ২৪০, ২৫৫, ৩৪০

বিষয়		পৃষ্ঠা
জীবনের উদ্দেশ্য	...	২০৯, ২৮৮
জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ	...	২৩০
জ্ঞানলাভের পথ	...	৯৫, ১৯৬, ২৬৬
ঠ		
ঠাকুর ধরার উদ্দেশ্য	...	৩৩০
ঠাকুর-বাংলার পুরানো কথা	...	৩৩৭
ঠাকুরের কাজের বিনিময়ে অর্থগ্রহণ	...	১১৮, ১৬৮, ৩৬৪, ৩৬৭
ড		
ড্যানিয়ুব নদীর নাম	...	১৫৮
ত		
তথ্য উদ্‌ঘাটনের কথা	...	৩১৩
তপোবন (বিদ্যালয়) নিকটে আনার ইচ্ছা	...	২০৫, ২৬০
তর্পণের উদ্দেশ্য	...	৩৬১
তাঁকে মনে রাখার পথ	...	১৭৮
তিক্ত ব্যবহারের প্রত্যুত্তর	...	৫৮
তেজ ও ব্যোম	...	৩১৪
দ		
দানগ্রহণের রীতি	...	১০৪
দানে বিপদ কাটে কিভাবে	...	৩২৬
দার্শনিক সাহিত্যিক	...	১৭১
দীক্ষা	...	২৪৫
দীক্ষা দেন ঠাকুর	...	১০৭
দীক্ষাপত্রে 'অপ্রত্যাশী' শব্দ যুক্ত হ'ল	...	২০
দীক্ষাবৃদ্ধির আদেশ	...	৬২, ৭২
দীক্ষা-শিক্ষা-বিয়ে	...	৩১৩
দীর্ঘজীবন লাভের প্রেরণা	...	২৭৩
দুনিয়ার অপ্রয়োজনীয় কিছুই নয়	...	২০৭
দুর্ভাগ্যের ক্রিয়া	...	৪৬

বিষয় পৃষ্ঠা

দুর্য্যোধন-চরিত্র ... ২৭০
দুষ্ট চলনের পরিণতি ... ১৯৮
দেড়পাট্টা (ঋত্বিকী) চাদর প্রসঙ্গে ... ১০৭
দেবপূজায় গন্ধপুষ্প প্রসঙ্গে ... ১৫৮
দেয় না অথচ পায় যারা ... ২৮৩
দেশবিভাগ রোধের চিন্তা ... ৩৩০
দেশের দুরবস্থার কথা ... ৭, ১৪৭, ২৫৮, ৩৫১
দৈববাণী কী ... ৪
দৈবানুগ্রহ লাভের রহস্য ... ৩২৫
দোল-উৎসব ... ১৬৩, ১৬৪
দোলে আবীরদানের তাৎপর্য্য ... ১৬৫
দোলের ছড়া ও তার ব্যাখ্যা প্রদান ... ৮৪
দ্রোণাচার্য্যের জন্মরহস্য ... ৪৪

ধ

ধর্ম্ম ... ২৬৬, ২৭৫, ৩৫৮
ধর্ম্মচর্য্যা ... ৩৫৮
ধাতুগত অর্থ ধরার কারণ ... ২১১
ধাতুর ধারা ... ৩৩৮
ধ্যান ... ২৯৬, ৩২২
ধ্যানের স্থান ... ৩৩৬

ন

নব উপবীত পরিধান ... ১৬৬
নবসায়কদের বর্ণ সম্বন্ধে ... ৮৩
নরকভোগের অর্থ ... ২৬৬
নাম ... ২৪৫
নামকরণে ক্রম ... ১৪৩
নামকালে শ্রুত শব্দের বিবরণ ... ৯৮
নামের ছন্দ ... ২৯৯
নারীর মিলিটারী ট্রেনিং ... ১৬৭

বিষয় পৃষ্ঠা

নারীর স্থান ... ৩৪৬

নিঃস্বার্থ সেবাদানের ফল ... ২৮২

নিজের দোষ ক্ষমা করতে নেই ... ২৫৬

নিন্দা নিরসনের পদ্ধতি ... ৩১৬

নিয়ন্ত্রিত হয় কে ... ৩৩১

নিরামিষ আহারের আদেশ ... ৩২৮

'নিরালা নিবেশ' গৃহের কথা ... ৩৬৩

নিষ্ঠা ... ২৬৬, ২৭৬, ২৮৯, ২৯১, ৩০৩, ৩২৬, ৩৪৫

নিষ্ঠাবানের চরিত্র ... ৩২৯

নিষ্ঠার পরখ ... ২৭৬

নিষ্ঠার শক্তি ... ১১৮, ২১৪, ২২২, ২৩১, ২৩২, ২৩৫, ২৫৩, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮, ২৮৮, ৩০৩, ৩৪৪

নিষ্ঠার সঙ্গে পুরুষকার যুক্ত হলে ... ২৭৩

নিষ্ঠাহীনের চরিত্র ... ৩৩৬

নেতিবাদে ত্রুটি ... ২৬১

প

পঞ্চবায়ু ও পঞ্চপ্রাণ ... ৩১১

পড়ার প্রেরণাদান ... ২৮

পরখ-পাঞ্জার উদ্দেশ্য ... ২৪৬

পরমপিতার ইচ্ছা ... ২৮৯

পরমপুরুষ ... ৩০১

পরস্পর মিল হয় না কেন ... ২৫৩

পরাক্রমী নিষ্ঠা ... ৩১৬

পরিত্রাণায় সাধুনাম্'-এর অর্থ ... ২২১

পরিবেশ নিয়ে চলার তুক ... ২৫১

পরিবেশের সেবা করার নির্দ্দেশ ... ২৪২, ২৮৭, ৩০০

পরিবেশের সেবার গুরুত্ব ... ১০

বিষয়		পৃষ্ঠা
পরিস্থিতির সুবিনায়ন	...	১৪৮
পাঠ্যবিষয় কেমন হবে	...	৬২
পাণ্ডবদের জন্মবৃত্তান্ত	...	৪৫, ১৬০
পাতিত্য আসে কিভাবে	...	১৪৩
পায়ের ব্যথার প্রতিবিধান	...	৩৪৩
পারগতা আসে কিসে	...	২০৪
পারশব	...	২০০, ২০৬
পারস্পরিকতা চাই	...	১২৮, ২৭২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৬, ২৮৭
পারিজাত শব্দের অর্থ	...	৩১১
পার্লারগৃহ দ্রুত সম্পন্ন করার কথা	...	৬১
পার্লারে গৃহপ্রবেশ	...	২৪৮
পার্লারে পরদা টাঙ্গানো	...	৩৬১
পার্লারে রাত্রিবাস	...	৩৭৫, ৩৭৬
'পুত্রাৎ পিণ্ডপ্রয়োজনম্'-এর ব্যাখ্যা	...	৩৬২
পুরাণকাহিনীতে সত্য আছে	...	১৪৭
পুরাতনে প্রীতি	...	৬৬, ২৭০, ৩০২, ৩৫০
পুরানো দিনের কথা	...	৭২
পুরীতে বাড়ি কেনার কথা	...	২১৯
পুরুষোত্তম	...	২৭১, ২৭২
পুলিশের কাজ	...	২৪৬
পূজার উদ্দেশ্য	...	১৪০
পেয়ে কৃতজ্ঞ হ'তে হয়	...	১১৪
পোষ-মানা জীবের শ্রেষ্ঠত্ব	...	১১৬
পৌরাণিক দেবদেবী প্রসঙ্গে	...	১১৫
প্রকৃত বিচার	...	১৪
প্রকৃত শিক্ষা	...	১০
'প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি'-এর অর্থ	...	৩৬
প্রকৃতি বদলায় না	...	২৬, ১৭৬, ৩৩০
প্রচারকের দায়িত্ব	...	৩৩৩
প্রণামকালে কাশির দাপট	...	৫৩

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রতিলোম-চরিত্র ... ২০১, ৩৩৫
প্রতিলোমদোষ সংশোধনের উপায় ... ১৩১
প্রতিলোম-শ্রবণে অস্বস্তি ... ৩৬১
প্রতিলোম সৃষ্টি হয় কিভাবে ... ১৫৯, ৩৪২
প্রতিলোমের ভয়াবহ পরিণতি ... ১৪৪
প্রধান শিক্ষক ... ৩৫৩
প্রভাব বিস্তারের তুক ... ৩২৩
প্রশ্ন করার রীতি ... ৩৩৪, ৩৩৫
প্রাইভেট পরীক্ষার সুযোগ থাকা উচিত ... ১০৯
প্রাচীন পদ্মবীজের প্রস্ফুটন ... ২৬২, ২৬৫, ২৭৪
প্রিয়জনবিয়োগে শোক কেমন হওয়া উচিত ... ২৩৮
প্রোটন তার অক্ষের চারদিকে ঘোরে ... ১২৪
প্রোটিন আছে সব কিছুতে ... ৩৬০

ব

বংশ উন্নত করার উপায় ... ৩৪১
বংশীধ্বনি ... ৩৭২
বই ছাপাবার ফাণ্ড করার কথা ... ১৭৭
বক্তা হিসাবে কোথাও যেতে হ'লে ... ১৪৬
বর্ণের উদ্ভব ... ১৪৩
বর্ণের গুরুত্ব ... ২০৬, ৩০৯
বর্ত্তমান শিক্ষা ... ২, ৯
বাঁচাবাড়ার জন্য করণীয় ... ২৮৮
বাঁচার আকৃতি সবারই ... ১৯৮
বাড়ী তৈরির যোগ্য স্থান ... ১১০
বাণীগুলি পুস্তকাকারে ছাপাবার প্রস্তুতি ... ৭০, ১৯৩
বাণীগুলি রক্ষা করার আদেশ ... ১৯১, ১৯৯
বাণীর আগম সম্বন্ধে ... ২১, ২২, ২৩, ২৪, ১০০, ১৭২
বাণীর ইংরাজী করার কথা ... ১৭৪
বাণী সম্বন্ধে ... ১৫২, ১৭৪, ২১১, ২১২, ২৩০, ২৬৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
বিদেশী পণ্ডিতদের অবদান	...	১০৬, ১০৭
'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'-এর তাৎপর্য্য	...	২২১
বিবাহনীতি সগোত্রীয়দের	...	১৫৩
বিবাহ—পাণ্ডু ও কুন্তীর	...	১৬০, ১৬১
বিবাহ ব্যাপারে লক্ষণীয়	...	১৫৯
বিবাহ—মূর্দ্ধাভিষিক্ত পুত্রকন্যার	...	১৫৭
বিবাহ সদৃশই ভাল	...	১৫৯, ২১৯, ৩১৩, ৩৪১
বিবাহে কুলীন ও শ্রোত্রিয়	...	১৫৬
বিবাহে কোষ্ঠী না থাকলে	...	২৯
বিবাহে ব্যতিক্রমের পরিণাম	...	৩০৬, ৩০৭
বিবাহে ব্যতিক্রমের সূত্রপাত	...	১৫৯, ৩০৭
বিবাহে শ্রদ্ধার স্থান	...	২৯০
'বিশাসিত ব্যক্তিত্ব' মানে	...	১৩৬
বিশ্বাস	...	৩৫২, ৩৫৩
বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন	...	২২৬
'বিহিতবহিত্রচরিত্রম্ অখেদম্'-এর অর্থ	...	১৭৯
বীজদেহে আত্মার অনুপ্রবেশের ধারা	...	৪৮
বীজমন্ত্র প্রসঙ্গে	...	৪১, ৪২
বৃন্দাবন মানে	...	২৭১
'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন'-এর অর্থ	...	৩১
বেগার-প্রথার প্রশংসা	...	১২৭, ২৩৬
বেতনভোগী বামুন	...	৩৬২
বেদের বিভিন্নতার কারণ	...	১৯৯
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে আনন্দ	...	৩৪৩
বৈদ্য-কায়স্থের বিবাহ অবৈধ	...	২৬৫
বৈদ্যনাথ	...	৩২৪
বৈষ্ণব দর্শনের সার কথা	...	২৩০
বোধের উদ্ভবে পরাক্রমের স্থান	...	২০৭
'বোম বিশ্বনাথ' বলে কেন	...	৩৪২
বোমা ফাটার আগে থামানো সম্ভব	...	১২২
বোমা বিস্ফোরণে ক্ষতি	...	১২২, ১৩৯

বিষয় পৃষ্ঠা

ব্যক্তিত্ব ... ২৩৫

ব্যবসায়ে সাফল্যলাভের তুক ... ৩৪, ৩৫, ১৩৪

ব্যবহারবিধি ... ২৫, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩২২

ব্যায়াম করার নীতি ... ৬

ব্রহ্ম ... ২০০

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথ ... ৩৬৯, ৩৭০

ব্রহ্মবিদ্ ... ২০০

ব্রহ্মভাবনা ... ৩৬৯, ৩৭০

ব্রাহ্মণ-চরিত্র ... ২৫৯

ব্রাহ্মী সত্তা ... ২০১

ব্রিটিশরা কুলকৃষ্টি মানে ... ৩০৬

ভ

ভক্তির চরিত্র ... ২৮৯

ভগবৎ-পথিকের চরিত্র ... ২৬৭

ভগবান ... ৩২৩

ভগবান কাছেই থাকেন ... ৩৭৪

ভগবান কার কথা শোনেন ... ১১৬

ভগবানের আবির্ভাব ... ১৮০

ভজন ... ২৬৭, ৩৩২, ৩৭০

ভাগ্যের বিকাশ ... ২১০

ভাব-অনুপাতিক কর্ম্মসম্বেগ হয় ... ২৭৭, ২৭৮

ভাব-অনুপাতিক ভাষা হয় ... ২১২

ভাববাণী প্রসঙ্গে ... ৩৬২

ভাববৃত্তি ... ১১১, ১৮৮

ভাববৃত্তির ক্রিয়া ... ১১১, ১৪১

ভারতের কর্ত্তব্য ... ৩৫০

ভাল ও খারাপ ... ১৩৬

ভাল লোক না জন্মাবার কারণ ... ৩৬৫

ভুল হ'লে ... ২৫৬, ৩২৭

বিষয়		পৃষ্ঠা

ম

মন্ত্র	...	২৪৫
মহাকাশ্যপ-চরিত্র	...	২৪৭
মহাপ্রাণ কে	...	২৮৭
মহাভারত	...	২৭০, ২৭২, ৩১২
মাটির হাঁড়িতে রান্না ভাল	...	২১৯
মাতৃস্মৃতি	...	৩৪৫, ৩৬৪
মাদুলি ধারণে রোগনিরাময়	...	৩২৫
মানুষই আসল সম্পদ	...	৩৩৭
মানুষ সংগঠন প্রসঙ্গে	...	১২৬, ৩০৮, ৩৪৬
মানুষের পেটে অন্য জীব হওয়ার কারণ	...	১৩২
মানুষের বিভাগ	...	১৮২
মানুষের সম্পদ	...	২৭২, ২৭৫
মায়া	...	২০০
মৃত্যুর পর আত্মার অধিষ্ঠান	...	১৮৭
মৃত্যুর পরেও চেতনা থাকে	...	১ ১৮
মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে	...	১ ৭৬
মেয়েদের সিনেমায় নামা প্রসঙ্গে	...	১০৮
মেয়েরা টক ভালবাসে কেন	...	৩৩২
মেরী ম্যাগডালিন	...	১৯৩
মোক্ষ সম্বন্ধে	...	৩৭০

য

যাজন	...	২৩০
যাজনের ভূমি	...	৩
যুক্তি কাকে বলে	...	২০২
যুধিষ্ঠিরের দ্রৌপদীকে পণ রাখা	...	১৭০
যুদ্ধ করে বিবাহের প্রথা ছিল কেন	...	১৫৭
যোগ্যতার বিচার	...	৪৯
যোগ্য লোকের অভাবে	...	১১৭

বিষয় পৃষ্ঠা

র

রন্তিদেবের কথা ... ৩৬৫
রাবণ-চরিত্র ... ১৫৬, ৩২২
রামদাস-শিবাজী ... ১৯০, ২১৫
রামপ্রসাদী সঙ্গীত ... ২০২
রামায়ণ-মহাভারতের গুরুত্ব ... ৪৫
রামলীলার তাৎপর্য্য ... ৩৬৬
রুটিনমাফিক চলা মানে কী ... ১৪২
রেকর্ড রাখার প্রয়োজনীয়তা ... ৪৬
'রেতঃ-নিক্কণ' শব্দের তাৎপর্য্য ... ১২৯, ১৩০
'রেতঃনিক্কণী সাত্বত সঞ্জিত সম্বেগ'-এর অর্থ ... ১৩৫
রোগ-নিরাময়ে যাদুর আশ্রয় ... ১৮৯
রোগ-নির্দ্ধারণের কৌশল ... ২১০

ল

লক্ষ্যে অবিচল নিষ্ঠা চাই ... ৩২৮
লাঠির পবিত্রতা রক্ষা ... ১, ২৬১
লীলা ... ২৮৯
লোকচর্য্যার প্রকৃতি ... ৩৩৯
লোকবুভুক্ষা ... ১৬, ৩৬, ৪৩, ৭৪, ১২১, ১৪৫, ১৯১
ল্যাবরেটরি করার চিন্তা ... ১২৫

শ

শকুনি-চরিত্র ... ১৫৬, ১৬১
শঠের সঙ্গে চলার রীতি ... ৩১৮
শবাসনের ক্রিয়া ... ২৫১
শব্দ-গন্ধের উচ্চায়িত অবস্থা ... ২৯৮
শব্দব্রহ্ম ... ৩৪৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
শব্দশ্রবণের কলাকৌশল	...	৩৪৭
শব্দের অর্থ করার নীতি	...	১৩৩
শসার উপকারিতা	...	৬৬
শান্তি	...	২৯৭
শাসকরা গোলাম হবে না	...	২৮২
শিক্ষক-গৌরবী ছাত্র	...	৩১৬
শিক্ষকের উপজীবিকা	...	২৮৩
শিক্ষকের দায়িত্ব	...	১১, ১২, ১৩১
শিক্ষকের সম্মান	...	৩৩৪
শিক্ষায় গণতন্ত্র চলে না	...	৬৯, ১১০
শিক্ষায় ঝোঁকের গুরুত্ব	...	১৫
শিক্ষার আদর্শ	...	৩৫৩
শিক্ষার ভূমি	...	১০৯, ২৯৪, ৩০৩
শিখাধারণের তাৎপর্য্য	...	২৮৮
শিবচতুর্দশীতে রাত্রিজাগরণের কারণ	...	১২৯
শিশুদের কাছে গল্প কেমন করা উচিত	...	৩৫২
শুক্র অর্থ	...	৩৬৪
শ্রদ্ধাভক্তি লাভের পথ	...	২৯১
শ্রীকৃষ্ণ	...	১৮৪, ১৮৬, ২২৫, ২৭২, ৩১৩
শ্রীকৃষ্ণকে কাল্পনিক বলার পরিণাম	...	৩৫৯
শ্রীরামকৃষ্ণদেব	...	১৯, ২৩০, ২৪৭, ২৫২, ৩২৩, ৩২৭, ৩৩৩
শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘরোয়া পরিবেশে	...	৬৪, ১৫১, ১৫২, ১৫৪, ১৬৩, ১৭৬, ১৯০, ২১৬, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৫
শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধান	...	১৪৯, ৩৬৭
শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুস্থতা	...	৪৭, ৪৯, ৫০, ৫৪, ৫৯, ৬০, ৬৭, ৭৬, ১০৮, ১৪২, ১৮৯, ২৩৭, ৩০২, ৩১০

বিষয় পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীঠাকুরের আত্মকথা ... ২৪, ২৭, ৩০, ৪১, ৪২, ৬৮, ৭৯, ১০৩, ১০৬, ১১০, ১১১, ১১৫, ১১৯, ১৪৪, ১৫৫, ১৭০, ১৭৭, ১৮৫, ১৯৪, ২০৯, ২১০, ২১৯, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৩১, ২৩৭, ২৫৩, ২৬৯, ২৭০, ২৯৭, ২৯৮, ৩০৮, ৩২০, ৩২১, ৩২৩, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৪৯, ৩৫০

শ্রীশ্রীঠাকুরের আত্মপ্রসাদ ... ৭৭, ৯৬, ১৮২, ২০৭

শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর ... ৩২, ৩৩, ১৩২, ১৬৯, ১৮৩, ৩৫২

শ্রীশ্রীঠাকুরের আবৃত্তি ... ২৫, ১৮৪, ২৭৯, ২৮৪

শ্রীশ্রীঠাকুরের আশা ... ১৭৫, ১৯৮, ২৭৩, ৩৫১

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা পূরণ হয় না কেন ... ৩৩৪, ৩৫৪

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার শক্তি ... ২৫১, ২৭৯, ২৮১, ৩৫১

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার সমর্থন ... ২৬৭, ৩২০, ৩৫৮

শ্রীশ্রীঠাকুরের কষ্ট ... ১২, ১৫৫, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৫১, ৩৫৮, ৩৬৭

শ্রীশ্রীঠাকুরের চাওয়ার কারণ ... ৩২৬

শ্রীশ্রীঠাকুরের চাহিদা ... ৮৩, ১১১, ২৪১

শ্রীশ্রীঠাকুরের দরদ ... ২৭, ৫১, ৫৫, ৫৭, ১৪৯, ১৭৪, ২২০, ২৩০, ২৩৯, ২৪৯, ৩৪৪, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭২

শ্রীশ্রীঠাকুরের দান ... ১২০, ১৬৯, ২১৭, ২১৮, ২৩৮, ২৪৪, ২৪৮, ২৬৪, ৩৬০

শ্রীশ্রীঠাকুরের দীক্ষিত ... ২৪৯, ২৫০

শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্র ... ২৮০

বিষয়		পৃষ্ঠা
শ্রীশ্রীঠাকুরের পরীক্ষা	...	১৩২
শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্বজন্মকথন	...	২৫৭
শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রশংসা	...	৬২, ৬৮, ৭২, ৭৩, ৯৭, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১১২, ১৪৮, ১৮৩, ১৯৫, ২০২, ২১২, ২৩১, ২৩৮, ২৬৭, ৩৫২
শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেরণাদান	...	১৬৭, ১৬৮, ২০৩, ২১৯, ২৩৩, ২৫৯, ৩০১, ৩০৩, ৩০৯, ৩১১, ৩১২, ৩১৯, ৩৪৯, ৩৫৭
শ্রীশ্রীঠাকুরের ভর্ৎসনা	...	১৩৯
শ্রীশ্রীঠাকুরের ভিক্ষা	...	২৩৫, ২৬৩, ২৬৯
শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রমণ	...	২১১, ২১৪, ২১৭
শ্রীশ্রীঠাকুরের রসিকতা	...	৫৮, ৬০, ৯৭, ১৩৮, ১৪৭, ১৪৯, ১৭০, ১৭৮, ২১৫, ২২১, ২৪১, ২৬৮, ২৭০, ৩৭১, ৩৭৩
শ্রীশ্রীঠাকুরের লোকব্যবহার	...	২২৯, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৯, ২৪৩, ২৪৮, ২৮৭, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ৩২০, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৫৬
শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গীত	...	১১৬, ১৮২, ১৮৩, ১৯০, ১৯৪, ২০১, ২১৭, ২২৭, ২৩১, ২৩৭, ২৬৯, ২৭৮, ৩৪২, ৩৭৪
শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে কলহ	...	১১৩, ১৬৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবক	...	১৫০
শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বপ্নদর্শন	...	৪০, ১০৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বস্তি	...	৩১৪
শ্রীশ্রীবড়মা	...	৩৪৬

বিষয় পৃষ্ঠা

স

সংবাদপত্র বের করার ইচ্ছা ... ১৮৪
সংসারে চলার রীতি ... ১২৬, ১৩৫, ১৫৩, ২১৫, ২১৬
সংস্কার ... ৩
সংস্কৃতি ... ১৭
সঙ্গীতপ্রীতি ... ৩৫৫
সতী ... ১৯৩
সত্তাই চালনকেন্দ্র ... ১২৬
সত্য ও ন্যায় ... ৮৭
সত্য কথনের নীতি ... ৩১৬
সৎসঙ্গ-নামকরণ ... ২৭০
সৎসঙ্গের সভ্য ... ৬৯
সৎসঙ্গের সাধনা ... ৩৩০
সদ্‌বংশের নিশানা ... ৩১৩
সন্ন্যাস ... ১৮৮
সপ্তলোক ... ৫
সভা করতে হ'লে ... ২৭৫
সময়মতো কথা না বলায় অসুবিধা ... ১৬৯, ১৭৫
সমাধি-অবস্থা ... ২৯৩, ২৯৫
সরকারী সাহায্য গ্রহণে অনিচ্ছা ... ১৩
সরস্বতীপূজায় অঞ্জলি দান ... ৭৮
সর্ব্বজ্ঞ ... ২০৮
সাধনা ... ২৯৫, ৩০৮
সুকেন্দ্রিকতার ফল ... ২৭৭
সুখ ও দুঃখ ... ১২
সুদামা-কাহিনী ... ২৩৫
সুন্দর হওয়ার তুক ... ২২৮
সুরত-সাকীর তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ ... ১০৪
সুরলোক ... ৩১৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
সূক্ষ্ম ব্যাপারে দৃষ্টি	...	১৬, ৩৫, ৬০, ৬৪, ১১৪, ১৩৯, ১৮৭, ২২৮, ২৩১, ২৬৮, ২৭৪, ৩৭৬
'সৃজন-প্রগতি' প্রসঙ্গে	...	৩৪৯
সৃষ্টিধারায় এককত্ব	...	১৮৬
সৃষ্টিধারায় স্পন্দনের ক্রিয়া	...	৩৪৮
সৃষ্টির উদ্দেশ্য	...	২৮৯
স্ত্রীর দায়িত্ব	...	১৩৪
স্বপ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের চাহিদার অর্থ	...	৭৬, ১৪১
স্বর্গ	...	৫, ২৮৭
স্বর্গের অধিষ্ঠান	...	১২৪
স্বামীহারাকে সান্ত্বনাদান	...	১৯, ১১৩
স্বার্থলোভীর চরিত্র	...	১৪৫

হ

হতাশকে উদ্দীপিতকরণ	...	৩০৩, ৩০৮, ৩০৯
হল্‌ঘরে প্রবেশ	...	১৭৮
হল্‌ঘরের স্মৃতি-রোমন্থন	...	১৭৯
হনূমান	...	২২৯, ২৪৪, ৩২১, ৩২৬

A

Advent	...	৩৫৪
Allegiance form লেখার আদেশ	...	১২১
Auto-initiative serviceable attitude	...	১১১

B

Behaviour correct হয় না কখন	...	১৯৭

C

Caste মানে	...	৩০৭, ৩০৯
Combustion কী	...	১০৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
Conference মানে	...	২৮৬
Conversation লেখা সুরু	...	৩৪৯
D		
Day of judgement	...	৫
Degeneration-এর কারণ	...	৩৩৩
Discipline কিভাবে আসে	...	২১৩
E		
Economy adjust করার পথ	...	২৫৯
Education	...	২৩০
Education-এ consistancy	...	১৯৭
Energy সব কিছুর মূলে	...	২০২
F		
False Prophet	...	৪৪, ৩৩৩
Freedom	...	২৮৩
G		
Greatest good for every individual	...	২১২
H		
Heaven	...	৩১৪
Hereditary trend	...	১৩৮
I		
Independence	...	২০৩
Intelligence-এর উদ্ভব	...	১৫৩
Interpolation-কে resist না-করার পরিণাম	...	১৩১
Intuition-এর উদয়	...	১৪৬, ২০৯
J		
Justice	...	১৩

বিষয়		পৃষ্ঠা
K		
Knowledge	...	৪, ৯৩, ৯৪, ২৬৬
L		
Light and mass theory	...	১২১
Loving magnet	...	৩২৮
Law-book লেখার কথা	...	৩
M		
Mathematics-এর প্রভাব	...	৩১৪
Mixed Course	...	১০৯, ১২৫
Modestly bitter হওয়ার আদেশ	...	১২৩
Mutation-এর সম্ভাব্যতা	...	১৯৮
N		
Neutrality সাজে কার	...	১৬
Normal education	...	১৫১
P		
Philology	...	৩০২
Physics-এর আরম্ভ	...	৩৪৪
Positive-চিন্তায় অগ্রগতি	...	৩১৮
Power inpart করতে পারে কারা	...	৩২৯
Psychological manipulation	...	৩২৭
R		
Ray shoot করা প্রসঙ্গে	...	১২৬
Religious education-এর গোড়ার কথা	...	১৩০
Resist no evil-এর অর্থ	...	৩০১
S		
Science	...	৩০৯
Self-regarding sentiment-এর উৎপত্তি	...	১৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
Sex-urge মানে	...	৩০
Soul	...	১১৭
Spelling correct করার তুক	...	৩১৯
Sperm always dominating	...	১৭৩
Student unrest-এর কারণ	...	২১৩

T

Tackle করা মানে	...	৩২১
Thakur as I know Him নামে বই লেখার আদেশ	...	১১৯
Traditional Trail	...	১৩৬, ১৩৭

U

University	...	১১

V

Vibration manipulation-এর ক্রিয়া	...	৩৪৫, ৩৪৮, ৩৫০
Virtue	...	৯

W

Wealth of the country	...	২৮২
Will	...	২১০
Wisdom	...	২০৭

Z

Zygote form-এ affinity-র স্থান	...	২০৫